লুইস ক্যারল
রচনাবলী



লুইস ক্যার্‌ল রচনাবলী

২

অনুবাদ

লীলা মজুমদার ॥ জয়ন্ত চৌধুরী

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন ১৩, ১৩৮৩
ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৭৭

প্রকাশিকা :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিণ্টিং প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

অলঙ্করণ :
স্যার জন টেনিয়েল

প্রচ্ছদ লিপি :
সুব্রত ত্রিপাঠী

বাঁধাই :
সুবর্ণ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য :
পঁচিশ টাকা

মুখবন্ধ

প্রখ্যাত রসিক এবং সাহিত্যিক জি, কে চেস্টারটন ১৯৩২ সালে, লুইস ক্যারলের জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে, বেশ আশঙ্কাভরেই মন্তব্য করেছিলেন যে, অ্যালিসকে নিয়ে পণ্ডিতরা যেরকম উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে অ্যালিস যে শিগগিরই একটা প্রাণহীন ঐতিহাসিক পুরাবস্তুতে পরিণত হবে, তার ভয়ঙ্কর সূত্রপাত ইতিমধ্যেই সাতঙ্কে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লিখেছিলেন, "বেচারা অ্যালিস! ধরে-বেঁধে তাকে পড়তে বসানো তো হয়েইছে, সেইসঙ্গে অন্যদেরও জ্ঞান দেবার চেষ্টা চলেছে তার মাধ্যমে। অ্যালিস এখন শুধু আর পড়ুয়াই নয়, ইস্কুলের দিদিমনিও বটে। তার ছুটির পালা, খুশির পালা শেষ; লুইস ক্যারলের (ডজ্‌সন) হাতে কলমের বদলে আবার গুঁজে দেওয়া হয়েছে গুরুমশাইয়ের বেত। এবার থেকে কত-শত প্রশ্নপত্রেই-না দেখা যাবে এই ধরনের সব জিজ্ঞাসা: (১) এই-সকল বিষয়ে যাহা জান, লিখ:—মিম্‌সিয়ে, গিম্‌গিম্, কৈ মাছের চোখ, ঝোলাগুড়ের কুয়া, মনোহর স্যপ। (২) 'আয়নার ওপারে', দাবার ছকে অ্যালিস কোন ঘর হইতে কোন ঘরে অগ্রসর হইয়াছিল, চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। (৩) গোঁফ সবুজ হইয়া যাইলে যে সামাজিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তাহার প্রতিকারকল্পে সাদা নাইট বাস্তবে কী উপায় অবলম্বন করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন? (৪) টুইড্‌লডাম ও টুইড্‌লডী-র পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।"

দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধ লিখতে বসে ভয় করছে (সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান'-এ তৃষ্ণার্ত পথিকের কথা মনে পড়ে), পাঠকের সামনে যখন রসের হাঁড়ি টইটুম্বুর, তখন অযথা খানিকটা ভূমিকা ফাঁদতে গিয়ে সেই রসের হাঁড়ির মুখটাই না বন্ধ করে ফেলি। তবে চেস্টারটনের আশঙ্কাটা ছিল পণ্ডিতদের সম্পর্কে; আমার দিক থেকে সেইটাই একমাত্র ভরসার বিষয়।

রসাস্বাদন করার আগে জিভটাকে শানিয়ে নেবার জন্য অ্যালিস এবং লুইস ক্যারল সম্পর্কে যতখানি জানা দরকার, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এবং পরিচয়পত্র তার পক্ষে যথেষ্ট বলেই আমার বিশ্বাস। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে রস গেঁজে যাবার ভয় থাকে।

একটা ব্যাপার এই অবকাশে উল্লেখ করে রাখা যাক। অ্যালিসকে নিয়ে আশ্চর্য দুখানি বই লেখার পর, কেন কে জানে, ক্যারলের সম্ভবত মনে হয়েছিল, ছোটোদের কিছু সারগর্ভ নীতিকথা শোনানোর পবিত্র দায়িত্বটা বোধ হয় এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই বোধটা, মনে হয়, পীড়িত করেছে তাঁকে অনুক্ষণ। আর তাই থেকে জন্ম নিয়েছে 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'র দীর্ঘ কাহিনী দুটি। সিল্‌ভির মধ্যে, গোড়ার দিকে কোথাও কোথাও একটি সুকুমারী কিশোরীর ছায়া যে ভেসে উঠেছে বার বার (আসল অ্যালিস

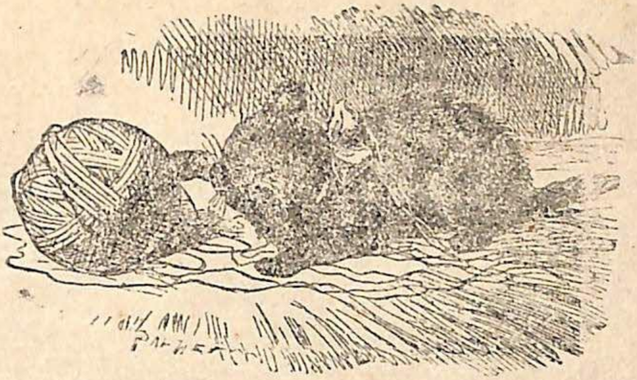
সত্যিই আর তখন খুকি নেই), পাগলা মালির ক্ষ্যাপাটে গানের মধ্যে যে ফুটে উঠেছে অ্যালিস কাহিনীরই উদ্ভট রসের ব্যঞ্জনা, সেটা বুঝতে দেরি হয় না ঠিকই। কিন্তু যখনই লেডি মিউরিয়েল-এর গম্ভীর আলোচনা আর অন্যান্য বয়স্ক চরিত্রের মহানুভবতা বা কূটকৌশলের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, কিম্বা সব ঘটনার পরিণতি দেখি ধর্মের জয়ে এবং অধর্মের পরাজয়ে, তখন আর এ কথা মনে না করে উপায় থাকে না যে, লুইস ক্যারল নিজে থেকেই রসের ভিয়ান নামিয়ে পাঁচন তৈরির ব্রত নিয়ে ফেলেছেন ; পাগলা প্রফেসরের সঙ্গে সাদা নাইটের যত সাদৃশ্যই থাকুক, শিশু-মনের খেয়াল-খেলার সাথী লুইস ক্যারল যে নতুন করে অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অধ্যাপকের জোব্বা পরে চার্লস লাট্‌উইজ ডজ্‌সন বনে গেছেন, তাতে সন্দেহ থাকে না। ফাঁকে ফাঁকে ক্যারল উঁকি মারেন বটে, কিন্তু প্রাধান্য পান না। কেন এমন হল ? বাস্তব জীবনে আসল অ্যালিসের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ পড়ার জন্যই কি ?

লুইস ক্যারল এবং তাঁর রচনা সম্বন্ধে এত আলোচনা হয়েছে, ওদেশে, এত গ্রন্থ লেখা হয়েছে যে কোনো সার্থক লেখকের পক্ষেও যা শ্লাঘার বিষয় হতে পারে (সে হিসাবে ক্যারল তো এমন কিছু বেশি লেখেন নি)। ব্যক্তিগত জীবনের প্রেক্ষিতে তাঁর রচনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে যত বই বেরিয়েছে, এত আর কোনো একটি লেখকের সম্বন্ধে বোধ হয় নয়।

কিন্তু, এহ বাহ্য। দুটো মলাটের মাঝখানে, পাতায় পাতায় যেখানে বিমল আনন্দ আর নির্দোষ কৌতুকের এমন অনন্য পসরা সাজিয়ে দেবার সৌভাগ্য অর্জন করা গেছে, সেখানে সন্দেশ খাওয়াবার নাম করে গুণতে শেখানোর দুর্ভাগাকে জোর করে টেনে আনবার প্রয়োজন কী ?

চেস্টারটনের আশঙ্কা যেন সত্যে পরিণত না হয়।

জয়ন্ত চৌধুরী



লুইস ক্যারল রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

আয়নার ওপারে অ্যালিস

বাস্তব জীবনের অতি আদরের খেলার সাথী, প্রতিবেশীর ছোট্টো ফুট্‌ফুটে যে মেয়েটিকে কল্পনার আসনে বসিয়ে লুইস ক্যারল (চার্লস লাটউইজ ডজ্‌সন) 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' রচনা করেছিলেন, 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' লেখার আগেই তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটেছিল। সম্পর্কে ছেদ ঘটলেও, সেই শিশু-সাহচর্যের জাদু তখনো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি তাঁর মন থেকে। তারই রেশটুকু বজায় থাকতে থাকতেই 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' লেখবার অবকাশ পেয়েছিলেন লুইস ক্যারল। অ্যালিসকে নিয়ে লেখার এইখানেই ইতি। একই রসের কাহিনী, কল্পনা আর বাস্তবের সেই একই অবাধ আত্মীয়তা, সম্ভব আর অসম্ভবের সেই একই অনায়াস সমাহার ; সব জড়িয়ে আর একটি অনবদ্য রচনা, যা লুইস ক্যারলের লেখনী ছাড়া বেরুনো সম্ভব নয়। 'আজব দেশে অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার' যাদের পড়া হয়ে গেছে আলোচ্য রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে, 'আয়নার ওপারে অ্যালিস' যদি তাদের আরো ভালো লাগে, সেটা কিছু অভাবিত ব্যাপার নয়।

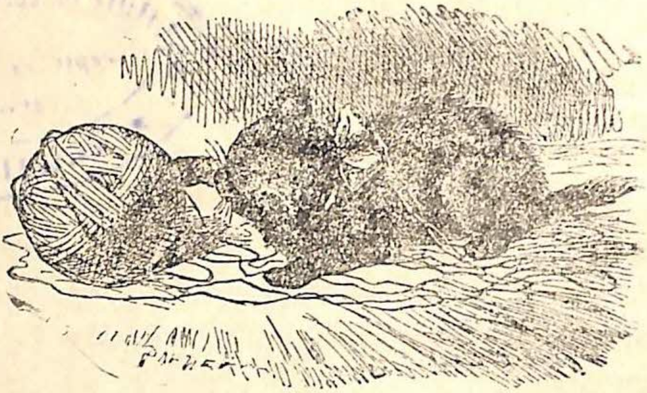
প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়না-বাড়ি

এই ব্যাপারে সাদা বেড়াল-ছানাটার যে কোনো হাত নেই, সেটা নিশ্চিত ; দোষ পুরো ঐ কালো বেড়াল-ছানার। কেননা, গত মিনিট পনেরো ধরে সাদা ছানাটা ধাড়ি মেনির কাছে আটকে আছে—মেনি তার মুখ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। (বাচ্চাটা মুখ বুজে সয়েও যাচ্ছে বটে) ; কাজেই, দেখা যাচ্ছে, এই দুষ্কর্মের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

ডাইনা তার ছানা-পোনাদের মুখ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল এইরকম করে : প্রথমে একটা থাবা দিয়ে এক বেচারার কান পাকড়ে মাটিতে ঠেসে ধরলে, তার পর আর-এক থাবা দিয়ে তার সারা মুখটা ঘষতে লাগল—তাও আবার নাকের ডগা থেকে শুরু করলে, যেটা একদম নিয়ম নয় ; আর এখন, আগেই যা বললুম, সাদা বাচ্চাটাকে নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত। বাচ্চাটা একদম চুপটি করে পড়ে আছে আর গলা দিয়ে খুশির আওয়াজ বার করবার চেষ্টা করছে—নিশ্চয়ই বুঝেছে যে, এ-সব তো তার ভালোর জন্যেই বটে।

কালো বাচ্চাটাকে আগেই সারা হয়ে গেছে ও-বেলা, তাই বিরাট আরাম-কেদারার এক কোণে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসে অ্যালিস যখন মাঝে-মাঝে ঢুলছিল আর আপন মনে বকবক করছিল, কালো বাচ্চাটা সেই

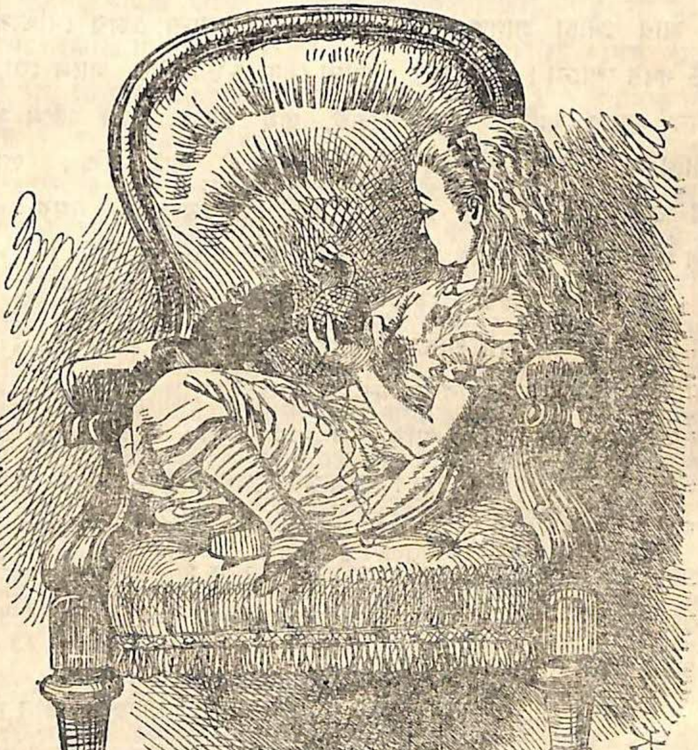


তালে পশমের গোলাটা নিয়ে নেচে-কুঁদে দিব্যি খেলা করতে শুরু করে দিয়েছে। অ্যালিস অনেকক্ষণ থেকেই গোলাটা পাকাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কেবলই খুলে খুলে যাচ্ছিল। আর এখন দেখ-না কী হাল হয়েছে, আগুন পোহাবার চুল্লীর সামনে-পাতা কম্বলটাময় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পশমের সতো ; এখানে জট, ওখানে গেঁট, আর তার মাঝখানে বেড়াল-ছানাটা নিজের ল্যাজটাকে ধরবার জন্যে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

বেড়াল-ছানাটাকে ধরে অ্যালিস বলে উঠল, "পাজি, নচ্ছার কোথাকার!" তার 'পর ছোট্টো করে তাকে একটা চুমু দিয়ে বোঝাতে চাইলে যে, অ্যালিসের কাছে তার আদর নেই। তার পর বললে, "ডাইনার উচিত ছিল তোমায় আরো একটু সহবৎ শেখানো!" বেশ বিরক্তি নিয়ে ধাড়ি বেড়ালটার দিকে চেয়ে আবার বললে, "সত্যিই তোমার উচিত ছিল, ডাইনা। উচিত যে ছিল, তা তুমিও জানো!" যতটা সম্ভব রেগেমেগেই বললে, তার পর বেড়াল-ছানা আর পশম নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আবার আরাম-কেদারাটাতে গিয়ে বসে গোলা পাকাতে লাগল। কখনো বেড়াল-ছানাটার সঙ্গে, কখনো-বা আপনমনে কেবলই বকবক করছে অ্যালিস, তাই কাজ বিশেষ এগোচ্ছে না। বেড়াল-ছানাটা অ্যালিসের হাঁটুর উপর খুব ভবিস্যসব্যি হয়ে বসে আছে, যেন কতই মন দিয়ে গোলা-পাকানো দেখছে, আর মাঝে মাঝে নুলো বাড়িয়ে খুব আলতো করে পশমের গোলাটা ছুঁচ্ছে, যেন সাহায্য করতে দিলে খুশি

হয়েই করে।

অ্যালিস বলতে লাগল, "কালকে কী, জানিস রে পুঁচকে? আমার সঙ্গে একটু আগে যদি জানলায় গিয়ে দাঁড়াতিস, তা হলে আন্দাজ করতে পারতিস—কী করবি, তখন তো ডাইনা তোকে সাফ-সুতরো কচ্ছিল। আগুন জ্বালার উৎসব করবার জন্যে ছেলেরা সব ডালপালা কাঠকুটো জোগাড় করছে, তাই দেখছিলাম—অনেক কাঠ লাগে, জানিস পুঁচকে! বড্ডো ঠাণ্ডা, তার ওপর বরফ পড়তে শুরু হয়ে গেল, তাই ছেলেদের চলে যেতে হল। তা হোক গে, কাল আমরা বন্‌ফায়ার দেখতে যাচ্ছি।" বলতে বলতে অ্যালিস ছানাটার গলাতেই দু-তিন পাক পশম জড়িয়ে দিয়েছে; কিছু না, কেমন দেখায়, তাই পরখ করা। কিন্তু, তার ফলে যে হাঁচড়ানি-পাঁচড়ানি শুরু হল, তাতেই পশমের গোলাটা



মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল, আর কত গজ পশম যে খুলে গেল, তার ঠিক নেই।

আবার সব গুছিয়ে-গাছিয়ে বসবার পর অ্যালিস বললে, "তোর দুষ্টুমি দেখে আমার এমন রাগ হয়েছিল যে, জানলা খুলে তোকে বাইরে বরফের মধ্যে ছেড়ে দিতুম আর একটু হলে! তোর পক্ষে সেটাই ঠিক হত, দুষ্টু-সোনা কোথাকার! কী, কিছু বলবার আছে তোমার? আমায় বলতে দাও, বাধা দিয়ো না।" এবার অ্যালিস আঙুল উঁচিয়ে বলতে লাগল, "কী কী দোষ করেছ, সব একে একে বলি। পয়লা নম্বর, ডাইনা যখন আজ তোমার মুখ পরিষ্কার করছিল, তখন তুমি মিউ-মিউ করেছিলে। উঁহু, অস্বীকার করলে চলবে না, আমি নিজের কানে শুনেছি! কী বলছিস?" (যেন ছানাটা সত্যিই কথা বলছে।) চোখে ডাইনার থাবার খোঁচা লেগেছিল? সে তো তোরই দোষ, চোখ খুলে রেখেছিলি কেন—চেপে চোখ বন্ধ করে থাকলে তো আর খোঁচা লাগত না। না, আর কোনো ওজর দেখিয়ো না, চুপটি করে শোনো! দু নম্বর: সাদা বেড়াল-ছানাটার, মানে স্নোড্রপের সামনে দুধের বাটিটা ধরে দিতেই, তুই তাকে ল্যাজ টেনে সরিয়ে দিয়েছিলি! কী? তোর তেষ্টা পেয়েছিল? তাই বুঝি? তা কী করে জানলি যে, ওরও তেষ্টা পায় নি? এবার তিন নম্বর: আমি যখন দেখছিলুম না, তখন সমস্ত পশমটা তুই খুলে দিয়েছিলি!

"এই তিনটি কুকর্ম করেছিস তুই, অথচ এখনো একটারও শাস্তি পাস নি। তোর সমস্ত শাস্তি বুধবারের জন্যে তোলা রইল।" বেড়াল-ছানাটাকে ঠিক নয়, এবার আপন মনেই অ্যালিস বলতে লাগল, "আচ্ছা, যদি আমার সমস্ত পাওনা শাস্তি ওরা এমনি জমা করে রেখে থাকে! বছরের শেষে কী করবে ওরা? আমায় জেলেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে বোধ হচ্ছে। কিম্বা—দেখা যাক—ধর, এক-একটা শাস্তি মানে এক-একবার খাওয়া বন্ধ: তা হলে, সেদিন কী দুর্দশা হবে? একসঙ্গে পঞ্চাশবার খাওয়া বন্ধ! তবে অতটা ঘাবড়াবার কিছু নেই! যা খাবার! খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াই ভালো!

"জানলার শার্সির গায়ে বরফ পড়ছে, শুনতে পাচ্ছিস, ছানু? কী সুন্দর নরম আওয়াজ! ঠিক যেন জানলার বাইরের দিকটার সারা গায়ে কে চুমু খাচ্ছে। তবে কি বরফরা গাছপালা আর মাঠেদের

ভালোবাসে বলেই অত নরম করে চুমু খায় ? তার পর তাদের আদর করে জড়িয়ে পড়ে থাকে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়ে ; হয়তো বলে, 'গরম-কাল না আসা অবধি ঘুমিয়ে থাক, সোনারা।' তার পর জানিস ছানু, গরমকাল এলে আবার যখন তারা জেগে ওঠে, তখন সারা গায়ে সবুজ পোশাকের সাজ চড়িয়ে তারা নাচে—যখনি হাওয়া দেয়, তখনি নাচে—আহা, কী সুন্দর দেখতে হয়।" এই কথার সঙ্গে হাততালি দিতে গিয়ে অ্যালিসের হাত থেকে পশমের গোলাটা আবার পড়ে গেল। "ওঃ, তাই যেন সত্যি হয়! আমি ঠিক জানি, হেমন্তে গাছের পাতা যখন হলদে হতে শুরু করে, গাছপালা-ভরা বনবাদাড়গুলোকে দেখে মনে হয়, তাদের ঘুম পেয়েছে।

"হ্যাঁ রে ছানু, দাবা খেলতে পারিস ? হেসো না তো মানিক, আমি সত্যিই জানতে চাইছি। কারণ একটু আগেই যখন খেলছিলুম, তুই এমন করে দেখছিলি, যেন সব বুঝতে পারছিস ; তার পর যখন বলে উঠলুম, 'কিস্তি!' তখন ঘড়্ ঘড়্ করলি! কিস্তিটা বেশ ভালোই দিয়েছিলুম রে ছানু, কিন্তু ঐ ঘোড়া, মানে নাইট্‌টা যদি আমার ঘুঁটি-গুলোর মধ্যে অমন তড়্‌বড়্ করে এসে না পড়ত, তা হলে বোধ হয় জিতেও যেতুম। ছানু-সোনা, আয় তো দেখি, মনে কর, আমরা যেন—" অ্যালিসের মুখের বুলি, এই 'মনে কর, আমরা যেন।' এই দিয়ে শুরু করে যে-সব কথা সে বলত, তার অর্ধেকও যদি তোমাদের শোনাবার সুযোগ পেতুম! এই তো সেদিন তার বোনের সঙ্গে তুমুল তর্ক হয়ে গেল—কারণ অ্যালিস শুধু বলেছিল "এসো, মনে করা যাক, আমরা যেন অনেক সব রাজা-রানী" ; তার বোন আবার সব ব্যাপারেই নিখুঁত হতে চায়, তাই বলেছিল যে, তা হওয়া সম্ভব নয় ; অনেকজন হওয়া যায় না, কারণ তারা মাত্র দুজন রয়েছে। তাতে অ্যালিস শেষ অবধি আগের কথাটাকে একটু বদল করে বলেছিল, "বেশ, তুমি রাজা বা রানী, একটা কিছু তো হতে পারো, আমি একাই নাহয় বাকি সব হচ্ছি।" আর-একবার তার বুড়ি দাসীকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল—তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আচমকা চীৎকার করে বলেছিল, "এক-বার মনে কর তো দাসীদিদি, আমি একটা খাইখাই হায়না, আর তুমি এক টুকরো হাড়!"

কিন্তু এ-সব বলতে গিয়ে বেড়াল-ছানার সঙ্গে অ্যালিসের কথাবার্তা

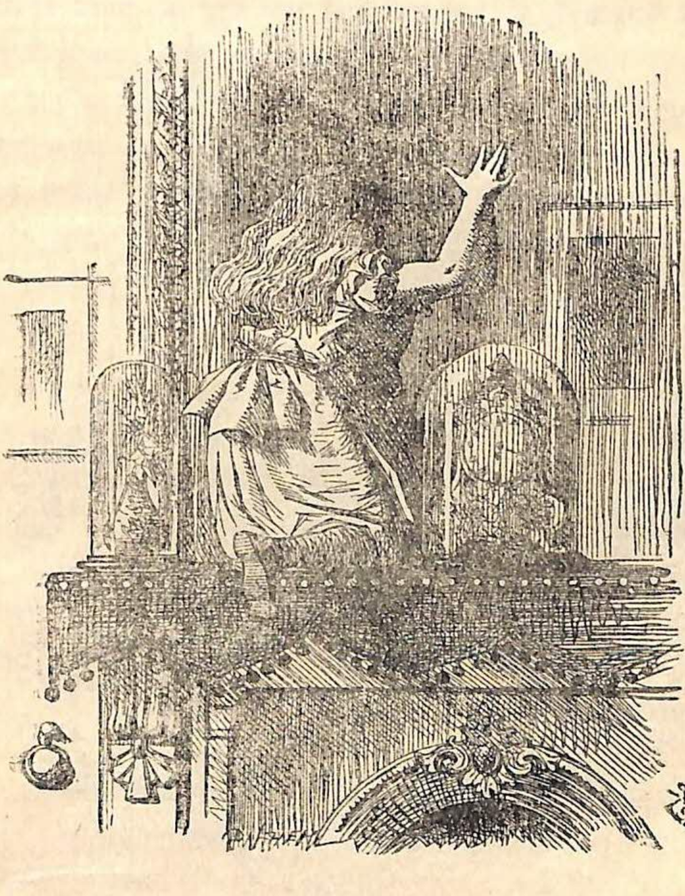
থেকে আমরা সরে এসেছি। "মনে কর, ছানু, তুই হলি লাল রঙের রানী! জানিস, আমার মনে হয়, খাড়া হয়ে বসে বুকের ওপর আড়াআড়ি করে হাত মুড়ে রাখলে, তোকে ঠিক লাল রানীর মতো দেখাবে! এসো তো মানিক, একবার দেখ তো!" এই বলে অ্যালিস টেবিলের ওপর থেকে দাবার লাল রানীর ঘুঁটিটাকে তুলে নিয়ে বেড়াল-ছানাটার সামনে বসিয়ে দিলে, যাতে দেখে দেখে সে নকল করতে পারে; অবশ্য তাতে কাজ হল না। অ্যালিসের মতে, তার প্রধান কারণ হল, বেড়াল-ছানাটা কিছুতেই বুকের ওপর হাত মুড়ে রাখতে রাজি নয়। তখন শাস্তি দেবার জন্যে অ্যালিস তাকে আয়নার সামনে তুলে ধরলে, নিজেই দেখুক, কেমন গোমড়া-পানা দেখাচ্ছে তাকে। তার পর বললে, "এক্ষুনি যদি লক্ষ্মী না হও, তা হলে দেব তোমায় চালান করে ঐ আয়নার বাড়িটাতে। তখন কেমন হবে?

"শোন ছানু, বেশি কথা না বলে যদি মন দিয়ে শুনতে রাজি থাকিস, তো আয়নার বাড়ি সম্বন্ধে আমার মাথায় যত-সব ভাবনা আসে, সব তোকে বলতে পারি। প্রথমে দেখ, আয়নার ভেতর যে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে, সেটা হুবহু আমাদের এই বসবার ঘরটার মতো, তবে সব উলটো দিকে, এই যা। চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালে সারা ঘরটা দেখতে পাই, কেবল ফায়ারপ্লেসের পেছন দিকে কী আছে, তা চোখে পড়ে না। ওহ্! যদি সেটা দেখতে পেতুম!

"শীতকালে ওখানে আগুন জ্বালা হয় কি না, জানতে এত ইচ্ছে করে; কিন্তু, আমাদের ফায়ারপ্লেসের চুল্লী থেকে ধোঁয়া না বেরোলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই, আর তখন ও-ঘরেও ধোঁয়া ওঠে—কিন্তু তাও লোক-দেখানো হতে পারে তো, যেন ওখানেও আগুন জ্বালা হয়েছে। তার পর ধর, বইগুলো আমাদেরই মতন, তবে কথাগুলো উলটোবাগে; আমি ঠিক জানি, কারণ, আমাদের একটা বই উঁচু করে আয়নার সামনে ধরতেই, আয়নার ঘরেও একটা বই উঁচু হয়ে উঠল।

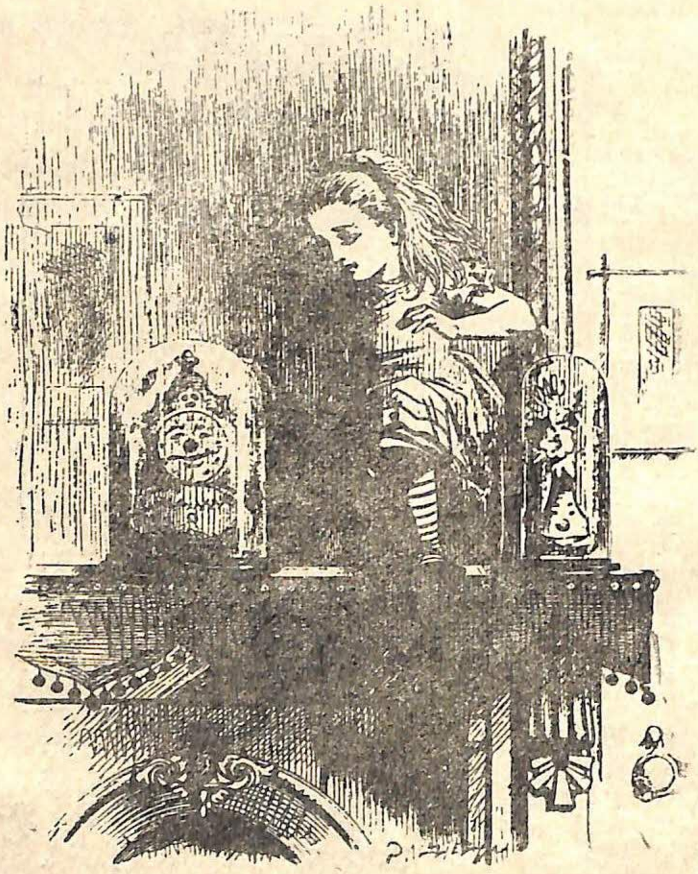
"আয়নার বাড়িতে থাকতে তোর কেমন লাগবে রে, ছানু? ওখানে তোকে দুধ দেবে কি না কে জানে। আয়না-বাড়ির দুধ খাওয়া যায় না হয়তো—কিন্তু ওহ্, ছানু! এবার বারান্দার কথা বলি। আমাদের এই বসবার ঘরের দরজাটা হাট করে খুলে দিলে, আয়না-বাড়ির বারান্দার খুব একটুখানি দেখা যায়; যতটা চোখে পড়ে, আমাদের

বারান্দারই মতন, তবে বাদ-বাকিটা একেবারে অন্যরকম কি না কে জানে। ওহ্, ছানু রে, আয়না ফুঁড়ে ঐ বাড়িটার মধ্যে যদি যেতে পারতুম আমরা, কী মজাই হত! আমি ঠিক জানি, ওখানে খুব ভালো ভালো সব জিনিস আছে! আয়, মনে করা যাক, ওর মধ্যে ঢোকবার কোনো একটা উপায় আছে। ধর, আয়নার কাঁচটা পাতলা কাপড়ের মতো এমন নরম হয়ে গেছে যে, তার মধ্যে দিয়ে ঢোকা যায়।—আরে, আয়নাটা কী রকম কুয়াশার মতো হয়ে যাচ্ছে, সত্যি বলছি! এবার তো ওর মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়া খুবই সোজা—" বলতে বলতে অ্যালিস ফায়ার-প্লেসের তাকের ওপর উঠে পড়েছে, কী করে যে উঠল, নিজেরই খেয়াল নেই। আর, আয়নার কাঁচটা তখন সত্যি সত্যিই রুপোলি কুয়াশার



মতো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

আর, তার পর এক পলকের মধ্যেই আয়নার ভেতর দিয়ে টুক্ করে লাফিয়ে নেমে পড়েছে অ্যালিস আয়না-বাড়ির ঘরে। পৌঁছে, তার প্রথম কাজ হল, ফায়ারপ্লেসে আগুন আছে কি না, তাই দেখা। দেখে খুশি হল যে, সত্যিকারের আগুন রয়েছে, আর তাদের বসবার ঘরের চুল্লীর মতোই গন্‌গন্‌ করে জ্বলছে। অ্যালিস ভাবলে, 'যাক, আমাদের আগের ঘরে যেমন গরমে থাকতুম, এখানেও সেইরকম গরম পাব, বরং বেশিই গরম পাব, কারণ আগুনের কাছ থেকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেবার তো কেউ নেই এখানে। ওরা যখন আয়নার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখতে পাবে, অথচ আমার নাগাল ধরতে পারবে না, তখন কী মজাই হবে!'



অ্যালিস তখন চারি দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ; লক্ষ্য করলে, তাদের বসবার ঘর থেকে যা-যা দেখা যেত, সেগুলো সব মামুলী আর সাধারণ হলেও, বাকি সব এত আলাদা যে, বলবার নয়। যেমন, ফায়ারপ্লেসের পাশের দেওয়ালটাতেই যে-সব ছবি টাঙানো রয়েছে, সেগুলো যেন জ্যান্ত, আর ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর যে ঘড়িটা বসানো রয়েছে (আয়নায় ঘড়িটার পিছন দিকটাই শুধু দেখা যাবে, বুঝতেই পারছ), সেটা ঠিক ছোট্টো একটা বুড়ো লোকের মুখের মতো—আবার অ্যালিসের দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে।

চুল্লীর কাছে আধ-পোড়া কাঠের সঙ্গে দাবার অনেকগুলো ঘুঁটি পড়ে রয়েছে দেখে অ্যালিস ভাবলে, 'আমাদের আগের ঘরটার মতো এ-ঘরটাকে তেমন সাফ-সুতরো করে না দেখছি।' কিন্তু ঠিক তার পরেই মুখে বিস্ময়ের শব্দ তুলে হামা দিয়ে বসে অ্যালিস ঘুঁটিগুলোকে মন দিয়ে দেখতে লাগল। জোড়ায় জোড়ায় ঘুঁটিগুলো চলে বেড়াচ্ছে।

অ্যালিস বললে, "এই তো লাল রাজা আর লাল রানী (খুব ফিস্-ফিস্ করে বললে, পাছে ওরা ভয় পেয়ে যায়), আর ঐ তো, আগুনে কাঠ দেবার বেল্চাটার কিনারায় বসে রয়েছে সাদা রাজা আর সাদা রানী—আর ঐ যে, দুটো ক্যাসল্ (ভারতীয় দাবার 'নৌকো') হাত



ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে,"—আরো কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ে অ্যালিস বললে, "আমার কথা শুনতে পাচ্ছে বলে তো মনে হয় না, দেখতে পাচ্ছে না তো বটেই। নিজেকে যেন অদৃশ্য মনে হচ্ছে—"

এই সময়ে টেবিল থেকে কুটুর্-কুটুর্ একটা আওয়াজে মাথা ঘোরাতেই অ্যালিস দেখতে পেলে একটা সাদা পন ('বোড়ে') গড়িয়ে পড়ে গিয়ে লাথি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে ; এর পরে কী ঘটে তাই দেখবার জন্যে অ্যালিস খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

"এ যে আমার বাচ্চার গলা!" বলে চীৎকার করে সাদা রানী এমন দুদ্দাড় করে রাজার গা ঘেঁষে দৌড়ে গেলেন, যে রাজামশাই ধাক্কার চোটে আধপোড়া ছাইগাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। চুল্লীর জায়গাটা রেলিং দিয়ে বেড়ার মতো করে ঘেরা থাকে, সেই বেড়াটা টপকাবার জন্যে হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে রানী বলতে লাগলেন, "আমার সাত-রাজার-ধন লিলি রে! আমার রাজ-রাজত্বের টুকুন্ রে!"

পড়ে গিয়ে রাজার নাকে লেগেছিল, চোটের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "রাজ-রাজত্বের কচু রে!" বিরক্ত হওয়া তাঁর সাজে, কারণ তাঁর আপাদমস্তক ছাইয়ে মাথামাখি।

ওদের সাহায্য করবার জন্যে অ্যালিস মুখিয়ে ছিল, তাই লিলি বেচারি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার দাখিল হচ্ছে দেখে, সে ঝট্ করে রানীকে তুলে টেবিলের ওপর তাঁর পাড়া-মাতানো মেয়ের পাশে বসিয়ে দিলে।

রানী হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন ; সোঁ করে হাওয়ায় ভেসে আসাতে তাঁর হাঁফ ধরে গেছে, তাই মিনিট দুয়েক আর কিছুই করবার ক্ষমতা ছিল না, চুপচাপ শুধু ছোট্টো লিলিকে বুকে জড়িয়ে রইলেন। তার পর একটু একটু দম ফিরে পেতেই সাদা রাজার দিকে হাঁক পাড়লেন, "খুব সাবধান! আগ্নেয়গিরিটার দিকে নজর রেখ!"

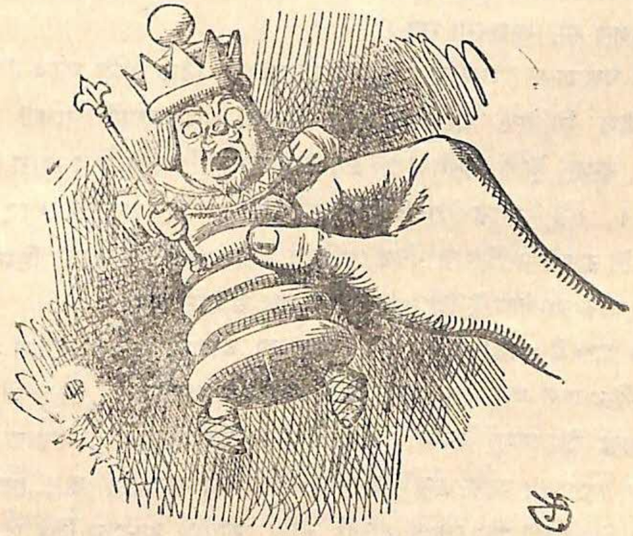
রাজামশাই ছাইগাদার ওপর গোমড়া মুখ করে বসেছিলেন, বললেন, "কোন্ আগ্নেয়গিরি?" বলে আগুনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, যেন আগ্নেয়গিরি থাকলে আগুনেই থাকবে।

রানী তখনো পুরো দম ফিরে পান নি, তাই হাঁস্ফাঁস্ করতে করতে বললেন, "আমায়—উড়িয়ে—নিয়ে এসেছে, দেখ, তুমি আবার যেন—উড়ে যেয়ো না—যেমন ভাবে আসা-যাওয়া কর, তেমনি ভাবে এসো!"

অ্যালিস দেখছিল সাদা রাজা কেমন অনেক কসরত করে বেড়ার এক-একটা রেলিঙ বেয়ে বেয়ে একটু একটু করে ওঠবার চেষ্টা করছেন। শেষপর্যন্ত থাকতে না পেরে বললে, "আরে, এই ভাবে চললে তো টেবিল অবধি পৌঁছতে তোমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাবে। তার চেয়ে বরং আমি তোমায় সাহায্য করি, কেমন?" কিন্তু রাজামশাই কথাটা কানেই নিলেন না; বেশ বোঝা গেল, তিনি অ্যালিসকে দেখতেও পাচ্ছেন না, তার কথা শুনতেও পাচ্ছেন না।

অ্যালিস তাঁকে খুব আলতো করে ধরে তুলে, রানীর বেলার মতো তাড়াতাড়ি না করে, বেশ আস্তে আস্তে নিয়ে আসতে লাগল, যাতে এঁর আবার দম বন্ধ হয়ে না যায়; তবে সেইসঙ্গে ভাবলে যে, টেবিলে বসাবার আগে রাজামশাইকে একটু ঝেড়ে-পুঁছে নিলে হয়, গা-ভর্তি ছাই।

একটা অদৃশ্য হাত তাঁকে শূন্যে তুলে ধরে রেখেছে, আবার তাঁকে ঝাড়-পোঁছ করছে, এই দেখে রাজামশাইয়ের মুখখানা যা হয়েছিল, অ্যালিস জীবনে আর কখনো তেমন দেখে নি—এ কথা সে পরে বলেছে। তিনি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, চীৎকার করতে পারেন নি, শুধু তাঁর চোখ আর মুখের হাঁ ক্রমশই গোল আর বড়ো-বড়ো হয়ে যাচ্ছিল। হাসতে গিয়ে অ্যালিসের হাত এত জোরে কেঁপে উঠল যে,



হাত থেকে খসে রাজামশাই মাটিতে পড়েন আর কি!

রাজামশাই, যে তার কথা শুনতে পাচ্ছেন না, সে কথা ভুলে অ্যালিস বললে, "আহা, মুখখানাকে অমন কোরো না তো! দেখে আমার এমন হাসি পাচ্ছে যে, তোমায় ধরে রাখতে পারছি না! আর, অত বড়ো হাঁ কোরো না! সমস্ত ছাই মুখে ঢুকে যাবে—এই তো, এবার খানিকটা পরিষ্কার-ঝরিষ্কার দেখাচ্ছে!" বলতে বলতে অ্যালিস রাজামশাইয়ের চুলগুলোকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে রানীর পাশে টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজামশাই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন, একদম কাঠ; অ্যালিস ভাবলে, কী জানি কী করে ফেলেছি, তাই ভয় পেয়ে ঘরের চার দিকে জলের সন্ধান করতে লাগল, যাতে রাজার মুখে-চোখে দেওয়া যায়। অবশ্য, এক-দোয়াত কালি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না; সেটা নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দেখলে, রাজা সামলে উঠেছেন, আর রানীর সঙ্গে খুব ভয়-পাওয়া চাপা গলায় কী-সব কথাবার্তা বলছেন—এত আস্তে যে, অ্যালিস প্রায় শুনতেই পেল না।

রাজা বলছেন, "বিশ্বাস কর গিন্নী, ভয়ে আমার গোঁফের ডগা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল!"

তাতে রানী বললেন, "তোমার তো গোঁফই নেই মোটে!"

রাজা বলেই চললেন, "তখন কী আতঙ্কই যে হয়েছিল, সে আমি কখনো ভুলব না, কক্ষনো নয়!"

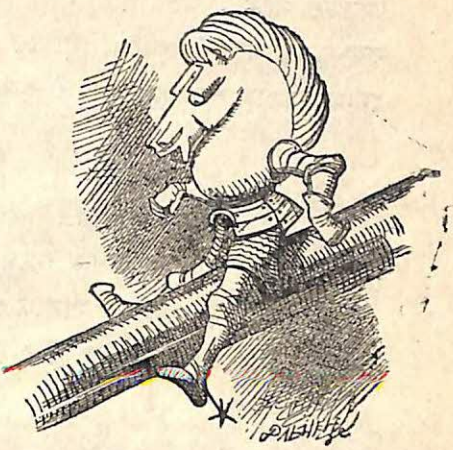
রানী বললেন, "যত্ন করে লিখে না রাখলে ঠিক ভুলে যাবে।"

অ্যালিস নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল, রাজামশাই পকেট থেকে দরকারি কথা টুকে রাখবার একটা গোব্‌দা খাতা বার করে লিখতে লাগলেন। চট্‌ করে অ্যালিসের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল; পেনসিলটা রাজামশাইয়ের কাঁধ পেরিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে ছিল, তার গোড়াটা ধরে অ্যালিসই লিখে যেতে লাগল রাজার হয়ে।

রাজামশাই থতমত খেলেন, ব্যাজার হলেন, এবং কোনো কথা না বলে খানিকক্ষণ ধরে পেনসিল নিয়ে ধস্তাধস্তি করলেন; কিন্তু অ্যালিসের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন, তাই শেষপর্যন্ত হাঁস্‌ফাঁস্‌ করতে করতে বললেন, "ওগো! আর-একটু সরু পেনসিল না হলে তো আর চলছে না! এটাকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না; মোটেই যে-সব লিখতে চাই নি,

সেই-সব লেখা বেরোচ্ছে খালি খালি—"

খাতাটার দিকে ঝুঁকে পড়ে রানী বললেন, "কী ধরনের লেখা ?" (অ্যালিস খাতাটাতে লিখেছে, "সাদা নাইট আগুন খোঁচাবার শিক বেয়ে হড়কে হড়কে নামছে। বড্ডো টলমল করছে।") দেখে রানী বললেন, "যা লেখা হয়েছে, তা তো তোমার মনের কথা নয়।"



সাদা রাজার দিকে বরাবরই অ্যালিস লক্ষ্য রাখছিল বসে বসে (কারণ, তাঁর জন্যে ওর এখনো একটু ভাবনা রয়ে গেছে, তাই রাজা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার মুখে-চোখে ঢালবার জন্যে কালির দোয়াতটা হাতছাড়া করে নি) ; এবার টেবিলের ওপর একটা বই পেয়ে, তার পাতা উলটে উলটে দেখতে লাগল, যদি এমন কিছু থাকে, যা পড়া যায়—'কারণ, যে-ভাষায় সব লেখা, তা তো বিলকুল অজানা,' নিজের মনেই বললে সে।

লেখাটা এইরকম :

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

গোড়ায় খানিকক্ষণ মাথায় কিছুই ঢুকল না, তার পর শেষকালে একটা বুদ্ধি গজাল। "আরে, এটা যে আয়না-বাড়ির বই! একটা আয়নার সামনে ধরলেই তো লেখাগুলো সব আবার সোজা হয়ে যাবে!"

তখন অ্যালিস যে কবিতাটা পড়লে, সেটা হল :

জবরজঙ্গী

বিরলিং-এতে আকাশ ভরা, শ্লিথিল টভরীরা
ক্ষেভের মাঝে গায়রা দিয়ে গিম্‌গিমিয়ে ডাকে ;
বরদগবের সবকটা আজ মিম্‌সিয়ে ব্যস্থিরা,
মৌমা বাতাস হুহুঙ্কারে হাত্রাসী হাঁক হাঁকে।

"বাছা আমার ! যাস নি যেন জবরজং-এর কাছে।
দাঁতের আগায়, নখের ডগায় শান দিয়ে সে রাখে।
জুব্‌জুব-কে সামলে চলিস, থাকে সে তালগাছে ;
এড়িয়ে চলিস দাঁতখিঁচোনো বাঁদর-ছ্যাচাটাকে।"

খাপ খুলে সে বাগিয়ে ধরে ভুর্‌পি তলোয়ার,
আঁতিপাঁতি খুঁজতে থাকে মান্দাসী শত্রুরে।
অনেক ঘুরেও খোঁজ পেলে না ; ভাবনা হল তার।
টামুই গাছের তলায় এল ক্লান্ত ঘুরে ঘুরে।

দাঁড়িয়ে আছে আফ্‌শানো সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে,
এমন সময়ে টালমাটালী বনের ভিতর থেকে
জবরজং-এর আগুনে চোখ দেখল উঁকি দিয়ে,
আলুম্‌ফিয়ে এগিয়ে এল বুড়্‌বুড়ি ডাক ডেকে !

শনৈঃ শনৈঃ ভুর্‌পি চলে ঝিলিক দিয়ে দিয়ে,
শন্‌শনিয়ে তলোয়ারের কোপ মারে বারবার।
টেঁসে-যাওয়া জবরজং-এর মুণ্ডু কেটে নিয়ে
বীরের দর্পে গাফ্‌গাফিয়ে ফিরল সে আবার !



"জবরজং-এ শেষ করেছিস ? বাছা আমার ওরে !
বিম্বিসি মোর ! আয় রে সোনা ! আয় রে আমার পেটে !
কী আনন্দ ! লে হালুয়া ! হা রে রে রে রে রে !"
আহ্লাদেতে উল্সে উঠে পড়েন তিনি ফেটে।

বিরলিং-এতে আকাশ ভরা, শ্লিথিল টভরীরা
ক্ষেভের মাঝে গায়রা দিয়ে গিম্গিমিয়ে ডাকে ;
বরন্দগবের সবকটা আজ মিম্সিয়ে ব্যস্থিরা,
মৌমা বাতাস হুহুঙ্কারে হাভ্রাসী হাক হাঁকে।

কবিতাটা শেষ করে অ্যালিস বললে, "বেশ চমৎকার লাগল কবিতাটা, তবে বোঝা বড়ো শক্ত !" (মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝতে পারে নি, নিজের মনেও সেটা মানতে চাইছে না, দেখছ তো।) "কিন্তু, কী জানি কেন, মাথার মধ্যে হরেকরকমের সব ছবি ঘুরপাক খাচ্ছে—তবে সেগুলো ঠিক কী তা বলতে পারব না ! যাই হোক, একজন লোক যে কিছু একটাকে মেরে ফেলেছে—আর কিছু হোক না-হোক, এটা তো পরিষ্কার—"

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অ্যালিস বলে উঠল, "এই রে ! আর দেরি করলে যে আয়না-বাড়ির বাদ-বাকি সব না দেখেই আয়না টপ্কে ফিরে যেতে হবে ! তাড়াতাড়ি করা দরকার ! যাই, প্রথমে বাগানটা দেখি !" পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল অ্যালিস, তার পর নীচে নামবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালে—তবে, ঠিক পা চালানো বলা চলে না, বরং সহজে এবং তাড়াতাড়ি সিঁড়ি টপ্কাবার উপায় হিসাবে একটা নতুন আবিষ্কার—অ্যালিস তো অন্তত মনে-মনে তাই-ই বললে। আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে রেলিঙের হাতলটা ছুঁয়ে রইল, আর, আপনা-আপনি ভাসতে ভাসতে নীচে নামতে লাগল, সিঁড়িতে পা ফেললেই না মোটে। তার পর, হল-ঘরের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলতে লাগল। ভাসতে ভাসতে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেত হয়তো, ভাগ্যিস কপাটের পাশের দিকের মোটা কাঠটা ধরে ফেললে, তাই রক্ষে। এতটা ভেসে এসে কেমন মাথা ঝিম্ঝিম্ করছিল, এবার স্বাভাবিকের মতো আবার মাটিতে পা ফেলে হাঁটতে পারছে দেখে, খুশিই হল সে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যান্ত ফুলের বাগান

অ্যালিস বলতে লাগল, "ঐ উঁচু টিলাটার ওপর উঠে দাঁড়াতে পারলে বাগানটা আরো ভালো করে দেখা যায় ; রাস্তাও তো রয়েছে দেখছি, সোজা টিলার ওপরেই গেছে—না, তা অবশ্য ঠিক নয়, সোজাসুজি টিলার দিকে অবশ্য যায় নি, তবে—" (ইতিমধ্যে সেই রাস্তা ধরে ঘন ঘন ডাইনে-বাঁয়ে মোড় ঘুরতে ঘুরতে হাত কয়েক এগিয়েছে সে)। "—শেষ-পর্যন্ত নিশ্চয় টিলার দিকেই গেছে। কিন্তু, কী অদ্ভুত প্যাঁচানো রাস্তা রে বাবা! রাস্তা তো নয়, ছিপি খোলবার কর্কস্ক্রু!—যাক, এই বাঁকটা নিলেই নিশ্চয় টিলার দিকে যাওয়া যাবে। না, এবারেও হল না। আবার তো দেখছি বাড়ির দিকেই যাচ্ছি! বেশ উলটো দিকে মোড় ঘুরে দেখি।"

তাই করল। এদিক-ওদিক পাক খেয়ে, কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে, নানাভাবে চেষ্টা করেও কিন্তু সেই একই ব্যাপার, শেষপর্যন্ত সেই বাড়ি। অন্য বারের চেয়ে একবার সে বেশ একটু ঝাঁ করে শেষ মোড়টা ঘুরেছিল। তার ফলে আচমকা বাড়িটার গায়ে ধাক্কাই খেয়ে বসল বেচারা, সামলাবার ফুরসৎ পেলে না।

অপ্রস্তুতে পড়ে, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অ্যালিস এমনভাবে কথা বলতে লাগল, যেন বাড়িটার ওর সঙ্গে তক্‌রার করছে। বললে, "এ নিয়ে

তক্ক করে কোনো লাভ নেই, আমি এখন ভেতরে ঢুকছি না। আমি জানি, আবার সেই আয়নার ভেতর দিয়ে গিয়ে সেই চেনা ঘরটিতে ফিরে যাওয়াই উচিত আমার—কিন্তু সেইসঙ্গে আমার অ্যাডভেঞ্চারেরও তো ইতি !”

এই বলে, অটল সংকল্পে ঘাড় উঁচু করে সে বাড়িটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল, তার পর আবার সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল, টিলার মাথায় না পৌঁছে আর থামবে না। মিনিট কয়েক বেশ ভালোই কাটল দেখে সবে বেচারা বলতে গেছে, ‘এবার দেখছি সত্যিই—’ আর ঠিক তখনই ভয়ানক রকম চোখা একটা বাঁক খেয়ে রাস্তাটা এমন আচমকা তাকে বাড়ির দোরগোড়ায় এনে ফেললে যে, পা বাড়ালেই একেবারে চৌকাট ডিঙোতে হয়।

অ্যালিস বলে উঠল, “কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড! এমন গায়ে-পড়া বাড়ি তো কখনো দেখি নি বাপু! জন্মে দেখি নি !”

টিলাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কাজেই আবার হাঁটতে শুরু করা ছাড়া উপায় কী ? যেতে যেতে এবারে তার চোখে পড়ল একটা ফুল-গাছের কেয়ারি, তার কিনারায় ডেজি-ফুলের সারি, মধ্যিখানে একটা উইলোগাছ।

একটা টাইগার-লিলি ফুল ঝাতাস পেয়ে দুলছিল, সেই দিকে চেয়ে অ্যালিস বললে, “টাইগার-লিলি গো! তুমি যদি কথা বলতে পারতে গো!”

টাইগার-লিলি বলে উঠল, “তেমন-তেমন লোক পেলে আমরা কথা বলি বৈকি।”

বিস্ময়ের ধাক্কায় মিনিট-খানেক অ্যালিসের মুখ দিয়ে রা শব্দটিও বেরোল না, দম আটকে এল। খানিক বাদে, টাইগার-লিলি তখনো দুলেই চলেছে, খুব মিন্‌মিন্‌ করে, প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে অ্যালিস বললে, “সব ফুলেরাই কি কথা বলতে পারে ?”

টাইগার-লিলি বললে, “তোমার চেয়ে কিছু কম পারে না। বরং আরো জোর-গলায় বলতে পারে।”

গোলাপ বলে উঠল, “আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাওয়াটা আমাদের ভব্যতায় বাধে কিনা, তাই ভাবছিলুম, কখন তুমি কথা বল! মনে মনে বলছিলুম, ‘মেয়েটার মুখে একটু-আধটু জ্ঞান-গম্যির ছোঁয়াচ দেখতে পাচ্ছি বটে, তবে খুব যে চালাক-চতুর, তা অবশ্য নয়!’ তা, যাই হোক,



তোমার রঙটা ঠিক আছে, সেটাও তো কম কথা নয়।"

টাইগার-লিলি ফোড়ন কাটলে, "রঙ-টঙ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। পাপড়িগুলো আর-একটু করে কুঁকড়ে থাকলে আর কোনো গোল থাকত না।"

ওকে নিয়ে ব্যাখ্যানা হয়, এটা অ্যালিস চায় না, তাই শুরু করলে, "তোমাদের যে এইখানে পোঁতা হয়েছে, দেখাশোনা করার কেউ নেই—ভয় করে না?"

গোলাপ বললে, "ঐজন্যেই তো মাঝ-মধ্যিখানে গাছটা রয়েছে।"

অ্যালিস জিগেস করলে, "কিন্তু, কোনো আপদ-বিপদ হলে ওর দ্বারা কোন কম্মটা হবে শুনি?"

গোলাপ বললে, "গুঁড়ি মেরে বসে আমাদের সাবধান করে দিতে পারবে।"

ডেজি বলে উঠল, "গাছ চেঁচিয়ে বলে, 'পালা, পালা'! এইজন্যেই তো গাছের শাখা-প্রশাখাকে 'ডালপালা' বলে!"

আর-একটা ডেজি ফুট্ কাটলে, "ওমা, তুমি এটা জানতে না?" ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে সব-কটা ডেজিতে মিলে কলরবলর করে এমন গোলমাল করতে লাগল যে, কান পাতা দায়। রাগে থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে উত্তেজনায় দুলে উঠে টাইগার-লিলি চীৎকারে ফেটে পড়ল, "চোপ্, চোপ্!" তার পর কাঁপা-কাঁপা মাথায় অ্যালিসের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, "জানে তো, ওদের হাতের নাগালে পাবে না, তাই এত সাহস!"

শান্ত গলায় অ্যালিস বললে, "যেতে দাও, যেতে দাও!" তার পর, ডেজি-ফুলগুলো আবার চেঁচাবার উপক্রম করতেই ঝুঁকে পড়ে তাদের কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "আবার মুখ খুলেছ কি পট্ পট্ করে ছিঁড়ে নিয়েছি!"

সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা। কয়েকটা ফিকে বেগুনি ডেজি তো ভয়ে একেবারে সাদা।

টাইগার-লিলি বললে, "ঠিক হয়েছে! ডেজিগুলোই সব চেয়ে ওঁচা! একজন মুখ খুললেই, সবাই একসঙ্গে পোঁ ধরবে। আর এমন কাণ্ড বাধাবে যে, আমাদের পাপড়ি না-ঝরে যায় কোথায়!"

সুখ্যাতি-টুখ্যাতি করলে হয়তো মেজাজটা নরম হবে, এই ভেবে অ্যালিস বললে, "তোমরা এত সুন্দর করে কথা বলতে পারো কী করে গো? কত বাগানেই তো গেছি, কোনো ফুলই তো কথা বলতে পারে নি।"

টাইগার-লিলি বললে, "হাত ঠেকিয়ে জমিটা পরখ কর, তা হলেই বুঝতে পারবে।"

অ্যালিস পরখ করে বললে, "খুব শক্ত দেখলুম। কিন্তু তাতে কী হল?"

টাইগার-লিলি বললে, "বেশির ভাগ বাগানে দেখবে, জমি বড্ডো নরম করে তৈরি করে—তাতে ফুলেরা সব সময়েই ঘুমিয়ে পড়ে থাকে।"

কথাটায় যুক্তি আছে। ব্যাপারটা জেনে অ্যালিস খুশিই হল। বললে, "আগে কথাটা মাথায় আসে নি তো।"

বেশ একটু কটু গলায় গোলাপ বলে উঠল, "আমার মতে, তুমি কখনো মাথাই খাটাও না, তা মাথায় আসবে কী করে।"

একটা ভায়োলেট ফুলের গলা শোনা গেল, "এ মেয়েটাকে এত বোকা-বোকা দেখতে, আগে কখনো এমনটা চোখে পড়ে নি।" এমন আচমকা কথাটা শোনা গেল যে, অ্যালিস চমকে লাফিয়ে উঠল ; আগে তো ভায়োলেট একবারও মুখ খোলে নি।

টাইগার-লিলি ধমকে উঠল, "চোপ্ রও! এর আগে উনি যেন কত মেয়েই দেখেছেন। পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে নাক ডাকাও তো বাছা —কুঁড়ির মতো চোখ-কান বন্ধ করে পড়ে থাক, কোথায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে টের্ পেয়ে কাজ নেই তোমার।"

গোলাপের শেষ কথাটায় কান না দিয়ে অ্যালিস জিগেস করলে, "আমি ছাড়া বাগানে আরো মানুষ-জন আছে নাকি ?"

গোলাপ বললে, "এখানে তুমি ছাড়া আর-একটা ফুল আছে, যে তোমার মতো চলতে-ফিরতে পারে। কী করে যে পারে, ভেবে অবাক হই। তোমার তুলনায় সে অনেক ঝাঁকড়া।"

অ্যালিস ভাবলে যে, বাগানে বোধ হয় তার মতো আর-একটি মেয়ে আছে, তাই খুব ব্যগ্র হয়ে শুধোলে, "সে কি আমারই মতন ?"

গোলাপ বললে, "তোমারই মতো বিদঘুটে চেহারা। তবে আরো বেশি লালচে, আর যদ্দূর মনে হচ্ছে, পাপড়িগুলো একটু ছোটো।"

টাইগার-লিলি বলে উঠল, "তার পাপড়িগুলো ডালিয়ার মতো ভেতর দিকে কোঁকড়ানো, তোমার মতো ছড়ানো নয়।"

গোলাপ এবার একটু দয়া দেখিয়ে বললে, "তবে, সেটা তো আর তোমার দোষ নয়। তোমার তো এবার ঝরে যাবার সময় এল—এ সময়ে পাপড়িগুলো এলোমেলো হয়ে পড়বেই, রোখা যাবে না।"

কথাটা মোটেই ভালো লাগল না অ্যালিসের। অন্য কথা পাড়বার জন্যে বললে, "এদিকে আসে-টাসে নাকি ?"

গোলাপ বললে, "জোর গলায় বলতে পারি, সে এসে পড়ল বলে। ঐ যে, যাদের মাথায় গোটা নয়েক খোঁচা মতন জিনিস লাগানো থাকে, ও হল সেই জাতের। অবাক হয়ে ভাবছিলুম, তোমার মাথায় সেই-রকম নেই কেন। (এইখানেই টাইগার-লিলি ফুট্ কাটলে, 'তুমি তো দিন-রাত্তির কেবল অবাক হয়েই ভাবছ।') আমি তো ভাবতুম

সেইটাই নিয়ম।"

একটা লার্কস্পার ফুল চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ-যে, আসছে! খোয়া-ফেলা রাস্তার ওপর তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি, থপ্-থপ্, থপ্-থপ্, থপ্-থপ্!"

সাগ্রহে চারি দিকে তাকাতে তাকাতে অ্যালিস দেখলে, যিনি আসছেন, তিনি হলেন দাবার লাল রানী। দেখেই অ্যালিস বলে উঠল, "ওঃ! খুব বড়ো হয়ে গেছেন যে দেখছি!" সত্যিই তাই। অ্যালিস প্রথম যখন দেখেছিল, তখন ছিলেন ইঞ্চি তিনেক—আর, এখন দেখা যাচ্ছে, অ্যালিসের চেয়ে বিঘৎ-খানেক লম্বা!

গোলাপ বললে, "তাজা হাওয়ার জন্যেই এমন হয়। ভারি সুন্দর হাওয়া এখানকার।"

ফুলেদের কাছে থাকতে বেশ মজাই লাগছিল অ্যালিসের, কিন্তু ভাবলে, আসল একজন রানীর সঙ্গে আলাপ করার গৌরব আরো বেশি। তাই বললে, "এগিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করব ভাবছি।"

শুনে গোলাপ বললে, "তা বোধ হয় পারবে না। আমি তো বরং বলব যে, তুমি উলটো দিকে পা চালাও!"

কথাটার কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। কোনো কথা না-বলে অ্যালিস তাই রানীর দিকে এগিয়ে গেল। আর, পর মুহূর্তেই অবাক হয়ে দেখল, রানীর কোনো পাত্তা নেই। আরো অবাক কাণ্ড—আবার সেই বাড়ির দোর গোড়ায় এসে পেঁাছে গেছে!

নিজেকে সামলে নিয়ে পিছিয়ে এল অ্যালিস দরজা থেকে, তার পর রানীর হদিশ পাবার জন্যে ইতি-উতি তাকালে (অনেক দূরে রানীকে আবিষ্কারও করলে পরে), তার পর ভাবলে, এবার নাহয় সেই উলটো দিকে পা চালাবার মতলবটাই কাজে লাগিয়ে দেখা যাক।

চমৎকার কাজ হল। মিনিট খানেক হাঁটতে না-হাঁটতেই একেবারে লাল রানীর মুখোমুখি আর সেই টিলাটার একেবারে পায়ের গোড়ায়।

লাল রানী বললেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে? যাচ্ছই-বা কোথায়? মুখ তোল, ভালো করে কথা বল, আর অমন অনবরত আঙুল মুচড়িয়ো না।"

ওঁর সমস্ত নির্দেশ নির্বিবাদে মেনে নিয়ে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে অ্যালিস বুঝিয়ে বললে যে, তার রাস্তা গুলিয়ে গেছে।



রানী বললেন, "তোমার রাস্তা বলতে কী বোঝাচ্ছ জানি না বাপু! এখানে সব রাস্তাই তো আমার দখলে—যাই হোক, এখানে এলেই-বা কেন? জবাব দাও। কথা বলবার সময়ে একটু বেশি করে মুখ খুলবে, আর সব সময়ে 'আজ্ঞে মহারানী' বলবে।"

"বাগানটা কেমন, তাই কেবল দেখতে ইচ্ছে করছিল, আজ্ঞে মহারানী—"

"বাঃ, ঠিক হয়েছে!" বলে রানী তার মাথায় কয়েকটা থাবড়া মারলেন। অ্যালিসের মোটেই ভালো লাগল না। "তবে, ঐ যে 'বাগান' কথাটা বললে না—আমি তো বাগান কম দেখি নি, সে-সবের তুলনায় এটাকে জঙ্গল বলাই ঠিক।"

তর্ক করতে সাহস হল না, তাই অ্যালিস বলে চলল, "—আর ভাবলুম, দেখি, যদি টিলায় পৌঁছবার রাস্তাটা পেয়ে যাই—"

বাধা দিয়ে রানী বলে উঠলেন, "ঐ-যে, 'টিলা' কথাটা বললে না—

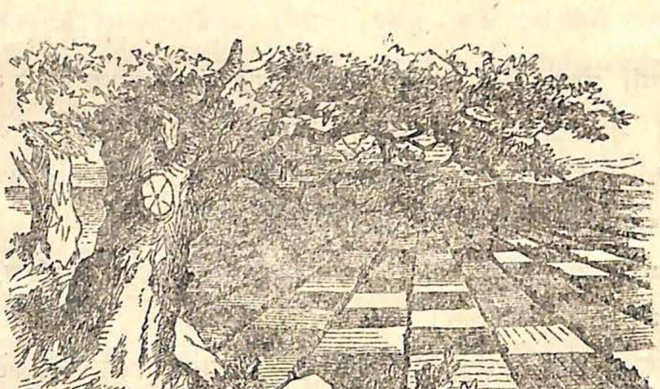
আমি তো টিলা কম দেখি নি, সে-সবের তুলনায় এটাকে বরং খাদ বলাই ঠিক।"

"না, মোটেই তা ঠিক নয়! পাহাড় বা টিলা কখনো খাদ হতে পারে না! সেটা একদম উদ্ভট—"

মাথা দোলাতে দোলাতে রানী বললেন, "তা, যদি ইচ্ছে হয়, 'উদ্ভট' বলতে পারো। তবে উদ্ভট কথা তো কম শুনি নি, সে-সবের তুলনায় এটাকে বরং অভিধানের মতো খাঁটি কথা বলাই ঠিক।"

অ্যালিস আর কোনো কথা বললে না, পাছে রানী চটে যান। ওঁর কথার সুরে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হওয়ার আভাস পাওয়া গেছে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে টিলার ওপরে এসে পেঁাছে গেল।

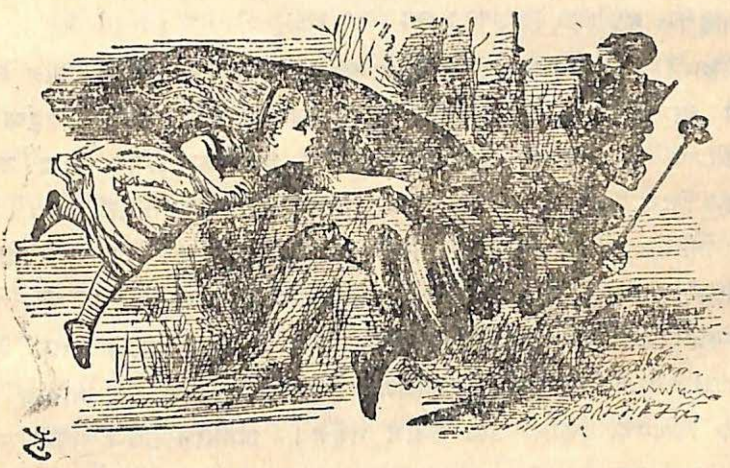
ওপর থেকে খানিকক্ষণ চুপচাপ নীচের দিকে চেয়ে রইল অ্যালিস— কী অদ্ভুত রাজ্য! যত দূর চোখ যায়, সারি সারি লম্বা লম্বা সমান্তরাল কয়েকটা সরু সরু নালা সোজা একটানা চলে গেছে, দুটো খালের মাঝের ফালি জমিগুলোর ওপর আড়াআড়ি ছোটো-ছোটো সব সবুজ কেয়ারি-করা ঝোপের সার। সব জড়িয়ে সারা জায়গাটা চৌখুপি ঘর-কাটা।



শেষ অবধি অ্যালিসের মুখে কথা ফুটল, "বেশ বোঝা যাচ্ছে, ঠিক একটা প্রকাণ্ড দাবার ছকের মতো! কিন্তু, কিছু লোক-লস্কর থাকা

উচিত ছিল তো—আরে, রয়েছে তো দেখছি!" আহ্লাদে নেচে উঠল অ্যালিসের মনটা; আনন্দের আবেগে বলতে লাগল, "আরে ব্বাস্, প্রকাণ্ড মাপের দাবা খেলা চলছে দেখছি—সারা পৃথিবী জুড়ে দাবা খেলা চলেছে—অবশ্য, সত্যি সত্যি এইটাই পৃথিবী কিনা কে জানে। ওঃ, কী মজার ব্যাপার! ইস্, আমি যদি একটা ঘুঁটি-টুঁটি কিছু হতে পারতুম গো! যা হোক কিছু, বোড়ে হতেও আপত্তি নেই, শুধু একবার দলে ভিড়ে পড়তে পারলেই হয়—তবে সব চেয়ে ভালো হত রানী হতে পারলে।"

শেষ কথাটা বলবার সময়ে সসংকোচে একবার পাশে আসল রানীর দিকে তাকালে, কিন্তু তিনি কিছু মনে করেন নি। মিষ্টি হেসে শুধু বললেন, "ভাবছ কেন, যদি চাও, অনায়াসে সাদা রানীর বোড়ে হওয়া যায়, কেননা, লিলিটা বড্ডো বাচ্চা, ওকে নিয়ে খেলা যায় না। তোমার খেলা শুরু হবে দ্বিতীয় ঘর থেকে; আটের ঘরে গেলেই রানী হয়ে যাবে—" ঠিক এই সময়ে, কেন কে জানে, দেখা গেল ওরা দুজনেই ছুটতে আরম্ভ করেছে।



পরেও অনেকবার ভেবে দেখেছে অ্যালিস, কিন্তু কেন যে হঠাৎ দৌড়টা শুরু হল, কেমন করে হল, কিছুই হদিস করতে পারে নি। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, দুজনে হাত-ধরাধরি করে ছুটতে শুরু করে দিলে, আর

রানী এত জোরে দৌড়তে লাগলেন যে, তার সঙ্গে তাল রাখা দায় হয়ে উঠল, অথচ রানী তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন, 'জোরে! আরো জোরে!' কিন্তু অ্যালিস জানে যে আরো জোরে দৌড়ানো ওর সাধ্যের বাইরে। কিন্তু তখন এমন দম আটকে আসছে যে, মুখ ফুটে কথাটা বলাও যাচ্ছে না।

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, ওরা দৌড়লে কী হবে, আশপাশের গাছপালাগুলো কিন্তু একটুও পিছু হটছে না, যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাণপণে দৌড়েও একটা গাছও পার হওয়া যাচ্ছে না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে অ্যালিস ভাবতে লাগল, 'সব-কিছুই দৌড়চ্ছে না কি রে বাবা!' রানী বোধ হয় ওর মনের কথা শুনতে পেলেন, বললেন, "আরো জোরে! কথা বোলো না!"

কথা বলতে বয়ে গেছে অ্যালিসের। বলতে পারলে তো! মনে হচ্ছে, জীবনে আর কখনোই কথা বলার সুযোগ পাবে না বেচারি, দম বলে আর কিছু নেই। অথচ রানী সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন, "জোরে! আরো জোরে!" আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন। শেষপর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে অ্যালিস বললে, "কাছাকাছি এসেছি কি?"

রানী বললেন, "কাছাকাছি এসেছি কি! দশ মিনিট আগে পার হয়ে এসেছি!" তার পর নিঃশব্দে ওরা দৌড়ল আরো কিছুক্ষণ; বাতাসের শিস্ উঠছে অ্যালিসের কানে, চুলগুলো এমন হু হু করে পিছন দিকে উড়ছে, ভয় হয়, মাথা থেকে উপড়ে না বেরিয়ে যায়।

আবার রানীর চীৎকার শোনা গেল, "আরে বাবা! জোরে! আরো জোরে!" তার পর ওরা এমন জোরে দৌড়তে লাগল যে, মনে হল পা-দুটো বোধ হয় আর মাটিতে ঠেকছে না, হাওয়ার মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছে ওরা। শেষপর্যন্ত অ্যালিস যখন আর কিছুতেই পারছে না, ঠিক তখনই হঠাৎ ওরা থেমে পড়ল। অ্যালিস তখন মাটিতে বসে পড়ে দম নেবার চেষ্টা করছে, বন্‌বন্ করে মাথা ঘুরছে।

একটা গাছের গুঁড়িতে ওকে হেলান দিয়ে বসিয়ে রানী কোমল কণ্ঠে বললেন, "এবার একটু জিরিয়ে নিতে পারো।"

চারি দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অ্যালিস। "এ কি! সারাক্ষণই তো এই গাছটার তলাতেই ছিলুম! আগেও যেমন, এখনো সেই

হুবহু একইরকম রয়েছে তো দেখছি।"

রানী বললেন, "রয়েছেই তো! তা ছাড়া আর কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?"

অ্যালিস তখনো হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে, "না, মানে, আমাদের দেশে হলে, কোথাও একটা গিয়ে পৌঁছে যেতুম—যেরকম জোরে আর অনেকক্ষণ ধরে দৌড়লুম আমরা।"

রানী বললেন, "কী অদ্ভুত শামুক-পানা দেশ তোমাদের! ব্যাপার কী জানো, এখানে, মানে এ দেশে, একই জায়গায় থাকবার জন্যেও প্রাণপণে দৌড়তে হয়। যদি অন্য কোথাও যেতে হয়, তা হলে ডবল জোরে দৌড়তে হবে। আমরা যেরকম দৌড়েছি, তার চেয়ে ডবল জোরে।"

অ্যালিস বললে, "মাপ করবেন, আমার চেষ্টা করার ইচ্ছে নেই। এখানেই বেশ আছি—কেবল বড্ডো গরম লাগছে আর গলা শুকিয়ে কাঠ!"

"হুঁ, বুঝেছি। তোমার ঠিক কী দরকার, বুঝেছি।" খুব সদয় কণ্ঠে কথা বলতে বলতে রানী পকেট থেকে একটা বাক্স বার করলেন! "নাও, একটা বিস্কুট দিচ্ছি, ধর।"

অ্যালিস কী আর বিস্কুটের কথা ভেবে কথাটা বলেছিল, কিন্তু 'নেব না' বললে পাছে অভদ্রতা হয়, তাই বাধ্য হয়েই নিলে! প্রাণপণ চেষ্টায় যতটা পারলে গলা দিয়ে নামালে। কী শুকনো রে বাবা! গলায় যেন আর হাওয়া ঢোকবার জায়গাও নেই। জীবনে কখনো এমন অবস্থায় পড়ে নি বেচারি।

রানী বললেন, "তুমি খাচ্ছ, খাও, ইতিমধ্যে আমি মাপটা নিয়ে নিই।" পকেট থেকে ইঞ্চি-দাগা একটা ফিতে বার করে তিনি জমির মাপ-জোক করতে লাগলেন, মাঝে মাঝে কি সব হিসেব করে এখানে-ওখানে খোঁটা পুঁতে পুঁতে মাপের নিশানা দিতে লাগলেন।

"দু গজ হলে, তোমায় হদিস বাৎলে দেব। আর-একটা বিস্কুট হবে না কি?"

অ্যালিস বললে, "আজ্ঞে, না। একটাই ঢের।"

রানী বললেন, "তেষ্টা মিটেছে তো?"

কী যে জবাব দেবে, ভেবে পাচ্ছে না বেচারি; তবে, জবাব দিতেও হল না, রানী বলেই চললেন, "তিন গজ হলে, হদিসগুলো আরো

একবার বাৎলে দেব, পাছে ভুলে যাও। চার গজ হলেই, 'আসি, ভাই' বলব। পাঁচ গজ হলেই, কেটে পড়ব!"

ইতিমধ্যে সব-কটা খোঁটাই পোঁতা হয়ে গেছে। অ্যালিস দেখলে, তিনি গাছটার কাছে ফিরে এলেন, তার পর একে একে খোঁটার পাশ দিয়ে দিয়ে এগোতে লাগলেন।

দু গজের নিশানার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "প্রথম চালে বোড়ে দু ঘর যায়, জেনে রাখ। কাজেই তিনের ঘরে পেঁাছতে তোমার মোটেই দেরি হবে না—রেলেই যাবে নিশ্চয়ই—আর, চারের ঘরে যেতেই-বা কতক্ষণ লাগবে। ব্যাপার হল, চারের ঘরটা টুইড্‌ল্‌ডাম আর টুইড্‌ল্‌ডী-র এক্তিয়ারে—পাঁচের ঘরের প্রায় সবটাই জল—ছয়ের ঘরটা হাম্‌টি-ডাম্‌টির—কী, কিছু বলছ না যে বড়ো?"

আমতা আমতা করে অ্যালিস বললে, "বুঝতে পারি নি যে কিছু বলা দরকার।"

বেশ একটু চটে-মটেই রানী বললেন, "তোমার বলা উচিত ছিল—'আপনি কী ভালো, আমায় এত-সব শেখালেন'—যাই হোক, আমরা ধরেই নিচ্ছি যে, তুমি তাই বলেছ। সাতের ঘরটা খালি জঙ্গল—অবশ্য একজন নাইট তোমায় পথের হদিস বলে দেবে—আটের ঘরে রানী হয়ে আমার দেখা পাবে, তার পর খালি খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তি!" উঠে দাঁড়িয়ে সহবৎ দেখিয়ে অভিবাদন জানালে অ্যালিস।

পরের খোঁটাটার কাছে এসে রানী আবার বললেন, "কোনো জিনিসের ইংরেজি মনে না পড়লে, ফরাসিতে বলবে—হাঁটবার সময়ে পায়ের আঙুল বাড়িয়ে রাখবে—তুমি কে, সেটা যেন কক্ষনো ভুল না হয়!" এবার আর অ্যালিসের সৌজন্য দেখাবার জন্যে অপেক্ষা করলেন না, চট্‌ করে পরের খোঁটাটার কাছে এগিয়ে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে 'গুড্‌-বাই' বলেই শেষ খোঁটাটার কাছে গিয়ে পেঁাছলেন।

কী করে যে হল, অ্যালিস আজও বুঝতে পারে না, কিন্তু ঐ শেষ খোঁটাটার কাছে পেঁাছনোমাত্রই রানীকে আর দেখা গেল না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন, না সাঁ করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন (খুব তাড়াতাড়ি যে দৌড়তে পারেন, তা তো অ্যালিস জানেই) বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু রানী সত্যিই অদৃশ্য। অ্যালিসের মনে পড়ে গেল, সে এখন বোড়ে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে চৌখুপি ঘর ধরে ধরে এগোতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আয়নার পোকা-মাকড়

প্রথমে তো সব দেখে-শুনে নিতে হবে যে, দেশটা কী রকম। তাই আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে ডিঙি মেরে আরো একটু ভালো করে চারি দিক দেখবার চেষ্টা করলে অ্যালিস। "ভূগোল পড়ার মতো হল দেখছি। প্রধান নদনদী—একটাও নেই। প্রধান প্রধান পাহাড়-পর্বত —এই যা একটার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কোনো নাম-টাম আছে বলে তো মনে হয় না। প্রধান প্রধান নগর—আরে, নীচে ওগুলো কি, মধু জোগাড় করে বেড়াচ্ছে? মৌমাছি হলে তো এত দূর থেকে দেখতে পাবার কথা নয়—!" খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। একটা আবার ফুলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে হুল ঢোকাচ্ছে। 'সত্যিকারের মৌমাছির মতো', অ্যালিস ভাবলে।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলে যে, মোটেই তা নয়, আসলে ওটা একটা হাতি। দেখে অ্যালিসের তো দম বন্ধ হবার জোগাড়। "আরে ব্বাস্, ফুলগুলো তা হলে কী প্রকাণ্ড! বড়ো-বড়ো কুঁড়েঘরের চালা খুলে নিলে যেমন হয়, তেমনি ধরনের হবে বোধ হয়! কী এন্তার মধু হবে! যাই, নীচে গিয়ে—না, বাবা, এখন যাব না।" দৌড় শুরু করবার মুখে হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলে, তার পর আচমকা এমনি থেমে যাবার ওজর হিসাবে বলতে লাগল, "একটা বড়ো-গোছের

গাছের ডাল হাতে থাকা দরকার, ওদের তাড়াতে হবে তো। শুধু-হাতে যাওয়াটা ঠিক নয়। হয়তো জিগেস করবে, 'বেড়াতে কেমন লাগল।' আমি বলব, 'বেশ ভালোই, তবে বড়ো ধুলো আর গরম, তা ছাড়া হাতিগুলো বড্ডো জ্বালাতন করেছে!' "

একটু থেমে আবার বললে, "ও পাশ দিয়ে যাই বরং। হাতিদের সঙ্গে মোলাকাতটা নাহয় পরেই হবে। তা ছাড়া তিনের ঘরে যাওয়াটা আগে দরকার।"

এই বলে, পাহাড় বেয়ে নীচে নামল অ্যালিস, আর পাশাপাশি ছটা নালার মধ্যে প্রথম নালাটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল।

জানলা দিয়ে কামরার মধ্যে মুখ বাড়িয়ে গার্ড-সাহেব বললেন, "টিকিট!" সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সব্বাই একটা করে টিকিট বাড়িয়ে ধরেছে; যার চেহারা যত বড়ো, তার টিকিটও প্রায় তেমনি মাপের, কামরাটা টিকিটে টিকিটেই ভরে গেল বলতে গেলে।

অ্যালিসের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে গার্ড-সাহেব বললেন, "টিকিট দেখাও হে, খুকি!" সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে আওয়াজ এল (অ্যালিসের মনে হল যেন কোরাস গান), "ওঁকে দাঁড় করিয়ে রাখছ কেন গো খুকি! ওঁর সময়ের দাম জানো? মিনিটে এক হাজার পাউণ্ড!"

ভয়ে ভয়ে অ্যালিস বলে উঠল, "কী আর বলব, আসলে আমার টিকিটই নেই। যেখান থেকে রেলে চাপলুম, সেখানে টিকিট-ঘরই ছিল না মোটে।" সঙ্গে সঙ্গে আবার একসঙ্গে সবাইকার গলা শোনা গেল, "যেখান থেকে আসছ, বাছা, সেখানে টিকিট-ঘরের জায়গা থাকলে তো? ওখানে এক ইঞ্চি জমির দাম এক হাজার পাউণ্ড।"

গার্ড-সাহেব বললেন, "ও-সব ছুতো দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, ইঞ্জিন-ড্রাইভারের কাছ থেকে টিকিট কিনলেই তো পারতে।" সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে, "বটেই তো! যে ইঞ্জিন চালায়, তার কাছ থেকেই তো কেনা যেত! জানো, এক ঝলক ধোঁয়ার দামই এক হাজার পাউণ্ড!"

অ্যালিস মনে-মনে ভেবে দেখলে, 'কথা কয়ে লাভ নেই।' চেঁচিয়ে তো বলে নি, তাই এবারে সবাই মিলে একসঙ্গে কোনো জবাব দিল না বটে, কিন্তু অবাক কাণ্ড, সব্বাই একসঙ্গে মনে-মনে ভাবতে লাগল (মনে-

মনে একসঙ্গে ভাবা মানে কী, বুঝতে পারছ ? আমি তো পারছি না), "কথা না কয়ে চুপ করে থাক তো বাছা ! জানো, এক-একটা শব্দের দাম এক হাজার পাউন্ড !"

অ্যালিস মনে-মনে ভাবতে লাগল, 'আজ রাত্তিরে এক হাজার পাউণ্ডের স্বপ্ন দেখব, নির্ঘাৎ দেখব ।'

সারাক্ষণ গার্ড-সাহেব অ্যালিসকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন—প্রথমে টেলিস্কোপ দিয়ে, তার পর মাইক্রোস্কোপ দিয়ে, তার পর দূরবীন দিয়ে। শেষ অবধি বলে বসলেন, "তুমি তো ভুল পথে যাচ্ছ।" তার পর জানালা ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

অ্যালিসের ঠিক সামনা-সামনি বসেছিলেন যিনি (সাদা কাগজের পোশাক পরা), তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাচ্চা মেয়ে হলে কী হবে, কোন দিকে যাচ্ছে, তাও কিনা জানে না ! নিজের নামটা বরং না-জানে না-জানুক।"

সাদা পোশাক ভদ্রলোকের পাশটিতে বসেছিল একটি রামছাগল, সে দু চোখ বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "টিকিট-ঘরের হদিসটুকুও জানে না ! এ. বি. সি. ডি. না-জানে না-জানুক !"

রামছাগলের পাশে ছিল একটা গুবরে পোকা। পর পর সবাই একে একে কথা বলাটাই বোধ হয় নিয়ম, তাই নিজের পালা আসতেই বলে উঠল, "এখন থেকে ওকে মালপত্রের মতো করে নিয়ে যাওয়া হবে।"

গুবরে পোকার পাশে যে কে, অ্যালিস ঠিক ঠাহর করতে পারলে না, শুধু একটা ঘড়্ঘড়ে গলা শোনা গেল, "ইঞ্জিন বদল কর—" তার পর আর কোনো কথা শোনা গেল না, আচমকা আটকে গেল।

অ্যালিস মনে-মনে ভেবে নিলে, 'ঘোড়ার গলার আওয়াজ বলে মনে হল।' সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে খুব মিন্‌মিনে গলায় কে বললে, "বেশ একটা মজার কথা হল, না ? 'ঘড়্ঘড়ে' আর 'ঘোড়া' ?"

এর পরই খানিকটা দূর থেকে বেশ মিষ্টি গলার আওয়াজ এল, "ওর গায়ে একটা লেবেল সেঁটে দেওয়া দরকার—'কাঁচা, সাবধানে নাড়াচাড়া করিবেক'।"

এবার একের পর এক মন্তব্য শোনা যেতে লাগল ('কতরকমের চিজ-ই না জুটেছে কামরায়,' অ্যালিস ভাবলে), "ডাক-এ পাঠানোই ভালো, স্ট্যাম্পের মতো একটা মুণ্ডু যখন রয়েছে," "না, না, টেলিগ্রাফে

পাঠানো হোক—," "বাকি রাস্তাটা ঐ বরং ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে যাক," ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু সাদা পোশাক-পরা সেই ভদ্রলোকটি ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, "ওদের কথায় কান দেবার দরকার নেই খুকুমণি, তবে যতবার ট্রেন থামবে, একটা করে ফিরতি-টিকিট কেটে নিয়ো, বুঝলে?"



অ্যালিসের আর ধৈর্য থাকছে না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "মোটেই কাটব না। আমি কি ট্রেনে চড়তে চেয়েছিলুম নাকি? এই তো, একটু আগেই একটা জঙ্গলের মধ্যে ছিলুম—সেখানে ফেরাই মঙ্গল দেখছি!"

কানের কাছে আবার সেই মিন্‌মিনে স্বর শোনা গেল, "আবার একটা মজার কথা হল—'জঙ্গলে' 'মঙ্গল'—বুঝলে?"

ফালতু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজে না পেয়ে অ্যালিস বললে, "জ্বালিয়ো না বাপু! অতই যদি মজা করবার সখ থাকে, নিজে নিজে করলেই তো পারো!"

একটা মিন্‌মিনে দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। খুব করুণ। অ্যালিস

ভাবলে, একটু সান্ত্বনা দিলে মন্দ হত না। কিন্তু "একটু স্বাভাবিক দীর্ঘশ্বাস হলেও নাহয় কথা ছিল। এমন বিদঘুটে আওয়াজ!" সত্যিই, এমন মিন্‌মিনে শব্দ যে, নেহাত কানের গোড়ায় বলেই শোনা গেছে। যাই হোক, কানের গোড়ায় এই ফিস্‌ফিসে ফোঁস্‌ফোঁসানির জ্বালায় সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দেবার কথাও বেমালুম ভুলে যেতে হল তাকে।

ফিস্‌ফিসে আওয়াজ তখন বলে চলেছে, "আমি জানি, তোমার সঙ্গে আমার ভাব, হলায়-গলায় ভাব, অনেকদিনের ভাব। আমি ছোট্টো পোকা তো, তবু জানি, তুমি আমায় কষ্ট দেবে না।"

একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে অ্যালিস বলে উঠল, "কী জাতের পোকা?" আসলে সে জানতে চায়, হুল আছে না নেই, কিন্তু সরাসরি সেটা জিগেস করাটা ঠিক ভদ্রতা হয় না।

ফিস্‌ফিসে গলায় সবে শুরু হয়েছে— "তার মানে, তুমি আমায়—" এমন সময়ে ইঞ্জিন থেকে একটা কান-ফাটানো শিস্ উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই ধড়্‌মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল—অ্যালিসও।

ঘোড়াটা কখন জানলা গলিয়ে বাইরে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিল, ভেতরে ঢুকিয়ে এনে বললে, "বিশেষ কিছু নয়, একটা ছোট্টো নালা শুধু লাফিয়ে পার হতে হবে।" সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লে, কিন্তু রেলগাড়ি লাফাবে, ব্যাপারটাই কেমন যেন ভালো ঠেকল না অ্যালিসের কাছে; একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। আপন মনেই বললে, 'যাই হোক, চারের ঘরে গিয়ে পৌঁছনো তো যাবে, সেইটাই লাভ!' পর মুহূর্তেই ওদের কামরাটা সোজা শূন্যে উঠে পড়ল, আর থতমত খেয়ে হাতের কাছে পায়ে অ্যালিস যেটা সজোরে আঁকড়ে ধরলে, সেটা হল রামছাগলের দাড়ি।

কিন্তু হাতের ছোঁওয়া লাগতে না-লাগতেই দাড়িটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেল, আর অ্যালিস দেখল যে, একটা গাছের তলায় সে চুপচাপ বসে আছে; মাথার ওপর একটা সরু ডালের ওপর ডাঁশ মশাটা (ও-ই এতক্ষণ ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছিল) টাল সামলাতে সামলাতে ডানা ঝাপ্‌টে তাকে হাওয়া করবার চেষ্টা করছে।

ডাঁশটা বেশ বড়ো: 'মোরগের মতন বড়ো', অ্যালিস ভেবে দেখলে। এতক্ষণ আলাপ-সালাপ করেছে তো, তাই বড়ো হলেও ভয় গেল না।

যেন কিছুই হয় নি, এমনি শান্ত গলায় ডাঁশ বললে, "তা হলে সব পোকাদেরই যে তুমি ভালোবাস, তা নয়?"

অ্যালিস বললে, "কথা বলতে পারলে ভালোবাসি। আমাদের দেশে পোকা-মাকড়রা কথা বলতে পারে না।"

ডাঁশ প্রশ্ন করলে, "তোমাদের দেশের কোন পোকা তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে?"

অ্যালিস বললে, "সত্যি কথা বলতে কি, পোকা আমার ভালোই লাগে না; আসলে ভয় করে তো—মানে, বড়ো পোকা হলে তো কথাই নেই। তবে, কয়েকটা পোকার নাম বলতে পারি।"

অন্যমনস্কের মতো ডাঁশ বললে, "নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় তো?"

"আমি তো বাবা কখনো শুনি নি।"

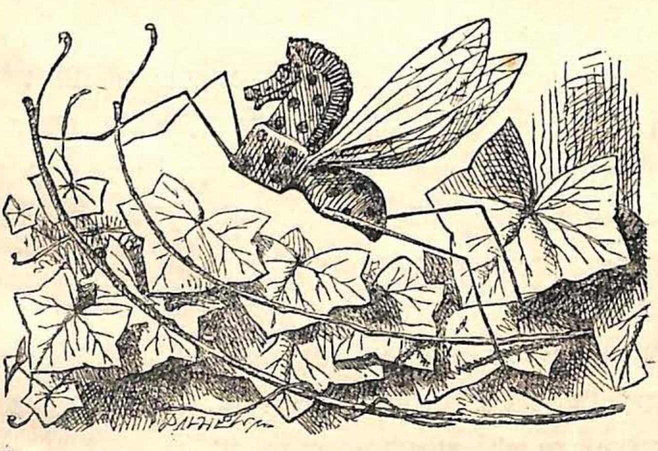
ডাঁশ বললে, "ডাক শুনে যদি সাড়াই না দিল তা হলে নাম থেকে লাভটা কী, শুনি?"

অ্যালিস বললে, "পোকাদের আর কীই-বা লাভ, তবে যারা নাম দেয়, তাদের বোধ হয় কাজে লাগে। না-হলে সব জিনিসের নাম থাকে কেন?"

জবাবে ডাঁশ বললে, "জানি না বাপু, ঐ-যে দূরে ঐ বন, ওখানে কারো নাম নেই—যাই হোক, নাম বলো, শুনি, সময় নষ্ট কোরো না।"

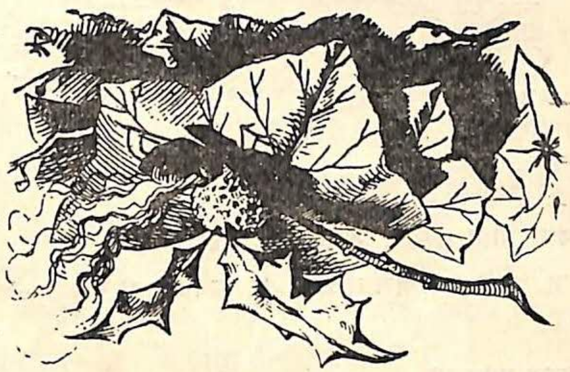
আঙুলের কড় গুনতে গুনতে অ্যালিস বলতে লাগল, "ঘোড়া-মাছি আছে—"

ডাঁশ বললে, "ভালো কথা। ঐ ঝোপটার মাঝামাঝি জায়গাটায় তাকিয়ে দেখ, দেখবে একটা ঘোড়া-মাছি দোল খাচ্ছে। পুরোটা কাঠের



তৈরি, পায়ের তলায় নৌকোর মতো বাঁকানো দুটো কাঠ লাগানো। নড়লেই সামনে-পেছনে দোলে। এমনি দুলতে দুলতেই এ ডাল থেকে ও ডালে যাওয়া-আসা করে।"

খুব অবাক হয়ে অ্যালিস বললে, "কী খায় ?"



ডাঁশ জবাব দিলে, "গাছের রস আর কাঠের গুঁড়ো। নাম বল, নাম বল।"

দোল-খাওয়া ঘোড়া-মাছিটার দিকে দেখে অ্যালিস বুঝতে পারলে, হালে রঙ করা হয়েছে—খুব ঝক্‌ঝকে আর তেলা। তার পর আবার নাম বলতে লাগল।

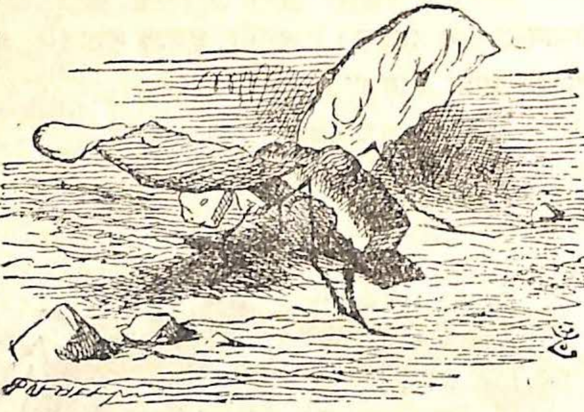
"তার পর, প্রজাপতি আছে, মানে, বাটারফ্লাই।"

ডাঁশ বললে, "পায়ের কাছে দেখ (অ্যালিস শিউরে উঠে পা টেনে নিলে), একটা ব্রেড-অ্যাণ্ড-বাটারফ্লাই দেখতে পাবে। ডানাদুটো খুব পাতলা মাখন-লাগানো পাঁউরুটির ফালি দিয়ে তৈরি, গা-টা তৈরি পঁউরুটির শক্ত মাথাটা দিয়ে, মাথাটা হল এক ড্যালা চিনি।"

"কী খায় ?"

"দুধ-মেশানো হালকা চা।"

অ্যালিসের মাথায় একটা সমস্যা এসে গেল। বললে, "যদি না-জোটে ?"



"না খেয়ে মারা পড়বে, আর কী।"

ভাবনায় পড়ে অ্যালিস বললে, "সেরকম তো বড়ো-একটা হয় না, তাই-না ?"

"আকচার হচ্ছে।"

এর পর অ্যালিসের খুব চিন্তা হল, মিনিট-দুয়েক কোনো কথা বললে না। ডাঁশ ততক্ষণে বেশ মজা করে অ্যালিসের মাথার ওপর বেশ কয়েকবার ভন্‌ভন্‌ করে চক্কর মেরে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গুছিয়ে বসে বললে, "তোমার নিজের নামটা খোয়াতে চাও না নিশ্চয়ই ?"

অ্যালিস একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, "একদম না !"

ডাঁশ নির্বিকার গলায় বলে যেতে লাগল, "কিছুই জানো না। একবার ভেবে দেখ তো, যদি নামটা খুইয়ে বাড়ি ফিরতে পারো, কত সুবিধে হয় ! যেমন ধর, তোমায় যিনি পড়ান, সেই দিদিমণি যখন ডাকবেন—'পড়তে এসো গো—' ব্যাস্‌, ঐখানেই ইতি ! নাম তো আর বলতে পারবেন না, তোমাকেও পড়তে যেতে হবে না !"

অ্যালিস বললে, "ওতে পার পাওয়া যাবে না। দিদিমণি যদি নাম ভুলে যান, তাতেও পড়ার হাত থেকে রেহাই নেই। চাকর-বাকররা যেমন ডাকে, তেমনি 'খুকি' বলেই ডাকবেন।"

ডাঁশ জবাব দিলে, "যদি আর কিছু না বলে শুধুই ডাকেন 'খুকি', তুমিও পড়ায় দেবে ফাঁকি ! আবার একটা কথার মজা হল, দেখেছ ? 'খুকি' আর 'ফাঁকি'। এটা অবশ্য তুমিই বার করলে !"

"আমার বয়ে গেছে। খুব বাজে হল।"

ডাঁশটা লম্বা দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। গাল বেয়ে বড়ো-বড়ো দুটো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

অ্যালিস বললে, "রসিকতা করলে যদি দুক্ষু হয়, না-করলেই তো পারো!"

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেল; এবারকারটা এত করুণ আর এত লম্বা যে, তারই চোটে ডাঁশটা উবে গেল বোধ হয়, কারণ অ্যালিস যখন মুখ তুলে চাইলে, তখন গাছের ডালটা ফাঁকা। অতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে শীত-শীত করছে, উঠে পড়ে হাঁটতে লাগল অ্যালিস।

সামনে বিরাট একটা ফাঁকা মাঠ, তার শেষে গভীর জঙ্গল; আগেকার সেই বনটার চেয়ে অনেক অন্ধকার আর ঘন, ঢুকতে ভয় করে। যাই হোক, শেষ অবধি সাহস করে ঢুকে পড়াই ঠিক করলে। মনে মনে ভাবলে, 'এখন আর ফিরে গেলে চলবে না'—তা ছাড়া, আটের ঘরে যেতে হলে, এ ছাড়া উপায়ই-বা কী।

আবার ভাবতে লাগল, 'যে-বনে কারো নাম থাকে না, এইটাই বোধ হয় সেই বন। ভেতরে ঢুকলে আমার নামটার কী গতি হবে কে জানে? না, বাবা, নাম খোয়ালে চলবে না। তা হলে ওরা আমায় অন্য একটা নাম দেবে, নিশ্চয়ই খুব বিচ্ছিরি নাম। তবে, একটা মজা হবে। আমার পুরনো নামটা তো কেউ একজন পাবে। তার খোঁজ করার সময়ে বেশ মজা হবে। কুকুর-বেড়াল হারালে কাগজে যেমন বিজ্ঞাপন দেয়—'অমুক বলে ডাকলে সাড়া দেয়, গলায় পেতলের বকলস আঁটা—'। যাকে সামনে পাও, দুহাত্তা 'অ্যালিস' 'অ্যালিস' বলে ডেকে যাও, আর দেখ, কে শেষ অবধি সাড়া দেয়!'

এই-সব ভাবতে ভাবতে আর হাঁটতে হাঁটতে বনের ধারে এসে পৌঁছল অ্যালিস। খুব ঠাণ্ডা আর খুব ছায়া-ছায়া। প্রথম গাছের নীচে এসে পৌঁছে ভাবলে, 'যাই হোক, বাবা, গা তো জুড়ল! ঐ খাঁ-খাঁ গরমের পর এখানে, মানে, এই ইয়ের নীচে, মানে—এই ইয়ের নীচে আর কি!" গাছের গুঁড়ির গায়ে হাত ঠেকিয়ে ফের বললে, "এইটার নীচে, আর কি! মানে এই—যা ব্বাবা, এর একটা নাম তো আছে? নাকি, নেই বোধ হয়।—হুঁ, সত্যি কথা বলতে কি, নাম নেই!"

মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, ভাবতে লাগল; তার পর ফের

বকবক করতে শুরু করলে, "শেষপর্যন্ত সত্যিই তাইই হল! তা হলে, এবার দেখা যাক, আমি কে? মনে করে দেখি তো। যে করে হোক, মনে পড়তেই হবে!" জোর করে বললেই তো আর হয় না। অনেক মাথা কুটে শেষপর্যন্ত বললে, "ল, নির্ঘাৎ ল দিয়ে আরম্ভ।"

ঠিক সেই সময়ে একটা হরিণ-ছানা গুটি গুটি এসে হাজির; অ্যালিসের দিকে শান্ত দুটি বড়ো-বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল, একটুও ভয় পেলে না। "আয়, আয়, তু তু!" বলে হাত বাড়িয়ে দিলে অ্যালিস, গায়ে হাত বুলোতে চেষ্টা করলে। হরিণ-ছানাটা দু-পা পেছিয়ে গিয়ে আবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হরিণ-ছানাটাই প্রথম কথা বললে, "তোমার নাম কী?" কী মিষ্টি, নরম গলা!

একটু দুক্ষু করে অ্যালিস বললে, "বলতে পারছি না। আপাতত কোনো নামই নেই!"

"তা বললে তো চলবে না! আবার ভেবে দেখ।"

অ্যালিস আবার ভাবলে, কিন্তু কোনো লাভ হল না। "কিছু মনে কোরো না, তুমি কী? মানে তোমায় কী বলে ডাকব? তাতে হয়তো আমার নামটাও মনে পড়ে যেতে পারে।"

হরিণ-ছানা বললে, "বলতে পারি, যদি আমার সঙ্গে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে পারো। এখানে আমার মনে পড়বে না।"

হরিণ-ছানার গলাটা আদর করে একহাতে জড়িয়ে ধরলে অ্যালিস, তার পর দুজনে বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। শেষ অবধি যখন বন পেরিয়ে আবার একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল, তখন হরিণ-ছানাটা তিড়িং করে একটা লাফ দিতেই অ্যালিসের হাতটা তার গলা থেকে খুলে গেল। খুব ফুর্তির গলায় হরিণ-ছানাটা চীৎকার করে বলে উঠল, "আমি হরিণ-ছানা! আর—তাই তো! ওরে ব্বাবা! তুমি হচ্ছ মানুষ!" বলতে না-বলতেই তার অমন সুন্দর চোখদুটো ভয়ে চকিত হয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে একছুটে একেবারে হাওয়া।

এমন আচমকা পথের সাথীকে হারিয়ে দুঃখে, ক্ষোভে অ্যালিস বেচারি কেঁদে ফেলে আর কি! "যাই হোক, নিজের নামটা অন্তত মনে পড়েছে, সেটাও কম নয়। অ্যালিস—অ্যালিস—আর কখনো ভুলছি না। কিন্তু আঙুল আঁকা এই যে পথের নিশানা রয়েছে, তার কোনটা

ধরব বুঝতে পারছি না তো !"

বোঝা অবশ্য মোটেই শক্ত নয়, কারণ পথ একটাই, আর আঙুল-আঁকা দুটো নিশানাই সেই একটিমাত্র পথের দিকেই ফেরানো।

রাস্তা হয়তো কোথাও কোথাও দু ভাগ হয়ে গেছে, পথের নিশানাও হয়ত দুটো, কিন্তু দুটোই একই রাস্তার দিকে ফেরানো। একটায় লেখা 'এই দিকে টুইড্‌ল্‌ডাম-এর বাড়ি', অন্যটায় লেখা টুই্‌ডল্‌ডী-র বাড়ি এই দিকে।'

শেষ অবধি ভেবে-চিন্তে অ্যালিস দেখলে, 'আমার তো ধারণা হচ্ছে, ওরা এক বাড়িতেই থাকে। যাই হোক, আগে এটা ভেবে দেখি নি। তবে, বেশিক্ষণ থাকা হবে না, সাড়া নিয়ে 'কেমন আছেন-টাছেন' বলে বন থেকে বেরোবার রাস্তাটা শুধু জেনে নেব। উফ্‌! অন্ধকার নামবার আগে আটের ঘরে পৌঁছতে পারলে বাঁচি!'

অগত্যা নিজের মনে বকর্‌ বকর্‌ করতে করতে এগোতে লাগল অ্যালিস। খানিক বাদে একটা খুব চোখা মোড়ের বাঁক ঘুরতেই এমন আচমকা দুটি ছোটোখাটো গোলগাল মানুষের সামনে পড়ে গেল যে, আঁতকে উঠে পিছু হঠতে গিয়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলে, বুঝতে পারলে, আসলে ওরা কে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

টুইড্‌ল্‌ডাম আর টুইড্‌ল্‌ডী

গাছের নীচে এ-ওর গলা জড়িয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। কে যে কোন জন, বুঝতে মোটেই অসুবিধে হল না অ্যালিসের, কারণ একজনের শার্টের কলারে রঙিন সুতোয় 'ডাম' লেখা, আর একজনের 'ডী'। আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করলে অ্যালিস, "দুজনেরই কলারের পেছনে নিশ্চয় লেখা আছে 'টুইড্‌ল্‌'।

দুজনে এমন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, জ্যান্ত কি না বোঝা শক্ত। কলারের পিছনে সত্যি সত্যি 'টুইড্‌ল্‌' লেখা আছে কিনা দেখবার জন্যে ঘুরে ওদের পেছন দিকে যেতে গেছে, আর অমনি একটা আচমকা কথার আওয়াজে আঁতকে উঠতে হল। 'ডাম' মার্কা কথা বলছে।

"যদি মনে করে থাক, আমরা মোমের পুতুল, তা হলে পয়সা দিতে হবে। মুফতে দেখবার জন্যে তো আর কেউ মোমের পুতুল বানায় না। মোটেই বানায় না।"

'ডী' মার্কা বলে উঠল, "অপর পক্ষে, যদি মনে করে থাক, আমরা জ্যান্ত মানুষ, তা হলে কথা বলতে হবে।"

কোনোরকমে অ্যালিস বললে, "মাপ করবেন, আমি খুবই অনুতপ্ত।" ওর মাথায় তখন সেই পুরনো ছড়াটা এমন পাক খাচ্ছে যে,

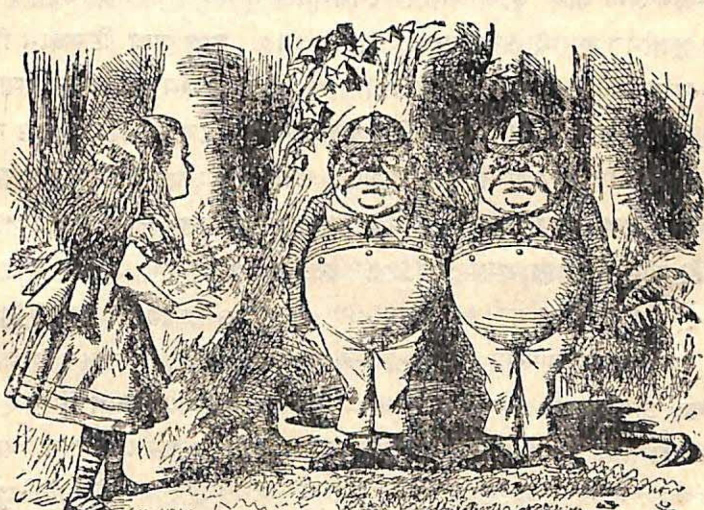
আর কিছু বলা হয়ে উঠল না। বরং মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল :

"টুইড্‌ল্‌ডাম ও টুইড্‌ল্‌ডী
ঠিক করছে, লড়েই যাবে তারা!
ডাম-এর খাসা নতুন ঝুমঝুমি—
ডী করেছে তার দফাটি সারা।
সেই সময়ে বিরাট কালো কাক
হঠাৎ এল ঝাঁপ খেয়ে সেইখানে!
ভয়ের চোটে দু ভাই হতবাক,
ঝগড়া ভুলে তাকায় আকাশপানে।"

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "বুঝতে পারছি, কী ভাবছ। আসলে কিন্তু তা নয়। মোটেই নয়।"

টুইড্‌ল্‌ডী তার খেই ধরে বলে উঠল, "অপর পক্ষে যদি তা হত, তা হলে তাই-ই হত ; যদি তা হতে পারত, তা হলে তাই-ই হতে পারত ; কিন্তু যেহেতু তা নয়, তা নয়। একে বলে যুক্তি।"

অ্যালিস খুব বিনীত হয়ে বললে, "আমি ভাবছিলুম, এই বন থেকে



বেরোবার সোজা রাস্তা কোনটা ; বড্ডো অন্ধকার হয়ে আসছে তো। একটু ব'লে দেবেন ?"

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে শুধু মুচকে হাসলে।

দুজনকে ঠিক ইস্কুলের পড়ুয়ার মতো দেখতে—একটু বড়োসড়ো অবশ্য—যে, অ্যালিস টুইড্‌ল্‌ডাম-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ফেললে, "ফার্স্ট বয় !"

আচমকা চেঁচিয়ে উঠে টুইড্‌ল্‌ডাম বলে উঠল, "মোটেই না !" তার পর খপ্ করে মুখ বন্ধ করে ফেললে।

টুইড্‌ল্‌ডীর কাছে এসে অ্যালিস বললে, "নেক্সট্ বয় !" বলেই মনে হল, টুইড্‌ল্‌ডী নিশ্চয়ই বলবে "অপর পক্ষে !" আর সত্যিই তাই বললে টুইড্‌ল্‌ডী।

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "তুমি তো শুরুতেই গণ্ডগোল করেছ। কোথাও এলে প্রথমে বলতে হয়, 'ভালো তো ?' তার পর করমর্দন করতে হয় !" বলা শেষ হতেই দুভাই খানিকটা কোলাকুলি করে নিলে, তার পর একখানা করে হাত বাড়িয়ে দিলে অ্যালিসের দিকে—আর একখানা করে হাত তো পরস্পরের গলায় জড়ানো।

কার সঙ্গে প্রথমে করমর্দন করা উচিত, ভেবে পেলে না অ্যালিস—আর-একজন যদি দুঃখ পায়। শেষপর্যন্ত মুশকিল আসান করে দুহাত দিয়ে দুজনের হাতই একসঙ্গে ধরলে। আর, সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করে দিলে। ব্যাপারটা, কেন কে জানে, মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকল না ; এমন-কি, হঠাৎ বাজনা বেজে ওঠা সত্ত্বেও নয়। যে-গাছের তলায় ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই গাছ থেকেই যেন বাজনাটা আসছে বলে মনে হয়। যদ্দূর আন্দাজ করতে পারা গেল, গাছের একটা ডালের ওপর আর-একটা ডালের ঘষা লেগে লেগেই যেন বাজনার মতো আওয়াজটা বেরোচ্ছে—বেহালার তারের ওপর যেমন ছড়ের টান।

পরে যখন অ্যালিস তার দিদিকে সব গল্প করেছিল, তখন বলেছিল, "কিন্তু, ভাই, যখন টের পেলুম যে আমি বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গান ধরে ফেলেছি, তখন অবাক না হয়ে পারি নি। কখন যে গান গাইতে শুরু করলুম, জানি না, তবে মনে হল যেন অনেকক্ষণ ধরেই গাইছিলুম !"

নাচিয়ে দুজন যা মোটা, একটু পরেই হাঁফিয়ে-টাঁফিয়ে একাক্কার। "চার-ফের ঘোরা হলেই একটা নাচ শেষ।" এই কথা বলেই

টুইড্‌ল্‌ডাম নাচ থামালে, সঙ্গে সঙ্গে টুইড্‌ল্‌ডীও আচমকা থেমে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও খতম।

অ্যালিসের হাত ছেড়ে দিয়ে এবার ওরা মিনিটখানেক ওর দিকে চেয়ে রইল। কেউ কথা কইছে না, খুব বিদিকিচ্ছিরি অবস্থা। এই-মাত্র যাদের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে নেচেছে, তাদের সঙ্গে কী ভাবে কথা শুরু করা যায় ভেবেই পাচ্ছে না অ্যালিস। মনে-মনে ভেবে দেখলে, 'এখন আর 'ভালো আছেন তো' বলা সাজে না, আরো অনেক আগে হলে চলত।'

শেষপর্যন্ত বলে বসল, "খুব ক্লান্ত লাগছে না তো?"

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "মোটেই না। জিগেস যে করলে, তাতে খুব খুশি হলুম।"

টুইড্‌ল্‌ডী ফুট্ কাটলে, "খুব বাধিত হলুম। কবিতা ভালো লাগে?"

অ্যালিস আমতা-আমতা করে বললে, "তা, হ্যাঁ, ভালোবাসি বৈকি কিছু কিছু কবিতা। আচ্ছা, কোন দিক দিয়ে বনটা পার হওয়া যায়, বলবেন?"

টুইড্‌ল্‌ডাম-এর দিকে তাকিয়ে টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "কোন কবিতাটা মুখস্থ বলি, বল তো?" অ্যালিসের প্রশ্নটা গায়েই মাখলে না, ড্যাবা-ড্যাবা চোখ করে টুইড্‌ল্‌ডাম-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

আদর করে টুইড্‌ল্‌ডীকে জাপটে ধরে টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "সিন্ধু-ঘোটক আর ছুতোরের' কবিতাটাই বেশ বড়োসড়ো হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে টুইড্‌ল্‌ডী শুরু করলে:

"নীচে সাগর উথাল-পাথাল—"

অ্যালিস মাঝপথে বাধা না দিয়ে পারলে না। বললে, "খুব বড়ো কবিতা হলে, আগেই যদি বলে দেন যে, বন থেকে বেরুতে হলে কোন দিকে যাব, তা হলে—"

মুচকি হেসে টুইড্‌ল্‌ডাম আবার শুরু করলে:

"নীচে সাগর উথাল-পাতাল, মাথায় চড়া রোদ,
সুয্যিমশাই উজাড় করে ঢালছে কড়া তাত।
সাগর জলে চমকে দিয়ে নিচ্ছে যেন শোধ,
ঝিল্‌মিলিয়ে দিচ্ছে, যেমন নতুন রুপোর পাত—

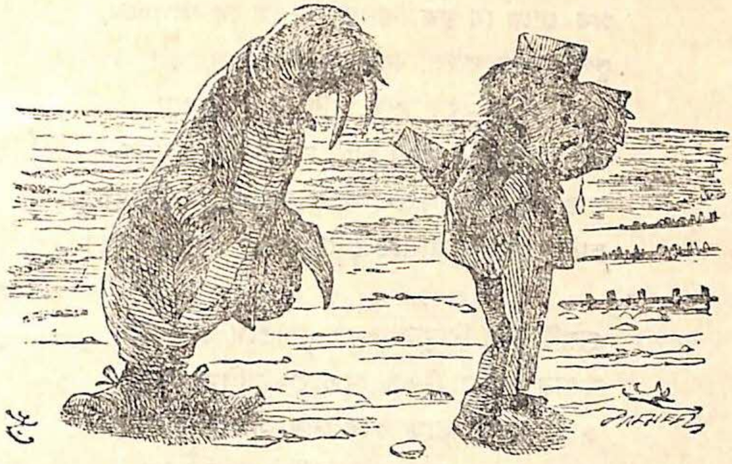
কিন্তু পুরো ব্যাপারখানাই গোলমেলে, তার কারণ,
তখন, সত্যি বলতে গেলে, সময়টা মাঝরাত।

চাঁদ উঠেছে, ঢালছে কিরণ নেহাত ব্যাজার মুখে ;
ভাবছে, এখন সুয্যি কেন নাক গলাবে এসে ?
দিন তো গেছে, তার পালা তো আগেই গেছে চুকে,
কোন আক্কেলে থাকছে তবু মাঝ-আকাশে ভেসে ?
বললে, "এটা ইত্‌রোমি ওর ! এমন করে আমার
এত সাধের আনন্দটা বিগড়ে দিলে শেষে !"

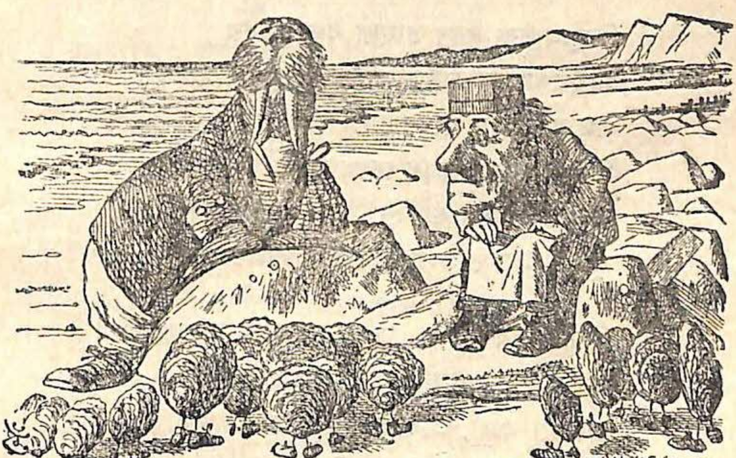
সুমুদ্দুরটা বেজায় ভিজে, যারপরনাই জোলো ;
বালির চড়া শুকনো বেজায়, একদম খট্‌খটে।
আকাশে মেঘ দেখবে নাকো, যতই চক্ষু তোল,
কারণ, সারা আকাশটাতে মেঘ নেইকো মোটে।
মাথার ওপর পাখির ডানার শব্দ না-যায় শোনা,
কারণ, কোনো পাখিই যে নেই বিজন বালুতটে।

সিন্ধুঘোটক এবং ছুতোর, পরম বন্ধু তারা—
সাগরবেলায় গুটিগুটি হাঁটছে পাশাপাশি ;
আকুল হয়ে দুজনাতে কেঁদেই হল সারা
দেখে সাগরতীরের অপার অসীম বালির রাশি।
বললে পরে, "সমস্তটা ঝেঁটিয়ে সাফাই হলে
খুব ভালো হয়, অদ্ভুত হয়, তখন মোরা হাসি !"

সিন্ধুঘোটক শুধোয়, "যদি সাতটা ঝিয়ে মিলে
সাতটি গাছা খ্যাংরা নিয়ে কেবলই ঝাঁট পাড়ে,
তখন কি ভাই সাফ হত সব—মাস ছয় ঝাঁট দিলে ?"
প্রশ্ন শুনে ছুতোর ভায়া তাকায় আড়ে আড়ে,
অনেক ভেবে বললে, "আমার হতেছে সন্দেহ !"
বলার পরেই ফুঁপিয়ে উঠে আবার কেঁদে নিলে।



সিন্ধুঘোটক হঠাৎ তখন ডাকে আকুল হয়ে—
"কোথায় তোরা গুগলি-ঝিনুক, আয় না মোদের সাথে,
পাশাপাশি বেড়িয়ে বেড়াই প্রাণের কথা কয়ে ;
সাগরবেলায় সুখ যদি পাই, কার-বা ক্ষতি তাতে ?
গুটি চারেক আয় তোরা, ভাই, তার বেশি নয়, কারণ,
তার বেশি তো কুলোবে না মোদের চারটে হাতে।"



সব চেয়ে যে বৃদ্ধ ঝিনুক, দেখল কেবল চেয়ে,
চুপটি করে রইল, কারণ বন্ধ ছিল মুখ ;
বৃদ্ধ ঝিনুক রইল বসে, ছুটল নাকো ধেয়ে,
চোখ মট্‌কে ধ্যাবড়া মাথা নাড়ল সে ঢুক্‌ঢুক্—
তার মানে সে মোটেই রাজি নয়কো সে-প্রস্তাবে,
চাইছে না সে আসতে ছেড়ে জলের বাড়ির সুখ।

চারটি কচি ঝিনুক কেবল চেতিয়ে ওঠে সুখে
মজার আশায় উৎসাহেতে ডগ্‌মগিয়ে সারা।
জামা-কাপড় সাফ করে নেয়, সাবান দিল মুখে,
পায়ের জুতো ধুয়ে মুছে পালিশ করে তারা—
কিন্তু এটা কেমন যেন গোলমেলে, তার কারণ,
ওদের না-কি পা হয় না। আহা গো, বেচারা।

সেই চারটি কচি ঝিনুক নিলে ওদের পিছু,
তার পরেতে জুটল এসে তিন-চারেতে বারো।
ক্রমে ক্রমে ভিড়ল এসে আরো কিছু কিছু
পিল্‌পিলিয়ে এল আরো, আরো এবং আরো।
জলের ফেনায় ছপ্‌ছপিয়ে হুড়্‌মুড়িয়ে ছোটে,
গুড়্‌গুড়িয়ে এগোচ্ছে, তর সইছে নাকো কারো।

সিন্ধুঘোটক এবং তাহার বন্ধু সূত্রধর
মাইলখানেক হাঁটল সোজা নিঝুম বালচরে।
পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে থামল অতঃপর,
ঢিবির মতন পাথর দেখে বসল আরাম করে।
আর, যত সব গুগলি-ঝিনুক ওদের চারি ধারে
মুখটি বুজে শান্ত হয়ে দাঁড়ায় লাইন ধরে।

সিন্ধুঘোটক বললে, "এবার আড্ডা মারার পালা।
করব শুরু আলোচনা, বিষয় হবে নানা—
জুতোর কথা, জাহাজ, কিম্বা সীল করবার গালা,
বাঁধাকপি, রাজা-গজা—কিছুতেই নেই মানা ;

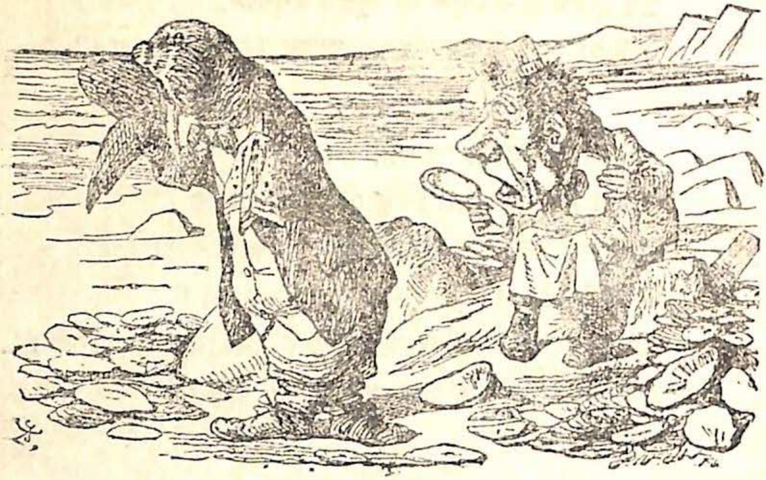
সুমুদ্দুরের জল কেন সে ফুটন্ত টগ্‌বগে,
শুয়োরছানার কাঁধের ওপর আছে, কি নেই ডানা।"

ঝিনুকেরা বললে, "আরে, একটু সবুর কর,
আড্ডা মারার আগে কিছু চাই যে অবসর ;
হেঁটে এসে কারুর কারুর হাঁফ ধরেছে বড়ো,
দেখছই তো সবাই কেমন পুরুষ্টু, নধর !"
বললে ছুতোর, "ঠিক আছে, ভাই, নেইকো তাড়াতাড়ি !"
তাই-না শুনে বহে গেল ধন্যবাদের ঝড়।

সিন্ধুঘোটক বললে, "কিছু রুটি যে দরকার,
বড়োসড়ো টাটকা-রুটি, পাউণ্ডখানেক ওজন ;
গোলমরিচের গুঁড়ো এবং একটু ভিনিগার
লাগত ভালোই, পরম তৃপ্ত হতাম আমরা কজন।
ঝিনুকভায়া, তোমরা যদি তৈরি থাক, বল,
এবার তবে নিশ্চিন্তে, করব শুরু ভোজন।"

শুনে ওরা চমকে গেল, নীলচে হল ডরে,
বললে, "দেখ, আমরা যেন খাবার না-হই তবে !
এমন সদয় এবং মিষ্টি ব্যবহারের পরে
মোদের দিয়ে পেট ভরানো—সেটাকে কি ঠিক হবে ?"
সিন্ধুঘোটক বললে শুধু, রাতটা কী সুন্দর,
এমন দৃশ্য কেই-বা কবে দেখেছে এই ভবে !

তোমরা সুজন, তাইতে সাড়া দিলে মোদের ডাকে,
তোমরা ভালো, মোদের সাথে এলে হেথায় হেঁটে।"
ও-সব কথায় কান না-দিয়ে ছুতোর ভায়া হাঁকে,
"সিন্ধুঘোটক, বানাও দেখি আর-এক ফালি কেটে।
কানের মাথা পুরোপুরি খেয়েই আছ বসে ?
দুবার কেন বলতে হবে, বুদ্ধি কি নেই পেটে ?"



সিন্ধুঘোটক বললে, "আমি অনুতপ্ত আজি ;
এতটা দূর এনে ওদের, হাঁটিয়ে তাড়াতাড়ি
মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে এনে শেষেতে ঠগবাজি !
ছি ছি ছি ছি ছি ছি ! আমার লজ্জা করে ভারি।"
ছুতোর ভায়া কান দিলে না, বললে বিরক্তিতে,
"এত পুরু মাখন দিলে তারিয়ে খেতে পারি ?"

"তোদের কথা ভেবে, ওরে", সিন্ধুঘোটক বলে,
কাঁদছি আমি, গভীর দুঃখ করছি অনুভব।"
তার পরেতে ডুকরে উঠে, ভেসে চোখের জলে
বড়োগুলো বেছে বেছে তুললে টপাটপ্ ;
পকেট থেকে রুমালখানা হিঁচড়িয়ে বার করে
ধরলে সেটা বান-ডাকা তার সিক্ত চোখের তলে।

ছুতোরভায়া বললে, "ওগো, গুগলি-ঝিনুকেরা,
আমোদে বেশ কাটল সবার, ঘোরাও হল বেশ।
আসবে সবাই ? এবার শুরু করবে ঘরে ফেরা ?"
নেইকো জবাব, কোথাও নেই টুঁ শব্দের রেশ।
—এতে মোটেই অবাক হবার নেই কিছু, তার কারণ,
ততক্ষণে খ্যাঁটের চোটে সব কজনাই শেষ !

শুনে অ্যালিস বললে, "ওদের মধ্যে সিন্ধুঘোটকটাই ভালো, ঝিনুকদের কথা ভেবে একটু দুক্ষু অন্তত হয়েছিল!"

টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "ছুতোরের চেয়ে ও-ই বেশি খেয়েছিল অবশ্য। বুঝলে না, মুখের সামনে রুমালটা ধরে রেখেছিল বলে সিন্ধুঘোটক টেরই পায় নি যে, অপর পক্ষে, ছুতোর আসলে কটা খেলে।"

জ্বলে উঠে অ্যালিস বললে, "কী নীচ! তা হলে বলব, ছুতোরটাই ভালো—যদি অবশ্য ও সিন্ধুঘোটকের চেয়ে কম খেয়ে থাকে।"

এবার টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "কিন্তু সেও তো যত পারে খেয়েছে।"

গোলমেলে ব্যাপার। একটু চুপ করে থেকে অ্যালিস বললে, "তা হলে, দুজনেই খুব খারাপ—" কথাটা শেষ করবার আগেই আচমকা থেমে যেতে হল, কারণ তার কানে একটা বিকট শব্দ গেছে—বনের মধ্যে কোথা থেকে যেন রেল-ইঞ্জিনের ফোঁস্‌ফোঁসানির শব্দ আসছে। আসলে হয়তো কোনো প্রকাণ্ড বুনো জানোয়ার। খুব ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলে, "বনে বাঘ বা সিংহ-টিংহ থাকে না কি?"

টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "কিছু না, লাল রাজা নাক ডাকাচ্ছেন।"

"এসো-না, দেখবে।" বলেই দুভাই ওর দুহাত পাকড়ে ধরে টানতে টানতে লাল রাজার কাছে নিয়ে গেল।

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "দেখতে বেশ ভালো লাগে, না?"

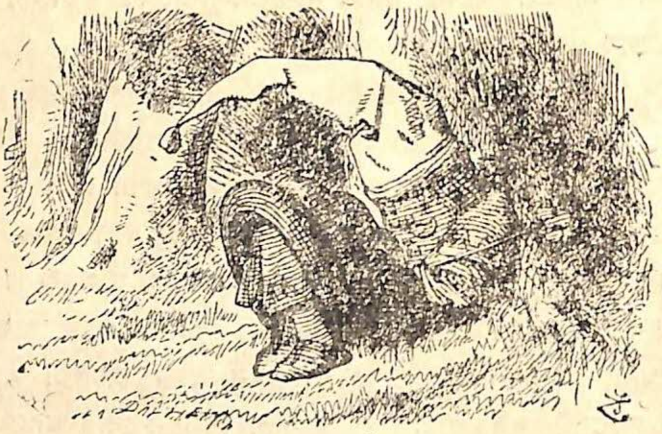
সত্যি কথা বলতে কি, অ্যালিসের ভালো লাগে নি। মাথায় একটা টোপরের মতো কাপড়ের টুপি, তার ছুঁচলো ডগায় আবার সুতোর একটা ঝুমকো—সেই পরে গাছের গোড়ায় কুঁকড়ে-মুকড়ে একতাল মাংসের মতো স্তূপাকার হয়ে বসে আছেন লাল রাজা, বিকট শব্দে নাক ডাকাচ্ছেন। টুইড্‌ল্‌ডাম-এর মতে, 'চাঁদি-ফাটানো নাক ডাকা!'

অ্যালিসের বুদ্ধি-বিবেচনা তো খুব, তাই বললে, "ভিজে ঘাসের ওপর অমন করে বসে থাকলে তো ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "উনি এখন স্বপ্ন দেখছেন। কিসের স্বপ্ন বল তো?"

অ্যালিস বললে, "তা কে বলতে পারে?"

জিতে যাবার ঢঙে হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠল টুইড্‌ল্‌ডী, "কী আশ্চর্য! তোমার স্বপ্ন দেখছেন! এখন যদি মাঝপথে স্বপ্ন ভেঙে যায়, তুমি থাকবে কোথায়?"



"এখন যেখানে আছি।"

"আজ্ঞে না!" সঙ্গে সঙ্গে ভেংচে জবাব দিলে টুইড্‌ল্‌ডী। "তুমি আর থাকবেই না। আরে বাবা, তুমি তো নেহাত ওঁর স্বপ্নেরই ব্যাপার!"

টুইড্‌ল্‌ডাম ভাইয়ের কথার জের টেনে বললে, "ঐ যে রাজা, উনি যেই জেগে উঠবেন, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ফক্কা!—মোমবাতির আলোর মতো পুট্ করে নিবে যাবে!"

চটে-মটে অ্যালিস বললে, "বয়ে গেছে আমার নিবে যেতে! তা ছাড়া, আমি যদি শুধু ওঁর স্বপ্নেরই জিনিস হই, বল তো বাপু, শুনি, তোমরা দুটি কী?"

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "ঐ!"

টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "ঐ, ঐ!"

এমন চেঁচিয়ে বললে যে, অ্যালিসের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, "শ্ শ্! অত গোলমাল করলে ঘুম ভেঙে যাবে না!"

তাই শুনে টুইড্‌ল্‌ডাম বলে উঠল, "উনি জাগবেন কি জাগবেন না, তা নিয়ে তোমার কথার কীই-বা দাম, বল! ওঁর স্বপ্নের জিনিস বৈ তো নও! নিজেও তো জানো, আসলে তুমি নেই!"

"আমি আছি, সত্যি সত্যি আছি!" বলতে বলতে কেঁদে ফেললে অ্যালিস।

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "কাঁদলেই কি আর সত্যি হওয়া যায়! কাঁদবার আছেই-বা কি?"

চোখের জলে একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। অ্যালিস বলে উঠল, "যদি সত্যি না হতুম, তা হলে কাঁদতে পারতুম না!"

খুব তাচ্ছিল্যভরে টুইড্‌ল্‌ডাম ফোড়ন কাটলে, "চোখের জলগুলো সত্যিকারের ভেবেছ নাকি?"

অ্যালিস ভাবলে, 'একেবারে আবোল-তাবোল বকছে, ওদের কথা নিয়ে কান্নাকাটি করাটাও বোকামি।' চোখের জল মুছে, যতটা পারে হাসি-খুশি হয়ে বললে, "সে যাক গে, আমার এবার বন থেকে বেরনো দরকার, সত্যি, খুব অন্ধকার হয়ে আসছে। বিষ্টি হবে বলে মনে হয়?"

বিরাট একটা ছাতা খুলে দুজনের মাথার ওপর ধরে টুইড্‌ল্‌ডাম মাথা তুলে দেখে নিয়ে বললে, "না, মনে তো হয় না। অন্তত ছাতার তলায় তো নয়ই। মোটেই না।"

"আহা, ছাতার বাইরে তো পড়তে পারে?"

টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "ইচ্ছে হলে পড়বে; আমাদের কিছু বলবার নেই—অপর পক্ষে।"

অ্যালিস ভাবলে, 'হাড় স্বার্থপর কোথাকার।' 'গুড্ নাইট' বলে বেরিয়ে পড়বে, এমন সময়ে তিড়িং করে ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে এসে টুইড্‌ল্‌ডাম খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরল।

তার পর ভয়ে ভয়ে বললে, "ওটা কী, দেখতে পাচ্ছ?" আতঙ্কে তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, চোখ দুটো দেখতে দেখতে হলদে হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা আঙুল বাড়িয়ে গাছের তলায় সাদা মতন কী একটা জিনিসের দিকে দেখালে।

ভালো করে পরখ করে দেখে অ্যালিস বললে, "ওটা ঝুমঝুমি, মানে র‍্যাটল; র‍্যাটল সাপ নয়, বুঝলে?" শেষের কথাটা চট্ করে মাথায় এসে গিয়েছিল, পাছে 'র‍্যাটল' অবধি শুনেই সাপ ভেবে ভয় পেয়ে যায়। "পুরনো একটা ঝুমঝুমি, ভাঙা।"

দু-হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে মাটিতে দাপিয়ে বেড়াতে বেড়াতে টুইড্‌ল্‌ডাম বলে উঠল, "ঠিক আন্দাজ করেছি! একেবারে বারোটা বেজে গেছে তো!" বলেই টুইড্‌ল্‌ডী-র দিকে এক ঝলক তাকাতেই সে ধুপ্ করে মাটিতে বসে পড়ে ছাতা দিয়ে গা আড়াল করবার চেষ্টা করতে লাগল।

টুইড্‌ল্‌ডামের গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে অ্যালিস বলতে



লাগল, "আহা, পুরনো একটা ঝুমঝুমি নিয়ে অত রাগারাগি করতে নেই।"

ভীষণ ক্ষেপে উঠে টুইড্‌ল্‌ডাম চীৎকার করে উঠল, "মোটেই পুরনো নয়! শুনে রাখ, একদম নতুন—মাত্তর কাল কিনেছি—আমার অমন সুন্দর নতুন ঝুমঝুমি!" বলতে বলতে গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে দিলে।

ইতিমধ্যে টুইড্‌ল্‌ডী নিজে ভেতরে থাকা অবস্থায় ছাতাটাকে বন্ধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অ্যালিস কিছুক্ষণ আর টুইড্‌ল্‌ডাম-এর দিকে নজর দিতে পারল না। টুইড্‌ল্‌ডী কিছুতেই কায়দা করতে পারলে না, শেষপর্যন্ত ছাতা-সমেত তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল, মাথাটা কেবল বাইরে বেরিয়ে। বড়ো-বড়ো চোখ দুটো আর ঠোঁট দুটো কেবল খুলছে আর বন্ধ করছে। অ্যালিসের মনে হল—'ঠিক যেন একটা খাবি-খাওয়া মাছ!'

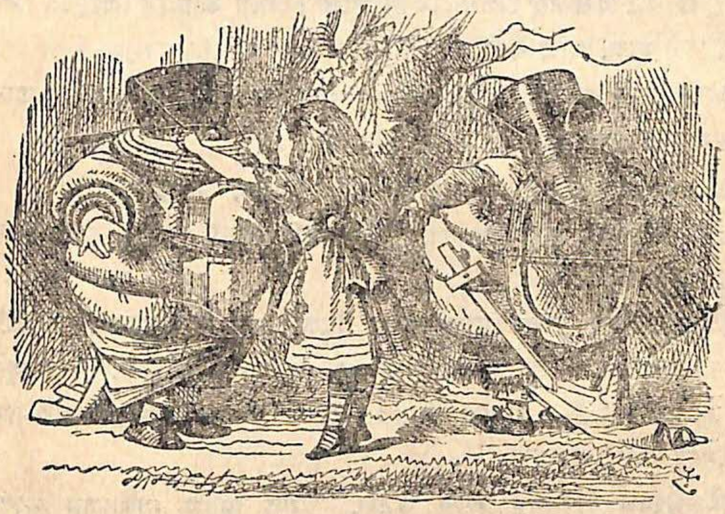
টুইড্‌ল্‌ডাম এবার একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। বললে, "লড়ে যেতে রাজি আছিস তো?"

ছাতার ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে নির্লিপ্ত গলায় ভাই বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে। তবে ঐ মেয়েটিকে আমাদের সাজ-পোশাক ঠিক করে দিতে হবে।"

তার পর দু ভাই হাত-ধরাধরি করে গাছ-গাছালির আড়ালে ঢুকে গেল। যখন বেরিয়ে এল, তখন হাত-বোঝাই জিনিস—তাকিয়া, পাশ-বালিস, চাদর, কম্বল, টেবিল-ক্লথ, ঝাড়ন, ঝুড়ি—এই-সব।

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "পিন লাগানো, ফাঁস লাগানো—এ-সব আসে তো? যে করে হোক, এগুলো সবই গায়ে পরাতে হবে।"

পরে অ্যালিস বলেছে যে, ঝুট্‌-মুট্‌ এরকম হুলুস্থুল কাণ্ডকারখানা সে জীবনে আর দেখে নি। যেভাবে দুজনে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাজে লেগে গেল, আর একের পর এক ঐ-সব জিনিসগুলো গায়ে-মাথায় চড়াতে লাগল, আর ফিতে বাঁধবার জন্যে, বোতাম লাগাবার জন্যে যেভাবে ওকে



ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। টুইড্‌ল্‌ডী-র গলায় একটা পাশবালিশ জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে অ্যালিস ভাবলে, 'সাজ শেষ হলে ঠিক কাপড়ের পুঁটলির মতো দেখাবে।' টুইড্‌ল্‌ডী-র মতে, "পাশ-বালিশ জড়ানো থাকলে মুণ্ডু কাটা যাবার ভয় থাকে না।'

খুব গম্ভীর হয়ে আরো বলেছিল টুইড্‌ল্‌ডী, "জানো তো, লড়াই করতে গিয়ে খুব সাংঘাতিক যা যা ঘটতে পারে, তার মধ্যে একটা হল, মুণ্ডু উড়ে যাওয়া!"

অ্যালিস আর হাসি চাপতে পারলে না, তবে পাছে মনে দুঃখ পায়, তাই কাশির মতো শব্দ করে হাসির আওয়াজটাকে ঢাকা দিলে।

মাথায় হেল্‌মেট পরবার জন্যে অ্যালিসের কাছে এগিয়ে এসে টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "আমায় কি খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে?" (নামেই 'হেল্‌মেট', আসলে সস্‌প্যান-ই বলা যায়।)

অ্যালিস খুব মিষ্টি করে বললে, "হ্যাঁ, তা একটু দেখাচ্ছে।"

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "এমনিতে আমার খুব সাহস। তবে, আজ আবার মাথাটা কেমন যেন ধরে রয়েছে।"

টুইড্‌ল্‌ডী কথাটা শুনে ফেলেছে। চট্‌ করে অমনি বলে উঠল, "আমারও দাঁতটা কন্‌কন্‌ করছে! আমার অবস্থা আরো কাহিল!"

লড়াই বন্ধ করবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে অ্যালিস ছাড়লে না, বললে, "তা হলে, আজ বরং লড়াই থাক।"

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "একটুখানি লড়াই অন্তত করতেই হবে। তবে বেশিক্ষণ করতে চাই না। এখন কটা বাজে?"

হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে নিয়ে টুইড্‌ল্‌ডী বললে, "সাড়ে চারটে!"

তাই শুনে টুইডল্‌ড্‌াম বললে, "ছটা অবধি লড়াই হোক, তার পর খাওয়া যাবে।"

টুইড্‌ল্‌ডী খুব করুণ গলায় জবাব দিলে "বেশ, তাই হবে। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দেখুক।" তার পর সাবধান করে দিয়ে বললে, "তবে খুব কাছে এসো না কিন্তু! রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না, চোখে পড়লেই দম করে মেরে বসব, হ্যাঁ!"

টুইড্‌ল্‌ডাম চীৎকার করে উঠল, "আর আমি নাগালের মধ্যে পেলেই কচু-কাটা করে ফেলব, চোখে পড়ুক আর না পড়ুক, হ্যাঁ!"

অ্যালিস তখনো হাল ছাড়ে নি। তাই বললে, "একটা সামান্য ঝুমঝুমি নিয়ে কিনা এই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড!"

টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "আনকোরা নতুন না হলে তেমন গায়ে মাখতুম না।"

অ্যালিস ভাবলে, 'এবার বোধ হয় সেই ধেড়ে কাকটা আসবে।'

ভাইকে ডেকে টুইড্‌ল্‌ডাম বললে, "তলোয়ার তো মাত্র একখানাই, বুঝলি? তুই ছাতাটা নিতে পারিস, ওটাতেও খুব ধার। কিন্তু, একটু তাড়াতাড়ি শুরু করা দরকার। অন্ধকারটা এমন ঘন হয়ে আসছে যে,

কহতব্য নয়।”

টুইড্‌ল্‌ডী বললে, “কহতব্যের চেয়েও বেশি ঘন হয়ে আসছে।”

হঠাৎ সত্যিই এমন অন্ধকার নেমে এল যে, অ্যালিস ভাবলে বুঝি-বা ঝোড়ো মেঘে আকাশটা ঢেকে গেল। বললে, “কী ঘন কালো মেঘ রে বাবা! কী তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে! আরে? আবার ডানা রয়েছে যে!”

আতঙ্কে ককিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল টুইড্‌ল্‌ডাম, “সেই কাকটা!” সঙ্গে সঙ্গে দু ভাই হাওয়া।

জঙ্গলের ভেতর খানিকটা দূর দৌড়ে গিয়ে একটা বড়ো গাছের নীচে দাঁড়াল অ্যালিস। মনে-মনে ভেবে দেখলে, ‘এখানে নিশ্চয়ই আমার নাগাল পাবে না। গাছ-গাছালির ফাঁকে কি আর ঢুকতে পারবে অত বড়ো শরীরটা নিয়ে? তবে, যেরকম ডানা ঝাপটাচ্ছে, বনের মধ্যে ঝড় তুলে দিলে একেবারে—ঐ যাঃ, কার গায়ের শালখানা উড়ে চলে গেল।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভেড়ায় বোনে পশম

বলতে বলতেই খপ্ করে শালটাকে ধরে ফেলল অ্যালিস, তার পর এদিক-ওদিক তাকাতেই নজরে পড়ল গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে পাগলের মতো ছুটে আসছেন সাদা রানী—হাতদুটো পাখির ডানার মতো দুদিকে লট্পট্ করছে, যেন উড়ছেন। সসম্ভ্রমে অ্যালিস শালটা নিয়ে এগিয়ে গেল।

তাঁর গায়ে শালটা জড়িয়ে দিতে দিতে বললে, "আমার হাতেই শালটা এসে পড়ল, বড়ো আনন্দের কথা!"

কেমন একটা অসহায় আর ভয়-পাওয়া চোখে রানী শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন আর ফিস্ফিস্ করে নিজের মনেই বার বার কী একটা কথা বিড়্বিড়্ করে যেতে লাগলেন—শুনে মনে হয় 'মাখন-রুটি, মাখন-রুটি।' অ্যালিস বুঝলে, আলাপ করতে হলে, তাকেই কথা শুরু করতে হবে। খুব বিনয় করে বললে, "গায়ে-পড়ে আলাপ করলে সাদা মহারানী কি রাগ করবেন?"

রানী বললেন, "না, করব না। তবে গায়ে একটা শাল পরিয়ে দিলেই কিছু গায়ে-পড়া হয় না।"

প্রথমেই তর্ক করাটা কিছু কাজের কথা নয়, তাই অ্যালিস হাসিমুখে আবার বললে, "কী ভাবে আলাপ-সালাপ শুরু করতে হয় যদি দয়া করে বলে দেন, সেই ভাবেই চেষ্টা করে দেখি।"

রানী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠলেন, "শুরু আবার করব কী ? দু ঘণ্টা ধরে সেই চেষ্টাই তো করছি—শালটা গায়ে পরতে !"

রানীর পোশাক-আশাক এমন এলোমেলো যে সে-সব ঠিক করা একার কম্ম নয়। অ্যালিস দেখলে, প্রত্যেকটা জিনিস এলোমেলো. বাঁকাচোরা ! সারা গায়ে যেখানে-সেখানে পিন দিয়ে সব আটকানো ! —"আপনার শালটা ঠিক করে দেব ?"

খুব করুণ গলায় রানী বললেন, "কী যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না ! বোধ হয় শালটার মেজাজ বিগড়েছে। এখানে পিন আটকেছি, ওখানে পিন আটকেছি, তবুও ওর মন পেলুম না !"

শালটা ঠিক করে লাগিয়ে দিতে দিতে অ্যালিস বললে, "গুচ্ছের পিন একই দিকে লাগালে কি আর চৌরস হয় ? ইস্ ! আপনার চুলের কী দুর্দশা হয়েছে !"

ফোঁস্ করে একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে রানী বললেন, "বুরুশটা চুলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আর চিরুনিটা কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না !"

খুব সাবধানে জট ছাড়িয়ে বুরুশটা বার করে চুল ঠিক করতে লাগল অ্যালিস। তার পর পিনগুলো যথাসম্ভব ঠিক জায়গায় লাগিয়ে মোটামুটি তাঁকে দুরস্ত করে বললে, "এই তো, আগের চেয়ে অনেক ভালো দেখাচ্ছে ! কিন্তু, আপনার তো একজন ঝি—মানে, পরিচারিকা রাখা দরকার !"

রানী বললেন, "তোমায় রাখতে পারলে খুব খুশি হব। হপ্তায় দু পেনি, আর একদিন অন্তর জ্যাম খেতে দেব।"

হাসি চাপতে না পেরে অ্যালিস জবাব দিলে, "না, না, আমায় ঝি রাখতে বলছি না—আর জ্যামে আমার কোনো লোভ নেই।"

রানী বললেন, "বেশ ভালো জ্যাম কিন্তু।"

"যাই হোক, আজকে অন্তত জ্যাম খাবার ইচ্ছে করছে না।"

রানী বললেন, "ইচ্ছে করলেও পেতে না। নিয়ম হল, গতকাল জ্যাম, আগামী কাল জ্যাম—কিন্তু আজ কোনোক্রমেই জ্যাম নয়।"

অ্যালিস তর্কের সুরে বলে উঠল, "একবার-না-একবার তো 'আজ জ্যাম' হবেই ?"

রানী বললেন, "না, তা হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। 'একদিন বাদে পরের দিন জ্যাম' এই হল নিয়ম—আজ কি 'পরের দিন' ?"

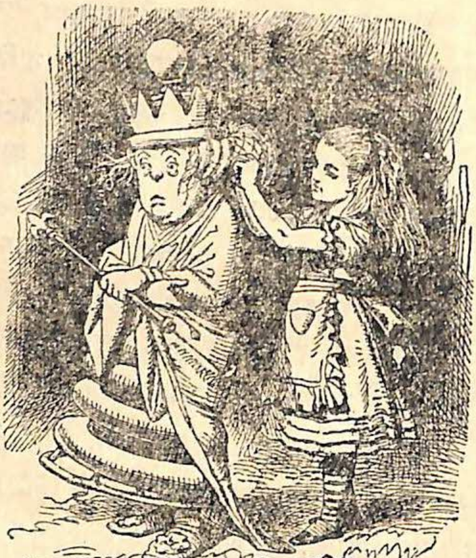
অ্যালিস বললে, "বুঝতে পারলুম না, বড্ডো গোলমেলে!"

রানী একটু অনুকম্পার সুরে বললেন, "কিছু নয়, কিছু নয়, অতীতে ফিরে গেলে অমন একটু-আধটু হয়; প্রথম প্রথম গোলমেলে লাগে—"

আশ্চর্য হয়ে অ্যালিস বললে, "অতীতে ফিরে যাওয়া—মানে, পিছিয়ে যাওয়া! এরকম তো কখনো শুনি নি!"

রানী নিজের কথার জের টেনে তখনো বলে চলেছেন, "—তবে তার সুবিধেও আছে বৈকি, অতীত আর ভবিষ্যৎ, দুটো কালের কথাই মনে পড়ে যায়। স্মৃতিশক্তিটা দু দিকেই কাজ করতে পারে।"

অ্যালিস মন্তব্য করলে, "আমার স্মৃতিশক্তি কিন্তু একমুখেই কাজ করে। কোনো কিছু ঘটবার আগে মোটেই তা মনে রাখতে পারি না।"



রানী মন্তব্য করলেন, "শুধু আগেকার ঘটনা মনে রাখতে পারা মানে, স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল!"

অ্যালিস এবার সাহসে ভর করে জিগেস করে বসল, "কী ধরনের ব্যাপার আপনার সব চেয়ে বেশি মনে থাকে?"

খুব নির্লিপ্ত গলায় রানী উত্তর দিলেন, "এই যেমন, দু হপ্তা পরের ঘটনা। যেমন ধর, এখন," আঙুলে একটা প্লাস্টার জড়াতে জড়াতে রানী বলতে লাগলেন, "রাজার যে পাইক, সে এখন জেলখানায় আছে, শাস্তি ভোগ করছে ; অথচ, আগামী বুধবারের আগে তার বিচারই শুরু হচ্ছে না ; আর বুঝতেই পারছ, তারও পরে, সব্বার শেষে ঘটবে তার অপরাধের ব্যাপারটা।"

অ্যালিস বললে, "ধরুন, যদি কোনো অপরাধ না করে শেষপর্যন্ত?"

একটা ফিতে দিয়ে প্লাস্টারটা বাঁধতে বাঁধতে রানী বললেন, "সে তো আরো ভালো, তাই-না?"

অ্যালিস ভেবে দেখলে, কথাটা এক দিক দিয়ে ঠিকই। "ভালো, ঠিকই, কিন্তু শুধু-মুধু এই যে শাস্তি পেল, সেটা তো আর ভালো হল না!"

রানী বললেন, "ঐখানেই ভুল করলে, নিজে কখনো শাস্তি পেয়েছ?"

অ্যালিস বললে, "সে তো কেবল দোষ-টোষ করলে।"

বিজয়গর্বে রানী বললেন, "আর শাস্তির ফলে তুমি শুধরে গিয়েছিলে, জানা কথা!"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু যেজন্যে আমি শাস্তি পেয়েছি, সেই খারাপ কাজটা যে সত্যিই করেছিলুম—সেইখানেই তো তফাত!"



রানী বললেন, "খারাপ কাজ করার চেয়ে খারাপ কাজ না-করাটা ভালো নয় ? তুমি যদি খারাপ কাজটা না-করতে, সেটা আরো ভালোই হত : আরো ভালো, আরো ভালো, আরো ভালো !" প্রত্যেক বার আরো ভালো বলবার সময়ে গলাটা চড়তে চড়তে শেষপর্যন্ত ক্যাঁক করে উঠল।

"কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমাদের—" এইরকম কিছু একটা বলতে যাচ্ছে অ্যালিস, এমন সময়ে মহারানীর আচমকা হাঁউমাউ চীৎকারে মাঝপথেই থেমে যেতে হল। সেই প্লাস্টার জড়ানো আঙুলটাকে বাড়িয়ে ধরে হাতটা তিনি এমন সজোরে ঝাড়ছেন, মনে হয় কাঁধ থেকে খসিয়ে ফেলতে চান। আর সঙ্গে বিকট চীৎকার, "ওহ হো হো হো হো! আমার আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে! ওহ হো হো হো হো!"

চীৎকারটা ঠিক রেলের সিটির মতো ; দুহাতে কানদুটো চেপে ধরলে অ্যালিস।

যখন বুঝলে এখন কথা বললে শোনা যাবে, তখন বললে, "ব্যাপার কী ? আঙুলে কিছু ফুটে গেল নাকি ?"

রানী বললেন, "এখনো ফোটে নি, তবে একটু পরেই ফুটবে! ওহ হো হো হো হো !"

প্রায় হেসে ফেলেছিল অ্যালিস। সামলে নিয়ে জিগেস করলে, "কতক্ষণ পরে ফোটার কথা ?"

কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে বেচারি রানী বলতে লাগলেন, আবার যেই শালটা আটকাতে যাব, তখন। ব্রোচটা খুলে আসবে। ওহ হো হো !" বলতে না-বলতেই ব্রোচটা (নক্‌শা কাটা বাহারি সেফটিপিনের মতো) হঠাৎ পটাঙ করে খুলে গেল, আর রানী সেটাকে বাগিয়ে ধরে আবার আটকাবার চেষ্টা করতে গেলেন।

অ্যালিস হাঁ হাঁ করে উঠল, "সাবধান! খুব বেমক্কা ধরেছেন কিন্তু !" কিন্তু ততক্ষণে যা হবার, হয়ে গেছে। কাঁটাটা পিছলে এসে রানীর আঙুলে বিঁধে গেছে।

মুচকি হেসে সাদা রানী বললেন, "এবার বুঝলে, তখন রক্ত বেরচ্ছিল কেন ? এবার বুঝতে পেরেছ তো এখানকার ব্যাপার-স্যাপার কী রকম ?"

অ্যালিস জিগেস করলে, "কিন্তু এখন চীৎকার করছেন না কেন ?"

প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দুহাতে কান ঢেকে ফেলেছে!

রানী বললেন, "সে কী! সে তো আগেই সারা হয়ে গেছে। আবার করার কোনো মানে হয়?"

ইতিমধ্যে বেশ আলো হয়েছে। অ্যালিস আপন মনে বললে, 'কাকটা তার মানে উড়ে গেছে। বাঁচা গেল বাবা। যেন রাত্তির হয়ে গিয়েছিল! খুব আনন্দ হচ্ছে!'

রানী বললেন, "আমার যদি একটু আনন্দ হত গো! কিছুতেই আনন্দ করবার নিয়মটা মনে পড়ে না। এই বনের মধ্যে যখন ইচ্ছে আনন্দ করে বেশ সুখেই আছ বোধ হয়?"

করুণ গলায় অ্যালিস বললে, "কেবল ভারি একা-একা লাগে।" সত্যিই বেচারি একলা—কথাটা মনে পড়ে যেতেই বড়ো-বড়ো দু ফোঁটা জল ওর গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

বিব্রতভাবে হাত কচলাতে কচলাতে রানী বলে উঠলেন, "আহা অমন করে না; অমন করতে নেই! কত সাহসী মেয়ে তুমি। ভেবে দেখ, কত দূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ। ভেবে দেখ, এখন কত বেজে গেছে। ভেবে দেখ—যা হোক কিছু ভেবে ভেবে দেখ, কেবল কেঁদ না!"

কাঁদতে গিয়েও হেসে ফেললে অ্যালিস। বললে, "ভেবে দেখার নাম করে আপনি কান্না চাপতে পারেন?"

খুব ভারিক্কি চালে রানী বললেন, "পারি! ঠিক অমনি করেই পারি! একসঙ্গে দুটো কাজ তো আর কেউ করতে পারে না। যেমন ধর, তোমার বয়সের কথা নিয়ে ভাবা যাক—কত হল?"

"সাত বছর ছ মাস—পাক্কা।"

রানী বললেন, "ঐ 'পাক্কা' কথাটা না বললেই চলত! এমনিতেই বিশ্বাস করছি। বেশ, এবার তোমায় এমন একটা কথা বলব, যা বিশ্বাস করা শক্ত। আমার বয়েস হল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একশো এক বছর পাঁচ মাস এক দিন।"

অ্যালিস বললে, "বিশ্বাস করতে পারছি না!"

করুণার ভঙ্গিতে রানী বললেন, "পারছ না? আবার চেষ্টা করে দেখ; খুব লম্বা করে নিশ্বাস টেনে নাও, আর চোখ দুটো বন্ধ করে ফেল।"

হেসে ফেললে অ্যালিস। "লাভ নেই। অসম্ভব জিনিস কখনো বিশ্বাস করা যায়?"

রানী বললেন, "তা হলে বলব, তোমার অব্যেস নেই! তোমার বয়েসে আমি রোজ আধঘণ্টা করে অব্যেস করতুম। বলব কি, সকালের জলখাবারের আগেই কোনো কোনোদিন একসঙ্গে ছ-ছটা অসম্ভব ব্যাপার বিশ্বাস করতেও অসুবিধে হত না।—এই দেখ, শালটা আবার খুলে গেল!"

কথা বলতে বলতেই ব্রোচটা খুলে গিয়েছিল, এখন একটা দমকা হাওয়ায় সরু একটা নালা পার হয়ে উড়ে গেল শালটা। আবার দুহাত ছড়িয়ে রানী ছুটলেন তার পিছু পিছু। এবার নিজেই ধরলেন, বিজয়-গর্বে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঠিক ধরেছি! এবার দেখবে, নিজেই পিন লাগাব!"

রানীর পিছু পিছু নালাটা পার হয়ে অ্যালিস বললে, "আঙুলটা ভালোই আছে তা হলে?"

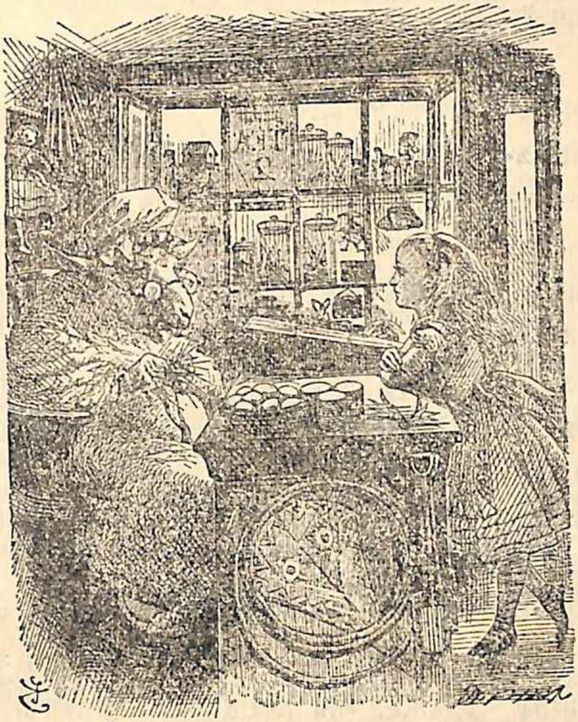
"ওহ্, অনেক ভালো!" চীৎকার করে বলে উঠলেন রানী, তার পর ক্রমশই গলা চড়িয়ে চড়িয়ে বলতে লাগলেন, "অনেক ভা-লো! ভা-লো! ভ্যা-ল-ও! ভ্যা—!" শেষটা এমন ভ্যাড়ার ডাকের মতো শোনাল যে, চমকে উঠল অ্যালিস।

রানীর দিকে চেয়ে দেখে মনে হল, যেন সারা দেহটা পশম দিয়ে ঢাকা। চোখ রগড়ে আবার তাকাল। কী যে হল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এটা কি একটা দোকান-ঘর? আর, লেন-দেনের টেবিলের ওদিকে, ওটা কি—সত্যিই ওটা কি একটা ভেড়া? আবার চোখ রগড়েও কিছু সুরাহা হল না; শুধু দেখা গেল, ছোট্টো একটা অন্ধকার দোকান-ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর কনুয়ের ভর রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওপাশে একটা বুড়ি-ভেড়া চেয়ারে বসে বসে উল বোনার ফাঁকে বার বার চোখ তুলে তুলে গোল গোল চশমার মধ্যে দিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে।

হাতের কাজে থাম্বা দিয়ে শেষপর্যন্ত সোজা অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে সে জিগেস করলে, "কী কিনবে?"

খুব নম্র হয়ে অ্যালিস বললে, "ঠিক বুঝতে পারছি না। চারি দিকে একটু দেখে নিয়ে পছন্দ করতে পারি?"

ভেড়া বললে, "সামনে দেখতে পারো, দু পাশেও দেখতে পারো, তবে সব দিকে তো আর দেখতে পাবে না—পেছনে একজোড়া চোখ থাকলে নাহয় হত।"



কিন্তু দেখা গেল, অ্যালিসের তা নেই, কাজেই কখনো পাশ ফিরে, কখনো পিছনে ফিরে জিনিস-ভরা তাকগুলো দেখে বেড়াতে লাগল সে।

আবোল-তাবোল জিনিসে দোকানটা ঠাসা, তবে সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, যখনই খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে কোনো তাকের দিকে বেশ বাগিয়ে তাকাতে যায়, তখনই পুরো তাকটাই বেবাক ফাঁকা হয়ে পড়ে, অথচ আশপাশের অন্য-সব তাকে মাল-পত্তর ঠাসা !

একটা তাকে বেশ ঝক্‌মকে একটা জিনিস—একবার মনে হল পুতুল, আবার একবার মনে হল বাক্স—বেশ চোখে পড়েছিল ; কিন্তু যতবারই কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেছে, জিনিসটা ঠিক তার ওপরের তাকে চলে গেছে। অনেক চেষ্টাতেও না পেরে শেষকালে অ্যালিস বলে ফেললে, "এখানে সব দেখছি উড়ে উড়ে বেড়ায় ! অথচ ঐ জিনিসটাই সব চেয়ে মজাদার লাগছে।" তার পর হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল, "দাঁড়াও, এবার কী করি, দেখ-না ! যতই উড়ে উড়ে ওপরের তাকে

যাবে, আমিও ততই সেই তাকের দিকে কট্‌মটিয়ে চাইব ! ছাদ ফুঁড়ে তো আর উড়ে যেতে পারবে না !"

কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না ; জিনিসটা নির্বিবাদে ছাদ ফুঁড়ে চলে গেল, যেন কতকালের অব্যেস।

আর-এক জোড়া বোনার কাঠি তুলে নিয়ে ভেড়া-গিন্নি বললে, "তুমি মানুষের মেয়ে, না লাট্টু, বাছা ? অমন করে চরকি-পাক খেলে, একটু পরে আমারই মাথা বন্‌ বন্‌ করবে।" দেখা গেল, ভেড়া-গিন্নি মোট চোদ্দোজোড়া কাঠি নিয়ে কাজ করছে ; অ্যালিস অবাক চোখে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগল, 'অতগুলো কাঁটা নিয়ে বুনছে কী করে রে বাবা ! মিনিটে-মিনিটে কাঁটার সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, এবার তো সজারু হয়ে যাবে !'

অ্যালিসের হাতে একজোড়া কাঁটা গুঁজে দিয়ে ভেড়া-গিন্নি বলে উঠল, "নৌকো বাইতে জানো ?"

অ্যালিস বললে, "একটু-একটু জানি, তবে ডাঙায় নয়—বোনবার কাঁটা দিয়েও নয়—" কিন্তু সবটা বলার আগেই দেখলে কাঁটাদুটো এক লহমায় দাঁড় হয়ে গেছে, আর ওরা দুজনে ছোট্টো একটা নৌকোয় বসে একটা খাল বেয়ে ভেসে চলেছে ; কাজেই সাধ্যমতো দাঁড় টানা ছাড়া আর উপায় কী !

আর-এক জোড়া কাঁটা তুলে নিয়ে ভেড়া-গিন্নি হাঁক ছাড়লে, "পালক !"

জবাব দেবার কিছু আছে বলে মনে হল না, অ্যালিস তাই চুপচাপ দাঁড় টেনে যেতে লাগল। জলটাও যেন কেমন-কেমন, মাঝে মাঝেই দাঁড়দুটো গেঁথে যাচ্ছে, কিছুতেই উঠতে চাইছে না !

আরো কয়েকটা কাঁটা নিয়ে ভেড়া-গিন্নি আবার হাঁকলে, "পালক ! পালক ! এক্ষুনি তুমি একটা কাঁকড়া ধরতে পারবে।"

অ্যালিস মনে-মনে ভাবলে, 'ছোট্টো ফুট্‌ফুটে একটা কাঁকড়া ! ভারি সুন্দর হবে !'

এবার বেশ গোছাখানেক কাঁটা তুলে নিয়ে ভেড়া-গিন্নি হাঁক ছাড়লে, "বার বার 'পালক', 'পালক' বলে চ্যাঁচাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছ না ?"

অ্যালিস বললে, "শুনেছি বৈকি, অনেক বারই তো বলেছেন—বেশ চেঁচিয়েই বলেছেন। এখন দয়া করে বলুন-না, কোথায় কাঁকড়া ?"

ভেড়া-গিন্নির হাত ভরা, তাই কয়েকটা কাঁটা মাথার চুলের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, "জলে, আবার কোথায় !"

অ্যালিস থাকতে না পেরে বললে, "আচ্ছা, আপনি কেবলই 'পালক' 'পালক' বলে হাঁক পাড়ছেন কেন ? আমি তো আর পাখি নই !"

ভেড়া-গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "হ্যাঁ, তুমি পাখি ! ছোট্টো একটা রাজহাঁস !"

অ্যালিস একটু ক্ষুণ্ণ হল। মিনিট দুয়েক কেউ কোনো কথা বললে না ; নৌকো ভেসে চলল—কখনো ঝাঁঝির ভিড় ঠেলে, কখনো গাছের তলা দিয়ে, আর বরাবরই দু দিকের পাড়গুলো উঁচু উঁচুই রয়ে গেল।

হঠাৎ আনন্দে ডগমগ হয়ে অ্যালিস বলে উঠল, "কী সুন্দর গন্ধওলা নল-খাগড়া গজিয়েছে দেখুন ! যদি দয়া করে—"

বোনার দিকে চোখ রেখেই ভেড়া-গিন্নি বলে উঠল, "নল-খাগড়ার কথায় দয়া করার কি আছে ? আমি লাগাইও নি, তুলবও না।"

অ্যালিস বললে, "তা নয়, বলছিলুম, দয়া করে যদি নৌকোটা থামাতে দেন, দু-একটা তুলি।"

ভেড়া-গিন্নি বললে, "আমি থামাতে দেবার কে ? তুমি দাঁড় না-টানলেই থেমে যাবে !"

দাঁড় টানা বন্ধ করতেই নৌকোটা ভাসতে ভাসতে নল-খাগড়ার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছোট্টো জামার ছোট্টো আস্তিন দুটো গুটিয়ে, ছোট্টো-ছোট্টো হাত দুটো কনুই পর্যন্ত জলের নীচে ডুবিয়ে অ্যালিস যতখানি পারে গোড়া ঘেঁষে নলখাগড়া তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। নৌকো থেকে ঝুঁকে পড়েছে, চুলের দু-একটা গোছা জলে এসে পড়ছে—ভেড়া-গিন্নির কথা, তার বোনার কথা এখন আর খেয়াল নেই অ্যালিসের। এক-একটা গোছা মুঠিয়ে ধরছে আর ভেঙে তুলছে।

মনে-মনে ভাবছে, 'নৌকোটা কাত হয়ে উলটে না পড়ে ! আহা ! কী সুন্দর একটা রয়েছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছি না !' দেখা গেল, একগাদা তোলবার পরেও 'আরো ভালো'-গুলো তোলা বাকিই রয়ে গেল, নাগালের বাইরে বলে কিছুতেই তোলা গেল না।

যাই হোক, আবার দাঁড় টানতে শুরু করলে আলিস, আর খানিকটা যেতে না-যেতেই দাঁড়টা এমন আটকে গেল যে, জল থেকে কিছুতেই উঠতে চায় না। এদিকে দাঁড়ের হাতলের দিকটা ওর থুতনির নীচে



লেগে রয়েছে। ফলে হল কি, অ্যালিস দু-একবার 'এই, এই, গেল, গেল' বলে চেঁচাতে না-চেঁচাতেই বসবার জায়গা থেকে একেবারে বোঝাই-করা নল-খাগড়ার গাদার ওপর কুপোকাৎ।

অবশ্য কোথাও লাগে নি, তাই তাড়াতাড়ি আবার উঠে বসতে পারল। ভেড়া-গিন্নি তেমনি নির্বিকার চিত্তে বুনে চলেছেন, যেন কিছুই হয় নি। নৌকোর বাইরে যে পড়ে যায় নি, এই ভেবে অ্যালিস যখন আয়েস করে বসেছে, সেই সময় ভেড়া-গিন্নি বলে উঠলেন, "বেশ সুন্দর কাঁকড়া ধরেছ!"

নৌকোর পাশে কালো জলের দিকে তাকিয়ে অ্যালিস বললে, "সুন্দর নাকি? দেখি নি তো! পালিয়ে যায় নি তো এখনো! একটা সুন্দর কাঁকড়া পেলে বাড়িতে নিয়ে যাই!" তাই শুনে একটু ফিক্ ফিকে হাসি হেসে ভেড়া-গিন্নি আবার বুনতে শুরু করে দিলেন।

অ্যালিস বললে, "এখানে অনেক কাঁকড়া বুঝি ?"

ভেড়া-গিন্নি বললে, "কাঁকড়া, তা ছাড়া আরো অনেক কিছু। পছন্দ করলেই হল। ঠিক করে নাও, কী কিনবে।"

"কিনব !" অ্যালিসের মুখ দিয়ে যেভাবে কথাটা বেরল, তাতে একসঙ্গে ভয় আর বিস্ময়ের সুর—কারণ ইতিমধ্যে সে দাঁড়ও নেই, সে নৌকোও নেই, সে নদীও নেই, আবার সেই ঘুপ্ সি দোকান-ঘরে ফিরে এসেছে সে।

মিন্‌মিন্ করে বললে, "একটা ডিম কিনব। কত করে বেচেন ?"

"একটার দাম পাঁচ পেনি এক ফার্দিং, আর জোড়া দু পেনি।"

ব্যাগ খুলতে খুলতে অ্যালিস অবাক হয়ে বললে, "একটার চেয়ে দুটোর দাম কম ?"

ভেড়া-গিন্নি বললে, "তাই। তবে দুটোই খেতে হবে।"

টেবিলের ওপর দামটা রেখে অ্যালিস বললে, "তবে একটাই দিন।" মনে-মনে ভাবলে, 'কে জানে বাবা, যদি বাজে হয় !'

ভেড়া-গিন্নি দামটা তুলে নিয়ে একটা বাক্সর মধ্যে রেখে বললেন, "আমি কারো হাতে জিনিস দিই না—আমার কাছে ও-সব নেই। নিজে নিয়ে নাও গিয়ে।" তার পর উঠে গিয়ে দোকানের অন্য দিকে তাকের ওপর একটা ডিম দাঁড় করিয়ে রেখে এলেন।

সেই অন্ধকার দোকান-ঘরে চেয়ার, টেবিল আর গাদা-গুচ্ছের মাল-পত্তরের মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে অ্যালিস ভাবতে লাগল, 'কেনই-বা লোকের হাতে জিনিস দেওয়া চলে না, কে জানে। এদিকে যতই এগোচ্ছি, ডিমের তাকটাও যে ততই দূরে সরে যাচ্ছে দেখছি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, এটা কী দেখি তো—চেয়ার নাকি ? উঁহু, এর যে দেখি ডাল-পালা রয়েছে ! এখানে আবার গাছ এল কোত্থেকে রে বাবা ! আরে, সরু একটা খালও দেখতে পাচ্ছি যে। নাঃ, এমন কিম্ভূত দোকান জীবনে দেখি নি তো !'

এমনিভাবেই এগিয়ে যেতে লাগল অ্যালিস, আর কাছাকাছি আসা-মাত্রই সব-কিছু গাছ হয়ে যেতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলে, ডিমটারও ঐ একই দশা হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাম্‌টি-ডাম্‌টি

আসলে কিন্তু ডিমটা কেবল ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল আর ক্রমেই যেন মানুষের মতো হয়ে যেতে লাগল। খানিকটা কাছাকাছি এসে অ্যালিস লক্ষ্য করলে, দিব্যি চোখ, নাক, মুখ গজিয়েছে; যখন বেশ কাছে এসেছে, তখন আর চিনতে বাকি নেই যে, এ হল সেই হাম্‌টি-ডাম্‌টি। নিজের মনেই বললে, 'হাম্‌টি-ডাম্‌টি ছাড়া হতেই পারে না! মুখে যেন একেবারে ছাপ-মারা রয়েছে, দেখলেই চেনা যায়!'

তা, সত্যি কথা বলতে কি, মুখখানা এতই বড়ো যে, হাজারটা ছাপ মারলেও, জায়গার অভাব হবে না। একটা উঁচু পাঁচিলের ওপর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে সে—এত সরু পাঁচিল যে, কী করে টাল সামলে আছে, সেটাই আশ্চর্যের কথা—একদৃষ্টিতে উলটো দিকে তাকিয়ে আছে, অ্যালিস যে এসেছে, যেন টেরই পায় নি। এমন কাঠ হয়ে বসে আছে যে, অ্যালিসের মনে হল, পুতুল-টুতুল নয় তো!

"একেবারে ডিমের মতো দেখতে!" কথাটা চেঁচিয়েই বললে অ্যালিস, আর সেইসঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে তৈরি হয়ে রইল, যাতে হাম্‌টি-ডাম্‌টি পড়ে গেলে, ধরে ফেলতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ পর অ্যালিসের দিকে না-তাকিয়েই হাম্‌টি-ডাম্‌টি

জবাব দিলে, "ডিম বলে ডাকলে কিন্তু খুব রাগ হয়—প্রচণ্ড রাগ হয়।"

অ্যালিস খুব বিনয় করে বোঝালে, "আজ্ঞে, আমি শুধু বলেছি, ডিমের মতো দেখতে।" তার পর ওকে খুশি করবে বলে বুদ্ধি করে বললে, "কিছু কিছু ডিম আছে, ভারি সুন্দর হয়, জানেন ?"

তেমনিই মুখ-ফেরানো অবস্থায় হাম্‌টি-ডাম্‌টি জবাব দিলে, "কিছু কিছু লোক হয়, বুদ্ধি-সুদ্ধি যাদের নেহাতই বাচ্চাদের মতন!"

কী বলবে, ভেবে পেলে না অ্যালিস, কারণ কথাবার্তা বলতে যা বোঝায়, তার ধার দিয়েও যাচ্ছে না কেউ, তা ছাড়া কথাগুলো যে অ্যালিসকেই বলা হয়েছে, সেরকম কোনো আভাসও নেই। শেষকালের কথাগুলো তো পরিষ্কার একটা গাছের দিকে চেয়েই বলা হল। কাজেই কোনো জবাব না দিয়ে অ্যালিস চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আপন মনে বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগল :

"হাম্‌টি-ডাম্‌টি সুখে বসে ছিল উঁচু পাঁচিলেতে চড়ে :
হাম্‌টি-ডাম্‌টি ধুপ্ করে গেল আচমকা নীচে পড়ে।
রাজা পাঠালেন লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া লাখে লাখে,
তবুও কিছুতে পাঁচিলে আবার বসানো গেল না তাকে।"

এই প্রথম অ্যালিসের দিকে চেয়ে কথা বললে হাম্‌টি-ডাম্‌টি, "অমন অনবরত বিড়্‌বিড়্ কোরো না তো! পরিচয় দাও, কী উদ্দেশ্যে আগমন ?"

"আমার নাম অ্যালিস, তবে—"

খুব বিরক্ত হয়ে মঝেপথেই হাম্‌টি-ডামটি বলে উঠল, "নামটার কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই! মানে কী ?"

অ্যালিস একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, "মানে কি থাকতেই হয় ?"

হো হো করে সামান্য একটু হেসে নিয়ে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "নিশ্চয়ই হয়! আমার নামটা বললেই বোঝা যায় আমার চেহারাটা কী রকম—একেবারে খুবসুরৎ চেহারা যাকে বলে। তোমার যা নাম, তাতে হরেকরকম চেহারা হতে পারে ; প্রায় যে কোনোরকম।"

তর্ক এড়াবার জন্যে অ্যালিস অন্য কথা পাড়লে, "আপনি একা একা ওখানে উঠে বসে আছেন কেন ?"

চীৎকার করে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলে উঠল, "সঙ্গে আর কেউ নেই বলে! তুমি কি ভেবেছিলে, জবাব দিতে পারব না? বরং অন্য একটা ধাঁধা বল।"

ধাঁধা বলবার ইচ্ছে মোটেই নেই অ্যালিসের, কেবল পাছে বেচারি পড়ে যায়, সেই ভাবনায় বললে, "নীচে নেমে এলে ভালো হত-না? বিপদের ভয় থাকে না আর কি?"

গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "কী-সব সহজ সহজ ধাঁধা যে বল তুমি!—না, মোটেই বিপদের ভয় নেই। পড়ে যদি যাইও—পড়ব না জানি, তবু বলছি—পড়ে যদি যাইও, তা হলে, রাজা-মশাই আমাকে কথা দিয়েছেন যে—কী? ভয়ে নীল হয়ে গেলে তো? ভাবতে পারো নি তো যে, একেবারে রাজার কথা পেড়ে বসব? —যাই হোক, রাজামশাই কথা দিয়েছেন যে, মানে, নিজের মুখে কথা দিয়েছেন যে, তিনি—তিনি—"

অ্যালিস বোকার মতো বলে ফেললে, "অনেক লোক-লস্কর আর হাতি-ঘোড়া পাঠিয়ে দেবেন।"

ভীষণ চটে উঠে হাম্‌টি-ডাম্‌টি চীৎকার করে উঠল, "অন্যায়! ভীষণ অন্যায়! দরজায় আড়ি পেতে শুনেছ—গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনেছ—চিমনির ভেতর ঘাপ্‌টি মেরে শুনেছ—নইলে জানলে কী করে!"

অ্যালিস খুব মোলায়েম করে বললে, "তা নয়, বইয়ে আছে।"

এবার একটু ঠাণ্ডা হয়ে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "আহ্‌! ঠিক! বইয়ে অবশ্য থাকতে পারে। তার মানে ইতিহাসের কথা, ইংলণ্ডের ইতিহাস যাকে বলে আর কি। বেশ, এবার ভালো করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ তো। এই আমি, নিজে রাজার সঙ্গে কথা বলেছি, নিজে! হয়তো জীবনে আর এমন কারো দেখা পাবে না! কিন্তু, তার জন্যে যে আমার মোটেই কোনো গর্ব নেই, সেইটা বোঝাবার জন্যে তোমায় আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করবার অনুমতি দিলাম।" বলতে বলতে প্রায় এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হাসি-হাসি মুখ করে ঝুঁকে পড়ে অ্যালিসের দিকে একটা হাত বাড়াতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাবার দাখিল।

খুব ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে সন্তর্পণে অ্যালিস তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলে। মনে-মনে ভাবলে, 'আর একটু বেশি করে হাসলে ঠোঁটের কোণদুটো বোধ হয় ঘাড়ের কাছে গিয়ে মিলে যাবে, আর তখন কী যে



হবে, জানি না বাবা : মাথাটা আলাদা হয়ে খুলে আসবে না তো ?”

হাম্‌টি-ডাম্‌টি তখনো বলে চলেছে, “হ্যাঁ যত লোক-লস্কর আর হাতি-ঘোড়া আছে, সব পাঠাবেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে আমায় তুলে ফেলবে, ফেলবেই! যাক গে, বড্ডো হুড়্‌মুড়্‌ করে কথা হচ্ছে। আগের কথায় ফিরে যাওয়া যাক—শেষ যে কথাটা হচ্ছিল, ঠিক তার আগের কথায়।”

খুব বিনয় করে অ্যালিস বললে, “আজ্ঞে, সত্যি কথা বলতে কি, ভুলে গেছি।”

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, “তা হলে, নতুন করে আরম্ভ করা যাক। এবার আমার পালা। বেশ, তোমায় একটা প্রশ্ন করছি। তোমার কত যেন বয়েস বলেছিলে ?”

একটু হিসেব করে নিয়ে অ্যালিস বললে, “সাত বছর ছ মাস।”

“হয় নি, হয় নি, ভুল! আগে তুমি বয়েসের কথা বলই নি মোটে!”

অ্যালিস বোঝাতে গেল, “আমি ভেবেছিলুম আপনি বলতে চাইছেন, তোমার বয়েস কত ?”

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, “সেরকম বোঝাতে চাইলে সেইরকমই বলতুম!”

আবার পাছে তর্ক লেগে যায়, অ্যালিস তাই চুপ করে রইল।

খুব নিবিষ্ট মনে হাম্‌টি-ডাম্‌টি তখন বিড়্‌বিড়্‌ করছে, "সাত বছর ছ মাস! খুব গোলমেলে হিসেব। যদি ভালো কথা শুনতে চাও, ওটা সাত বছর পর্যন্তই রেখে দাও—কিন্তু এখন বোধ হয় তা করা যাবে না, দেরি হয়ে গেছে।"

অ্যালিস এবার ভালোমানুষি করতে পারলে না, বেশ বিরক্ত হয়েই বলে উঠল, "বয়েসের বাড় নিয়ে কারো ব্যাখ্যানা আমি শুনতে চাই না।"

"হুঁ! ডাঁট হয়েছে?"

অ্যালিস আরো চটে গেল। বললে, "বলছি কি, বয়েসের বাড় কেউ ঠেকাতে পারে না।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু কেউ কেউ হলে পারে—মানে একজন হলে পারে না, দুজন হলে পারে। ঠিকমতো কারো সাহায্য পেলে, সাতেতেই থাকতে পারতে।"

বয়েস নিয়ে অনেক কচ্‌কচি হয়েছে, আর তা ছাড়া নতুন কোনো কথা শুরু করতে হলে, এবার অ্যালিসেরই পালা। এই-সব ভেবে অ্যালিস হঠাৎ বলে উঠল, "কী সুন্দর বেল্ট পরেছেন আপনি!" তার পর আচমকা সামলে নিয়ে বললে, "মানে, কোমরের বেল্ট হয়তো নয়, কিন্তু, গলা-বন্ধ তো বটেই—কিম্বা, হয়তো বেল্ট-ই, মানে—মাপ করবেন—!" কূল-কিনারা না পেয়ে থেমে পড়তে হল বেচারিকে, কারণ হাম্‌টি-ডাম্‌টিকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, মনে-মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। নাঃ, কথাটা না তুললেই হত। "কোনটা যে কোমর, আর কোনটা যে গলা তাও যদি বোঝা যেত, গো!"

মিনিট দুয়েক কোনো কথা বলে নি হাম্‌টি-ডাম্‌টি, কিন্তু খুব যে চটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। যখন কথা বললে, তখন গলার স্বর খুব ঘড়্‌ঘড়ে আর মোটা।

"যখন কেউ গলা-বন্ধ আর কোমর-বন্ধের তফাত ধরতে পারে না, তখন পিত্তি একেবারে—মানে—চিড়্‌বিড়িয়ে জ্বলে ওঠে আমার!"

খুব অনুতপ্তের ভঙ্গিতে অ্যালিস যেই বললে, "বুঝতে পারছি, খুব মুখ্যুর মতন কথা বলে ফেলেছি"—সঙ্গে সঙ্গে হাম্‌টি-ডাম্‌টির মেজাজ ঠাণ্ডা।

"এটা গলা-বন্ধ খুকুমণি! তোমার কথাতেই বলি, খুব সুন্দর গলা-

বন্ধ। সাদা রাজা আর সাদা রানীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া। এবার হল তো!"

অ্যালিস ভেবে দেখলে, বেল্টের কথাটা পেড়ে ভালোই হয়েছে। মওকা পেয়ে তাই বললে, "ওমা! তাই বুঝি?"

পায়ের ওপর পা রেখে দুহাতে হাঁটুতে বেড় দিয়ে গম্ভীরভাবে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলতে লাগল, "ওঁরা আমায় এটা দিয়েছেন—কী হিসেবে জানো? অ-জন্মদিনের উপহার হিসেবে।"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে অ্যালিস বললে, "মাপ করবেন—"

"মাপ চাইবার কিছু নেই, আমি রাগ করি নি।"

"তা নয়, মানে আমি বলছি, 'অ-জন্মদিনের উপহার' মানে কী?"

"জন্মদিন নয়, এমন দিনে যে উপহার দেওয়া হয়, এই আর কি!"

একটু ভেবে অ্যালিস আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বললে, "আমার বাপু জন্মদিনের উপহারই সব চেয়ে ভালো লাগে।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি চেঁচিয়ে উঠল, "ভেবে-চিন্তে কথা বল। বছরে কটা দিন?"

অ্যালিস বললে, "তিনশো পঁয়ষট্টি।"

"জন্মদিন কটা?"

"একটা।"

"তিনশো পঁয়ষট্টি থেকে এক বাদ দিলে কত হয়?"

"কেন, তিনশো চৌষট্টি!"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি খুব নিশ্চিন্ত হতে পারল না বোধ হয়, তাই বললে "কাগজে কষে দেখাই ভালো।"

অ্যালিস হাসি চাপতে পারলে না। তবু নোট-বই বার করে অঙ্কটা কষে দিলে:

$$\begin{array}{r} ৩৬৫ \\ ১ \\ \hline ৩৬৪ \\ \hline \end{array}$$

নোট-বইটা নিয়ে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল হাম্‌টি-ডাম্‌টি। তার পর বললে, "ঠিকই কষা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে—"

অ্যালিস বাধা দিয়ে বলে উঠল, "উলটো করে ধরেছেন।"

নোট-বইটাকে সোজা করে নিতে নিতে বেশ খোস-মেজাজেই হাম্‌টি-

ডাম্‌টি বললে, "হ্যাঁ, উলটো করেই ধরেছিলাম! তাই একটু কেমন কেমন লাগছিল। যাক গে যা বলছিলুম, দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে—খুঁটিয়ে অবশ্য দেখা হয় নি—, আর এও বোঝা যাচ্ছে যে বছরে তিনশো চৌষট্টিটা এমন দিন পাওয়া যেতে পারে, যেদিন তুমি অ-জন্মদিনের উপহার পেতে পারো—"

"তা তো বটেই", অ্যালিস জবাব দিলে।

"আর জন্মদিনের উপহার পেতে পারো বছরে মাত্র একটি দিনে, তাই-না? হুঁ হুঁ বাবা, কেমন একটা 'মহিমা' দিলুম!"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু 'মহিমা' কেন? ঠিক মানে বুঝতে পারলুম না।"

একটু শ্লেষের হাসি হেসে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলে উঠল, "বুঝতে পারবে না-ই তো। আমি বুঝিয়ে না দিলে বুঝবে কী করে?—'মহিমা' মানে, 'এমন একটা যুক্তি দিলুম, যা কাটাতে পারবে না'!"

অ্যালিস মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু 'মহিমা' মানে তো 'এমন একটা যুক্তি দিলুম, যা কাটাতে পারবে না' নয়!"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি এবার বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলে, "আমি যখন কোনো শব্দ ব্যবহার করি, তখন কাঁটায় কাঁটায় আমার ইচ্ছে-মতো মানে হয়—বেশিও নয়, কমও নয়!"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি ইচ্ছেমতো একই কথার হাজাররকম মানে করলেই তো হয় না!"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "আসল কথা হচ্ছে, শব্দের মানে অনুযায়ী আমি চলব না, আমার মানে অনুযায়ী শব্দ চলবে—ব্যাস্!"

অ্যালিস কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল, খানিকক্ষণ কোনো কথা জোগাল না। ইতিমধ্যে হাম্‌টি-ডাম্‌টি আবার বলতে শুরু করেছে, "কিছু কিছু শব্দের মেজাজ বড়ো চড়া—বিশেষ করে ক্রিয়া: চালে একেবারে মট্‌মট্ করছে—বিশেষণগুলোকে বাগ মানানো সোজা, কিন্তু ক্রিয়া? মোটেই তা নয়। যাই হোক, আমার কাছে অবশ্য সবাই ঠাণ্ডা! দুরবগাহ! সেই কথাই বলছি, আর কি!"

অ্যালিস বললে, "দুরবগাহ বলতে কী বোঝাচ্ছেন, বলে দেবেন দয়া করে?"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বেশ খুশি হল। বললে, "এতক্ষণে বুদ্ধিমতীর

মতো কথা বললে একটা। 'দুরবগাহ' বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি—আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাজারঙ ভ্যাজারঙ করলুম, এবার বল তো বাছা, এখন কী করবে? বাকি জীবনটা নিশ্চয়ই এইখানেই কাটাতে আস নি।"

সন্দেহের ভঙ্গিতে অ্যালিস বললে, "একটামাত্র শব্দের এত বড়ো মানে—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "শব্দকে দিয়ে মাঝে মাঝে একটু বেশি খাটিয়ে নিই ঠিকই, তার বদলে বাড়তি মজুরিও দিই।"

"ও!" এ ছাড়া আর কোনো কথা বলতে পারলে না অ্যালিস।

খুব গম্ভীরভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলতে লাগল, "মজুরি নিতে যখন ফি শনিবার সন্ধের দিকে ওরা সব দল বেঁধে আমার কাছে এসে জমায়েত হয়, তখন সে এক দৃশ্য!"

(কী মজুরি দেওয়া হয়, সেটা জিগেস করতে অ্যালিসের আর সাহসে কুলোয় নি, তাই আমারও আর জানা হয়ে ওঠে নি।)

অ্যালিস বললে, "কথার মানে করবার কী অদ্ভুত বুদ্ধি আপনার, মশাই! 'জবরজঙ্গী' বলে একটা কবিতা আছে, তার মানেটা করে দেবেন দয়া করে?"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "শোনাও দেখি। আজ পর্যন্ত যত কবিতা আবিষ্কার হয়েছে, সবেরই মানে বলে দিতে পারি—আরো যে-সব অসংখ্য কবিতা এখনো আবিষ্কার হয় নি, তারও!"

শুনে ভারি আশা হল। অ্যালিস কবিতার প্রথম স্তবকটা আবৃত্তি করলে:

'বিরলিঙ-এতে আকাশ ভরা, শ্লিথিল টভরী-রা
ক্ষেভের মাঝে গায়রা দিয়ে গিম্‌গিমিয়ে ডাকে;
বরদগবের সব কটা আজ মিম্‌সিয়ে ব্যস্থিরা,
মৌমা বাতাস হুহুঙ্কারে হাত্রাসী হাঁক হাঁকে।'

এই অবধি হতেই বাধা দিয়ে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলে উঠল, "আপাতত এই ঢের, এই ঢের: অনেক শক্ত শক্ত কথা পেয়ে গেছি। 'বিরলিঙ' মানে হল, বিকেলের কালবৈশাখী, ঠিক যখন বীরের মতো লিঙ লিঙ করতে করতে মেঘেরা সব আকাশে এসে জমা হয়।"

অ্যালিস বললে, "মানেটা ভালোই দাঁড়াচ্ছে। আর 'শ্লিথিল' ?"

"আসলে 'শ্লিথিল' মানে হল 'শ্লথ' আর 'শিথিল'। বুঝলে কিনা, একে বলে পুঁটলি-শব্দ—একটা কথায় দুটো মানে।"

একটু দ্বিধাভরে অ্যালিস জবাব দিল, "এখন বুঝতে পারছি। আর, 'টভরি' ?"

"দেখ, 'টভরি' হচ্ছে একরকমের ছুঁচো—অনেকটা গিরগিটির ধাঁচের—দেখতে খানিকটা ছিপি খোলবার প্যাঁচানো কর্কস্ক্রুর মতন।"

"ভারি কিম্ভূত দেখতে হবে তো তা হলে ?"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "খুব কিম্ভূত। সূর্য-ঘড়ির থামের নীচে বাসা বাঁধে—তা ছাড়া, চীজ ছাড়া আর কিছু খায় না।"

"আচ্ছা, 'গায়রা' আর 'গিম্‌গিম্‌' কী ?"

" 'গায়রা' দেওয়া মানে পায়রার মতন গর্‌গর্‌ করতে করতে বোঁ বোঁ শব্দে পাক খাওয়া। 'গিম্‌গিম্‌' করা মানে আসলে গম্‌গম্‌ করা।"

"আর, 'ক্ষেভ' নিশ্চয় সূর্য-ঘড়ির থামের চারি দিকের ঘাসের জমিটা ?" নিজের বুদ্ধি দেখে অ্যালিস নিজেই অবাক।

"হুবহু তাই। 'ক্ষেভ' বলা হয়, তার কারণ হল, ক্ষেতের মতো সামনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ভোঁ হয়ে যায়, পেছন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ভোঁ হয়ে যায়—"

সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিসও বলে দিলে, "এপাশে অনেক দূর পর্যন্ত ভোঁ হয়ে যায়, ওপাশে অনেক দূর পর্যন্ত ভোঁ হয়ে যায়—"

"ঠিক তাই। বেশ, এবার দেখ, 'মিম্‌সিয়ে'—'মিম্‌সানো' কথাটা এসেছে 'চিম্‌সে' যাওয়া আর 'হিম্‌সিম্‌' খাওয়া থেকে (আর-একটা পুঁটলি-শব্দ পাওয়া গেল)। আর 'বরদ্দগব' হল একরকমের হাড়গিলে নোংরা-ঝোংরা পাখি, পালকগুলো সারা গায়ে খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকে—যেন জ্যান্ত একটা মুড়ো-ঝ্যাঁটা।"

অ্যালিস বললে, "আর, 'মৌমা' আর 'হাভ্রাসী' ? কিছু মনে করবেন না, বড্ডো খাটাচ্ছি আপনাকে।"

"দেখ, 'মৌমা' হচ্ছে একরকমের সবুজ রঙের শুয়োর। 'বাতাস' কথাটার মানে ঠিক বলতে পারছি না, তবে মনে হয়, 'বাতাসা' হতে পারে—তার মানে, বাতাসা না-পেয়ে শুয়োরগুলো রেগে গেছে, আর কি।"

"বেশ! এবার, 'হাভ্রাসী' মানে কী ?"



"দেখ, 'হাত্রাসী' হল হাঁস্‌-ফাঁস্‌ করা আর শিস্‌ দেওয়ার মাঝামাঝি একটা ব্যাপার, তার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে হাঁচির আওয়াজ হলে যা হয়। যাই হোক, ওদিককার ঐ জঙ্গলের মধ্যে গেলে আওয়াজটা কানে যেতে পারে—একবার শুনলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। তা, এইরকম শক্ত কবিতা তোমায় শোনালে কে হে?"

অ্যালিস বললে, "বইয়ে পড়লুম। তবে, টুইড্‌ল্‌ডাম আমায় একটা কবিতা বলেছে সেটা, মনে হয়, বেশ সহজ।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি একটু রেগেই যেন একটা হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, "যদি তা-ই বলতে চাও, যদি কবিতার কথাই বলতে চাও,

তা হলে বলব, আমিও কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, যে-কোনো আরো পাঁচজনের মতোই ভালো আবৃত্তি করতে পারি। সে কথাই যদি বলতে চাও—"

"না, না, আমি মোটেই তা বলতে চাই না!" অ্যালিস তাড়াতাড়ি সামাল দিতে গেল, নইলে এক্ষুনি হয়তো কবিতা শুরু করে দেবে!

অ্যালিসের কথায় কান না দিয়ে হাম্‌টি-ডাম্‌টি তখন বলে চলেছে, "যে-কবিতাটা বলছি, সেটা বিশেষ করে তোমার সখ মেটাবার জন্যেই বানিয়েছি।"

এ কথার পর না শুনে আর উপায় নেই। ধপ্ করে বসে পড়ে খুব বিমর্ষ গলায় অ্যালিস বললে, "ধন্যবাদ।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি শুরু করলে :

"শীতে যখন মাঠ হয়ে যায় সাদা,
তখন তোমায় গান শোনাব দাদা—

তবে, আসলে আমি গাই না, আবৃত্তি করি।"

অ্যালিস বললে, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

খুব খিঁচিয়ে উঠে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলে উঠল, "গান গাওয়া বা না-গাওয়া যদি চোখে দেখতে পাও, তা হলে অসাধারণ চোখ তোমার বলতে হয়!" অ্যালিস চুপ করে রইল।

"বসন্তে গাছ সবুজ হবে যখন,
গানের অর্থ বলব তোমায় তখন।"

অ্যালিস বললে, "ধন্যবাদ!"

"গ্রীষ্মে যখন বিকেল হবে বড়ো,
বুঝবে গানের মানে কেমনতরো।

হেমন্তে সব পাতা যাবে ঝরে,
লিখবে সে-গান খাতায় মক্স করে।"

অ্যালিস বললে, "তদ্দিন যদি মনে থাকে, ঠিক লিখব।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "ফুট্ কেটো না। পয়লা নম্বর, কথাগুলোর কোনো মাথামুণ্ডু নেই ; দোসরা নম্বর, ওতে আমার সব গুলিয়ে যায়।"

এই বলে আবার আরম্ভ করলে :

"মাছের রাজ্যে পাঠিয়ে দিলাম খবর,
আমার বাড়ি নেমন্তন্ন জবর।

সাগর-জলের কুচো মাছের নবাব
পাঠিয়ে দিলে আমার চিঠির জবাব।

জানিয়ে দিলে, 'মাপ করবেন, মশাই,
পারব না তা, যতই করুন গোঁসা-ই!' "

অ্যালিস বললে, "ঠিক বুঝলুম না।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি উত্তর দিলে, "পরের দিকে সোজা হয়ে আসবে।" ফের শুরু করলে :

"আবার খবর দিলুম তাদের কাছে—
'কপালেতে অনেক দুক্ষু আছে'।

মাছগুলো সব হেসেই হল সারা,
বললে, 'তোমার মেজাজ কেমনধারা!'



দুবার করে পাঠানু বারতা,
কোনো মতেই শুনলে নাকো কথা!

নতুন দেখে কেতলি নিলুম হাতে,
মতলবটা হাসিল হবে তাতে।

বুক ঢিব্ ঢিব্, গা করে টল্ মল্
কেতলি ধরে ভরে নিলাম জলে।

এক ব্যাটা মাছ বলল এসে সোজা,
'ঘুমচ্ছে মাছ, চোখগুলো সব বোজা!'

সাফ কথাতে জানিয়ে দিলুম তাকে,
'বেশ, তা হলে জাগাও না হাঁকডাকে!'

জোর-গলাতে জানিয়ে দিলুম ফের,
কানের গোড়ায় চ্যাচালুমও ঢের।"

এইখানে হাম্‌টি-ডাম্‌টি গলা ছেড়ে সত্যিই এমন চ্যাঁচাল যে, অ্যালিস

তো কেঁপে সারা। ভাবলে, 'সর্বনাশ! আমি যদি সেই লোকটা হতুম!'

"কিন্তু, ব্যাটার বেশ তেলানি আছে,
বললে, 'অত চ্যাঁচাবার কী আছে?'

বললে আরো সেই সে-ব্যাটা ঘ্যাঁচড়া,
'ডাকব, যদি—' দেখেছ কী ছ্যাঁচড়া!

কর্কস্ক্রু নিলাম, পারলাম না থাকতে,
চলে গেলাম নিজেই তাদের ডাকতে।

গিয়ে দেখি দরজা তালা-বন্ধ।
রাগের চোটে আমি তখন অন্ধ!

ধাক্কা মেরে হয়ে গেলুম ক্লান্ত—
আসল ব্যাপার কেই-বা তখন জানত!

চেয়ে দেখি তালার বালাই নেই;
হাতল ধরে খুলতে গেছি যেই—"

বেশ কিছুক্ষণ আর সাড়া-শব্দ নেই।

ভয়ে ভয়ে অ্যালিস জিগেস করলে, "এইখানেই শেষ?"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "এইখানেই শেষ। গুড্-বাই।"

ব্যাপারটা বড়ো আচমকা হয়ে গেল। কিন্তু এর পর তো না গেলেই নয়, থাকাটা ভদ্রতা হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "গুড্-বাই! আবার দেখা হবে।"

হ্যাণ্ডশেক করবার জন্যে একটিমাত্র আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে খুব ব্যাজার হয়ে হাম্‌টি-ডাম্‌টি বললে, "দেখা হলেও, চিনতে পারব না, তোমাকে দেখতে একদম অন্য সবাইয়ের মতন।"

অ্যালিস বললে, "আসলে, মুখ দেখে চিনতে হয়।"

হাম্‌টি-ডাম্‌টি বলে উঠল, "সেইখানেই তো আমার আপত্তি—তোমার মুখখানাই তো অন্য সবাইয়ের মতন—সেই দুটো চোখ, মাঝখানে একটা নাক, নীচে একটা হাঁ-মুখ। সেই এক ধাঁচ। হ্যাঁ, বুঝতুম যে, নাকের একপাশেই দুটো চোখ, কিম্বা হাঁ-মুখটা নাকের ওপরে, তা হলে নাহয় একটা কাজের কাজ হত।"

অ্যালিস বললে, "বিচ্ছিরি দেখাত।" হাম্‌টি-ডাম্‌টি চোখ বন্ধ করে শুধু বললে, "আগে হোক, তার পর বোলো।"

আরো মিনিটখানেক অপেক্ষা করেও যখন হাম্‌টি-ডাম্‌টি চোখ খুললে না, বা অ্যালিসকে গ্রাহ্য করলে না, তখন গত্যন্তর না দেখে আর-এক বার "গুড্-বাই!" বলে অ্যালিস আরো একটু অপেক্ষা করলে। কিন্তু তাতেও কোনো সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "জীবনে কত কিম্ভূত লোকই তো দেখেছি—" কিন্তু, কথাটা শেষ করা গেল না, কারণ তার আগেই একটা বিকট শব্দে সারা বনটা থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সিংহ আর ইউনিকর্ন

পরমুহূর্তেই জঙ্গল থেকে হুড়্‌মুড়্‌ করে একদল সৈন্য বেরিয়ে এল, প্রথমে জোড়ায় জোড়ায়, তার পর তিনজন তিনজন করে, তার পর দেখতে না দেখতে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে—সারা বনটা একেবারে যেন থিক্‌ থিক্‌ করছে। পাছে ওদের পায়ের তলায় চেপ্টে যায়, সেই ভয়ে অ্যালিস তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখতে লাগল।

এমন কিম্ভূত সৈন্য জীবনে দেখে নি—কারুর যেন পায়ের ঠিক নেই। দেখ-না-দেখ ঠোক্কর খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, আর একজন পড়লেই, পর পর আরো কয়েকজন করে তার ঘাড়ের ওপর আছাড় খাচ্ছে এবং ফলে দেখা যাচ্ছে, সারা জায়গাটাময় এখানে-ওখানে স্তূপাকার মানুষের ঢিবি।

এবার এল সব ঘোড়সওয়ার। ঘোড়াদের চারটে করে পা, তাই খানিকটা তাল সামলে চলছে বটে, কিন্তু তা হলেও একদম পড়ছে না যে, তা নয়। আর ঘোড়া যেই হোঁচট খাচ্ছে, সওয়ারও সঙ্গে সঙ্গে টুপ্‌ করে পিঠ থেকে খসে পড়ছে—একবারে বাঁধা নিয়ম। ক্রমেই হট্টগোল বাড়তে লাগল, আর সেই ফাঁকে অ্যালিস চুপি চুপি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটু ফাঁকা মতন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে সাদা রাজা মাটিতে থেবড়ি খেয়ে বসে একমনে নোট-বইয়ে কি লিখে চলেছেন।

অ্যালিসের দিকে চোখ পড়তেই রাজামশাই বেশ খুশি-ভরা গলায় বলে উঠলেন, "যাক! সব্বাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি! বনের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কোনো সৈন্য-টৈন্য কি চোখে পড়েছে তোমার, বাছা?"

অ্যালিস বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ কয়েক হাজার সৈন্য।"

নোট-বই দেখে রাজা বললেন, "সঠিক সংখ্যা হল, চার হাজার দুশো সাত। ঘোড়া সব পাঠাতে পারি নি, কারণ দাবা খেলার জন্যে দুটোকে আটকে রাখতে হয়েছে। পাইক দুটোকেও পাঠাই নি! দুজনেই শহরে গেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ তো, কেউ আসছে? দেখতে পাচ্ছ?"

অ্যালিস বললে, "দেখতে পাচ্ছি, কেউ নেই।"

একটু ঠাট্টার ভঙ্গিতে রাজামশাই বলে উঠলেন, "'কেউ নেই'-কে দেখতে পাচ্ছ—বড়ো জবর চোখ তোমার। তাও আবার এত দূর থেকে।"

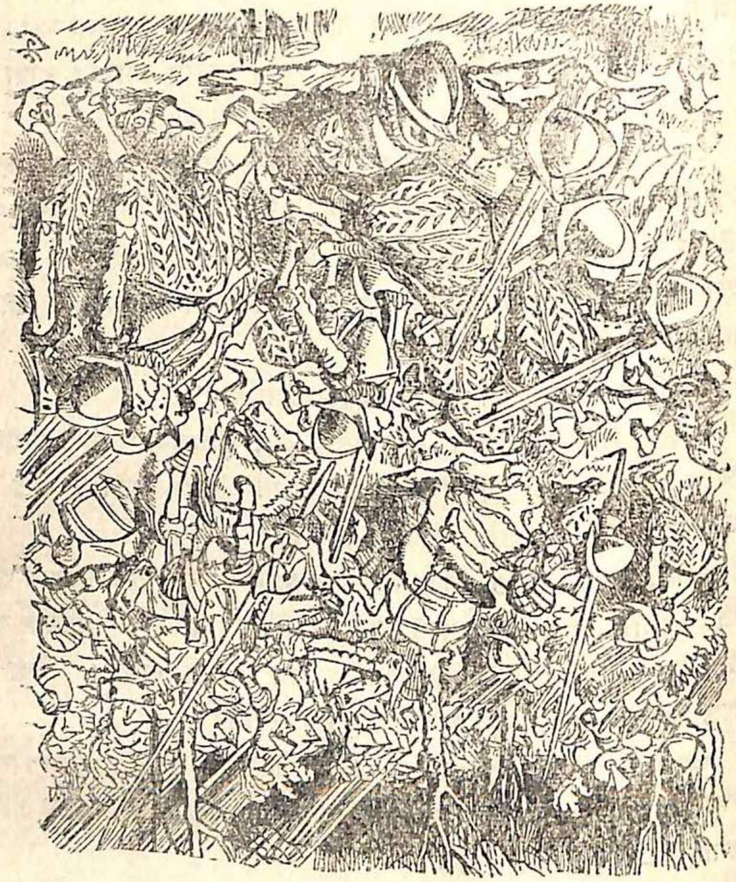
অ্যালিসের কানেও গেল না কথাগুলো। সে তখন ভুরুর ওপর হাত আড়াল করে একদৃষ্টে রাস্তার দিকে দেখছে। খানিক বাদে হঠাৎ বলে উঠল, "এবার যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু খুব আস্তে আস্তে আসছে—কী অদ্ভুত ঢঙ্ রে বাবা!"

আসলে রাজার পাইক তখন কখনো লাফিয়ে, কখনো সাপের মতো কিল্‌বিল্ করে, কখনো লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছিল—সত্যিই অদ্ভুত ঢঙ।

রাজামশাই কিন্তু তা মানেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, "ঢঙটা মোটেই অদ্ভুত কিছু নয়। আসলে আনন্দ হলেই ও অমন করে। ওর নাম, হাইঘা।" (ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, হাইঘা আসলে 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর সেই চৈতী খরগোশ।) আমার আর একজন যে পাইক, তার নাম হাত্তা। দুজন পাইক না হলে চলে না। আসা যাওয়া করতে হয় তো। একজন যায়, আর একজন আসে।"

বলতে না বলতেই পাইক এসে হাজির। বেচারি এত হাঁফিয়ে গেছে যে, কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে বিদিকিচ্ছিরি সব মুখভঙ্গি করতে করতে হাত-পা নাড়া ছাড়া আর কিছুই তখন তার করবার সাধ্য নেই।

রাজামশাই একটা কিছু কথা বলে তাকে নিরস্ত করতে চাইছিলেন,



কিন্তু ততক্ষণে তার মুখ-চোখ আরো বদখৎ দেখাতে আরম্ভ করেছে, চোখদুটো ভাঁটার মতো ঘুরছে। রাজামশাই থাকতে না পেরে বলে উঠলেন "তোমায় দেখে পিলে চমকে যাচ্ছে! অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যেতে পারি—শিগ্‌গির একটা হ্যামস্যাণ্ডুইচ দাও!"

সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঝোলানো-ব্যাগের ভেতর থেকে পাইক মহাপ্রভু একটা স্যাণ্ডুইচ বার করে দিতেই রাজা পরম পরিতোষে সেটাকে খেয়ে ফেললেন।

বললেন, "আর-একটা দাও।"

ব্যাগের ভেতর উঁকি মেরে পাইক বললে, "একটুখানি খড় আছে, আর কিছু নেই।"

বিড়্‌বিড়্‌ করে রাজামশাই বললেন, "খড়ই সই।"

তা, খড় খেয়ে ভালোই হল। খানিকটা সুস্থ হলেন রাজামশাই। বললেন, "অজ্ঞান-টজ্ঞান হবার মতো হলে, খড়ের মতো আর কিছু নেই।"

অ্যালিস বললে, "মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললে বোধ হয় আরো ভালো হয়।"

রাজামশাই খিঁচিয়ে উঠলেন, "খড়ের চেয়ে আরো ভালো যে কিছু নেই, তা তো বলি নি, বলেছি খড়ের 'মতো আর কিছু নেই'।"

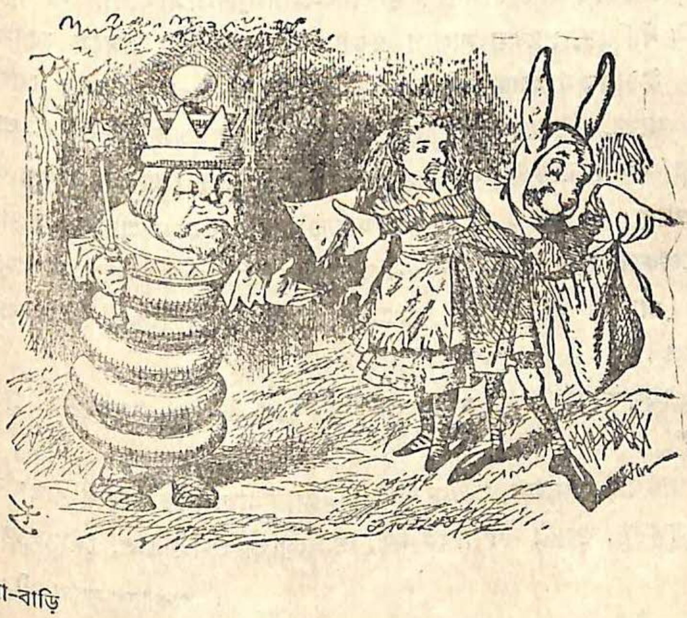
অ্যালিসের মুখে আর কথা জোগাল না।

আরো খানিকটা খড় নেবার জন্যে পাইকের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরে রাজা জিগেস করলেন, "রাস্তায় কাকে দেখলে? আছে কেউ?"

পাইক বললে, "কেউ নেই।"

রাজা বললেন, "ঠিক! এই মেয়েটিও তাকে দেখেছে, ঐ 'কেউ নেই'-কে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, 'কেউ নেই' হাঁটে তোমার চেয়েও আস্তে আস্তে।"

পাইক খুব ক্ষুণ্ণ গলায় বললে, "আপ্রাণ জোরে হাঁটি তো। আমি জোর গলায় বলতে পারি, এমন কেউ নেই, যে আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটে।"



রাজা বললেন, "হতেই পারে না। তা হলে সে তোমার আগে এসে পৌঁছে যেত এখানে। যাই হোক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই দম ফিরে পেয়েছ। বল, শহরের খবর বল।"

মুখের কাছে দুটো হাত জড়ো করে, ঝুঁকে পড়ে রাজার কানের কাছে মুখটা এগিয়ে এনে পাইক বললে, "চুপি চুপি বলব।" শুনে অ্যালিসের দুঃখ হল। খবরটা আর শোনা হল না। যাই হোক, পাইক কিন্তু চুপি চুপি বলল না, বরং আচমকা একটা চীৎকার করে বলে উঠল, "ফের লেগেছে!"

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে রাজামশাই বলে উঠলেন, "এই তোমার চুপি চুপি কথা। আবার যদি হয়, একেবারে ময়দা-মাখা করে ফেলব। মাথার মধ্যে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল।"

অ্যালিস প্রশ্ন করলে, "কী লেগেছে? কাতে কাতে লেগেছে?"

রাজা বললেন, "কাতে কাতে আবার, সেই সিংহ আর ইউনিকর্ন-এ তে।"

এইখানে তোমাদের একটা কথা বলে নিই: ইংল্যাণ্ড আর স্কটল্যাণ্ড যখন এক হয়ে যায়, তখন বৃটিশ-রাজের যে সরকারি তকমা বা প্রতীক (ভারতের যেমন অশোকস্তম্ভ) তৈরি হল, তাতে রইল স্কটল্যাণ্ডের প্রতীক হিসেবে একটা ইউনিকর্ন আর ইংল্যাণ্ডের প্রতীক হিসেবে একটা সিংহ। একটা বিরাট ঢাল-এর দুদিকে এরা দুজন সামনের পা তুলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ঢালের মাথায় একটা রাজ-মুকুট। সিংহ তোমরা জানো। ইউনিকর্ন হচ্ছে একরকম কাল্পনিক প্রাণী—মাথা এবং দেহটা ঘোড়ার মতো, পিছনের পা দুটো হরিণের, ল্যাজটা সিংহের আর কপালের ওপর একটা খাড়া শিং। গ্রীস আর রোমের পুরাণে এর বর্ণনা আছে। বৃটিশ সরকারের এই প্রতীক বা তকমা সম্বন্ধে অনেকে রসিকতা করে বলত যে, ইউনিকর্ন আর সিংহটা যেভাবে রুখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয়, দুজনেই মুকুটটা বাগাবার জন্যে লড়ে গেল বলে।

রাজামশাইয়ের কথা শুনে অ্যালিস বলে উঠল, "মুকুটের জন্যে নাকি?"

রাজামশাই বললেন, "ঠিক তাই। আর সব চেয়ে মজার কথা কী জানো, মুকুটটা ওদের কারোরই নয়, আসলে আমার! চল, দৌড়ে গিয়ে

দেখে আসা যাক ব্যাপারটা।"

দৌড়তে দৌড়তে অ্যালিস বললে, "যে জিতবে—লড়াইয়ে—মকুটটা কি—সে-ই—পাবে ?"

রাজা বললেন, "ইল্লি ? কী কথাই বললেন !"

আরো খানিকটা এগিয়ে অ্যালিস বললে, "দয়া করে—একটু—থামবেন ? একবার দম নিয়ে নিতুম !"

রাজামশাই বললেন, "দয়া করতে হয়তো পারি, কিন্তু সময় নেই। দেখছ না, এক-একটা মিনিট কিরকম ধাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে ! ওদের ধরে রাখা বড়ো শক্ত, বাঁদরছঁ্যাচাকে ধরার চেয়েও শক্ত !"

কথা বলতে গিয়ে আরো দম ফুরিয়ে গেল, অ্যালিস তাই আর কথা বলবার চেষ্টা না করে ছুটতে লাগল। শেষকালে এক জায়গায় দেখা গেল একগাদা লোকজনের মাঝখানে সিংহমশাই আর ইউনিকর্ন-এ লড়াই হচ্ছে। এত ধুলো উড়ছে যে দুজনকে প্রথমে চেনাই যাচ্ছিল না, একটু পরে মাথার শিংটা দেখে বোঝা গেল, কে ইউনিকর্ন আর কে সিংহ।

এক জায়গায় হাত্তা—সেই অন্য পাইক-মহাপ্রভু—এক হাতে চায়ের কাপ আর অন্য হাতে স্যাণ্ডুইচ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছিল, ওরা দুজন তারই কাছাকাছি জায়গা নিলে। (ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, দ্বিতীয় পাইক-মহাপ্রভু হচ্ছেন আসলে সেই পাগলা টুপিওলা।)

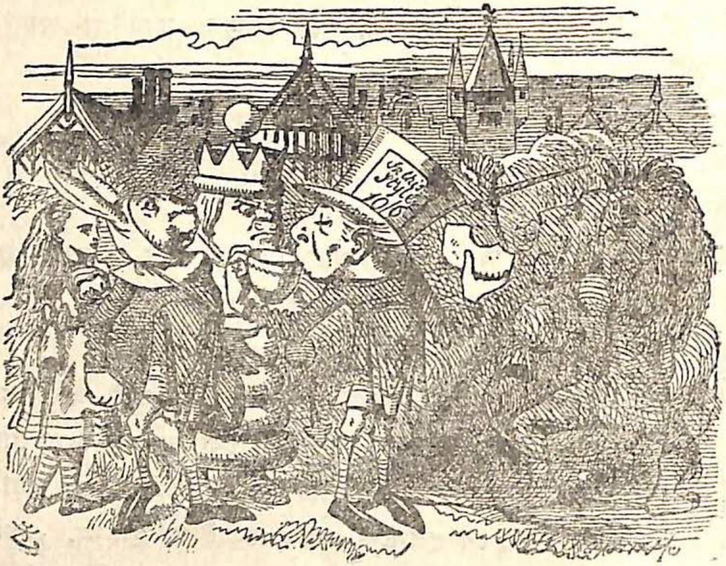
হাইঘা ফিস্‌ফিস্‌ করে অ্যালিসের কানে কানে বললে, "বেচারা সবে কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়েছে ; কয়েদে ঢোকবার সময়ে চা বা স্যাণ্ডুইচ, কিছুই শেষ করতে পারে নি। তা ছাড়া, কয়েদখানায় খাবার বলতে জুটেছে কেবল ঝিনুকের খোলা। বুঝতেই পারছ, বেচারার তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, খিদেয় পেট জ্বলছে।" তার পর হাত্তার গলা জড়িয়ে জিগেস করলে, "তা, কেমন আছ, বাছা ?"

হাত্তা একবার মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় কাত করে স্যাণ্ডুইচ আর চা খেতে লাগল।

হাইঘা আবার বললে, "কয়েদখানায় বেশ আরামে ছিলে তো ?"

হাত্তা আবার একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালে ; এবার দু-এক ফোঁটা জল দেখা গেল চোখে, কিন্তু কথা বললে না।

এবার ধৈর্য হারিয়ে হাইঘা বলে উঠল, "কথা বলতে কী হয় ?" হাত্তা নির্বিকারভাবে স্যাণ্ডুইচে কামড় বসালে, এক চুমুক চা খেলে।



এবার রাজা বললেন, "কথা বলবে না কি? লড়াই কেমন হচ্ছে?"

অনেক কসরৎ করে এক মুখ স্যাণ্ডুইচ কোঁৎ করে গিলে নিয়ে কোনোরকমে হাত্তা জবাব দিলে, "ভালোই চলছে। প্রায় বার-নব্বুই কাত হয়েছে দুজনে।"

অ্যালিস বললে, "এবার তো তা হলে টিপিনের ছুটি হবে। পাঁউরুটি আসবে।"

হাত্তা বললে, "পাঁউরুটি তৈরি। আমি তো তাই থেকেই এক টুকরো ভেঙে এনে খাচ্ছি।"

লড়াই স্থগিত হল, সিংহ আর ইউনিকর্ন বসে পড়ে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করতে লাগল। রাজামশাই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "দশ মিনিট টিপিনের ছুটি!" হাইঘা আর হাত্তা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ট্রেতে করে পাঁউরুটি বিলোতে লাগল। অ্যালিস এক টুকরো খেয়ে দেখলে, বড্ডো শুকনো।

রাজামশাই হাত্তার দিকে চেয়ে বললেন, "আজ আর লড়বে বলে মনে হয় না। তুমি গিয়ে বরং ঢাক পেটাতে বল।" ফড়িংয়ের মতো লাফাতে লাফাতে হাত্তা হুকুম তামিল করতে চলে গেল।

অ্যালিস মিনিট দুয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সেই দিকে চেয়ে। তার পর হঠাৎ খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে, দেখুন!

সাদা রানী আসছেন যে! বন থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আসছেন। কী তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারেন রে বাবা!"

রাজা সেদিকে দেখলেনও না, শুধু বলে উঠলেন, "পেছনে নিশ্চয়ই শত্রু লেগেছে। বনের মধ্যে শত্রুর লেখা-জোখা নেই তো!"

রাজার নির্লিপ্ত ভাব দেখে অ্যালিস অবাক হল। বললে, "এগিয়ে গিয়ে সাহায্য-টাহায্য করবেন না?"

রাজা বললেন, "ফালতু, ফালতু! এত তাড়াতাড়ি দৌড়য়, বাঁদর-ছ্যাঁচার চেয়েও জোরে। তবে; যদি বল, নোটবইয়ে নাহয় ওর সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য লিখে রাখি—রানী বড়ো সদাশয়।" তার পর নোট-বইয়ের পাতা বার করতে করতে বললেন, "বানানটা কী বল তো? 'সদাশয়' কি দুটোই তালব্য শ?"

ঠিক এই সময়ে ইউনিকর্ন প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রাজার দিকে চেয়ে বলে উঠল, "এবারের লড়াইটায় বেশ বেকায়দায় ফেলেছিলুম ব্যাটাকে।"

রাজামশাই বেশ থতমত খেয়ে বলে উঠলেন, "তা, খানিকটা খানিকটা বটে। শিং দিয়ে গোঁতানোটা অবশ্য ঠিক হয় নি।"

"তাতে ওর কিস্যু লাগে নি," এই কথা বলতে বলতে ইউনিকর্ন চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ অ্যালিসের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে খুব বিরক্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে বললে, "এটা কী?"

পরিচয় করিয়ে দেবার উৎসাহে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাইঘা বললে, "একটি শিশু। আজই সবে চোখে পড়ল। ঠিক জ্যান্তর মতন বড়ো, আর এক্কেবারে আসলের মতন!"

ইউনিকর্ন বললে, "আমার তো ধারণা, এরা খোক্কস-টোক্কস গোছের কিছু। বেঁচে আছে?"

হাইঘা গম্ভীরভাবে বললে, "কথা কইতে পারে।"

খুব মোলায়েম করে অ্যালিসের দিকে চেয়ে ইউনিকর্ন বললে, "কথা বল, বাছা।"

একটু মুচকি হেসে অ্যালিস বললে, "সত্যি কথা বলব? আমিও ভাবতুম, ইউনিকর্ন একটা রাক্ষস-টাক্ষস কিছু হবে। জ্যান্ত ইউনিকর্ন এই প্রথম দেখলুম।"

ইউনিকর্ন বললে, "তা, যখন দেখাই হল—আমিও তোমায় দেখলুম, তুমিও আমায় দেখলে—, এবার তুমি যদি আমায় বিশ্বাস কর, আমিও তোমায় বিশ্বাস করব, রাজি ?"

অ্যালিস বললে, "বেশ, তাই হবে।"

এবার রাজার দিকে ফিরে ইউনিকর্ন বললে, "এবার প্লাম-কেকটা বার কর হে, দোস্ত। তোমার ঐ পাঁউরুটি-টুটি আমার পোষাবে না !"

বিনয়ে নেতিয়ে পড়ে রাজামশাই বিড়্‌বিড়্‌ করে উঠলেন, "তা তো বটেই, তা তো বটেই !" তার পর হাইঘার দিকে ইশারা করে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "ব্যাগটা খোল-না তাড়াতাড়ি।—দুৎ, ওটা নয়, ওটাতে তো কেবল খড় !"

ব্যাগ থেকে একটা বিরাট কেক বার করে হাইঘা অ্যালিসকে ধরতে দিলে, তার পর একটা প্লেট আর ছুরি বার করলে। ব্যাগের মধ্যে অত সব জিনিস যে কোথায় লুকিয়ে ছিল, অ্যালিস মালুম পেলে না, মনে হল যেন ম্যাজিক।

ইতিমধ্যে সিংহমশায়ও কখন ওদের দলে এসে ভিড়ে গেছেন ! সর্বাঙ্গে ক্লান্তি আর ঘুম-ঘুম ভাব, চোখদুটি ঢুলু ঢুলু। অ্যালিসের দিকে অলস দৃষ্টিতে একবার চেয়ে প্রশ্ন করলে, "এটা আবার কী ?"

ইউনিকর্ন খুব তড়পে উঠে বললে, "বল তো কী ? হুঁ হুঁ ববাবা, ধারণাই করতে পারবে না ! আমিও পারি নি !"

খুব বিব্রতভাবে অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে সিংহ বললে, "তুমি কি কোনো প্রাণী—না উদ্ভিদ—নাকি, খনিজ পদার্থ ?" প্রত্যেক কথার শেষে একবার করে হাই তুললে।

অ্যালিস কোনো জবাব দেবার আগেই ইউনিকর্ন চেঁচিয়ে উঠল, "বিরাট একটা খোক্কস !"

সটান শুয়ে পড়ে, থাবার ওপর থুঁতনি রেখে সিংহ বললে, "তা হলে, ওহে খোক্কস, প্লাম-কেকটা ভাগ করে দাও। তোমরা দুজনেও বসে যাও (রাজা এবং ইউনিকর্নকে)। কেকের ব্যাপারে কোনো এক-চোখোমি করতে চাই না।"

দু-দুটো অমন কেঁদো কেঁদো জানোয়ারের মাঝখানে গিয়ে বসতে রাজার বড়ো অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু আর কোথাও জায়গাও তো নেই।

রাজার মাথার মুকুটটার দিকে একবার চোখ মট্‌কে তাকিয়ে নিয়ে



ইউনিকর্ন হঠাৎ বলে উঠল, "মুকুটটা নিয়ে আমাতে আর সিংহতে যা লড়াই একখানা হবে!" শুনে রাজার মুকুট-সুদ্ধ মাথাটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল।

সিংহ বললে, "ফুঁ দিয়ে তোকে উড়িয়ে দেব!"

ইউনিকর্ন বললে, "দিয়ে একবার দেখ-না!"

উত্তেজনায় আধ-বসা হয়ে খিঁচিয়ে উঠল সিংহ, "সারা শহরময় যতবার লড়েছি, ততবারই তো হেরে ভূত হয়েছিস রে, ম্যাদা!"

রাজামশাই দেখলেন, এখনি হয়তো ঝগড়া বেধে যাবে, তাই কথা ঘোরাবার জন্যে বলে উঠলেন, "সারা শহরময়? বাবা, সে তো অনেকখানি। পোলের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন, না বাজারের মধ্যে দিয়ে? পোলের ওপর দিয়ে যাওয়াই ভালো।" ভয়ে তাঁর গলা তখন কাঁপছে।

আবার চিৎপাত হয়ে সিংহ বললে, "কী জানি, এত ধুলো, যে কিছুই টের পাই নি।—উফ্, ঐ খোক্কসটা কতক্ষণ ধরে কেক কাটছে বল তো?"

একটা নালার ধারে হাঁটুর ওপর কেকের প্লেটটা রেখে বসে বসে ছুরি দিয়ে টুকরো করছিল অ্যালিস। সিংহের কথা শুনে বলে উঠল,



"অদ্ভুত ব্যাপার তো! যতই টুকরো করছি, কেবলই আবার জুড়ে জুড়ে যাচ্ছে।"

শুনে ইউনিকর্ন বললে, "আয়না-রাজ্যের কেক-এর ব্যাপার কিছুই জানো না দেখছি। আগে বিলি কর, তার পর কাটো।"

কথাটা আজগুবি মনে হলেও তাই-ই করলে অ্যালিস। আর, আশ্চর্য, প্লেটটা হাতে করে নিয়ে ও:দের সামনে ধরতেই, কেকটা আপনা-আপনি তিন টুকরো হয়ে গেল। খালি প্লেটটা নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে শুনতে পেলে, সিংহ বলছে, "এবার কাটো।"

ছুরি বাগিয়ে অ্যালিস যখন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কী করবে, তখন ইউনিকর্ন হঠাৎ বলে উঠল, "এ ভারি অন্যায়! খোক্কসটা সিংহকে অনেক বেশি দিয়েছে—আমার ডবল!"

সিংহ বললে, "সে যাই হোক, নিজের জন্যে তো কিছুই রাখে নি বেচারি। প্লাম-কেক খেতে ভালো লাগে না, খোক্কস?"

অ্যালিসের আর কোনো উত্তর দেওয়া হয়ে উঠল না, কারণ তার আগেই ঢাক বেজে উ.ঠছে।

কোথা থেকে যে আওয়াজটা আসছে, বোঝা গেল না, কিন্তু সারা আকাশ-বাতাস আওয়াজে গম্ গম্ করতে লাগল, মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ করতে লাগল, কানে তালা লেগে গেল ; আর, সঙ্গে সঙ্গে তড়াং করে এক লাফ দিয়ে নালাটা প্যার হয়ে গেল অ্যালিস আর হাত দিয়ে প্রাণপণে দুটো কান চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমার নিজস্ব আবিষ্কার

খানিক বাদে আওয়াজটা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসতে লাগল, তার পর একেবারে থেমে যেতেই মুখ তুললে অ্যালিস। চোখ মেলে চাইতেই—অবাক! কেউ কোথাও নেই! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সেই সিংহ, সেই ইউনিকর্ন রাজার সেই পাইক, সবই বোধ হয় স্বপ্ন। কিন্তু, সেই বিরাট প্লেটটা, যার ওপর রেখে প্লাম-কেকটা কাটবার চেষ্টা করেছিল, সেটা তো এখনো পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। তা হলে, নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয়। অ্যালিস ভাবতে লাগল, 'না, স্বপ্ন তো নয়। অবশ্য এক হতে পারে, আমিও স্বপ্ন, পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন, এখনো স্বপ্ন। তাই যদি হয়, তা হলে স্বপ্নটা লাল রাজার না হয়ে যেন আমারই হয়। খুব ইচ্ছে করে, লাল রাজাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে দেখি, কী হয়!"

ভাবছে, আর ঠিক তখনই কানে গেছে বিকট একটা চীৎকার, "সামাল! সামাল! কিস্তি!" পরক্ষণেই লাল বর্মাপরা একজন নাইট (আমাদের দেশের দাবার 'ঘোড়া') ঘোড়ায় চড়ে খপ্ খপ্ করতে করতে অ্যালিসের সামনে এসে হাজির। হাতে তার ফলা-লাগানো একটা গদা। খুব পাঁই পাঁই করে ঘোরাচ্ছে। অ্যালিসের নাকের গোড়ায় এসে ঘোড়াটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই নাইট বলে উঠল, "তুমি আমার বন্দী!" বলেই টুপ্ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

থতমত খেয়ে তো গেছেই, তবু আপাতত নিজের জন্যে বিশেষ ভয় হল না অ্যালিসের, বরং নাইটের কথা ভেবেই বেশি চিন্তা হল। বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়েই দেখলে নাইট-মহাপ্রভু আবার কোনোরকমে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ঘোড়ার পিঠে চাপছেন। জিনের ওপর বেশ জুতসই করে বসেই নাইট আবার হাঁকলে, "তুমি আমার—" কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই আর একজনের গলা শোনা গেল, "সামাল! সামাল! কিস্তি!" চমকে গিয়ে অ্যালিস নতুন অতিথির সন্ধানে ইতি-উতি তাকাতে লাগল।

ইনি হলেন সাদা নাইট। ইনিও অ্যালিসের কাছাকাছি এসেই টুপ্‌ করে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়লেন, হাঁচড়-পাঁচড় করে আবার চড়লেন, এবং তার পর দুই নাইটে মিলে মুখোমুখি ঘোড়ার পিঠে বসে চুপচাপ এ-ওর দিকে নির্বিকার মুখে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ, কারো মুখে কথা নেই। অবাক হয়ে একবার এর দিকে আর-একবার ওর দিকে দেখতে লাগল অ্যালিস।

শেষ অবধি লাল নাইট মুখ খুললে, "শুনে রাখ, ও আমার বন্দী!"

সাদা নাইট উত্তর করলে, "তা বটে, তবে আমি ওকে উদ্ধার করেছি!"

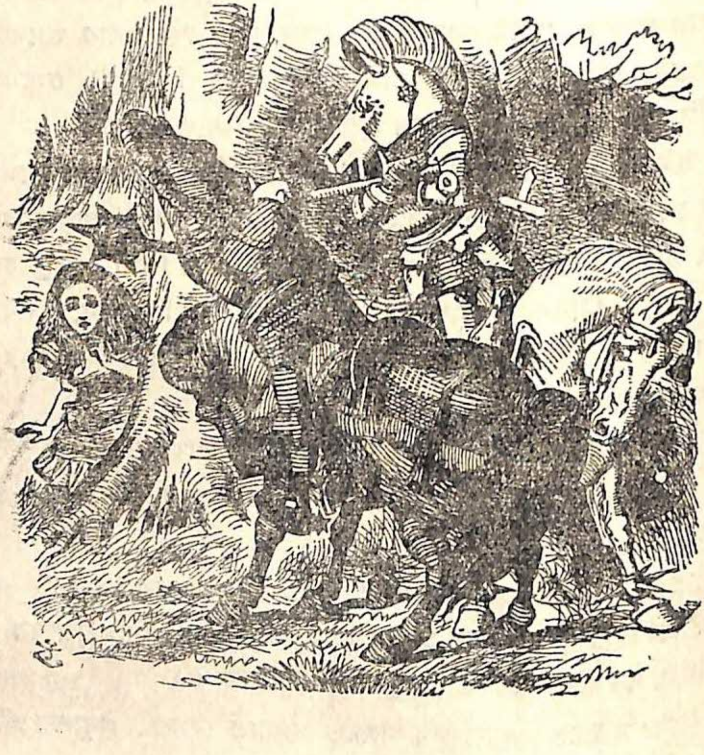
"বেশ, তা হলে, ওকে নিয়ে একটা লড়াই হয়ে যাক!" বলেই একটা লোহার টুপি মাথায় চড়ালে লাল নাইট। (টুপিটা জিনের পাশে ঝুলছিল, দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মাথার মতো।)

সাদা নাইটও মাথায় টুপি গলাতে গলাতে বললে, "যুদ্ধের নিয়ম-টিয়ম-গুলো মানবে তো, না কি?"

"সব সময়েই মানি", বলেই সাদা নাইট তড়পে এল, আর তার পরেই দুজনে এমন হুড়্‌মুড়্‌ করে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে লড়াই করতে শুরু করলে যে, চোট খাবার আশঙ্কায় একটা গাছের পিছনে গিয়ে আড়াল নিতে হল অ্যালিসকে।

সাবধানে উঁকি মেরে মেরে দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল, 'যুদ্ধের নিয়ম যে কী, কে জানে, বাবা! একটা নিয়ম তো দেখতে পাচ্ছি, একজন নাইট অন্য নাইটকে মারলেই সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়, আর যদি মারটা ফস্‌কে যায়, তা হলে নিজেই তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে পড়ে। আর-একটা নিয়ম দেখছি, গদাগুলোকে এরা দুহাতে জাপটে ধরে। আর পড়বার সময়ে কী ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ হয় রে, বাবা! যেন

বাসন-ভাঙার শব্দ! ঘোড়াগুলোও কী নিরীহ! চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কতবার ওরা নামছে আর উঠছে, কোন হেল-দোল নেই!'



আর-একটা নিয়ম, যেটা অ্যালিসের চোখে পড়ে নি, সেটা হল, ওরা যখনই পড়ে, তখনই মাথা গুঁজড়ে পড়ে। যুদ্ধের শেষটাও হল ঐ মাথা গুজড়ে পড়ে—দুজনেই পাশাপাশি মাথা গুঁজড়ে ঠ্যাঙ উঁচু করে পড়ে রইল। যখন উঠল, বেশ হাসিমুখেই দুজনে শেকহ্যাণ্ড করলে, তার পর লাল নাইট ঘোড়ায় চড়ে টগ্‌বগ্ করতে করতে চলে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এসে সাদা নাইট বললে, "জেতার মতো জিতলুম, বল?"

আমতা আমতা করে অ্যালিস বললে, "কী জানি। তবে, আমি কিন্তু কারুরই বন্দী হতে চাই না, রানী হতে চাই!"

সাদা নাইট বললে, "তা হবে, পরের নালাটা পার হলেই হবে। এই

বনের শেষপর্যন্ত তোমায় নিরাপদে পৌঁছে দেব, তার পর কিন্তু আমায় ফিরতে হবে। আমার দৌড় ঐ পর্যন্ত, অন্য ঘরে যাবার উপায় নেই।"

অ্যালিস বললে, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তা, মাথার টুপিটা নিয়ে বড্ডো মুশকিলে পড়েছেন দেখছি, খুলে দেব ?" সাদা নাইট সত্যিই নিজে নিজে টুপিটা খুলতে পারছিল না। অ্যালিস কোনোরকমে টেনে-টুনে ছাড়ালে।

সাদা নাইট দুহাতে তার এলোমেলো চুলগুলোকে ধাতস্থ করে নিলে, তার পর অ্যালিসের দিকে যখন তাকালে, তখন দেখা গেল, তার টানা টানা চোখদুটি ভারি কোমল আর মুখটি ভারি নরম। যারা যুদ্ধ করে, তাদের যে এমন চেহারা হতে পারে, অ্যালিস আগে কখনো ভাবে নি।

গায়ের বর্মটা তার টিনের, খুব বেঢপ। কাঁধ থেকে একটা বাক্স ঝোলানো রয়েছে, মুখটা নীচের দিকে করা, ডালাটা তাই খুলে লট্‌পট্‌ করছে।

ভুরু কুঁচকে বাক্সটা লক্ষ্য করছিল অ্যালিস, তাই দেখে সাদা নাইট বললে, "বাক্সটা দেখে তাক লেগে গেছে দেখছি। ওটা আমার নিজের আবিষ্কার—জামা-কাপড় আর স্যাণ্ডুইচ রাখবার জন্যে তৈরি করেছি। দেখছ তো, উলটো করে রেখেছি—বৃষ্টি পড়লেও ভেতরে জল ঢুকবে না।"

অ্যালিস খুব মিষ্টি করে বললে, "কিন্তু ভেতরের জিনিস-পত্তর সব পড়ে যেতে পারে তো ? বাক্সর ডালাটা যে একদম হাঁ হয়ে আছে, সেটা খেয়াল করেছেন কি ?"

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল সাদা নাইট। "জানতুম না তো ! তার মানে সবই পড়ে গেছে ! তার মানে, জিনিস না থাকলে বাক্সটাই তো বরবাদ !" বলতে বলতে দড়ি খুলে বাক্সটাকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আবার কী মনে করে সযত্নে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলে। অ্যালিসের দিকে ফিরে বললে, "কেন করলুম বল তো ?"

অ্যালিস বলতে পারলে না, শুধু মাথা নাড়লে।

"বলা যায় না, মৌমাছিরা বাসা বাঁধতে পারে। তা হলে বেশ মধু পাওয়া যাবে।"

অ্যালিস বললে, "কিন্তু আপনার জিনের সঙ্গে তো দেখছি মৌচাকের মতো কি একটা ঝোলানো রয়েইছে।"

সাদা নাইটের কথায় এবার একটু আফসোসের সুর। "হ্যাঁ, খুবই

ভালো মৌচাক, যাকে বলে সেরা জাতের। কিন্তু একটা মৌমাছিও এ পর্যন্ত ধারে কাছে এল না। হ্যাঁ, আর-একটা জিনিস দেখেছ, ঝোলানো রয়েছে? ওটা ইঁদুর-কল। ইঁদুরের ভয়ে মৌমাছি আসে না, না মৌমাছির ভয়ে ইঁদুর আসে না, ঠিক ঠাহর পাই না।"

অ্যালিস বললে, "সত্যি কথা বলতে কি আমার আগেই মনে হচ্ছিল, ইঁদুর-কল দিয়ে কী হবে। ঘোড়ার পিঠের ওপর কি আর ইঁদুর আসবে?"

"আসার কথা নয়, ঠিকই। তবে, ধর, একান্তই যদি কোনো গতিকে এসে পড়ে, তা হলে যেন পিঠের ওপর নেচে-কুঁদে বেড়াতে না পারে। সেটা আবার আমি সইতে পারি না।"

খানিক বাদে আবার বললে, "দেখ, সবরকম অবস্থার জন্যে তৈরি থাকা ভালো। সেইজন্যেই ঘোড়াটার চারটে পায়েই গোড়ালির কাছে পটি লাগিয়ে রেখেছি।"

খুব অবাক হয়ে অ্যালিস বললে, "কিসের জন্যে?"

সাদা নাইট জবাব দিলে, "যাতে হাঙরের কামড় খেতে না হয়। এটাও আমার নিজের আবিষ্কার। নাও, এবার আমায় একটু তুলে ধর ঘোড়ায় চড়ি, তার পর বনের শেষপর্যন্ত তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।— ঐ প্লেটটা কিসের?"

"ওটা প্লাম-কেকের প্লেট।"

"ওটাও সঙ্গে নেওয়া যাক। প্লাম-কেক পেলে কাজে লাগানো যাবে। একটু হাত লাগাও তো, থলের মধ্যে পুরে ফেলি।"

অ্যালিস খুব ভালো করে থলের মুখটা ফাঁক করে ধরে রইল, তবু কিছুতেই আর হয় না। নাইট-বাবাজি এমন এলোমেলো করে প্লেটটাকে নিয়ে থলের মধ্যে গোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল যে কহতব্য নয়। প্রথম দু-একবার তো প্লেটের বদলে নিজেই ঢুকে গেল থলের মধ্যে। যাই হোক, শেষপর্যন্ত কোনোক্রমে প্লেটটা থলের মধ্যে গোঁজবার পর সাদা নাইট বললে, "খুব চাপা-চাপি হয়ে গেল। থলের মধ্যে একগাদা মোমবাতি পুরেছি তো।" তার পর থলেটাকে জিনের সঙ্গে বেঁধে যখন ঝুলিয়ে রাখলে, দেখা গেল সেখানে আরো সব অনেক জিনিসপত্র ঝুলছে— আঁটি-বাঁধা গাজর, উনুন খোঁচাবার শিক গোছাখানেক, আরো কত কি।

চলতে চলতে সাদা নাইট হঠাৎ জিগেস করে বসল, "তোমার চুল বেশ শক্ত করে বাঁধা আছে তো?"

একটু হেসে অ্যালিস বললে, "যেমন থাকে আর কি।"

সাদা নাইটকে খুব চিন্তিত দেখাল। বললে, "উঁহু, ওতে চলবে না। এখানকার হাওয়া বড়ো তেজী, বুঝলে না।"

অ্যালিস জিগেস করলে, "হাওয়ায় যাতে চুল উড়ে না যায়, তার কোনো উপায় বার করেছেন নাকি?"

নাইট বললে, "এখনো করি নি, তবে এমন একটা মতলব করেছি, যাতে চুল কিছুতেই আর পড়তে পাবে না।"

"বলুন-না, শুনি।"

নাইট বললে, "প্রথমে একটা শক্ত কাঠি নিতে হবে। তার পর লতানে গাছের মতো করে চুলগুলোকে সেই কাঠি বেয়ে ওপর দিকে তুলে দিতে হবে। এখন দেখ, চুল যে পড়ে যায়, তার একমাত্র কারণ হল, চুল নীচের দিকে ঝোলে—ওপর দিকে কি কিছু পড়তে পারে, বল? এটাও আমার নিজের আবিষ্কার। ইচ্ছে হলে করে দেখতে পারো।"

মতলবটা খুব সুবিধার মনে হল না। ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগল অ্যালিস চুপচাপ, আর মাঝে মাঝেই চলা থামিয়ে নাইট-বাবাজিকে তুলে ধরতে হল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়সওয়ার বটে একখানা!

যখনই ঘোড়া থমকে দাঁড়ায় (দেখ-না-দেখ থমকে দাঁড়ায়), নাইট-বাবাজি সামনের দিকে খসে পড়েন; আর যখনই ঘোড়া চলতে শুরু করে (বেশির ভাগ সময়েই আচমকা শুরু করে), হ্যাঁচকানির চোটে তিনি পিছন দিকে খসে পড়েন। এ ছাড়া মোটামুটি তিনি চলেন মন্দ নয়, তবে মাঝে মাঝে আপনা থেকেই পাশের দিকেও টলে পড়েন, এই যা একটু মুশকিল। আর বেশির ভাগই যেহেতু অ্যালিসের দিকেই পড়েন, তাই অ্যালিস দেখলে যে, ঘোড়ার খুব কাছাকাছি না-থাকাই ভালো।

পাঁচ বারের বার তাকে ঠেলে তুলতে তুলতে অ্যালিসের মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে গেল, "ঘোড়ায় চড়া বিশেষ রপ্ত হয় নি দেখছি।"

সাদা নাইট খুব অবাক হল, একটু যেন ক্ষুণ্ণও। অ্যালিসের চুলের গোছা মুঠিয়ে ধরে টাল সামলে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চড়তে বললে, "কেন বল তো?"

"রপ্ত থাকলে এত ঘন ঘন তো কেউ ঘোড়া থেকে পড়ে না, তাই আর কি।"

খুব গম্ভীর গলায় নাইট বললে, "চুটিয়ে রপ্ত করেছি! একেবারে



যাকে বলে, চুটিয়ে !"

অ্যালিস আর কি করে, তাই যথাসম্ভব মিষ্টি করে বললে, "তাই বুঝি ?" তার পর, আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ চলতে লাগল দুজনে। নাইট-বাবাজি চোখ বুজে আপনমনে কী বিড়্‌বিড়্ করছে, আর অ্যালিস লক্ষ্য রাখছে কখন আবার তিনি মাটিতে খসে পড়েন।

সাদা নাইট তখন বলতে শুরু করেছে, "ঘোড়ায় চড়ার আসল কায়দাটা হল—" খুব চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ডান হাতখানাকে সজোরে নাড়তে নাড়তে বাকিটুকু যেই বলতে গেছে—"টাল সামলে—", ব্যাস্ ! কথাটা শেষ হবার আগেই মাথা নিচু করে পড়বি তো পড় একেবারে অ্যালিসের প্রায় গায়ের ওপর। দারুণ ভয় পেয়ে তাকে ঠেলেঠুলে তুলতে তুলতে অ্যালিস বললে, "হাড়-টাড় ভাঙে নি তো ?"

"তেমন নয়।" এমনভাবে বললে, যেন দু-একখানা যদি ভেঙেও থাকে, কিছু আসে-যায় না। "হ্যাঁ, যা বলছিলুম—ঘোড়ায় চড়ার আসল কায়দাটা হল, টাল সামলে বসে থাকা। আমার দিকে দেখ, ঠিক এইরকম—"

বলে, বল্লাটা ছেড়ে দিয়ে দুহাত ছড়িয়ে অ্যালিসকে কায়দাটা দেখাতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে, যাকে বলে, চিৎপটাং—ঘোড়ার পায়ের মাঝখানে।

অ্যালিস যখন ওকে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে, তখনো আগের কথার জের টেনে সে বলে চলেছে, "চুটিয়ে রপ্ত করেছি। একেবারে চুটিয়ে!"

এবারে আর মেজাজ রাখতে পারলে না অ্যালিস। খিঁচিয়ে উঠে বললে, "ডাহা বাজে কথা। আপনার আসলে চাকা-লাগানো কাঠের ঘোড়ায় চড়া উচিত, আপনার পক্ষে সেই ভালো।"

আকুল আগ্রহে নাইট জিগেস করলে, "চাকা-লাগানো কাঠের ঘোড়া কি খুব শান্ত হয়ে চলে?" বলতে বলতে দুহাতে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে কোনোরকমে টাল সামলে নিলে, নইলে নির্ঘাৎ আবার পড়ে যেত।

"জ্যান্ত ঘোড়ার চেয়ে অনেক অনেক শান্ত হয়ে চলে।" অনেক চেষ্টা করেও এবার কিন্তু অ্যালিস হাসি চাপতে পারলে না।

খুব চিন্তিত হয়ে আপন মনে বিড়্‌বিড়্ করতে লাগল নাইট, "একটা জোগাড় করতে হবে। একটা না, দুটো—না, অনেকগুলো।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ যাবার পর নাইট হঠাৎ শুরু করলে, "আমি কিন্তু খুব আবিষ্কার করতে পারি, জানো?

"লক্ষ্য করেছিলে বোধ হয়, এবারে যখন আমায় টেনে তুলছিলে, তখন আমার কপাল কুঁচকে ছিল?—তার মানে আমি ভাবছিলুম।"

অ্যালিস বললে, "একটু গম্ভীর গম্ভীর দেখাচ্ছিল বটে।"

"আসলে তখন ভাবছিলুম, কী করে সহজে বাগানের বন্ধ গেট টপ্‌কে পার হওয়া যায়। একটা খুব নতুন উপায় ঠাওরেছি, শুনতে চাও?"

"নিশ্চয়ই।"

নাইট বললে, "কি করে মতলবটা মাথায় এল, বলি, শোনো। প্রথমে, মনকে বোঝালুম, 'দেখ মন, আসল গণ্ডগোল হল পা নিয়ে, মাথাটা তো উঁচুতেই আছে।' তার পর, মনে মনে ভেবে দেখলুম যে, প্রথমে যদি মাথাটাকেই গেটের ওপর রেখে দিই, তা হলে মাথাটা তো ওপরে রয়েই গেল! এবার যদি পা দুটাকে তুলে দিয়ে উলটোবাগে দাঁড়াই, তা হলে তো পা দুটোও উঁচু হয়ে গেল, তাই-না? তার পর গেট টপ্‌কানোর আর বাকি রইল কী, তাই-না?"

একটু ভেবে নিয়ে অ্যালিস বললে, "যা যা বললেন, সেই মতো করতে পারলে অবশ্য টপ্‌কানো যায় ঠিকই, তবে, করাটা বেশ শক্ত না ?"

গম্ভীর গলায় নাইট বললে, "চেষ্টা করে অবশ্য দেখি নি। তবে, তুমি যা বললে মনে হচ্ছে, একটু শক্তই হবে।"

কথা বলতে বলতে নাইট বেচারা এমন থতমত খেয়ে গেল যে তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালে অ্যালিস, "ওঃ ! আপনার টুপিটা কিন্তু অদ্ভুত! ওটাও আপনারই আবিষ্কার নাকি ?"

জিন থেকে দড়ি-বাঁধা টুপিটা ঝুলছিল, গর্বভরে সেই দিকে একবার চেয়ে নিয়ে নাইট বললে, "হ্যাঁ, আমারই আবিষ্কার। তবে এর চাইতে আরো ভালো একটা টুপি আবিষ্কার করেছিলুম—চোঙার মতন গড়ন। যখন মাথায় থাকত, পড়ে-টড়ে গেলে, টুপির ছুঁচলো ডগাটাই প্রথমে মাটিতে লাগত। টুপি থেকে আমি আর কতটুকু তফাতে থাকতুম বল! কাজেই সামান্য একটুখানি পড়তুম, ঘোড়ার পিঠ থেকে সবটা তো আর পড়তে হত না! তবে মুশকিল হল, অন্য একটা বিপদের ভয় থেকে গেল—টুপির ভেতরে ঢুকে যাবার ভয়। একবার সত্যিই তাই হল, টুপির ভেতরেই পড়ে গেলুম। আর, সব চেয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হল, টুপি থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই সাদা নাইট এসে খপ্‌ করে টুপিটা নিজের মাথায় পরে ফেললে। ভেবেছিল, ওরই টুপি।"

নাইটকে এমন গম্ভীর দেখাতে লাগল যে, অ্যালিস হাসতে পারলে না। হাসি চাপবার চেষ্টায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, "সাদা নাইটের লাগে নি ? একেবারে তার চাঁদির ওপরে চেপে বসেছিলেন তো আপনি!"

গম্ভীরভাবে নাইট বললে, "লাথি না ছুঁড়ে তো আর উপায় ছিল না! তার পর ও অবশ্য টুপি খুললে, কিন্তু আমায় বার করতে যে কত ঘণ্টা লেগে গেল, কী আর বলব। এত এঁটে বসে গিয়েছিলুম না—"

বলতে বলতে নাইট মহাপ্রভু আবার চিৎপটাং। এবারে একটা খানার মধ্যে।

তাড়াতাড়ি খানার ধারে গিয়ে খুঁজতে লাগল অ্যালিস। বড়ো আচমকা পড়েছে বেচারা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘোড়ার পিঠে দিব্যি টাল সামলে চলছিল, তাই অ্যালিস ভেবেছিল আর বোধ হয় পড়বে না। সাদা নাইটের পায়ের পাতাজোড়া ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না অবশ্য, তবু বেশ বহাল তবিয়তে কথা বলতে পারছে দেখে অ্যালিস নিশ্চিন্ত

হল যে, বিশেষ চোট খায় নি। নাইট তখন বলে চলেছে, "কিন্তু, অন্য লোকের টুপি পরাটা কি উচিত হয়েছে ওর—বিশেষ করে টুপির ভেতরে স্বয়ং মালিক যখন বসে? বল?"



ঠ্যাঙ ধরে হিঁচড়ে টেনে পাড়ের ওপর কোনোরকমে তাকে বসিয়ে দিয়ে অ্যালিস বললে, "মাথা নীচের দিকে করে অমন নিশ্চিন্দি হয়ে কথা বলেন কী করে?"

প্রশ্ন শুনে নাইট-বাবাজি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলে না। খানিক বাদে বললে, "মাথাটা যেখানেই থাক, তাতে কী যাচ্ছে আসছে? মনটা তো ঠিকই কাজ করছে, নাকি? সত্যি কথা বলতে কি, মাথাটা আমার যত নীচের দিকে থাকে ততই বেশি বেশি নতুন নতুন মতলব গজায় আমার মাথায়।"

একটু থেমে আবার বললে, "সব চেয়ে চমৎকার যে মতলবটা ঠাওরেছিলুম, সেটা কী জানো? খাবার টেবিলে যখন মাংস্ দেওয়া হচ্ছে সেই সময়ে মাথায় এল একটা নতুন ধরনের পুডিং এর কথা।"

অ্যালিস বললে, "মাংস খেতে খেতেই তৈরি হয়ে পাতে পরিবেশন করা যাবে, এমন পুডিং? খুব তাড়াতাড়ি বানানো যায় তো?"

খুব আস্তে আস্তে, মাথা দোলাতে দোলাতে নাইট বললে, "সেই

পাতে বোধ হয় নয়। বোধ হয় কেন, সেই পাতে তো নয়ই।"

"তা হলে নিশ্চয়ই পরের দিন ?"

আগের মতোই বিড় বিড় করে নাইট বলতে লাগল, "না, পরের দিনও না। পরের দিন তো নয়ই।" বলতে বলতে নাইটের মাথাটা হেঁট হয়ে এল, গলার আওয়াজ আরো নিচু হয়ে গেল, "আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে, পুডিংটা শেষ অবধি তৈরিই হয় নি। আসলে, কোনোদিন হবেও না। কিন্তু, তবু বলব, এমন কায়দার পুডিং আর হয় না!"

দেখা গেল, এই পুডিং-এর ব্যাপারটা নিয়ে সাদা নাইটের মনে অনেক দুঃখ জমে আছে। তাই তাকে একটু খুশি করবার মতলবে খুব আগ্রহ দেখিয়ে অ্যালিস জানতে চাইলে "কী দিয়ে তৈরি করবার কথা ছিল।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললে, "আরম্ভ করতে হয় ব্লটিং পেপার দিয়ে।"

"কী জানি, বাবা! সে কি ভালো হত।"

এবার খুব উৎসাহ নিয়ে নাইট বললে, "শুধু ব্লটিং পেপারে অবশ্য ভালো হত না, কিন্তু পরে পরে তার সঙ্গে বারুদ, গালা, এই-সব মেশাতে মেশাতে কী খাসা জিনিস যে দাঁড়ায়, তোমার ধারণাই নেই।—আচ্ছা, এবার আমায় ফিরতে হবে।"

ততক্ষণে ওরা বনের শেষে পৌঁছে গেছে।

খব উৎকন্ঠা নিয়ে সাদা নাইট আবার বললে, "তোমার খুব মন খারাপ লাগছে, না? একটা ছড়া গেয়ে শোনাই বরং, চাঙ্গা লাগবে।"

আজ সারাদিন ধরে কবিতা আর গান শুনে শুনে এলে গেছে অ্যালিস। তাই ভয়ে ভয়ে জিগেস করলে, "খুব বড়ো নয় তো?"

নাইট বললে, "বড়ো। কিন্তু ভারি সুন্দর। যারাই শুনেছে, হয় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে, আর নাহয়—"

আচমকা কথার মাঝখানে থেমে গেল নাইট। অ্যালিস জিগেস করলে, "নাহয় কী?"

"নাহয়, চোখের জলে বুক ভাসায় নি, জানো? ছড়াটার একটা নাম আছে, তাকে বলে 'কৈ মাছের চোখ'।"

আগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করে অ্যালিস বললে, "ও! ছড়াটার নাম তা হলে 'কৈ মাছের চোখ'।"

কেমন যেন হয়ে গিয়ে নাইট বললে, "না, না, বুঝতে পারছ না। ছড়ার নামটাকে 'কৈ মাছের চোখ' বলা হয় বটে, আসলে ছড়াটার নাম

'থুত্থুড়ে বুড়ো'।"

অ্যালিস বললে, "বুঝেছি। আমার বলা উচিত ছিল, 'ছড়াটাকে বলে কৈ মাছের চোখ'।"

"না, না, তাও নয়! ছড়াটাকে আসলে বলে, 'যত মত, তত পথ'। ছড়াটার নাম হল 'থুত্থুড়ে বুড়ো'। কিন্তু লোকে বলে 'কৈ মাছের চোখ', আর, আসলে ছড়াটাকে বলা উচিত, 'যত মত, তত পথ', জানো?"

অ্যালিসের মাথা এবার একদম গুলিয়ে গেছে। "ছড়াটা আসলে তা হলে কী?"

নাইট বললে, "সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। ছড়াটা আসলে হল 'গেটের ওপর আসীন'। ছড়ার সুরটা আমার নিজের আবিষ্কার।"

এই কথা বলে সে ঘোড়া থামাল, তার পর লাগামটাকে আলতো করে ফেলে দিল ঘোড়াটার ঘাড়ে। তার পর হাতে তাল দিতে দিতে, বোকা-বোকা মুখে পরম তৃপ্তির একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে গান গাইতে লাগল।

আয়না-রাজ্যে ঘুরে ঘুরে অ্যালিস যত কিছু আজগুবি আর আশ্চর্য ঘটনা দেখেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে এই ছবিটি। অনেক অনেক দিনের পরেও চোখ বুজলেই অ্যালিসের মনের আয়নায় ভেসে উঠত সেই ছবি—সাদা নাইটের সেই আকাশ-নীল করুণ চোখ-দুটি, তার ঠোঁটের সেই মন-জুড়ানো হাসির রেখাটি—অস্তগামী সূর্যের কিরণে তার চুলের মাঝে মাঝে আলোর ঝিলিমিলি—আল্‌গা-হয়ে-ঝুলে-থাকা লাগামটাকে গলায় দুলিয়ে ঘোড়াটা ঘুরে বেড়াচ্ছে শান্ত-চরণে; পায়ের কাছ থেকে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে—পিছনে অন্ধকার বন—আর গাছে ঠেস দিয়ে, এক হাতে চোখের ওপর আলো বাঁচিয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে অ্যালিস দেখছে আর শুনছে—গানের করুণ সুর মৃদু হয়ে আসছে তার কানে—এ-সবই ছবির মতো মনে পড়ত তার।

পুরো গানটাই শুনেছিল অ্যালিস ধৈর্য ধরে, কিন্তু তার কান্না অবশ্য পায় নি।

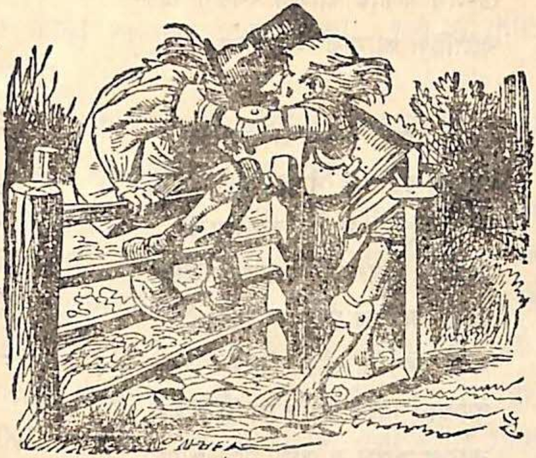
খুঁটিয়ে সব বলব আমি তোরে,
বলার বিশেষ নেইকো তেমন, তবু।
—দেখেছিলাম তেমাথাটার মোড়ে
গেটের ওপর আসীন মহাপ্রভু।

শুধিয়েছিলাম, 'কে তুমি গো বুড়ো ?
কী কাজ কর ?   কোথায় এবং কখন ?'
জবাবে যা বললে সে থুত্থুড়ো
শুনেও আমি শুনি নিকো তখন।

বললে বুড়ো, 'গমের ক্ষেতে গিয়ে
প্রজাপতি ধরি ভারে ভারে।
তাই দিয়ে সব কাটলেট বানিয়ে
বিক্রি করে ফিরি পথের ধারে।
বিক্রি করি তাদের কাছে, যারা
ঝড়ের দিনে সাগরে দেয় পাড়ি।
এই হল মোর রোজগারেরই ধারা,
তাতেই জোটে রুটি ও তরকারি।'

আমি তখন ভাবছি মনে মনে—
গোঁফটা নেব নীল রঙে রাঙিয়ে
এবং সেটা রাখব সঙ্গোপনে
বিরাট একটা পাখা আড়াল দিয়ে।
আপন মনে কেবল ভেবেই চলি,
কোনো কথা কানেই তো গেল না।
বুড়োর মাথায় গাঁট্টা মেরে বলি,
'কেমন করে দিন চলে, বল-না ?'

বললে বুড়ো, 'কৈ মাছেদের চোখ
শিকার করি, এবং আরো জানাই,
গভীর রাতে যখন চাপে রোখ,
সে-সব দিয়ে কোটের বোতাম বানাই।
এ-সব আমি বেচি নাকো মোটে
যতই দেখাও সোনারুপোর ঘটা ;
তবে যদি নয়া পয়সা জোটে,
বিক্রি করি এক পয়সায় নটা।



'কখনো-বা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
পাঁউরুটি আর মাখন জোগাড় করি।
কিম্বা আটাকাঠি দিয়ে দিয়ে
কাঁকড়া ধরে চুপড়িটাকে ভরি।
এমনিতরো নানানরকম করে
কোনো মতে দিন করি গুজরান।
আলাপ করে বুকটা গেল ভরে,
আপনি মশাই অতি মহাপ্রাণ!'

এবার বুড়োর কথাগুলো বেশ
কানে আমার গেছে পরিষ্কার,
কারণ তখন ভাবনা আমার শেষ,
হয়ে গেছে নতুন আবিষ্কার—
হাওড়ার পোল তালের রসে ফেলে
গরম আঁচে নিলে সেদ্ধ করে,
চিরদিনই থাকবে গো তেলতেলে
মরচে ধরে হবে না নড়্‌বড়ে।

বুড়োয় তখন উজাড় করে দিই
ধন্যবাদ, আর প্রভূত সম্মান:

এ-সব করার আসল কারণ এই—
বলেছিল আমায় 'মহাপ্রাণ।'

এবং এখন, যখন অসাবধানে
আঙুল ডোবাই গঁদের বাটিটাতে,
কিম্বা জুতো পরতে অন্যমনে
ডান পা ঢোকাই বাঁয়ের পাটিটাতে,
কিম্বা আমার বেখেয়ালে যখন
পায়ে কোনো ভারী জিনিস পড়ে
অঝোর ধারে কাঁদি আমি তখন,
কারণ তখন বুড়োয় মনে পড়ে।

সেই বুড়ো যার কণ্ঠ মৃদু, ধব্‌ধবে সব চুল,
মুখটা যেন কাকের মতন, হুবহু বিলকুল,
চোখদুটো যার আগুনপারা, নেইকো তাতে ভুল,
এবং কেবল এপাশ ওপাশ করছিল দুল্‌দুল্‌,
নিচু গলায় বিড় বিড়িয়ে বকছিল বেভ্‌ভুল,
—অনেক অনেক দিনের কথা, মনে আছে তবু,
সন্ধেবেলা গেটের ওপর আসীন মহাপ্রভু।

শেষের দিকটা গাইতে গাইতে নাইট লাগাম তুলে নিয়ে রাস্তার দিকে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিলে, তার পর যাবার আগে বললে, "বেশি পথ বাকি নেই আর। ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্টো খালটা পার হলেই—রানী। তবে, এখুনি যেয়ো না, আগে আমি চলে যাই।" অ্যালিস ততক্ষণে সেই পাহাড় আর খালটার দিকে চোখ ফিরিয়েছে। নাইট আবার বললে, "বেশিক্ষণ নেব না। একটু দাঁড়িয়ে যাও। ঐ বাঁকটার মুখ পর্যন্ত আমায় দেখতে পাবে, তার পরই তুমি হয়ে যাবে রানী— কিন্তু তার আগে আমাকে বিদায় দেবার জন্যে দাঁড়াবে তো? বেশি দেরি হবে না। ঐ মোড়ের মাথায় আমি যখন পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ব, আর আমায় দেখা যাবে না, তার আগে পর্যন্ত তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়বে। আমার ভালো লাগবে, জানো?"

"নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকব।" অ্যালিস বললে। "এতদূর আমার সঙ্গে এলে, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ—আর গান যে শোনালে, সেও খুব ভালো লাগল।"

"ভালো লাগলেই ভালো।" নাইটের স্বরে কেমন সন্দেহের আভাস। "ভেবেছিলুম শুনে খুব কাঁদবে কিন্তু তেমন কিছু কাঁদ নি।"

দুজনে হ্যাণ্ডশেক করলে, তার পর ধীরে ধীরে ঘোড়ায় চড়ে নাইট বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগল। আর অ্যালিস সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, 'কত আর দেরি হবে, বুড়ো এই পড়ল বলে!—এই, এই, এই পড়ল! আবার সেইরকম মাথা নিচু করে! যাই হোক, বেশ তাড়াতাড়ি সামলে-সুমলে উঠে পড়েছে দেখছি—ঘোড়ার গা থেকে এত-সব জিনিস ঝুলছে যে, যা হোক একটা-কিছু পাকড়াতে পারছে, সেইটুকুই সুবিধে—।' আপন মনে বকবক করতে লাগল অ্যালিস, আর নেহাত অলস ভঙ্গিতে ঘোড়াটা নাইটকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, আর নাইট বারে বারে খসে পড়তে লাগল ঘোড়ার পিঠ থেকে—একবার ডান পাশে, একবার বাঁ পাশে। এমনি করে বার পাঁচেক ওঠা-পড়া করার পর নাইট গিয়ে পৌছাল সেই বাঁকের মুখে। মুখ ফিরিয়ে তাকাল নাইত, রুমাল নাড়ল অ্যালিস, বাঁকের মুখে চোখের আড়াল হয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

'আশা করি বুড়ো খুশি হয়েছে।' ভাবতে ভাবতে ঢালু রাস্তায় নামতে লাগল অ্যালিস। 'আর একটামাত্র খাল পার হলেই, ব্যাস্! রানী! আঃ, ভাবতেই কী আরাম!' কয়েক পা এগোতেই খাল। 'যাক বাবা, সামনেই আটের ঘর! শেষপর্যন্ত এলম তা হলে!' তার পরেই এক লাফ।

সবুজ ঘাসের নরম জমি, এদিকে-ওদিকে কয়েকটা ফুলগাছের ঝোপ। "আঃ, ভারি আনন্দ লাগছে এখানে এসে! আরে, আমার মাথায় এটা আবার কী?" খুব আশ্চর্য হয়ে মাথায় হাত দিল অ্যালিস। ভারী মতন কী একটা বেশ শক্ত হয়ে মাথার চার দিকে চেপে বসে আছে।

'কিন্তু, জানলুম না শুনলুম না, আপনা-আপনি এটা মাথায় চড়ে

বসল কী করে?' ভাবতে ভাবতে দুহাতে মাথা থেকে তুলে নিয়ে জিনিসটাকে কোলের ওপর রাখল সে।

জিনিসটা একটা সোনার মুকুট।



নবম পরিচ্ছেদ

রানী অ্যালিস

"আঃ চমৎকার! ভাবতেই পারি নি এত শিগ্‌গির রানী হওয়া যাবে!" বকবক করতে লাগল অ্যালিস, আর যথারীতি নিজেই নিজেকে ধমকাতে লাগল। "কিন্তু, মহারানী, একটা কথা তোমায় বলা দরকার। এভাবে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা তোমার শোভা পায় না! রানীদের বেশ সম্ভ্রান্ত হয়ে থাকতে হয়।"

উঠে পড়ে চলতে লাগল অ্যালিস। প্রথম প্রথম বেশ একটু আড়ষ্ট হয়ে হাঁটল—কেবলই ভয় করছে, মাথা থেকে মুকুটটা খসে না পড়ে, অভ্যাস তো নেই। মনে মনে ভেবে নিলে অবশ্য যে, 'সত্যিই যদি রানী হয়ে গিয়ে থাকি, তা হলে মুকুট পরাটাও নিশ্চয়ই দুরস্ত হয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে।' আবার বসল সে।

হঠাৎ টের পেল লাল রানী আর সাদা রানী দুজনে তার দুপাশে বসে। অবাক হল না, কারণ অদ্ভুত ব্যাপার দেখে দেখে এ-সব তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। একবার ভাবলে, ওদের জিগেস করে, কখন কেমন করে এল। তার পর মনে হল, সেটা ঠিক হবে না বোধ হয়, অভদ্রতা হয়ে যাবে। তবে, একটা কথা জিগেস করা যেতে পারে যে, খেলা শেষ হয়ে গেছে কি না।

"দয়া করে বলবেন—" লাল রানীর দিকে চেয়ে সবে কথাটা শুরু

করেছে অ্যালিস, অমনি রুক্ষ স্বরে জবাব এল, "আগ বাড়িয়ে কথা বোলো না!"

অ্যালিসও ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, "কিন্তু সবাই যদি সেই নিয়ম মেনে চলে, আর অপর পক্ষ কথা না-বললে যদি মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়, তা হলে তো দেখা যাবে কোনোদিনই কারো সঙ্গে কথা বলা হবে না। কাজেই—"

"কোনো মানে হয় না।" গর্জে উঠলেন রানী। "আরে, খুকি, এটা বুঝতে পারছ না যে—" বলতে বলতে ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল তাঁর; নিবিষ্ট মনে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তার পর বললেন, "তখন যে বিড়্‌বিড়্‌ করে বলছিলে, 'সত্যিই যদি রানী হয়ে গিয়ে থাকি' —তার মানে কী? কোন অধিকারে ভেবে নিলে যে, রানী হয়ে গেছ? যথাযথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত কেউ রানী হয় না, জানো না? আর, সে পরীক্ষা যত শিগ্‌গির শুরু করা যায়, ততই মঙ্গল।"

করুণ গলায় আবেদন জানালে অ্যালিস, "আমি তো শুধু 'যদি' বলেছিলুম।"

তাই শুনে দুই রানী পরস্পরের দিকে তাকালেন। হঠাৎ লাল রানী বলে উঠলেন "মেয়েটা বলছে, ও শুধু 'যদি' বলেছিল।"

হাতে হাতে পাকাতে পাকাতে সাদা রানী বলে উঠলেন, "মোটেই শুধু 'যদি' বলে নি। আরো অনেক কিছু বলেছে ও। অনেক, অনেক কিছু!"

লাল রানী বললেন, "সত্যিই, অনেক কিছু বলেছ তুমি, বাছা, সব সময়ে সত্যি কথা বলবে—বলবার আগে ভেবে বলবে—বলবার পর, যা বলেছ লিখে রাখবে।"

"আমি ঠিক তা বলতে চাই নি। মানে শুধুই যে 'যদি' বলেছি, তা নয়—" অ্যালিসের কথার মাঝখানে তড়পে উঠলেন লাল রানী, "এই-জন্যেই তো আরো রাগ ধরে! বলতে চাও নি বা কেন? একটা ছোট্টো মেয়ে তুমি, মানে হয় না এমন কথা বলবেই-বা কেন? একটা ছোট্টো খুকি, তার কোনো মানে থাকবে না? একটা ঠাট্টা-ইয়ার্কিরও মানে থাকে। খুকি নিশ্চয়ই ঠাট্টা-ইয়ার্কির চেয়েও খেলো জিনিস নয়? কী? অস্বীকার করতে পারো? পারো না। দুহাত দিয়ে চেষ্টা করলেও পারো না!"

"অস্বীকার করলেও, হাত দিয়ে করতে যাব কেন? কোনো জিনিস অস্বীকার করতে হলে, অন্যভাবে করি, হাত দিয়ে নয়।"

"নয়ই তো। হাত দিয়ে কেউই অস্বীকার করে না, কেউই না। আমি কি বলেছি যে, তুমি কর? আমি বলেছি, হাত দিয়ে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও, পারবে না।"

সাদা রানী এইখানে বলে উঠলেন, "আসলে মেয়েটার খেয়াল হয়েছে, একটা কিছু অস্বীকার করে। কিন্তু কী যে অস্বীকার করবে, তাই বুঝতে পারছে না। সেইজন্যে অমন করছে।"

"খুব নোংরা আর কদর্য মনোভাব।" লাল রানীর মন্তব্য শোনা গেল। তার পর অনেকক্ষণ সব চুপচাপ, অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

নীরবতা ভাঙলেন লাল রানীই। সাদা রানীর দিকে চেয়ে বললেন, "অ্যালিসের ডিনার পার্টিতে আজ বিকেলে তোমায় নেমন্তন্ন করলুম।"

সাদা রানী মৃদু হেসে বললেন, "আমিও নেমন্তন্ন করলুম তোমায়।"

অ্যালিস তো অবাক! বললে, "জানতুম না তো যে, আমি পার্টি দিচ্ছি। যাই হোক, তাই যদি হয়, তা হলে নেমন্তন্ন তো করব আমি!"

লাল রানী বলে উঠলেন, "সে সুযোগ তো অনেকক্ষণ যাবতই দেওয়া হল তোমায়। কিন্তু দেখলুম, সভ্যতা-ভব্যতা বা সামাজিকতা কিস্যুই শেখ নি। সহবৎ সম্বন্ধে লেখাপড়া কর নি একদম।"

"সহবৎ লিখে পড়ে শিখতে হয় না! লেখাপড়া করে তো লোকে অঙ্ক-টঙ্ক শেখে।"

সাদা রানী বলে উঠলেন এবার, যোগ দিতে পারো? বল তো, এক আর এক আর এক আর এক আর এক আর এক আর এক আর এক আর এক আর একে কত হয়?"

"বলতে পারলুম না। খেই হারিয়ে গেল।"

লাল রানী বলে উঠলেন, "দেখলে, যোগ করতে পারে না। বিয়োগ পারো? আট থেকে নয় বিয়োগ কর।"

"আট থেকে নয় কী করে বিয়োগ করব? বরং যদি বলেন—"

সাদা রানী বলে উঠলেন, "বিয়োগও জানে না মেয়েটা। ভাগ পারো? বেশ, ছুরি দিয়ে একটা পাঁউরুটিকে ভাগ কর। কত উত্তর?"

"বোধ হয়—" বলে সবে কথা বলতে শুরু করেছে অ্যালিস, কিন্তু তাকে শেষ করতে না দিয়ে লাল রানীই বলে দিলেন উত্তরটা, "রুটি আর

মাখন। আচ্ছা, আর-একটা বিয়োগ দিচ্ছি চেষ্টা করে দেখ। কুকুর থেকে হাড় বিয়োগ দাও। কী রইল?"

ভেবে নিলে অ্যালিস। "হাড়টা তো থাকবেই না, কারণ ওটা তো নিয়ে নেওয়াই হয়েছে। কুকুরটাও নিজের জায়গায় থাকবে না, হাড়ের শোকে কামড়াতে ছুটে আসবে আমায়। আমিও কি আর যথাস্থানে থাকব? পালাব না?"

"তার মানে, বলছ, কিছুই থাকবে না?" লাল রানী জেরা করলেন।

"আমার তো মনে হয় সেইটাই হল এর উত্তর।"

লাল রানী বললেন, "আবার সেই ভুল। কিছুই থাকবে না কেন? কুকুরের মেজাজটা বাকি থাকবে।"

"আমি তো মাথামুণ্ডু কিছু—"

"বুঝতে পারছ না? এই দেখ, হাড়টা কেড়ে নেওয়ায় কুকুরের মেজাজটা বিগড়ে যাবে তো?"

"তা বোধ হয় যাবে।" ক্ষীণ স্বরে অ্যালিস জবাব দিলে।

"তা হলে কুকুরটা চলে গেলেও, তার মেজাজটা পড়ে থাকবে না? বিগড়েই তো গেছে, কাজেই পড়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? বেগড়ানো জিনিস কি আর নড়া-চড়া করতে পারে?" রানীর কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস।



এবার দুজন রানী সমস্বরে বলে উঠলেন, “অঙ্ক-টঙ্ক একেবারেই আসে না মেয়েটার।”

এবার আর অ্যালিসের পক্ষে ধৈর্য ধরা মুশকিল হল। সাদা রানীর দিকে ফিরে ঝাঁঝিয়ে উঠল, “আপনি অঙ্ক কষতে পারেন?”

সাদা রানী চোখ বন্ধ করে বার দুয়েক ঢোক গিললেন। বললেন, “যোগ করতে পারি। একটু সময় লাগবে অবশ্য। বিয়োগ একেবারেই আসে না, সময় দিলেও নয়।”

লাল রানী হঠাৎ অ্যালিসকে জিগেস করে বসলেন, “এ. বি. সি. ডি. জানো?”

“হাজার বার জানি।” অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে।

“আমিও।” সাদা রানী গর্বভরে বলে উঠলেন। “মাঝে মাঝে আমরা দুজনে একসঙ্গে এ. বি. সি. ডি. বলি, জানো? তা ছাড়া, এক অক্ষরের শব্দ আমি খুব ভালো পড়তে পারি। আশ্চর্য না? দুঃক্ষু কোরো না, আস্তে আস্তে তুমিও শিখবে।”

লাল রানী আবার মুখ খুললেন, “দরকারি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো? কী করে রুটি তৈরি হয় বল তো?”

সাগ্রহে বলে উঠল অ্যালিস, “খুব বলতে পারি। প্রথমে খানিকটা ময়দা নিতে হয়—”

“কোথা থেকে ময়দা তুলবে? ফুল বাগান থেকে, না ঝোপ-ঝাড় থেকে?”

“ময়দা কি ফুল, যে তুলব? ময়দা পেতে হলে তো গম ভাঙতে হয়!”

“ভাঙলে সব জিনিসই বরবাদ হয়ে যায়; তোমার ময়দাও বরবাদ!”

“ওর মাথায় একটু হাওয়া কর তো।” সাদা রানী খুব উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠলেন। “ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে গেছে মেয়েটার।”

দুজনে গোছা গোছা গাছের পাতা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন অ্যালিসকে। চুল-টুল উড়ে একাক্কার। শেষপর্যন্ত অ্যালিস খুব করে অনুনয় করতে থামলেন তাঁরা।

লাল রানী বললেন, “এতক্ষণে ধাতে এসেছে বেচারি। বল তো, ফিড্‌ল-ডি-ডি কথাটার ফরাসী প্রতিশব্দ কী?”

“ফিড্‌ল-ডি-ডি কথাটা ইংরেজিই নয়।” বললে অ্যালিস।

"কে বলেছে ইংরেজি শব্দ ?" বললেন লাল রানী।

এবার অ্যালিসের মাথায় একটা মতলব এল। বললে, "ফিড্‌ল-ডি-ডি কথাটা আসলে কোন ভাষার শব্দ তা যদি বলতে পারেন, তা হলে আমিও বলব কথাটার ফরাসী প্রতিশব্দ কী।"

লাল রানী বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। নীরস গলায় শুধু বললেন, "রানীরা ওভাবে কখনো কোনো ব্যাপারে দরাদরি করে না। করতে নেই।"

'সেইসঙ্গে রানীদের পক্ষে প্রশ্ন করাও বারণ হওয়া উচিত ছিল।' এটা অ্যালিস বলে নি, মনে মনে ভেবেছিল।

সাদা রানী হঠাৎ বলে উঠলেন, "ঝগড়া-ঝাঁটি করার দরকার নেই। বল তো, বিদ্যুৎ চমকায় কেন ?"

"বিদ্যুৎ-এর কারণ হল বাজ—না, না, আসলে ঠিক উলটোটা, মানে—"

অ্যালিসের কথা শেষ হবার আগেই লাল রানী বলে উঠলেন, "আর হবে না, আর হবে না, সময় পার হয়ে গেছে। একবার যা বলেছ, তা আর ফেরানো যায় না। ভুল হোক, ঠিক হোক, তার ফল ভোগ করতেই হবে।"

মাটির দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে সাদা রানী বেশ একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, "কথায় কথায় মনে পড়ে গেল, গত মঙ্গলবার এখানে সে কী ঝড় আর বাজ পড়ার ঘটা ! গত মঙ্গলবার মানে, শেষ যে-কটা মঙ্গলবার গেল আর কি !"

অ্যালিস অবাক হল। বললে, "আমাদের দেশে কিন্তু একটা একটা বার এক-এক দিন করে হয়।"

লাল রানী বললেন, "খুব বিচ্ছিরি ব্যবস্থা। এখানে আমাদের দিন আর রাত একসঙ্গে দু-তিনটে করে আসে। শীতকালে মাঝে মাঝে একসঙ্গে গোটা পাঁচেক রাত্তিরও কাটিয়ে দিই—তাতে গরম বেশি পাই, বুঝলে ?"

"তার মানে, একটা রাত্তিরের চেয়ে পাঁচটা রাত্তির বেশি গরম ?" অবাক হয়ে জিগেস করলে অ্যালিস।

"নিশ্চয়ই। পাঁচগুণ গরম।"

"কিন্তু, নিয়ম অনুযায়ী তো পাঁচগুণ বেশি ঠাণ্ডা—"

"ঠিক তাই।" লাল রানী চেঁচিয়ে উঠলেন, "পাঁচগুণ গরম আর পাঁচগুণ ঠাণ্ডা—যেমন ধরো, তোমার চেয়ে আমি পাঁচগুণ বড়োলোক আর পাঁচগুণ চালাক!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দিল অ্যালিস। মনে মনে ভাবলে, 'এক্কেবারে ধাঁধা। জবাব নেই এমন ধাঁধা!'

"হাম্‌টি-ডাম্‌টিও টের পেয়েছিল সেটা। "সাদা রানী এবার যেন আপন মনেই বিড়্‌বিড়্‌ করতে লাগলেন, "হাতে একটা কর্কস্ক্রু নিয়ে ব্যাটা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার দোরগোড়ায়।"

"কী দরকারে এসেছিল?" লাল রানী শুধোলেন।

সাদা রানী বললেন, "ভেতরে আসতে চাইলে। বললে, একটা হিপোপোটেমাস খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, আমার বাড়িতে কোনো হিপোপোটেমাস ছিল না—মানে, সেদিন সকালে অন্তত ছিল না।"

আশ্চর্য হয়ে অ্যালিস জিগেস করে ফেললে, "এমনিতে কখনো থাকে নাকি?"

"বেস্পতিবার বেস্পতিবার থাকে।" গম্ভীরভাবে বললেন রানী। একটু থেমে আবার শুরু করলেন, "ওঃ! সে কী ঝড় আর বাজের ঘটা সেদিন! ছাদের খানিকটা গেল উড়ে। আর সেই ফাঁকে একতাল বাজ এসে ঢুকল ঘরের ভেতর। তার পর ঘরময় গড়িয়ে বেড়াতে লাগল গড়্‌গড়্‌ করে। টেবিল-চেয়ার সব ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে লাগল —এমন ভয় খেয়ে গেলুম যে, নিজের নামটাই আর মনে এল না!"

অ্যালিস মনে মনে ভাবলে, 'ওরকম বিপদের সময়ে কেউ নিজের নামের কথা ভাবে না কি? আমি হলে তো কখনই নিজের নাম মনে করার চেষ্টা করতুম না। নাম নিয়ে কি তখন ধুয়ে খাব?' মনে মনেই ভাবলে, মুখ ফুটে বললে না।

অ্যালিসের দিকে চেয়ে একবার লাল রানী বললেন, "ওকে ক্ষমা করে দাও, ভাই!" সাদা রানীর একটা হাত টেনে নিয়ে তাতে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে অ্যালিসের দিকে চেয়ে আবার বললেন, "মনটা ওর ভালো কিন্তু কথা বললেই আজে-বাজে বকে!"

কিছু হয়তো বলা উচিত ছিল সাদা রানীকে, কিন্তু কী বলবে অ্যালিসের মাথায় এল না।

লাল রানী তখনো বলে চলেছেন, "আসলে ছেলেবেলা থেকেই ঠিক-

মতো মানুষ হয় নি আর কি। তবে, আশ্চর্য ঠাণ্ডা ওর মেজাজ! মাথায় দুবার চাপড়াও, দেখবে কত খুশি হবে!"

অ্যালিসের কিন্তু সাহস হল না।

সাদা রানী এতক্ষণে মুখ খুললেন। লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বড্ডো ঘুম পাচ্ছে।" তার পর অ্যালিসের কাঁধে নিজের মাথাটা এলিয়ে দিলেন।

লাল রানী বললেন, "বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বেচারি! মাথায় হাত বুলিয়ে দাও--তোমার রাতে শোবার নাইটক্যাপটা ওর মাথায় পরিয়ে দাও— একটা মিষ্টি ঘুমপাড়ানি গান গুন্‌গুন্ কর ওর কানের কাছে।"

সাদা রানীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অ্যালিস বললে, "নাইট-ক্যাপ কোথায় আমার? তা ছাড়া, কোনো মিষ্টি ঘুমপাড়ানি গানও জানা নেই।"

"তা হলে, আমাকেই গাইতে হয় দেখছি।" তৈরি হয়ে নিলেন লাল রানী, তার পর গাইলেন:

'ঘুমপাড়ানি মাসি ঘুমোয় অ্যালিস খুকির কোলে!
ঘুমিয়ে নে না যতক্ষণ না খাবার কথা তোলে।
খাবার পরে জুটব সবাই নাচের আসর যেথা—
লাল, সাদা আর অ্যালিস-রানী, সবাই যাব সেথা।'

গান শেষ করে অ্যালিসের খালি কাঁধটার ওপর মাথা কাত করে লাল রানী বললেন, "কথাগুলো জানা হয়ে গেল তো? এবার আমার কানে গুন্‌গুন্ করে শোনাও। আমারও ঘুম আসছে।"

পরক্ষণেই দু রানীরই নাক ডাকতে লাগল।

বারে বারেই রানীদের গোল গোল মাথাদুটো অ্যালিসের কাঁধ থেকে খসে কোলের ওপর এসে পড়তে লাগল ধুপ্ করে। অ্যালিস ভেবেই পেল না কী করা যায়। ভাবতে লাগল, 'কী করি? দু-দুজন ঘুমন্ত রানীকে সামলানো কি সহজ ব্যাপার? আগে কি কারো কপালে জুটেছে এমন কঠিন কাজ? না, কাউকে এমন দায়ে পড়তে হয় নি আগে। নিশ্চয়ই নয়, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এমন হয় নি। আমি জানি, কক্ষনো হয় নি, কারণ ইতিহাসে দেখেছি, একসঙ্গে কক্ষনো দুজন রানী ছিল না।—এই! ধুম্‌সোগুলো। ওঠো না!'



উত্তরে নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

সে শব্দ কিন্তু ক্রমেই বেশ জোরালো হতে লাগল, আর বেশ সুরেলা গানের মতো হয়ে উঠতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে তার মধ্যে থেকে যেন দু-একটা শব্দও আবিষ্কার করতে পারলে অ্যালিস। কান খাড়া করে শুনতে লাগল সে, সমস্ত মন দিয়ে শোনবার আর বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। এত মশগুল হয়ে গেল যে, অমন হেঁড়ে মাথাদুটো যে কখন তার কোল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, খেয়ালই করল না সে।

এখন, বিরাট একটা খিলেন-ওলা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যালিস। খিলেনের ওপর বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা 'রানী অ্যালিস।' খিলেনের দুপাশে দুটো ঘণ্টা বাজাবার হাতল। একটায় লেখা 'চাকরদের জন্য', অন্যটায় 'অতিথিদের জন্য'।

অ্যালিস ভাবতে লাগল—'গানটা শেষ হোক, তার পর ঘণ্টা বাজাব। কিন্তু, কোন ঘণ্টাটা ? আমি তো চাকর নই, আবার অতিথিও তো নই। দেখ দিকিনি। 'রানীর জন্য' লেখা একটা ঘণ্টা থাকা উচিত ছিল তো!'

ভাবছে, আর ঠিক সেই সময়ে দরজার পাল্লাদুটো সামান্য একটু ফাঁক হতেই, তার মধ্যে থেকে লম্বা ঠোঁটওলা একটা মাথা বেরিয়ে এসে বললে, "পরের হপ্তার পরের হপ্তার আগে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না!" দমাস্ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

অনেকক্ষণ ধরে বৃথাই দরজায় ধাক্কা মারলে অ্যালিস, আর ঘণ্টা

বাজালে। শেষপর্যন্ত একটা কোলা ব্যাঙ থপ্‌থপিয়ে এগিয়ে এল তার কাছে—এতক্ষণ কাছেই একটা গাছের তলায় বসে ছিল সে! ঝক্‌ঝকে হলুদ রঙের পোশাক তার পরনে, পায়ে বিরাট একজোড়া বুট।

ভারি ঘড়্‌ঘড়ে গলায় ব্যাঙ-বাবাজি বললেন, "ব্যাপারটা কী?"



অ্যালিসের তখন মেজাজ খুব খারাপ। ঘুরে দাঁড়িয়ে চটে-মটে বললে, "চাকর-টাকর গেল কোথায়? একটা জবাব দেবার কেউ নেই?"

"কোন দরজা?" নির্বিকার গলায় বললেন ব্যাঙ-বাবাজি।

ঐরকম ঘুম-জড়ানো টানা-টানা কথার ঢঙ শুনে অ্যালিসের সর্বাঙ্গ তখন জ্বলে উঠেছে। "এই দরজা, আবার কোন দরজা!"

ড্যাবা ড্যাবা বোকা চোখে দরজাটার দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইলেন ব্যাঙ-বাবাজি। তার পর কাছে গিয়ে দরজার গায়ে আঙুল ঘষতে

লাগলেন—যেন দেখছেন রঙটা কাঁচা কি না। তার পর অ্যালিসের দিকে তাকালেন।

"কিসের জবাব দেবে? কেউ কোনো প্রশ্ন করেছে কি?"

"কী বলছেন, ঠিক ঢুকছে না মাথায়।" জবাব দিল অ্যালিস।

"বাংলাতেই তো কথা বলছি, তাই-না?" বলে চললেন ব্যাঙ-বাবাজি তাঁর হেঁড়ে গলায়। "না কি, তুমি কালা? প্রশ্নটা কী ছিল যে জবাব দেবে?"

"প্রশ্ন আবার কী? আমি দরজায় ধাক্কা মারছিলুম।"

"খুব অন্যায়—খুবই অন্যায়—" বিড়্‌বিড়্‌ করতে লাগলেন ব্যাঙ-বাবাজি। "খুবই বিরক্ত হয় ওরা তাতে, মানে দরজারা।" বলেই এগিয়ে গিয়ে গোদা পায়ে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি কষালেন তিনি দরজার গায়ে। তার পর হাঁফাতে হাঁফাতে গাছের তলায় ফিরে যেতে যেতে বললেন, "ছেড়ে দাও, একা থাকতে দাও ওকে। বিরক্ত কোরো না। দেখবে ও-ও বিরক্ত করবে না তোমায়।"

সেই মুহূর্তে হাট হয়ে দরজাটা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠের সুর:

'আয়নার দুনিয়ায় অ্যালিস যে বলেছিল হেঁকে—
"হাতে মোর রাজদণ্ড, মুকুট রয়েছে মাথা ঢেকে।
খেতে এসো, আয়নার যে যেখানে আছ সব্বাই,
লাল রানী, সাদা রানী, আর আমি, পাশাপাশি এসো, বসে যাই।"

এবার বহু কণ্ঠে কোরাস শোনা গেল:

'গেলাসেতে জল ঢাল, কিছু যেন হয় না অমিল,
ভুষি আর বোতামেতে ভরে দাও খাবার টেবিল;
কফিতে বেড়াল দাও, চায়ে নেংটি দাও গোটা চার,
মহারানী অ্যালিসকে স্বাগতম নব্বইবার।'

এবার বেশ খানিকটা হৈ হৈ শোনা গেল। অনেক লোক আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল যেন। সেই সরু গলায় আবার শোনা গেল:

' "আয়নার যত প্রাণী", রানী বলে, "এসো কাছাকাছি।
দেখ মোরে, শোনো কথা; তোমাদের কী সৌভাগ্য আজি!

একসাথে খানা খাওয়া, বরাতের জোর আছে, ভাই।
লাল রানী, সাদা রানী, আর আমি, পাশাপাশি এসো, বসে যাই!"

তার পর আবার কোরাস :

'গেলাসেতে জল ঢাল, কিছু যেন হয় না অমিল,
ভুষি আর বোতামেতে ভরে দাও খাবার টেবিল ;
কফিতে বেড়াল দাও, চায়ে নেংটি দাও গোটা চার,
মহারানী অ্যালিসকে স্বাগতম আটশো দশ বার !'

'আটশো দশ বার। ওরে ব্বাবা! সে তো কোনোদিনই শেষ হবে না! তার চেয়ে এখুনিই ঢুকে পড়ি—' এই ভেবে অ্যালিস সোজা ঢুকে পড়ল ভিতরে, আর ঢোকবামাত্র সব চুপচাপ।

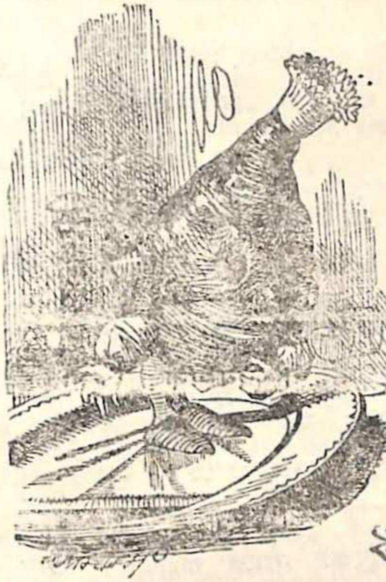
বিরাট একটা হলঘর। লম্বা টেবিল। তাকিয়ে দেখল অ্যালিস, জন পঞ্চাশ নিমন্ত্রিত বসে—হরেকরকম অতিথি : পশু, পাখি, এমন-কি, কয়েকটা ফুলও আছে। "যাক বাবা, নেমন্তন্ন না করতেই যে এসেছে, খুব ভাগ্যি আমার! যা দেখছি, বেছে বেছে এদের নেমন্তন্ন করার মতো বুদ্ধি আমার হত না!"

টেবিলের মাথার দিকে তিনটি চেয়ার। দুটি ইতিমধ্যেই লাল আর সাদা রানী দখল করে বসেছেন, মাঝেরটা খালি। তাতেই গিয়ে চুপচাপ বসল অ্যালিস। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, ভারি অস্বস্তি লাগল তার। কেউ কথা কইলে ভালো হত।

শেষপর্যন্ত লাল রানীই কথা কইলেন। "স্যুপ্ আর মাছ খাওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে, তোমার বরাতে নেই।" তার পর হাঁকলেন, "ঠ্যাং নিয়ে এসো এবার!" পরিচারক সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার একটা গোটা ঠ্যাং এনে বসিয়ে দিলে অ্যালিসের সামনে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যালিসেরই সেটা টুকরো করে ভাগ করে দিয়া উচিত। কিন্তু অত বড়ো একটা ঠ্যাং কায়দা করে কাটা ওর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

লাল রানী বলে উঠলেন, "একটু লজ্জা হচ্ছে, বুঝতে পারছি। পরিচয় নেই তো। তা বেশ, ঠ্যাং-মশাইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয়টা আমিই করিয়ে দিই নাহয়। অ্যালিস—মাটন ; মাটন—অ্যালিস।" ভেড়ার ঠ্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের ওপর খাড়া হয়ে উঠে সামনে ঝুঁকে

অভিবাদন জানাল অ্যালিসকে। অ্যালিসও তাই করলে। ভয় পাওয়া উচিত, না হাসা উচিত, ঠাহর করতে পারল না সে।



ছুরি বাগিয়ে রানীদের দিকে চেয়ে বললে, "আপনাদের এক-এক টুকরো দিই?"

লাল রানী বেশ মেজাজেই বলে উঠলেন, "খবরদার না! যার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় তাকে মোটেও কাটতে নেই। তার পর পরিচারকের দিকে চেয়ে বললেন, "প্লেটটা নিয়ে যাও!"

আদেশ শিরোধার্য করে পরিচারক এবার প্লাম-কেক আনলে একটা। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিস বলে উঠল, "দয়া করে পুডিং-এর সঙ্গে পরিচয়টা আর করিয়ে দেবেন না, তা হলে আর খাওয়াই হবে না আমার।—একটু দিই আপনাকে?"

কিন্তু লাল রানী ততক্ষণে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করেছেন, "পুডিং—অ্যালিস; অ্যালিস—পুডিং। পুডিংটা নিয়ে যাও!"

পরিচারক এ আদেশও পালন করল নির্বিবাদে।

অ্যালিস বুঝতে পারলে না, একা লাল রানীই-বা সব হুকুম করবে কেন। পরখ করে দেখবার জন্যে সে হাঁকলে, "ওয়েটার! পুডিংটা

ফেরত নিয়ে এসো !" বলতেই ম্যাজিকের মতো টেবিলের ওপর পুডিং এসে হাজির। প্রকাণ্ড পুডিং। দেখে সত্যিই একটু থতিয়ে গেল সে। যাই হোক, সংকোচ ঝেড়ে ফেলে এক টুকরো কেটে ফেললে, তার পর লাল রানীকে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে পুডিংটা বলে উঠল, "কী বেতমীজ ! বলি, আমি যদি তোমার গা থেকে খানিকটা চাকলা কেটে নিতুম, কেমন লাগত বল তো !"

কোনো কথা বলতে পারলে না অ্যালিস।

"উত্তর দাও !" বললেন লাল রানী। "সব কথা একা পুডিং-ই বলবে নাকি ?"

ভয়ে ভয়ে অ্যালিস বললে, "দেখুন, আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আজ সারাটা দিন কেবল ছড়া আর কবিতা শুনতে হয়েছে আমায়। আর, কী বলব, সব কবিতাই মাছ সম্বন্ধে—মানে সব কবিতাতেই মাছের কথা আছে। বলতে পারেন এখানে সবাই মাছ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে কেন ?"

কথাটা লাল রানীকেই বললে অ্যালিস। আর তাই শুনে লাল রানী অ্যালিসের কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, "মাছের কথাই যদি তুললে, মহামান্যা সাদা রানী একটা চমৎকার ধাঁধা জানেন—সবটা কবিতায়—বলতে বলব ?"

অ্যালিসের অন্য কানে সঙ্গে সঙ্গে সাদা রানীর ফিস্‌ফিসানি শোনা গেল। পায়রার মতো বকুম বকুম করে তিনি বললেন, "মহামান্যা লাল রানী যে কথাটা পাড়লেন, সেটা তাঁর অসীম করুণা। কবিতাটা শুনতে ভারি মজার। বলি ?"

কী আর করে ? সবিনয়ে অ্যালিস বললে, "বলুন।"

আহ্লাদে থল্ থল্ করে হেসে উঠলেন সাদা রানী। আদর করে অ্যালিসের গালে টোকা মেরে শুরু করলেন :

'প্রথমেতে মাছটা ধরা চাই।'
সোজা এ কাজ ; কচি খোকাও পারবে অবহেলে।
'সে মাছ এবার কিনতে হবে ভাই।'
সেটাও সোজা ; খুচরো কয়েক নয়া পয়সায় মেলে।

'এবার সে মাছ রাঁধো আচ্ছা করে!'
খুবই সোজা, কয়েক মিনিট লাগবে বড়ো জোর।
'এবার সেটা রাখ থালার 'পরে!'
আরো সোজা, বাড়াই আছে থালারই ওপর।

'আনো এবার! দেখব আমি চেখে।'
টেবিলেতে রাখব থালা, এমন কী আর শক্ত।
'খুলে ফেল, রাখছ কেন ঢেকে?'
শক্ত বেজায়, পারছি নাকো, হিম হয়ে যায় রক্ত।

কারণ, ঢাকা বসেই গেছে সেঁটে—
থালার ওপর আটকে গেছে, হচ্ছে না উৎপাটন
কোনটা সহজ? বল বুদ্ধি এঁটে—
ঢাকা খোলা, না কি ধাঁধার রহস্য উদ্‌ঘাটন?'

লাল রানী বললেন, "সময় নাও, নিয়ে উত্তর বল! ততক্ষণে আমরা তোমার স্বাস্থ্য কামনায় পান করি—রানী অ্যালিসের স্বাস্থ্য!" তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন লাল রানী, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই গেলাস থেকে ঢক্‌ঢক্ করে খেতে লাগল। সবাই অবশ্য ঢক্‌ঢক্ করে নয়, কেউ কেউ গেলাসটা নিজের মাথার ওপর উপুড় করে চাপিয়ে রাখলে। গড়িয়ে গড়িয়ে যা পড়তে লাগল গাল বেয়ে, তাই চেটে চেটে খেতে লাগল! কেউ কেউ গেলাসের ধার দিয়েও গেল না। শরবতের জারটা ফেলে দিলে টেবিলের ওপর, টেবিল ভেসে গেল, তখন ধার বেয়ে যেটুকু টপ্ টপ্ করে ঝরতে লাগল, তাই জিব দিয়ে শুষে নিলে। ক্যাঙারুর মতো দেখতে তিনটে জীব আবার মাটন রোস্টের প্লেটের ওপর গাদাগাদি করে বসে সপ্‌সপ্ করে ঝোল চাটতে লাগল।

অ্যালিসের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে লাল রানী বললেন, "বেশ মিষ্টি করে একটা বক্তৃতা দিয়ে ওদের ধন্যবাদ জানানো উচিত তোমার।"

একটু ভয় পেলেও, লাল রানীর নির্দেশ মেনে উঠে দাঁড়াল অ্যালিস। সাদা রানী এরই মধ্যে ওর কানে কানে বললেন, "ভয় নেই, আমরা সাহায্য করব তোমায়।"

"ধন্যবাদ, তবে আমি নিজেই সামলাতে পারব।"

"না, না, বুঝছ না! তোমাকে সবাইকার সামনে তুলে ধরাই তো আমাদের কাজ!"

উঠল অ্যালিস। কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু খাড়া হয়ে দাঁড়ানোই দুর্ঘট। কারণ সত্যি সত্যিই তাকে 'তুলে' ধরবার চেষ্টায় দুই রানী দুপাশ থেকে এমন ঠেলা মারতে লাগলেন তাকে যে, প্রায় মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠবার অবস্থা তার। বলতে শুরু করেছে, "আজ আমি এই কথাটাই আপনাদের জানাতে উঠেছি—" সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই মাটি ছেড়ে বেশ খানিকটা শূন্যে উঠে গেছে সে। কোনোরকমে টেবিলের কানাটা ধরে মাটিতে পা রাখতে পারল ফের।

দুহাতে অ্যালিসের চুলের মুঠি বাগিয়ে ধরে সাদা রানী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "সামাল! সামাল! যাচ্ছেতাই একটা কিছু ঘটবে মনে হচ্ছে!"

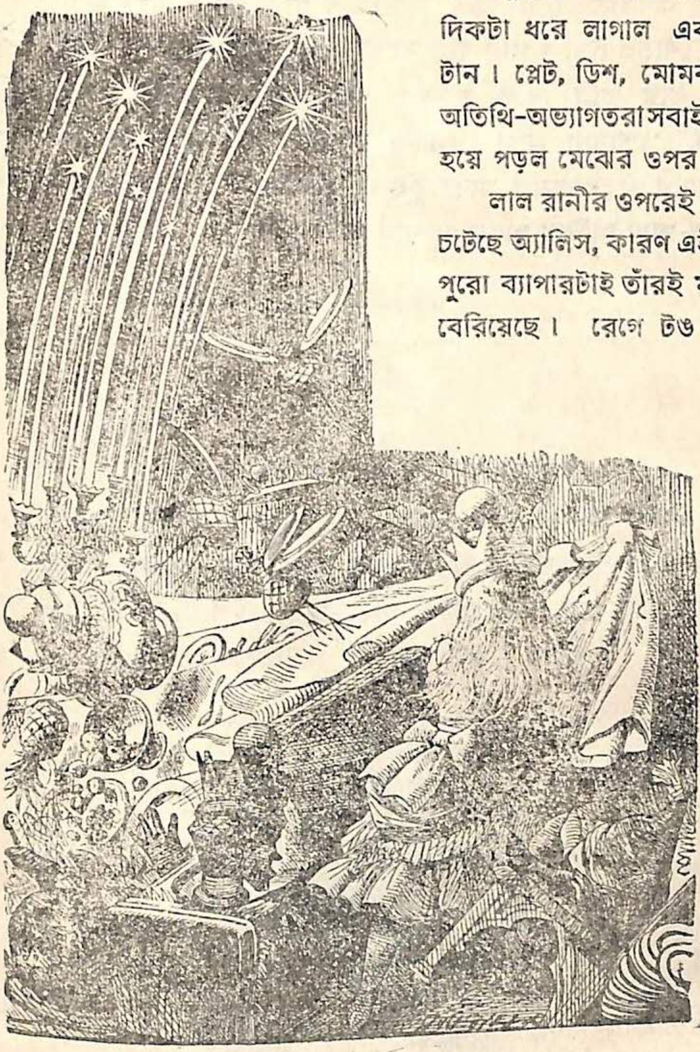
আর সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মোমবাতিগুলো সব হুহু করে লম্বা হয়ে গিয়ে ছাদে ঠেকল—দেখতে হল যেন বাঁশঝাড়ের ডগায় পিদিম জ্বলছে। বোতলগুলো সব দুটো দুটো করে ডিশ বাগিয়ে নিয়ে কাঁধে ডানার মতো সেঁটে নিলে। তার পর তলায় দুটো করে কাঁটাচামচ লাগিয়ে নিলে ঠ্যাং-এর মতো করে। তার পর ফড়্‌ফড়্‌ করে ঘরময় পাখির মতো উড়ে বেড়াতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে অ্যালিসের পাশ থেকে খুব জোর একটা হাসির শব্দ উঠতেই আন্দাজে সাদা রানীর দিকে চোখ ফেরাল অ্যালিস। কিন্তু দেখলে, সাদা রানীর বদলে চেয়ারে বসে রয়েছে সেই ভেড়ার ঠ্যাংটা। এমন সময়ে স্যুপের গামলা থেকে একটা চাপা চীৎকার শোনা গেল, "এই যে, আমি এইখানে!" সেইদিকে চোখ ফেরাতেই অ্যালিস দেখতে পেলে, গামলার ভিতর থেকে সাদা রানীর মুখখানা উঁকি মারছে। কানার আড়ালে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখা গেল একটু মুচকি হাসি, তার পর টুপ্‌ করে ডুবে গেল আবার।

বড্ডো বাড়াবাড়ি শুরু হল এবার। ইতিমধ্যে বেশ কিছু অতিথি-অভ্যাগত প্লেটের ওপর ঠাঁই নিয়েছেন। স্যুপ্‌ পরিবেশনের বড়ো হাতাটা এদিকে হাঁটতে হাঁটতে টেবিলের ওপর দিয়ে অ্যালিসের চেয়ারের দিকেই এগোতে আরম্ভ করেছে, এবং খুব বিরক্ত হয়ে অ্যালিসকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে ইশারা করে চলেছে।

"অসহ্য একেবারে!" আর থাকতে পারল না অ্যালিস। লাফিয়ে উঠে দুহাতে টেবিলক্লথের মাথার দিকটা ধরে লাগাল এক হ্যাঁচকা টান। প্লেট, ডিশ, মোমবাতি, মায় অতিথি-অভ্যাগতরা সবাই স্তূপাকার হয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

লাল রানীর ওপরেই বেশি করে চটেছে অ্যালিস, কারণ এই নেমন্তন্নের পুরো ব্যাপারটাই তাঁরই মাথা থেকে বেরিয়েছে। রেগে টঙ হয়ে লাল



রানীকে লক্ষ্য করে খিঁচিয়ে উঠল সে, "আর, তোমায় দেখাচ্ছি মজা!" কিন্তু যথাস্থানে তাকিয়ে দেখলে লাল রানীর পাত্তাই নেই! কোথায় গেলেন? ও হরি! ঐ যে, আবার সেই ছোট্টো দাবার ঘুঁটি হয়ে টেবিল-ময় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন পাগলের মতো দুহাত বাড়িয়ে—পিঠের শালখানা লট্‌পট্‌ করে উড়ছে।

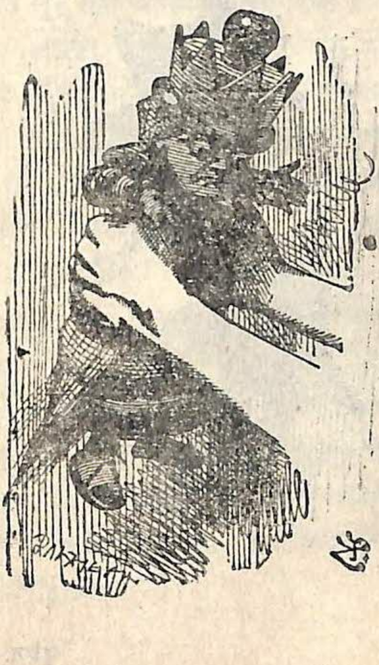
অন্য সময় হলে অবাক হত অ্যালিস, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে অবাক হবার অবসরও নেই তার। লাল রানী তখন সবেমাত্র একটা কাত-হওয়া বোতল টপ্‌কে পার হতে যাচ্ছেন, খপ্‌ করে অ্যালিস হাতের মুঠোয় চেপে ধরে তুলে নিলে তাকে। তার পর মুখের সামনে এনে আবার বললে, "তোমায় মজা দেখাচ্ছি এবার! এমন ঝাঁকানি দেব-না, একেবারে বেড়ালছানার মতো কুঁই কুঁই করবে! সত্যি বলছি! একেবারে বেড়াল-ছানা বানিয়ে ছাড়ব তোমায় আমি!"

দশম পরিচ্ছেদ

ঝাঁকানি

প্রাণপণে দাবার লাল রানীকে ঝাঁকাতে লাগল অ্যালিস।

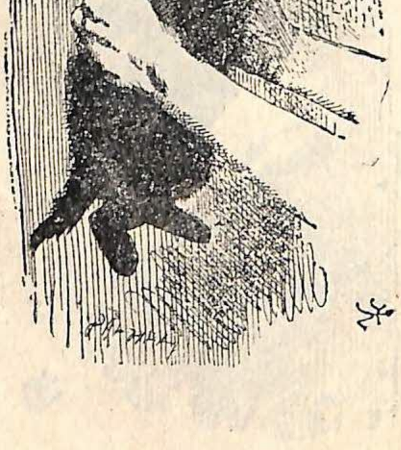
লাল রানী কোনো বাধা দিল না, আপত্তিও করলে না, কেবল তার মুখটা ক্রমশই কেমন যেন বদলে যেতে লাগল ; চোখদুটো হয়ে উঠতে লাগল বড়ো-বড়ো, নীল-নীল ; শরীরটা কেমন গোল হয়ে যেতে লাগল ; গোল—আর নরম—আর তুল্‌তুলে—আর মোলায়েম—আর—



একাদশ পরিচ্ছেদ

ঘুম ভাঙা

—আর, সব জড়িয়ে, সত্যিই একটা বেড়ালছানা।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন দেখল কে ?

"অত গলা ফাটিয়ে গর্‌গর্‌ করাটা উচিত হচ্ছে না, মহারানী !" চোখ কচলাতে কচলাতে বেড়ালছানাটাকে শাসিয়ে উঠল অ্যালিস। "ওঃ ! কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন তুই আমার ভেঙে দিলি রে ! কিন্তু স্বপ্নের সেই আয়নার জগতে তুই তো আমার সঙ্গেই ছিলি ! টের পেয়েছিস ?"

বেড়ালছানাদের একটা বিচ্ছিরি বদ অভ্যাস, সব কথাতেই গর্‌গর্‌ করা। কতবার অ্যালিস ভেবেছে, 'যদি 'হ্যা' বোঝাতে গর্‌গর্‌ করত আর 'না' বোঝাতে মিউ-মিউ—কিম্বা ঐরকম কোনো কিছু একটা নিয়ম মেনে চলত, তা হলে কথাবার্তা চালানো সহজ হত খানিকটা ! কিন্তু সব সময়ে যদি একই শব্দ করে, তা হলে তার সঙ্গে কথা বলা একেবারে ঝকমারি !'

বেড়ালছানাটা আবার গর্‌গর্‌ করল। 'হ্যাঁ' বলল, কি 'না' বলল কিছুই বোঝা গেল না।

টেবিল হাতড়ে লাল রানীকে খুঁজে বার করল অ্যালিস। তার পর আগুন পোহাবার চুল্লির সামনে কম্বলের ওপর হাঁটুগেড়ে বেড়ালছানা আর রানীকে মুখোমুখি বসিয়ে দিলে। বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "এবার ! স্বীকার কর তো ছানু, তুই ঐ লাল রানী হয়ে গিয়েছিলি !"

(পরে অ্যালিস ওর দিদিকে বলেছিল, "ছানু কিন্তু কিছুতেই স্বাকার করল না। ফিরে দেখলই না রানীর দিকে, কেবলই মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল, যেন দেখতেই পায় নি, তবে একটু যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব দেখলুম ওর মুখে। কাজেই, বুঝতে পারলুম, লাল রানী ও-ই!")

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে অ্যালিস বললে, "একটু শক্ত হয়ে বোসো, মানিক! রানীর মতো হয়ে বোসো!"

ঘাড় ঘুরিয়ে সাদা বেড়ালছানাটার দিকে তাকাল সে। তখনো সাফ-সুতরো হওয়া শেষ হয় নি তার। "আহা রে, স্নোড্রপ! ডাইনা যে কখন আপনাকে মুক্তি দেবে, সাদা মহারানী! এখনো আপনার সাফাই শেষ হল না! ডাইনা! জানো, যার গা-হাত-পা তুমি চাটছ, তিনি হলেন মহামান্যা সাদা রানী? ছি ছি, লজ্জা করছে না তোমার?"

তার পর আপন মনে ভাবতে লাগল অ্যালিস, 'আচ্ছা, ডাইনা কী হয়েছিল?' কম্বলের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, কনুয়ের ভর দিয়ে, হাতের ওপর থুতনি রেখে ভাবতে লাগল সে, আর বলতে লাগল, "বল তো ডাইনা, তুমিই কি সেই হাম্‌টি-ডাম্‌টি? আমার মনে হচ্ছে হাম্‌টি-ডাম্‌টিই বটে। যাই হোক, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এখনই কিছু বলতে যেয়ো না, কারণ আমার ভুলও তো হতে পারে।

"ভালো কথা ছানু, যদি তুই সত্যিই স্বপ্নের ভেতর আমার সঙ্গে থাকতে পারতিস, খুব একটা মজার ব্যাপার দেখতিস—মাছ নিয়ে কত যে কবিতা শুনলুম! কাল সকালে জলখাবারের সময়ে খুব মজা করব। যতক্ষণ তুই খাবি, আমি 'সিন্ধুঘোটক আর ছুতোর' কবিতাটা শোনাব তোকে।

"আচ্ছা, এবার ভেবে দেখা যাক তো, ছানু, আসলে স্বপ্নটা দেখল কে? ভারি দরকারি প্রশ্ন রে, ছানু, অমন করে থাবা চাটতে নেই এখন—এমন করছিস, যেন ডাইনা সকালে সাফাই করে নি তোকে। যাই হোক, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, স্বপ্ন দেখেছি, হয় আমি, নাহয় লাল রাজা। আমার স্বপ্নে অবশ্য লাল রাজা নিজেই ছিল, কিন্তু লাল রাজার স্বপ্নেও তো আমি ছিলুম! নাকি, সবটা লাল রাজারই স্বপ্ন? তুই তো ওর বউ, বল না, জানিস? দোহাই, ছানু, সন্দেহটা ঘোচা না, মানিক! আঃ, থাবাটা নাহয় একটু পরেই চাটিস!"

ছানু কিন্তু তখন আর-একটা থাবা নিয়ে পড়েছে। ভাবখানা, যেন

কিছু কানেই যায় নি।

তোমরা বলতে পারো, কে দেখেছিল স্বপ্নটা ?

সে একদিনের উজল বেলা শেষে
উদাসগতি নৌকা চলে ভেসে ;
ভিড়বে গিয়ে কোন অজানার দেশে।

তিনটি মেয়ে ঘনিয়ে এল পাশে
আজব দেশের গল্প শোনার আশে ;
চোখে তাদের দূরের স্বপ্ন ভাসে।

সেই সে দিনের রঙিন অবসর
কালের ছোঁয়ায় হয়েছে ধূসর ;
ঝাপ্‌সা ছবি, ক্ষীণ সে কলস্বর।

তবু কেবল স্মৃতির গন্ধ আসে
অ্যালিস আমার মনের ডিঙায় ভাসে ;
চোখ খুললে সামনে থাকে না সে।

থাকবে তবু গল্প শোনার কাল.
বসবে ঘেঁষে কচিকাঁচার পাল ;
তৈরি হবে কল্প-কথার জাল।

ঘুরবে তারা কল্পনারই দেশে,
দিন যাবে, আর চলবে তারা ভেসে ;
উজল আলো নিববে অবশেষে।

কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে থাকা,
আলোর রেশটি আঁকড়ে ধরে রাখা ;
জীবন যেন স্বপ্ন দিয়ে আঁকা।

সিল্‌ভি আর ব্রুনোর শেষের কথা

'সিল্‌ভি আর ব্রুনো'-র যে কাহিনীটি প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে, এটি তারই অনুসৃতি। লুইস ক্যারল দুটি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন সমগ্র উপন্যাসটি।

এবং যেহেতু দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে, সেইজন্য প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে এমন একটা সম্পূর্ণতা আনেন, যাতে দ্বিতীয় খণ্ডের অভাবে প্রথমটির অঙ্গহানি না ঘটে।

উনি এক জায়গায় লিখেছেন: 'সিল্‌ভি আর ব্রুনো' পাঠ করে যারা তাঁকে সুখ্যাতি বা সমালোচনা করে চিঠি লিখেছিল, তাদের মধ্যে একজনই কেবল—একটি শিশু—মন্তব্যে লিখেছিল যে, পড়ে মনে হয় কাহিনী শেষ হয় নি, আরও কিছু বাকি রইল। ক্যারল খুশি হয়েছিলেন। সেই বাকিটুকুই হবে 'সিল্‌ভি আর ব্রুনোর পরিশিষ্ট'।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রুনোর লেখা-পড়া

মাসদুয়েক লণ্ডনে থাকতে হল ; এল্‌ভেস্টনের তুলনায় সেই সঙ্গীহীন শহরে জীবন খুব বিচ্ছিরি লাগল। এল্‌ভেস্টনের পুরনো সঙ্গীসাথীদের জন্যে মন কেমন করতে লাগল—নিজেদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কেমন প্রাণখোলা আলোচনা হত, একের কোনো কল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে কেমন অন্যের সহানুভূতি পাওয়া যেত। কিন্তু, সব চেয়ে বেশি করে মনে পড়তে লাগল সেই দুটি বাচ্ছা পরীর কথা ; তাদের স্বভাবের উচ্ছলতা আমার জীবনে জাদুস্পর্শের দীপ্তি এনে দিয়েছে, অথচ তারা যে কী, তার সঠিক পরিচয় এখনো জানতে বাকি রয়ে গেল।

দশটা-পাঁচটা কাজের সময়টা যা হোক করে কেটে যেত, কিন্তু অবসর-সময়ে, যখন খবরের কাগজ বা বই পড়ে পড়ে ব্যাজার লাগতে আরম্ভ করে, যখন স্বপ্নের মতো সব অতীত দিনের স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন করতে করতে পুরনো সঙ্গী-সাথীদের প্রিয় মুখগুলির কথা মনে করে বৃথাই মনের শূন্যতা ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা করি, তখনই কেবল সত্যিকারের অনুভব করা যায়, নিঃসঙ্গতার জ্বালা কত মর্মান্তিক।

একদিন সন্ধেবেলা বড্ডো বেশি ব্যাজার বোধ হতে লাগল, তাই ক্লাবের দিকে পা বাড়ালুম। কোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে, তেমন কোনো আশা নিয়ে যাই নি, ভেবেছিলুম, মানুষের মুখের কথা তো অন্তত

শুনতে পাব, মানুষের চিন্তা-ভাবনার শরিক তো অন্তত হতে পারব।

বলতে গেলে, একেবারে প্রথমেই যার মুখ দেখতে পেলুম ক্লাবে গিয়ে, সে কিন্তু বন্ধুই বটে। দেখলুম, এরিক লিণ্ডন খবরের কাগজ নিয়ে খুব ব্যাজার মুখে বসে আছে। কথাবার্তা শুরু হতে, টের পাওয়া গেল, দুজনেরই বেশ ভালো লাগছে।

একটা কথা আমার মাথায় ঘুরছিল, এবার সেই প্রসঙ্গ তুললুম। বললুম, "আমাদের ডাক্তার (অপরিচিত লোকের মতো ভদ্রতা করে 'ডক্টর ফরেস্টার' না বলে, বা খুব অন্তরঙ্গের মতো 'আর্থার' বলে না ডেকে 'ডাক্তার' বলেই তাকে উল্লেখ করব বলে আমরা ঠিক করে-ছিলুম ; কারণ, এরিক লিণ্ডন তো আর্থারের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়, আবার একেবারে অপরিচিত দূরের লোকও নয়) তো এতদিনে বিদেশ চলে গেছে, তাই না ? ওর এখনকার ঠিকানাটা দিতে পারেন ?"

এরিক উত্তর দিলে, "আমি যদ্দূর জানি, উনি এখনো এল্‌ভেস্টনেই আছেন। তবে, আপনার সঙ্গে সেই যে দেখা হয়েছিল, তার পর আর এল্‌ভেস্টনে যাই নি।"

বুঝতে পারলুম না, কোন খবরটাতে বেশি অবাক হওয়া উচিত। বললুম, "যদি অভয় দেন, তো একটা কথা জিগেস করি—আপনাদের বিয়ের শাঁখ কবে বাজছে—নাকি, ইতিমধ্যে বেজে গেছে ?"

"না, সে বিয়ে ভেঙে গেছে। আমি আগের মতো অবিবাহিতই রয়ে গেছি।" বেশ পরিষ্কার গলায় জবাব দিলেও, এরিকের বলার ভঙ্গিতে একটা বেদনার সুর পুরোপুরি চাপা পড়ল না।

কথাটা শুনেই নতুন চিন্তার জাল বুনতে লাগলুম—আর্থারের সুখের সম্ভাবনা হয়তো আবার ফিরে এল। সেইসঙ্গে, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় এমন হতভম্ব বোধ হতে লাগল যে, আর কোনো কথাবার্তা চালানো সম্ভব হল না, প্রথম সুযোগেই ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লুম।

আমাকে চিঠি না লেখার জন্যে আর্থারকে খুব কষে, যতটা পারা যায় কড়া কড়া ভাষায় পরের দিনই একটা চিঠি লিখে দিলুম ; জানাতে লিখলুম, ব্যাপার-স্যাপার কী।

ওর উত্তর পেতে তিন-চারদিন, কিম্বা তার বেশিও লাগবে, জানি ; তবু, দিনগুলো যে কত ঢিমে-তেতালায় চলতে পারে, তা আগে কখনো টের পাই নি।

একদিন বিকেলে, নেহাত সময় কাটাবার জন্যেই, কেনসিংটন গার্ডেন্স-এ ঢুকে পড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ খেয়াল হল যে, কখন যেন একটা সম্পূর্ণ অচেনা রাস্তায় এসে পড়েছি। রাস্তাটা আমার কাছে একেবারে নতুন। নীচের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল, রাস্তার ধারের ঘাসের মধ্যে কিছু একটা যেন নড়া-চড়া করে বেড়াচ্ছে—পোকা-মাকড়, ব্যাঙ বা অন্য কোনো প্রাণী হতে পারে বলে তো বোধ হল না। আমার এখনকার জীবনের সঙ্গে এল্‌ভেস্টনের সেই-সব পরী-টরীদের কাণ্ড-কারখানার যোগসূত্রটা তখন এমনই ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে, আমার সেই ছোট্টো পরী-বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। অথচ কী কাণ্ড! সন্তর্পণে হাঁটু গেড়ে বসে দুটো হাত সামনা-সামনি জড়ো করে সেই চলন্ত অজানা প্রাণীটিকে ঘাসের মধ্য থেকে আঁজলা করে তুলে নিয়ে চোখের সামনে আনতেই বিস্ময় আর আনন্দে সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল—আমার হাতের তেলোয় বন্দী হয়ে আছে স্বয়ং ব্রুনো।

ব্রুনোর কোনোই ভাবান্তর দেখা গেল না। কথা বলার পক্ষে সুবিধা হয়, এমন একটা জায়গায় তাকে আবার নামিয়ে রাখতেই সে এমন সহজভাবে কথা বলতে শুরু করলে, যেন ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল মাত্র মিনিট কয়েক আগেই।

বললে, "কোনো পরী যদি তোমায় জানিয়ে না দেয় যে, সে কোথায় আছে, অচত তুমি তাকে পাড়কাতে পারো—তা হলে কী নিয়ম, জানো ?" (ব্রুনোর ভাষাজ্ঞান মোটেই শোধরায় নি দেখছি।)

বললুম, "না, তেমন কোনো নিয়ম যে আছে, তাই জানতুম না।"

জিতে যাবার ভঙ্গিতে হেসে ঘাড় তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ব্রুনো বললে, "আমার মনে হয়, তুমি আমাকে, ইচ্ছে করলে, খেয়ে ফেলতে পারো। তবে, নিয়মটা আমি একেবারে জোর করে বলতে পারছি না। জিগেস না করে বরং কিছু করতে যেয়ো না।"

খুঁটিয়ে খোঁজ-খবর না নিয়ে এমন একটা সাংঘাতিক কাজ করে ফেলাটা সত্যিই খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলেই মনে হল—ভুল শোধরাবার উপায় কী আর থাকবে তখন। বললুম, "আগে জিগেস করে তো নেবই। তা ছাড়া, তুমি খাওয়ার মতন জিনিস কিনা, তাও তো জানি না।"

ব্রুনো বেশ খুশি হয়েই উত্তর দিলে, "আমার ধারণা, আমায় খেতে খুব ভালো।" এমন ভাবে বললে, যেন খুব গর্বের ব্যাপার।

"কিন্তু, এখানে কী করছ তুমি, ব্রুনো?"

পুঁচকে স্যায়নাটা বললে কি, "উহুঁ, ওটা তো আমার নাম নয়! আমার নাম হল, 'ওফ্, ব্রুনো!' জানো না? যখন পড়া বলি, তখন সিল্‌ভি সব্বদা ঐ নামে ডাকে আমায়।"

"আচ্ছা, তাই সই। এখানে কী করছ, ওফ্ ব্রুনো?"

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে ব্রুনো বললে, "পড়া তৈরি করছি, আবার কি!" আমি জানি, হেঁয়ালি করবার সময়ে বরাবরই ওর চোখে ঐরকম দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে।

"ও! এইরকম করে বুঝি তুমি পড়া করো? তা, পড়া সব বেশ ভালো করে মনে আছে তো?"

ব্রুনো বললে, "আমার নিজের পড়া তো সব্বদাই মনে থাকে; সিল্‌ভির পড়াটাই কেবল মনে থাকে না।" তার পর খুব চিন্তা করার ঢঙে ভুরু-টুরু কুঁচকে কপালে টোকা মারতে মারতে আবার বললে, "ওর পড়াগুলো বুঝতে গেলে অনেক ভাবতে হয়, আমি অত ভাবতে পারি না। মনে হচ্ছে, ডবল করে ভাববার দরকার!"

"তা, সিল্‌ভি গেল কোথায়?"

খুব অধীর হয়ে ব্রুনো বললে, "আমিও তো ঠিক তাই-ই জানতে চাইছি। কঠিন কঠিন জায়গাগুলো যদি সামনে থেকে বুঝিয়েই না-দেবে, তবে পড়া দিয়ে লাভটা কী?"

বললুম, "দাঁড়াও, আমিই খুঁজে দেখছি।" যে-গাছটায় হেলান দিয়ে বসেছিলুম, উঠে দাঁড়িয়ে তার চার ধারটা খুঁজে দেখলুম। তার পরেই চোখে পড়ল, ঘাসের মধ্যে আবার কি যেন একটা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। হাঁটুগেড়ে বসতেই সিল্‌ভির সেই সরল মিষ্টি মুখখানি আমার সামনে দেখতে পেলুম। আমায় দেখে আনন্দ-বিস্ময়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সেই অতি পরিচিত মধুর গলায় সে যা বললে, বুঝতে পারলুম তার প্রথম দিকের খানিকটা আমার কানে পেঁছয় নি।

"এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেষ করে ফেলেছে। কাজেই, ওর কাছেই ফিরে যাচ্ছি। তুমিও আসবে নাকি? এই তো, এই গাছটার ও-পাশেই।"

আমার পক্ষে কয়েক পা এগোলেই যথেষ্ট, কিন্তু সিল্‌ভিকে অনেক

বার পা ফেলতে হল ; পাছে বেশি এগিয়ে গিয়ে সিল্‌ভিকে চোখের আড়াল করে ফেলি, সেই আশঙ্কায় খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলুম।

ব্রুনোর পুঁথি-পত্তরের হদিস পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না : আইভি-লতার পরিষ্কার পাতার ওপর কী সব লেখা রয়েছে, আর পাতাগুলো খানিকটা জায়গা জুড়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। জায়গাটায় ঘাস নেই। কিন্তু, লেখা পাতাগুলোর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে পিট বেঁকিয়ে যে-ছেলেটির বসে থাকার কথা, তার কোনো পাত্তাই নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজলুম কিছুক্ষণ ; কিন্তু দেখতে পেলুম না। শেষ অবধি সিলভির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া গেল না, দেখা গেল, আঁকড়ে ধরবার জন্যে আইভি-লতার গায়ে পাকানো-পাকানো মোটা সুতোর মতো যে আঁকড়ি থাকে, তারই একটা দুহাতে পাকড়ে ব্রুনো পরম আনন্দে দোল খাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই সিল্‌ভির আজ্ঞায় ব্রুনোর মাটিতে অবতরণ এবং পাঠশালায় প্রত্যাগমন।

এই পুঁচকেদের জীবনের মূলমন্ত্র বোধ হয়, 'আগে আনন্দ, তার পর কাজ'—কারণ, দেখলুম, অন্য কিছু করবার আগে ওদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গলা-জড়াজড়ি আর চুমু খাওয়া-খাওয়ির পালা চলতে লাগল।

তার পর ধমকের সুরে সিল্‌ভি বললে, "আচ্ছা, ব্রুনো, যতক্ষণ না-বলি, ততক্ষণ তোমায় পড়া করতে বলেছিলুম না ?"

ব্রুনো বললে, "কিন্তু, আমি তো তোমায় বলতে শুনলুম !" আবার তার চোখ দুটো দুষ্টুমিতে ভরে উঠেছে।

"কী শুনেছ তুমি ? দুষ্টু ছেলে কোথাকার !"

"একটা কী যেন আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল ; একটা খচ্‌মচ্‌ শব্দের মতো। আপনি শুনতে পান নি, মশাইবাবু ?"

বলতে বলতে ব্রুনো তার 'পুঁথি'র সব চেয়ে বড়ো পাতাটার ওপর গুটিয়ে-সুটিয়ে শুয়ে পড়ে, আর একটা পাতাকে বালিশ বানাবার চেষ্টা করতেই সিল্‌ভি বললে, "কিন্তু, তা বলে ওর ওপরে শুয়ে ঘুমতে হবে না, কুঁড়ের সর্দার কোথাকার !"

অভিমান-ভরা গলায় ব্রুনো বললে, "আমি তো ঘুমোই নি ! চোখের পাতা বন্দ করার মানে হল, আমি জেগে আছি !"

"বেশ, পড়া কদ্দূর হয়েছে বল তো ?"

পাছে বাড়িয়ে বলে ফেলে, তাই ব্রুনো একটু হাতে রেখে বললে, "খুব একটুখানি পড়া করেছি তো! তার চেয়ে বেশি করতে পারছি না।"

"ওফ্, ব্রুনো! ইচ্ছে করলেই তুমি পারো! তুমি নিজেই তো জান তুমি পারো!"

"পারিই তো; 'ইচ্ছে করলে', তবে তো পারি! কিন্তু ইচ্ছে না-করলে তো আর পারি না!"

হঠাৎ একেবারে অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলে ব্রুনোর এই-সব সৃষ্টি-ছাড়া যুক্তির বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা কায়দা সিল্‌ভির আছে, যেটা আমার একদম পছন্দ হয় না। কিন্তু, এবারেও সে কায়দা-টাই প্রয়োগ করলে।

"দেখ, একটা কথা বলে রাখি—"

খুব যেন চিন্তায় পড়েছে, এমনিভাবে ব্রুনো বলে উঠল, "সিল্‌ভি যে শুনতে জানে না, তা কি জানেন, মশাইবাবু? ও যখনই বলে, "একটা কথা বলে রাখি", তখনই জানি, অন্তত দুটো কথা ও বলবেই! করেও তাই।"

"একটা মাথার চেয়ে দুটো মাথা ভালো, জানো তো ব্রুনো! বললুম বটে, তবে কী অর্থে যে বললুম, নিজেই তার সঠিক হদিস পেলুম না।

ব্রুনো মৃদু গলায় আপন মনে বলতে লাগল, 'দুটো মাথা যদি পাই, তাতে ক্ষতি নেই। একটা মাথা খাবার জন্যে থাকবে, আর একটা মাথা সিল্‌ভির সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে। আচ্ছা, মশাইবাবু, একটার জায়গায় দুটো মাথা হলে আপনাকে কি আরো সুন্দর দেখতে হবে বলে মনে করেন?'

ওকে জানালুম যে, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

এর পর ব্রুনো খুব গম্ভীরভাবে, বরং বলা উচিত করুণভাবেই, বললে, "সিল্‌ভির এত চটে যাওয়ার কারণ হল—"

কথার মোড়টাকে এমন অদ্ভুতভাবে ঘুরে যেতে দেখে বিস্ময়ে সিল্‌ভির চোখদুটো গোল গোল হয়ে উঠল—তবে মুখে তখনো আমুদে ভাবটি বজায় রয়েছে। কোনো কথা না বলে, সে চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, "পড়া শেষ করে তার পর বললেই তো ভালো হত, তাই-না?"

যেন নেহাত দায়ে পড়েই ব্রুনো বললে, "বেশ, তাই হবে। তবে, তখন তো আর সিল্‌ভি চটে থাকবে না।"

সিল্‌ভি বললে, "আর মাত্র তিনটে পড়া বাকি। বানান, ভূগোল আর গান।"

বললুম, "পাটীগণিত নেই?"

"না। অঙ্ক-টঙ্ক ওর মাথায় কিছু নেই—"

ব্রুনো বললে, "নেই-ই তো! আমার মাথাটা তো শুধু চুলের জন্যে। আমার কি একশোটা মাথা?"

সিল্‌ভি ততক্ষণে গোটা গোটা করে লিখেছে মা—লি—কা। ব্রুনোকে প্রশ্ন করলে, "বানান করে উচ্চারণ কর।"

ব্রুনো মিনিটখানেক লেখাগুলোর দিকে চুপ করে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকার পর বললে, "এই বানানে কী উরুচ্চারন হয় না, সেটা বলতে পারি।"

সিল্‌ভি বললে, "তা বললে চলবে না। কী উচ্চারণ হয় বল!"

ব্রুনো আবার একবার অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে সোৎসাহে জবাব দিলে, "আরো! উলটো দিক থেকে 'কালিমা' হয়!"

সিল্‌ভি বললে, "এটা কী করে নজরে পড়ল?"

ব্রুনো বললে, "কিছু না, শুধু চোখদুটোকে একটু পাক খাওয়ালুম, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেললুম। এবার মাছরাঙার গানটা গাইব?"

সিল্‌ভি বললে, "এবার ভূগোল। নিয়ম সব গুলে খেয়েছ না কি?"

"দেখ, সিল্‌ভি, অত গাদা গাদা নিয়ম থাকা ঠিক নয়! আমার মনে হয়—"

"হ্যাঁ, ঐ অত অত নিয়মই থাকা দরকার, দুষ্টু ছেলে কোথাকার! আর, ও-সব ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার সাহসই-বা হয় কোত্থেকে? মুখ একদম বন্ধ!"

কিন্তু, সে মুখ নিজের থেকে বন্ধ হবার নয়। তাই সিল্‌ভিই দুহাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে চুমু খেয়ে তার ঠোঁটদুটো বন্ধ করে দিলে।

তার পর আমার দিকে ফিরে বললে, "ব্রুনোর মুখ তো বন্ধ হল। এই ফাঁকে তোমাকে ম্যাপটা দেখাই; ঐ ম্যাপ দেখেই ও ভূগোল পড়ে।"

মাটির ওপর, দেখলুম, বেশ বড়ো-সড়ো একটা পৃথিবীর মানচিত্র বেছানো রয়েছে। সেটা এত বড়ো যে, 'মাছরাঙা-পাঠ' থেকে জায়গার নাম দেখে দেখে মানচিত্রের ওপর সেগুলো খুঁজে বার করতে গিয়ে ব্রুনোকে তার ওপর হামাগুড়ি দিতে হল। ব্রুনো বলতে লাগল:

"মাছরাঙা পাখি যখন গয়াল পোকাকে উড়ে পালিয়ে যেতে দেখে তখন বলে, 'তুই যে দেখছি খুব উড়তে প্যারিস? শিখলি কোবে?" তার পর তাকে টপ্ করে পাকড়ে ধরে বলে, 'জলের দিকে যাচ্ছিস কেন, ডোভার ইচ্ছে আছে?" তার পর মুখের কাছে নিয়ে এসে বলে, "দুঃখের কথা বলি শোন; ভালো মাছ বড়ো আক্রা হল, তাই পেটে ভারি খিদে। অনেকে আছেন, তাঁরা জাপান, তাই-ই খান। আমার আবার যা হোক খেতে মন চায়না!" তার পর পোকাটাকে ঠোঁটে নিয়ে গেলবার আগে বলে, তাই, ইচ্ছে করছে তোকেই খাইবার।"—এইটুকু পড়া ছিল।"

সিল্‌ভি বললে, "ঠিক হয়েছে। এবার মাছরাঙার গানটা গাইতে পারো।"

ব্রুনো আমায় বললে, "গানের মধ্যে দুজনে গাইবার এক-একটা জায়গা আছে, সেইখানগুলো তুমি গাইবে?"

বলতে যাচ্ছিলুম যে, "কথা জানি না", কিন্তু তার আগেই সিল্‌ভি ম্যাপটা উলটে দিতেই দেখতে পেলুম, পেছন দিকে পুরো গানটা গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে।

গানের কথার এক-একটা স্তবকের শেষের চরণটা সাধারণত একসঙ্গে গাইতে হয়; ব্রুনোর গানে কিন্তু সেটা মাঝামাঝি জায়গায়! যাই হোক, সুরটা খুব সোজা বলে, ব্রুনোর কথা রাখতে বেশি অসুবিধা হল না। সিল্‌ভিকে ইশারা করে গলা দিতে বললুম, সে শুধু মুচকি হেসে মাথা নাড়ালে, গাইলে না।

"মাছরাঙা পাখি গয়াল পোকাকে অনুরোধ করে কতই—
গাও বরবটি, গাও বাটি-ঘটি, গাও গাও প্রজাপতি!
"ঘটকালি করো, বিয়ে করব যে আমি;
বউ-এর মাথাটা হয় যেন বেশ দামি,
দাড়িখানা যেন পুরুষ্টু হয়, সাদা সে দইয়ের মতোই—
চোখদুটি যেন হয় মনোরম অতি!"

"পোকা বলে, 'তুমি মাথা যদি চাও, আলপিনে মাথা থাকে—"
গাও গো খেজুর, গাও সে চিঙড়ি, গাও গাও গাঁদা ফুল!

"—যেখানে গাঁথবে, সেখানেই থেকে যাবে ;
বউ ছট্‌ফটে হলে অশান্তি পাবে।
পাত্রী হিসেবে আলপিন-ই ভালো। বিয়ে করা যাকে-তাকে
ঠিক কথা নয়, কোরো না এমন ভুল !"

"পোকা বলে, 'যদি দাড়ি চাও, তবে শামুকেরও থাকে দাড়ি।'
গাও মৌমাছি, গাও গাও ব্যাঙ, গাও বেহালার তার !
আমি পছন্দ করি যে তাদের। কারণ,
বাজে কথা বলা তাদের বেবাক বারণ।
রাজ্য দিলেও একটি শব্দ বেরবে না ঠোঁট ছাড়ি,
অনেক সেধেও মুখ খোলা হবে ভার !"

"পোকা বলে, 'যদি চোখ চাও, তবে ছুঁচেরও তো আছে চোখ।"
গাও সে বেড়াল, গাও গাও ছিপি, গাও সুবাসিত চা !
"ছুঁচ বড়ো চোখা, তুমি তা মোটেই নও ;
কাজেই সদ্য সদ্য বিদায় হও—
হেন কুপাত্রে ভালো মেয়ে দেবে, নেইকো এমন লোক :
অতএব, তুই যারে ব্যাটা ফিরে যা !"

গানের শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে যাবার পর ব্রুনো পুনশ্চ হিসেবে বলে দিলে, "তখন মাছরাঙাটা চলে গেল !"

সিল্‌ভি পুঁথিপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বললে, "আজকের পড়া শেষ !"

আমি বললুম, কান্নাকাটি হল না তো ? ছোটোরা তো পড়তে হলে কান্নাকাটি করে !"

ব্রুনো বললে, "বেলা বারোটার পর আমি কখনো কাঁদি না। কারণ, তার পরেই তো খাবার সময় !"

সিল্‌ভি নিচু গলায় বললে, "যেদিন ভূগোলের পড়া থাকে, আর ও অবাধ্যতা করে, সেই-সব দিনে সকালের দিকে মাঝে মাঝে—"

ব্রুনো মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "উঃ, কী কথাই তুমি বলতে পারো, সিল্‌ভি ! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল বক্‌বক্ করবে বলেই যেন ভগমান পিথিবি বানিয়েছিলেন !"

সিল্‌ভি তর্কের ঢঙে জবাব দিলে, "তা হলে কোথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্‌ করব ?"

ব্রুনো বেশ দৃঢ় ভঙ্গিতে বলে উঠল, "দেরি হয়ে গেছে, হাতে বেশি সময় নেই, তাই এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তক্ক করব না—তবে, তোমার কথাটা একদম ভুল, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ"—বলতে বলতে চোখে জল এসে পড়ল। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগল।

সিল্‌ভি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "রাগ কোরো না, সোনা আমার, মানিক আমার!" তার পর, তর্ক করা শিকেয় উঠল; খানিকক্ষণ ধরে কেবল চুমু খাওয়া আর জড়িয়ে ধরার পালা চলতে লাগল।

কিন্তু তাও খুব বেশিক্ষণ চলতে পারল না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের গর্জন আর মুষলধারে বৃষ্টি।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমেও গেল। গাছতলা থেকে বেরিয়ে এসে দেখলুম, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে; কিন্তু আমার ক্ষুদে বন্ধুদের আর দেখা পেলুম না। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারাও উধাও। কাজেই বাড়ির দিকেই পা চালাতে হল, আর কিছু তো করবার নেই।

বাড়ি ফিরেই দেখলুম, টেবিলের ওপর একটা টেলিগ্রাম। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল—কী দুঃসংবাদ, কে জানে; কার দুঃসংবাদ, তারই-বা ঠিক কী! টেলিগ্রামে আনন্দের খবর যে আসে না, তা নয়, তবে বেশির ভাগই তো কেবল খারাপ খবর।

আমার কপাল ভালো। খারাপ খবর কিছু নয়। বরং বলা যায়, আর্থার যে-খবর পাঠিয়েছে, তার মধ্যে থেকে যেন আর্থারের সেই পরিচিত গলাটাই আমার কানে এসে বাজল, আর মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আর্থার লিখেছে, "লিখতে বড়ো সংকোচ হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার জন্যে দরজা সব সময়ে খোলা। চিঠি দিচ্ছি। আর্থার।"

সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা ছাঁদা শুরু করে দিলুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ-কূল ভাঙে, ও-কূল গড়ে

ট্রেনের কামরা থেকে হাঁক শুনতে পেলুম, "ফেফিল্ড জংশন! এল্‌ভেস্টনের জন্য গাড়ি বদল করুন!"

এই সামান্য কটি কথার সঙ্গে আমার স্মৃতির এমন একটা নিবিড় যোগসূত্র বাঁধা হয়ে গেছে যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মন আনন্দে শিউরে উঠল। কিসের যেন একটা আকুলতা নিয়ে কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলুম। ছমাস আগে, ঠিক এমনি সময়ে আর-একবার এখানে এসেছিলুম. মনে আছে। কিন্তু, তার পর তো অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও দুর্বল হয়ে এসেছে। তাই প্রথমে হারানো সূত্রটা কিছুতেই সন্ধান করে উঠতে পারি নি। হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের একমেবাদ্বিতীয়ম বেঞ্চিটির দিকে নজর পড়ল, আর সেখানে একটি ভদ্রমহিলাকে বসে থাকতে দেখলুম; সঙ্গে সঙ্গে অতীত দিনের একটা ঘটনা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে—হুবহু সেই একই ঘটনা যেন আবার নতুন করে ঘটতে চলেছে।

মনে মনে ভাবলুম, 'ঠিক মনে পড়েছে, এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার এক প্রিয় বান্ধবীর স্মৃতি! ঐ বেঞ্চিটার ওপরেই সে বসে ছিল, আর আমাকে তার পাশে বসবার জন্যে ডেকেছিল। আর্ল আমায় শিখিয়েছিলেন, বাস্তব ঘটনার মধ্যে থেকে কী করে নাটক খুঁজে

নিতে হয় ; ভাবা যাক-না যে, ঐ ভদ্রমহিলাটিই লেডি মিউরিয়েল ? খানিকক্ষণের জন্যে কল্পনাটাকেই আঁকড়ে রাখি-না কেন !'

বেঞ্চিতে-বসা মহিলাটিকে আমার অতি পরিচিত লেডি মিউরিয়েল বলে ধরে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলুম। মহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন, তাই নিজেকে ঠকাতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কল্পনাটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে ওঁর মুখের দিকে চাইব না বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি ; কিন্তু, হলে কী হয়, পায়চারি করতে করতে ফেরবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সময়ে তাঁর মুখের দিকে একবার না-তাকিয়ে থাকতে পারলুম না। আর দেখলুম, স্বয়ং লেডি মিউরিয়েল !

ছমাসের আগের পুরো ঘটনাটা আমার চোখের সামনে দেখতে পেলুম। একেবারে হুবহু সব মিলে যাচ্ছে ; কারণ, সেই যে বৃদ্ধটিকে স্টেশনমাস্টারমশাই বেঞ্চি থেকে ধমকে উঠিয়ে দিয়ে লেডি মিউরিয়েলের জন্যে জায়গা করে দিয়েছিলেন, সে পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত ! কী অদ্ভুত সাদৃশ্য ! তবে একটু পার্থক্য দেখলুম : বৃদ্ধটি কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে চলে যাচ্ছেন না, মিউরিয়েলের পাশে বসে তার সঙ্গে কথা বলছেন। মিউরিয়েল বলছে, "হ্যাঁ, ওটা আপনার মানিব্যাগের মধ্যে রাখুন। মনে রাখবেন, পুরোটা কিন্তু মিনি-র জন্যে খরচ করতে হবে—ওর উপকারে লাগে, এমন একটা কিছু উপহার কিনে দেবেন। মিনিকে আমার ভালোবাসা দেবেন !" এমন তন্ময় হয়ে কথা বলছে যে, পায়ের শব্দে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়েও প্রথম কয়েক সেকেণ্ড ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না।

কাছে এগোতে এগোতে টুপি খুলে তাকে অভিবাদন জানাতেই আমায় চিনতে পারলে ; আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে এমন একটা খুশির ছাপ ফুটে উঠল যে, কেনসিংটন গার্ডেনে সিল্‌ভির মিষ্টি মুখখানির সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধটিকে পাছে বিব্রত করতে হয়, সেইজন্যে মিউরিয়েল উঠে এসে আমার সঙ্গে পায়চারি করতে করতে আলাপ করতে লাগল। কয়েক মিনিট ধরে মামুলি কথাবার্তা হল—লণ্ডনের কারো বাড়ির বসবার ঘরে বসে সাধারণ পরিচিত লোকেদের মধ্যে যেমন আলাপ হয়, তেমনি। যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে আমরা এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি, প্রথমেই সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দুজনেই সংকোচ বোধ করছিলাম।

কথা বলছি, এমন সময়ে এল্‌ভেস্টনের গাড়ি প্ল্যাটফর্মে এসে লাগল। স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের নির্দেশে বুঝলুম যে, সময় বেশি নেই, তাই তাড়াতাড়ি ট্রেনের একেবারে শেষ মাথার দিকে পা চালালুম—একমাত্র ফাস্টক্লাস কামরাটা ঐ দিকেই। বেঞ্চিটা তখন খালি পড়ে আছে। যেতে যেতে সেই দিকে নজর পড়তেই মিউরিয়েল দেখতে পেলে, বৃদ্ধের সেই মানিব্যাগটি বেঞ্চির ওপর পড়ে আছে। বৃদ্ধ খেয়ালই করেন নি; ট্রেনের ও-মাথার দিকের একটা কামরায় তখন তাঁকে ধরে-ধরে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মিউরিয়েল খপ্ করে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে বললে, "গরিব বেচারা! ভাববে, হারিয়ে গেছে! না, না, ওকে আটকাতেই হবে!"

বললুম, "আমায় দাও, আমি তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারব!" কিন্তু ততক্ষণে সে প্ল্যাটফর্মের মাঝ-বরাবর চলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি—যেন হাওয়ায় ভেসে—এগিয়ে গেছে, যে, চেষ্টা করার ফুরসৎই পেলাম না।

দৌড়বার ক্ষমতা নিয়ে জাঁক করতে গিয়েছিলুম; কিন্তু, আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মিউরিয়েল কাজ সেরে এসে হাজির। কামরায় ঢুকতে ঢুকতে বললে, "কী মনে হয়? সত্যিই আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি পারতেন?"

বললুম, "বিলকুল নয়! অতিকথনের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি; আদালতের যা অভিরুচি, তাই মাথা পেতে নেব!"

"আদালত এবারকার মতো মাফ করে দিচ্ছে—এই একবারই কিন্তু!" রসিকতা করে বললে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তার সমস্ত চপলতা কোথায় ভেসে গেল, মুখে ফুটে উঠল উৎকণ্ঠা আর গাম্ভীর্যের ছায়া।

উদ্বেগ-ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনাকে কিন্তু খুব সুস্থ দেখাচ্ছে না। এল্‌ভেস্টন থেকে যখন চলে গিয়েছিলেন, তখনকার তুলনায় আপনাকে বেশ কাহিল-ই দেখাচ্ছে। লণ্ডন আপনার ধাতে সয় না বলে মনে হচ্ছে!"

বললুম, "লণ্ডনের হাওয়াটাই বোধ হয় আমার পক্ষে খারাপ, কিম্বা খাটা-খাটুনির জন্যেও হতে পারে—হয়তো, একা একা থাকতে হয়েছে বলেই; সে যাই হোক, ইদানীং শরীরটায় জুত পাচ্ছি না। তবে এল্‌ভেস্টনের মহিমায় আবার নিশ্চয়ই চাঙ্গা হয়ে উঠব। আর্থার আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছে, জানেন তো আজ সকালেই ওর চিঠি

পেয়েছি। ওর প্রেস্‌কৃপশন হল, 'প্রচুর সমুদ্রের বাতাস, টাটকা দুধ আর সৎসঙ্গ'।"

মিউরিয়েল বললে, "সৎসঙ্গ? আলাপ করবার মতো তেমন লোকজন পাওয়া মুশকিল। পাড়া-প্রতিবেশী তো বিশেষ নেই। তবে টাটকা দুধের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মিসেস হাণ্টার আমাদের পুরনো চেনা-শোনা লোক, ওর কাছ থেকেই নেবেন। একেবারে খাঁটি দুধ পাবেন। ওর মেয়ে, বেসী, আপনার বাড়ির পাশ দিয়েই রোজ ইস্কুলে যায়, কাজেই পাঠাতেও অসুবিধে হবে না।"

বললুম, "তোমার কথামতোই ব্যবস্থা করব। কাল মিসেস হাণ্টারের কাছে গিয়ে বন্দোবস্ত করা যাবে। আর্থারকেও সঙ্গে নেব, ওরও ভালো লাগবে, খানিকটা ঘোরা হবে।"

"খুব একটা দূর হবে না—মাইল তিনেকেরও কম হবে বলে মনে হয়।"

"বেশ, একটা ল্যাঠা তো চুকল। এবার তোমার কথা বল। আমার শরীরের কথা নিয়ে খুব তো উপদেশ দিলে; এখন বল তো, তোমাকে বিশেষ সুবিধের দেখাচ্ছে না কেন?"

মিউরিয়েলের মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল, চাপা গলায় বললে, "সত্যিই আমি বিশেষ ভালো নেই। ইদানীং একটা সমস্যায় পড়েছি। সমস্যাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার খুব ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু লিখতে ভরসা পাই নি। এবার সুযোগ পেলুম, বলে খুব স্বস্তি বোধ করছি।"

তার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বেশ ইতস্তত করে বললে, "আচ্ছা, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সত্যবদ্ধ হয়ে কাউকে কোনো কথা দিলে, তা কি সব সময়ে রাখতেই হয়—অবশ্য যে-কথা রাখতে গেলে কোনো পাপ কাজ করতে হয়, তেমন প্রতিশ্রুতির কথা বাদ দিয়ে বলছি।"

বললুম, "এক্ষুনি কোনো ব্যতিক্রমের কথা তো মনে পড়ছে না। সাধারণত, বিবেক বা ন্যায়-অন্যায়ের এই-সব প্রশ্নগুলো সত্য আর মিথ্যার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হয়।"

মিউরিয়েল ব্যগ্র হয়ে বলে উঠল, "সত্যিই কি তাই? আমি তো বরাবরই ভেবে এসেছি যে, বাইবেলে এ-ব্যাপারে যা লেখা আছে, তাই-ই ঠিক—'কাউকে মিথ্যা কথা বলবে না'।"

উত্তরে বললুম, "আমিও ঐ কথাটা নিয়ে ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে যখন লোককে ঠকানোর উদ্দেশ্য থাকে, মিথ্যা হল আসলে তাই। খেলাপ করবে না, বলে সত্যি সত্যি মনে করে যখন তুমি কাউকে কোনো কথা দিলে, তখন নিশ্চয়ই তুমি সত্য কথাই বলেছ, মিথ্যাচরণ করো নি ; পরে বিশেষ কোনো কারণে যদি তুমি সে কথা না-রাখতে পারো, তা হলে কিন্তু ঠকানোর প্রশ্ন আসে না। একে আমি মিথ্যাচরণ বলি না।"

আবার খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। মিউরিয়েলকে দেখে মনে হল, খুশি হয়েছে, কিন্তু মনের মধ্যে তখনো যেন খটকা রয়ে গেছে। প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল যে, ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) লিণ্ডনের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে যাবার ঘটনা, আর তার এই প্রশ্নের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে। সন্দেহটা সত্যি কি না, জানতে আগ্রহ হল।

মিউরিয়েল বললে, "একটা ভীষণ ভয় কাটিয়ে দিলেন আপনি। কিন্তু, এখনো মনে হচ্ছে, কোথায় একটা অন্যায় থেকে যাচ্ছে। আমার এ-ধারণাটা যে ভুল, তার কোনো নজির দেখাতে পারেন ?"

"ধার নেবার আর ধার শোধ দেবার যে বাধ্যবাধকতা আছে, তাই থেকেই বুঝতে পারবে। 'ক' টাকা ফেরত দেবে বলে 'খ'-কে কথা দিল। 'খ' সেই টাকাটা 'ক'-র কাছ থেকে দাবি করতে পারে। 'ক' যদি কথার খেলাপ করে, তা হলে, আমার মনে হয়, তার অপরাধটা চুরির পর্যায়ে পড়ে, মিথ্যা কথার পর্যায়ে নয়।"

"আগে কখনো এভাবে দেখি নি, তাই আমার কাছে নতুন লাগছে ; তবে মনে হচ্ছে, কথাটা ঠিক। যাই হোক, আপনার মতো একজন পুরনো বন্ধুর কাছে আসল কথাটা এড়িয়ে যেতে চাই না।"

এই সময়ে ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামল। কয়েকজন যাত্রী উঠলেন, তাই আমরা আলোচনা বন্ধ করে রাখলাম।

এল্‌ভেস্টনে এসে পৌঁছবার পর আমার পরামর্শ মতো বাড়ি অবধি হেঁটে যাওয়াই ঠিক হল। আর্লের বাড়ি থেকে চাকর এসেছিল, তার জিম্মায় মিউরিয়েলের মালপত্র দিয়ে, আর আমার মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। চেনা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত পুরনো কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। মিউরিয়েল আলোচনার সূত্র টেনে কথা বলতে শুরু করলে।

"এরিকের সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা আপনি জানেন। কিন্তু জানেন কি—"

ওকে রেহাই দেবার জন্যে বলে উঠলুম, "শুনেছি। সে-বিয়ে ভেঙে গেছে।"

"কী করে ভাঙল, সেই কথাই আপনাকে বলতে চাই, আর আপনার পরামর্শও চাই। অনেক দিন থেকেই টের পেতাম যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে ওর ধারণা বড়ো ধোঁয়াটে। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ওর বিশ্বাসটা খুব পাকা নয়। কিন্তু তার জন্যে ওর জীবনযাত্রায় কিছু যায়-আসে না! লক্ষ্যহীন নাস্তিকরাও সৎ এবং নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে পারে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। ও যে কত ভালো ভালো কাজ করেছে, তার অর্ধেকও যদি আপনি জানতেন—" আবেগে ভেঙে পড়ে মিউরিয়েল মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বললুম, "তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আর স্বয়ং ক্রাইস্টই তো বলেছেন যে, সৎ এবং নিষ্পাপ জীবনে পুণ্যের আলো স্পর্শ করে।"

"আমিও ওকে সেই কথাই বলেছিলাম। এরিক বললে যে, ও বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবে, শুধু আমারই জন্যে। কিন্তু, এটা তো ঠিক নয়। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে খুশি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম করলে, ভগবান কি তাতে সন্তুষ্ট হবেন? তবু, বিয়েটা আমার দিক থেকে ভাঙে নি। আমি জানি ও আমাকে সত্যিই বিয়ে করতে চেয়েছিল, আমিও কথা দিয়েছিলাম—"

"বিয়ে তা হলে এরিকই ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ, এরিক আমাকে কথা দেওয়ার দায় থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছে।"

"তা হলে আর সমস্যার কী আছে?"

"সমস্যা হল, আমার বিশ্বাস, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশে ও এ-কাজ করে নি। ধরুন, আমার ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি ও এটা করে থাকে, তা হলে আমার ওপর ওর দাবি তো একটুও কমল না; আর, সেইজন্যে আমার প্রতিশ্রুতির দায় আগের মতোই রয়ে গেল না-কি? বাবা বলেন, 'না।' কিন্তু তবু আমার

সন্দেহ যায় না। আপনার মতো বন্ধু ছাড়া কার ওপরেই-বা ভরসা করে পরামর্শ চাইব!"

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতে লাগলুম। তার পর মিউরিয়েলকে বুঝিয়ে বললুম যে, এ-নিয়ে মনে কোনো অস্বস্তি পুষে রাখার দরকার নেই; যে-জন্যেই হোক, এরিক যখন বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছে, মিউরিয়েলের আর কোনো দায় নেই।

আমার অভিমত শুনে মিউরিয়েল নিশ্চিন্ত হল। 'হল'-এ পৌঁছবার আগে ও-প্রসঙ্গে আর কোনো কথাবার্তা হল না।

মিউরিয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় আসতেই দেখি আর্থার সাগ্রহে আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। সেদিন রাত্তিরে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত যেটুকু কথা হল তাতে জানলাম যে, মিউরিয়েলের বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত আর্থার অপেক্ষা করতে চেয়েছিল, এল্‌ভেস্টন ছেড়ে যেতে চায় নি। তার পর হঠাৎ একদিন বিয়ের সব তোড়জোড় থেমে গেল, পাড়া-প্রতিবেশীর উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেল; শোনা গেল, দু-পক্ষের সম্মতিক্রমে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এরিক তার পর বিদেশ যাবার মতলব বাতিল করেছে। এর মধ্যে কিন্তু একবারও সে মিউরিয়েলের সঙ্গে দেখা করে নি—বুঝে উঠতে পারে নি যে, মিউরিয়েল তাকে দেখলে খুশি হবে কি না।

আর্থারকে জিগেস করেছিলুম যে, বিয়ে ভেঙে যাবার কারণ সম্বন্ধে তার কানে কিছু এসেছে কি না।

আর্থার তার আঙুল গুনতে গুনতে বলে যেতে লাগল, "অনেক কারণের কথা শুনেছি: প্রথম হল, মিউরিয়েলের নাকি কিসের ওপর ভীষণ একটা টান আছে, তাই এরিক বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। তার পর শুনলুম, এরিকের নাকি কিসের ওপর ভীষণ টান, তাই মিউরিয়েল বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। তার পর শোনা গেল, মেজর লিণ্ডন নাকি একটা জুয়াড়ি, তাই আর্ল বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। তার পর, আর্ল তাকে অপমান করেছেন বলে এরিকই নাকি বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। ভাঙা-ভাঙির আর অন্ত নেই!"

"সব খবরগুলোই খুব পাকা, নিশ্চয়ই!"

"ভীষণ পাকা। আর, সব-কটাই খুব গোপনে পরম বিশ্বাসে শুধু আমাকেই বলা হয়েছে, যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়। এল্‌ভেস্টনে

আর যাই থাক না-থাক, গুজবের অভাব নেই।"

"কিন্তু, আসল কারণটা জানতে পেরেছ?"

"না, কোনো ধারণাই করতে পারছি না।"

যা শুনেছি, তা আর্থারকে জানানোটা অন্যায় হবে; তাই ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দুধের কথা তুললুম। ঠিক হল, কাল সকালেই মিসেস হাণ্টারের খামারে যাব; আর্থার খানিক দূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে, তার পর বাড়ি ফিরে আসবে। রুগী-পত্তরের ব্যাপারে ওর কী কাজ আছে।

পরের দিন সকালবেলা আর্থারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলছি। কী একটা আলোচনা করতে করতে আর্থার তার হাতের ছড়িটা দিয়ে রাস্তার পাশের একটা লম্বা কাঁটাগাছের ওপর তলোয়ারের মতো সজোরে একটা কোপ বসাতেই, গাছের ডগাটা ভেঙে পড়ে গেল, আর আমি অবাক হয়ে দেখতে পেলুম, গাছটার পেছনে সিল্‌ভি আর ব্রুনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে পারলুম না লাঠির বাড়িটা ওদের গায়ে লেগেছে কি না; কারণ হাসি মুখে ওরা আমার দিকে চেয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালে। এও বুঝলুম যে, আমি ছাড়া আর কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ওরা দৌড়ে এসে আমার দুপাশে হাত ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে।

ব্রুনো বললে, "লাঠিটা একেবারে আমার মুণ্ডু ফুঁড়ে চলে গেল, জানো! ঠিক দাড়ির তলা দিয়ে! ভাগ্যিস আমি কাঁটাগাছ নই!"

আর্থার বললে, "অনেক বক্‌বক্‌ করেছি। এবার আমি ফিরব। মোল্লার দৌড় শেষ হল বলে।"

সমুদ্রের দিকে যাবার রাস্তাটার মোড়ের কাছে এসে দেখতে পেলুম, কে একজন মহিলা ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। অনেকটা দূরে থাকলেও, বুঝতে অসুবিধা হল না যে, সে মিউরিয়েল ছাড়া আর কেউ নয়। আর্থার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, তাই দেখতে পায় নি। মুখে কিছু বললুম না, মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগলুম, কী করে আর্থারকে ঐ রাস্তায় পাঠানো যায়।

সুযোগ জুটেও গেল। আর্থার বললে, "এবার বেশ ক্লান্ত লাগছে। আর এগোনো ঠিক হবে না। এখান থেকেই ফিরি।"

আর্থারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা পিছিয়ে এসে আবার সেই গলিটার মুখের কাছে পেঁৗছতেই যথাসম্ভব নির্লিপ্তভাবে বললুম, "বড়ো রাস্তা দিয়ে নাই-বা গেলে। বড্ডো চড়া রোদ আর তেমনি ধুলো। এই গলিটা দিয়ে সমুদ্রের ধার-বরাবর গেলে রাস্তা একই পড়বে; সমুদ্রের হাওয়াটা পাবে।"

"তাই করব ভাবছি", এই বলে কথা শুরু করতেই আবার আমরা মিউরিয়েলকে দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর্থার সামলে নিয়ে বলে উঠল, "না, না, অনেকটা ঘুর পথ হয়ে যাবে। তবে, ঠাণ্ডা একটু হবে অবশ্য—" বলতে বলতে থমকে দাঁড়িয়ে একবার এ-রাস্তার দিকে, আর-একবার ও-রাস্তার দিকে তাকাতে লাগল—মন ঠিক করতে না-পেরে, থতমত খেয়ে গেছে বেচারা।

এই বিড়ম্বনা কতক্ষণ স্থায়ী হত কে জানে, কারণ আমি আর কী করতে পারি, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সিল্‌ভি ইতিমধ্যে মতলব এঁটে ফেলেছে। ব্রুনোকে বলছে, "তুমি গিয়ে লেডি মিউরিয়েলকে ঐ গলিটা দিয়ে এদিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো তো, ব্রুনো।" তার পর সে নিজে আর্থারের হাতের ছড়িটা ধরে খুব আস্তে আস্তে গলিটার দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

তার নিজের ইচ্ছা ছাড়া ছড়িটা অন্য কোনো কারণে নড়া-চড়া করতে পারে, আর্থার কি আর তা ভাবতে পেরেছে! ছড়ির ডগাটা উঁচু হয়ে উঠে পড়তে, ও ভাবল, ও নিজেই বোধ হয় উঁচিয়ে ধরেছে সেটা। দেখাবার ভঙ্গিতে ছড়িটা বাগিয়ে ধরে বললে, "আরে, ঝোপের তলায় ওগুলো একধরনের অর্কিড ফুল না! যাক, এবারে মনস্থির করে ফেলেছি। ও-দিক দিয়েই যাই, কয়েকটা ফুল তুলে নেওয়া যাবে।"

ব্রুনো ইতিমধ্যে মিউরিয়েলের পিছু ধাওয়া করে, তার চার পাশে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গোরু তাড়াবার মতো হৈ-হৈ শব্দ করে (আমি আর সিল্‌ভি ছাড়া আর কেউ অবশ্য দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না) তাকে ঘুরিয়ে আমাদের দিকে হাঁটিয়ে আনতে শুরু করছে।

বুঝলুম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্থার আর মিউরিয়েলে দেখা হবে। নিঃসাড়ে সেখান থেকে সরে পড়লুম। যেতে যেতে ভাবলুম, 'দেখা তো হবে; কী ঘটবে কে-জানে!'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুক্কুর–রাজ

আমার মনের কথার জবাব দেবার জন্যেই যেন লাফাতে লাফাতে আমার পাশে এসে ব্রুনো বললে, "ওরা হ্যান্-শেক করলে, জানো!"

ও-পাশ থেকে সিল্ভি বললে, "দুজনেই খুশি হয়েছেন মনে হল!"

বললুম, "এবার কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পা চালাতে হবে। হাণ্টারের খামার-বাড়ি যাবার সোজা রাস্তাটা যদি জানতুম গো!"

সিল্ভি বললে, "এই কুঁড়েঘরের লোকেরা বলতে পারবে না?"

"তা পারবে নিশ্চয়ই। ব্রুনো, ছুট্টে যাও তো, জিগেস করে এসো তো!"

ব্রুনো দৌড়বার উপক্রম করতেই খপ্ করে তাকে ধরে ফেলে হেসে উঠে সিল্ভি বললে, "এক মিনিট, তোমায় যাতে দেখা যায়, সে-ব্যবস্থা করতে হবে না?"

বললুম, "সেইসঙ্গে শোনা যাবার ব্যবস্থাও করতে হবে তো, না কি?" সিলভি ইতিমধ্যে গলা থেকে সেই লকেটটা খুলে নিয়ে ব্রুনোর মাথার ওপর দোলাতে লাগল, তার পর তার চোখে আর ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিলে।

আমায় বললে, "হ্যাঁ, শোনা যাবার ব্যবস্থা তো করতেই হবে। একবার, হয়েছিল কি জানো, ওকে দেখা যাবার ব্যবস্থা করতে ভুলে গিয়ে

শুধু ওর কথা শোনা যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলুম। দোকানে মিষ্টি কিনতে গেছে। দোকানি কী ভয়ই যে পেয়েছিল। কোথাও কিছু নেই, শুধু আওয়াজ ভেসে আসছে, 'আমায় দুটো ল্যাবাঞ্চুস দিন তো!' তার পর ঠকাস্ করে দোকানির সামনে একটা শিলিঙ এসে পড়ল। সে চেঁচিয়ে বললে, 'তোমায় যে দেখতেই পাচ্ছি না!' ব্রুনো বললে, 'আমায় দেখতে না পেলে কী এসে-যায়, শিলিঙটা তো দেখতে পাচ্ছেন!' কিন্তু দোকানি বললে যে, দেখা যায় না, এমন কাউকে সে জীবনে কখনো ল্যাবাঞ্চুস বিক্রি করে নি। কাজেই—হয়েছে, ব্রুনো, এবার যাও।" লাফাতে লাফাতে ব্রুনো ছুটল।

ব্রুনোর ফিরে আসার জন্যে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, তার মধ্যে সিল্‌ভি নিজেও সাধারণ মানুষের মতো হয়ে নিল। বললে, "লোক-জনের কাছে গেলে, একজনকে দেখতে পাবে, একজনকে পাবে না, সেটা বড়ো বদখৎ ব্যাপার হয়।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ব্রুনো ফিরে এল, কিন্তু খুবই বিরক্ত। বললে, "ওর সঙ্গে সব চেনাশোনা লোকেরা রয়েছে. আমার কথায় চটে গেল। আমায় জিগেস করলে যে, আমি কে। আমি বললুম, "আমি বুনো; এরা কে?' সে বললে, 'একজন হল আমার সৎ-ভাই, আর-একজন হল সৎ-বোন; এতেই আমার ঢের, আর কাউকে লাগবে না। তুমি তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে কেটে পড় দিকিনি!' তখন আমি বললুম, 'কেটে গেলে আবার যাব কী করে!' তাপ্পর বললুম, 'নিজের ভাই-বোনদের অত সৎ সৎ বলতে হয় না!' তখন ও বললে, 'ওফ্! আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না!' তাপ্পর আমায় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে। দরজা বন্দ করে দিলে!"

সিল্‌ভি জিগেস করলে, "হাণ্টারের খামার কোন দিকে, তা জিগেসই করো নি?"

ব্রুনো বললে, 'জিগেস করবার ফুসরত পেলুম কোথায়? কথাটা বলে ফেললেই তো হবে না; ফেলতে হলে জায়গা তো চাই! ঘরে তো জায়গাই নেই মোটে!"

সিল্‌ভি বললে, "তিনজন লোকে একটা ঘর ভরে যায় কখনো?"

ব্রুনোর জেদ তবু থামে না, "ভরে যায়ই তো! আসল লোকটাই বেশির ভাগটা ভরে রেখেছিল। কী ভালো মতন মোটা লোক—মারতে

গেলে হাত ভেঙে যাবে। কিছুতেই ওকে মেরে তক্তা করতে পারবে না!"

ব্রুনোর যুক্তির ধারাটা ঠিক বোধগম্য হল না। বললুম, "মোটা হোক, আর রোগাই হোক, মারের চোটে সকলকেই তক্তা করে দেওয়া যায়।"

ব্রুনো বললে, "ওকে পারবে না। ও লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশি। ওকে মেরে শুইয়ে ফেললে তো দাঁড়ানোর চেয়ে উঁচুই হয়ে থাকবে। তা হলে আর তক্তা করে ফেলা হল কী করে!"

আর একটা কুঁড়েঘরের সামনে এসে পড়ে বললুম, "এবার আমি জিগেস করে আসি।"

ভেতরে যেতে হল না। একজন মহিলা দেখলুম বাচ্চা কোলে করে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। চাষী লোক, পোশাক দেখে মনে হল, কোনো কাজে শহরের দিকে যাচ্ছেন।

আমরা এগিয়ে আসতেই, মহিলাটি শশব্যস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, আমি ভদ্রলোকটিকে জিগেস করলুম, "হাণ্টারের খামারটা কোন্ দিকে, বলতে পারেন?"

মুচকি হেসে ভদ্রলোক বললেন, "তা পারি বৈকি, মশায়! আমিই হলুম গিয়ে জন হাণ্টার, আপনার সেবায় মজুত! আর আধ মাইলটাক গেলেই পাবেন। ঐ সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে বাঁ দিকে মোড় ঘুরলেই দেখতে পাবেন—ওখেনে ঐ একটাই ঘর। আমার গিন্নির সঙ্গে যদি কিছু দরকার থাকে, তাকে ঘরেই পাবেন। আর আমায় দিয়ে যদি আপনার চলে, তাও বলতে পারেন।"

বললুম, "ধন্যবাদ, দুধ জোগানের কথা বলতে এসেছিলুম। স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা কওয়াই বোধ হয় ঠিক হবে।"

"তা, এজ্ঞে ঠিকই বলেছেন ও-সব সেই দ্যাকা-শুনো করে। আচ্ছা, চলি তাইলে, নমস্কার! ভারি ফুট্‌ফুটে গোলগাল বাচ্চাদুটি আপনার!" বলতে বলতে চলে গেলেন।

ব্রুনো বললে, " 'বাচ্চাদুটি' বললে কেন? শুধু 'বাচ্ছা' বলা উচিত ছিল। সিল্‌ভি কি দুটি বাচ্ছা?"

সিল্‌ভি বললে, "আমাদের দুজনকেই বলেছেন।"

ব্রুনোর সেই এক গোঁ, "মোটেই নয়! ফুটফুটে আর গোলগাল' বললেন, শোনো নি?"

সিল্‌ভি বললে, "দুজনের দিকে তাকিয়েই তো বললে রে বাপু!"

ব্রুনো বললে, "তা হলে তো বোঝা উচিত ছিল যে, আমরা দুজনেই ফুট্‌ফুটে নই। আমি তো তোমার চেয়ে খারাপ দেখতে! বলুন তো মশাইবাবু, উনি সিল্‌ভিকেই বললেন না?"

উত্তর দেব কাকে। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে কথা কটা ছুঁড়ে দিয়েই ব্রুনো ততক্ষণে রাস্তার বাঁকের আড়ালে চলে গেছে। কাছাকাছি এসে দেখলুম, ও তখন একটা বেড়া-দেওয়া জমির আগড় বেয়ে উঠে খুব ব্যগ্র চোখে ভেতর দিকে দেখছে। একটা ঘোড়া, একটা গোরু, আর একটা ছাগলছানা সেখানে একসঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে, আর ঘাস খাচ্ছে। ব্রুনো আপনমনে বিড়্‌ বিড়্‌ করছে শুনতে পেলুম 'বাবা হল ঘোড়া; মা হল গোরু। আর ওদের কোলের খোকাটি হল ছোট্টো ছাগলছানা। এমন আজব ব্যাপার জন্মে দেখি নি বাবা।'

উঁচু টিলার ওপর একটা বাড়ি; ঢাল বেয়ে কাঁচা রাস্তা উঠে গেছে। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সিল্‌ভি বললে, "এইটেই নিশ্চয় হাণ্টারদের খামার-বাড়ি। কাছাকাছি আর কোনো খামার তো চোখে পড়ছে না। আর, তুমি তো বললে যে, এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়া উচিত।"

ব্রুনো যখন আগড়ের ওপর ওঠবার চেষ্টা করছিল, তখন ঐ কথাটা মনে মনে ভেবেছিলুম বটে, মুখে তো বলি নি। যাই হোক, সিল্‌ভির ধারণাই ঠিক মনে হল। বললুম, "নেমে পড় তো ব্রুনো। আগড়টা খুলে দাও।"

বেড়া দেওয়া জমির ওপর দিয়ে চলতে চলতে ব্রুনো বললে, "ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে আমরা এসেছি, তাই-না মশাইবাবু? নইলে, ঐ কুকুরটা তোমায় একা পেয়ে যদি কামড়ে দিত!" তার পর সাহস দেবার জন্যে আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে বললে, "একদম ভয় পেয়ো না; খুব ভালো কুকুর, একদম কুদ্ধ হয় না।"

একটা বিরাট ঝাঁকালো নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর দূর থেকে দেখতে পেয়ে লাফাতে লাফাতে কাছে এসে তিড়িং তিড়িং করে আমাদের চার পাশে পাক খেতে লাগল; ঘেউ ঘেউ করে যেন অভ্যর্থনা জানালে। দেখে সিল্‌ভি বললে, "ক্রুদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, এ যে দেখছি ভেড়ার

মতোই নিরীহ ! আরে ! এ তো—চিনতে পারছিস না, ব্রুনো ? এ তো—”

দৌড়ে গিয়ে কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে ব্রুনো বললে, “তাই তো বটে ! আমার সোনামনি কুকুরটা রে !” তার পর দুজনে মিলে কুকুরটাকে কেবলই জড়িয়ে ধরে, আর আদর করে তার গায়ে চাপড় মারতে থাকে। আদরের পালা বুঝি শেষ আর হয় না।

ব্রুনো বললে, “কিন্তু ও এখানে এল কেমন করে ? জিগেস করো তো সিল্‌ভি !”

তার পর কুকুরদের ভাষায় যে-সব কথাবার্তা হল, আমি তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। তবে, আমার দিকে আড়-চোখে চেয়ে কুকুরটা সিল্‌ভির কানে ফিস্ ফিস্ করে কী একটা বলতেই বুঝলুম যে, এবার আমার কথা হচ্ছে। হাসতে হাসতে সিল্‌ভি ফিরে তাকাল।

বললে, “আমায় জিগেস করছে, ‘তুমি কে ?’ আমি বললুম, ‘আমাদের বন্ধু।’ ও বললে, ‘নাম কী ?’ আমি বললুম, ‘ওর নাম মশাইবাবু।’ ও বললে, ‘কিম্ভূত !’ ”

জিগেস করলুম, “কুকুরদের ভাষায় ‘কিম্ভূত’ কথাটার প্রতিশব্দ কী ?”

সিল্‌ভি বললে, “কথাটা একই, তবে কুকুররা যখন বলে, তখন একটু ফিস্‌ফিসে গলায় আধা-কাশি আর আধা-ঘেউ ঘেউ করলে যে-শব্দটা হয়, সেইটা হল ‘কিম্ভূত’। নিরো, বলত ‘কিম্ভূত’ !”

নিরো ততক্ষণে আবার খচ্‌মচ্ করে লাফাতে লাফাতে আমাদের চারি দিকে পাক খেতে শুরু করেছে। সিল্‌ভির কথামতো দু-চারবার ‘কিম্ভূত’ বলে ডাক ছাড়লে। দেখলুম, সিল্‌ভির বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

চলতে চলতে বললুম, “এই লম্বা পাঁচিলটার ও-পাশে কী আছে কে জানে।”

নিরোর সঙ্গে কথা কয়ে নিয়ে সিল্‌ভি বললে, ‘ও-পাশে ফলের বাগান। ঐ দেখ, কোণের কাছে একটা ছেলে পাঁচিল টপ্‌কে লাফিয়ে নেমে মাঠ ভেঙে কেমন দৌড়ে পালাচ্ছে। নিশ্চয়ই আপেল চুরি করছিল।’

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাওয়া করে গেল, কিন্তু ছোঁড়াটার নাগাল পাওয়া যাবে না দেখে, তখনি ফিরে এল।

বললে, “ধরতে পারলুম না। একটু আগে যদি দৌড় শুরু করতে পাত্তুম গো। ছেলেটের পকেটদুটো আপেলে একেবারে বোঝাই !”

কুক্কুর-রাজ সিল্‌ভির দিকে ঘাড় উঁচিয়ে নিজের ভাষায় কী বললে।

সিল্‌ভি বলে উঠল, "আরে, তাইতো ; তুমিই তো পারো ! কী বোকামি দেখ তো, কথাটা মাথাতেই আসে নি ! নিরোই ওকে পাকড়াবে। কিন্তু, আগে ওকে অদৃশ্য করে দিই, দাঁড়াও।" এই বলে তাড়াতাড়ি সেই জাদু-লকেটটা বার করে নিরোর মাথার ওপর দোলালে, তার পর তার পিঠ-বরাবর বুলিয়ে দিলে।

ব্রুনোর আর তর সইছে না। বলে উঠল, "ঐ বেশ হয়েছে ! যাও তো কুকুরমণি ! পাকড়াও তো ওকে !"

সিল্‌ভি রাগ করে বললে, "আঃ, ব্রুনো ! এত সাত-তাড়াতাড়ি ওকে লেলিয়ে দেবার কোনো মানে হয় ! ল্যাজটা অদৃশ্য করা বাকি রয়ে গেল যে !"

নিরোর ঝাঁকড়া লোমওলা ল্যাজটা বাতাসে দোল খেতে খেতে যে-ভাবে দূরে চলে যেতে লাগল, তাতে বুঝলুম, ও তীরের বেগে ছুটছে মাঠের ওপর দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আপেল-চোর ছেলেটার নাগাল ধরে ফেললে।

সিল্‌ভি ওর দৌড় দেখছিল, এবার চেঁচিয়ে উঠল. "ছেলেটার একটা ঠ্যাং ধরে ফেলেছে ! আর তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই, ব্রুনো !"

বেশ ধীরে-সুস্থেই আমরা এগিয়ে গেলুম ছেলেটার কাছে। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার দেখলুম ; ছেলেটা সর্বাঙ্গ দিয়ে ভীষণভাবে হাঁচড়-পাঁচড় করে ছুটে পালাতে চাইছে, কিন্তু তার বাঁ পাটা কোন অদৃশ্য শক্তিতে যেন মাটিতে আটকে বসে গেছে। আর, তার সামান্য একটু দূরেই, উঁচুতে একটি রোমশ ল্যাজ দিব্যি বাতাসে দোল খেয়ে চলেছে—তার মানে, নিরো ভারি মজার একটা খেলা পেয়ে গেছে !

খুব গম্ভীর হয়ে বললুম, "কী ব্যাপার বল তো হে, ছোকরা ?"

আপেল-চোর ছোঁড়াটা কাত্‌রে উঠে বললে, "গোড়ালিতে খিল ধরে গেছে ! পাটা নড়তেছে না !"

ছেলেটার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ব্রুনো খুব রাশভারি ঢঙে বললে, "শোনো, বাপু ! আপেলগুলো দিয়ে দাও !"

ছেলেটা আমার দিকে একবার তাকালে ; বুঝলে, আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। সিল্‌ভির দিকে তাকালে ; সেদিক থেকেও

আশঙ্কা করবার মতো কিছু পেলে না। তখন সাহস পেয়ে তেড়িয়া হয়ে বললে, "তোমাদের পরোয়া করি নাকি? আপেল ফেরত দিতে আমার বয়েই গ্যাচে!"

নিরোর অদৃশ্য পিঠে চাপড় মেরে তার কানে কানে সিল্‌ভি ফিস্‌-ফিসিয়ে বললে, "আর একটু জোরে চেপে ধরো তো!" ছোঁড়াটা হঠাৎ জোরে চীৎকার করে উঠতেই বোঝা গেল যে, কুক্কুর-রাজ সঙ্গে সঙ্গে সিল্‌ভির হুকুম তামিল করেছেন।

বললুম, "কী হল? গোড়ালির অবস্থা কি আরো খারাপ নাকি?"

ব্রুনো আবার সেইসঙ্গে তাকে সাফ জানিয়ে দিলে, "আপেল না দিলে, আরো খারাপ হবে, কেবলই ভালো মতন খারাপ হবে!"

ছেলেটাও বুঝতে পারলে যে, কথাটা অবিশ্বাস করে লাভ নেই, তাই নিতান্তই ব্যাজার হয়ে পকেট থেকে একটা একটা করে আপেল বার করে দিতে লাগল। সিল্‌ভি আর ব্রুনো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ছেলেটা একবার করে কাত্‌রে ওঠে, আর ব্রুনো খুশিতে তিড়িং তিড়িং করে নাচতে থাকে।

ছেলেটা বললে, "আর নেই।"

ব্রুনো বলে উঠল, "মোটেই নয়! ঐ পকেটে আরো তিনটে আছে!"

কুক্কুর-রাজকে সিল্‌ভি আর-একবার ইশারা করতেই ছেলেটা আবার একবার চিলের মতো চেচিয়ে উঠল, আর, বাকি তিনটে আপেলও বেরিয়ে এল তার পকেট থেকে।

সিল্‌ভি কুকুরদের ভাষায় বললে, "এবার ওকে ছেড়ে দাও!" সঙ্গে সঙ্গে ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে ছেলেটা রাম-দৌড় মারলে; মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে গোড়ালিতে হাত বোলাতে লাগল—তখনো তার ভয়, গোড়ালিতে আবার না খিল ধরে।

আপেলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাগানের পাঁচিলের ধারে গিয়ে ব্রুনো একটা একটা করে সেগুলো ভেতরে ছুঁড়ে দিতে লাগল। তার পর আমাদের কাছে ফিরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "কয়েকটা আপেল বোধ হয় ভুল গাছের তলায় গিয়ে পড়েছে!"

সিল্‌ভি আমায় বললে, "এক মিনিট দাঁড়াও। নিরোকে আবার দেখা যাবার মতো করে দেওয়া দরকার!"

ব্রুনো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না ভাই, কোরো না!" ততক্ষণে সে

রাজার পিঠে চড়ে তার লোমের গোছা বাগিয়ে ধরে বেশ জমিয়ে চেপে বসেছে। বললে, "ও এইরকম থাকলে কী মজা!"

কুক্কুর-রাজ অদৃশ্য হয়েই রইলেন, ব্রুনো সওয়ার হয়েই রইল। আমরা হাণ্টারদের বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন হাণ্টারের গিন্নি। আমরা কাছাকাছি আসতেই, সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে খুব হতভম্ব হয়ে গেলেন, বুঝতে পারলুম। বিড়্‌বিড়্‌ করে বললেন, শুনতে পেলুম, 'চশমাটায় কিছু গোলমাল হয়েছে, মনে হচ্ছে!' তার পর চশমাটা খুলে এপ্রনের কোণ দিয়ে খুব ঘষে ঘষে কাঁচদুটো পরিষ্কার করতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে, ব্রুনোকে নামিয়ে নিয়ে সিল্‌ভি তাড়াতাড়ি কুক্কুর-রাজকে পুরোপুরি দেখা যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

এখন সবই স্বাভাবিক; তবু মহিলার খটকা কাটে নি। বললেন, "চোখের জোর কমে যাচ্ছে। তবে এখন তোমাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি! এসো তো সোনারা! একটা করে চুমু দি!"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে আমার পেছনে আড়াল নিলে; সিল্‌ভি অবশ্য দুজনের হয়েই গাল বাড়িয়ে দিলে। সবাই ভেতরে গেলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ম্যাটিল্‌ডা জেন

মিসেস হান্টার ব্রুনোকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "আমার কাছে এসো তো বাছারা! এবার, আমায় সব খুলে বলো তো।"

ব্রুনো বললে, "অত কথা বলবার সময় হবে না। তা ছাড়া আমি সবটা জানিও না।"

ভদ্রমহিলা ধাঁধায় পড়ে গেলেন। সিল্‌ভির ওপর ভরসা করে জিগেস করলেন, "ও বুঝি পিঠে চড়তে খুব ভালোবাসে?"

সিল্‌ভি বললে, "তাই তো মনে হয়। ও এতক্ষণ ঐ নিরোর পিঠে চড়ে ছিল।"

ভদ্রমহিলা আলমারি খুলে একটা কেক বার করে বললেন, "বাছাদের একটু কেক দিই, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে!—দেখো, বাইরের শুকনো খড়্‌খড়ে ছালটা যেন ফেলে দিয়ো না, ইচ্ছে করে কোনো জিনিস অপচয় করা উচিত নয়! পড়ার বইয়ে কী লেখা আছে, জানো তো?"

ব্রুনো বললে, "জানি না তো? কী লেখা আছে?"

একটি গোল-গাল ফুট্‌ফুটে মেয়ে সেইমাত্র ঘরে ঢুকে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তার দিকে চেয়ে খুব গর্বের সঙ্গে মিসেস হাণ্টার বললেন, "তোমার ছড়ার বইয়েতে অপচয় সম্বন্ধে কী লেখা আছে, একবার শুনিয়ে দাও তো বেসী!"

বেসী সঙ্গে সঙ্গে এমন চাপা গলায় ছড়াটা বলে উঠল যে, খুব কষ্ট করে শুনতে হল : " 'অপচয়ে অভাব আসে ; ভাববে তুমি পরে—যা ফেলেছি, খুঁজে পেলে খেতাম মজা করে !' "

"এবার তুমি বল তো মানিক ! অপচয়ে অভাব—"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলে, "অপচয়ে অভাব—তাপ্পর কী সব—" কিন্তু পরক্ষণেই বললে, "আর মনে নেই।"

"বেশ, তা যেন মনে নেই ; কিন্তু এ-থেকে কী শিখলে, সেটা তো বলতে পারো ?"

কেকে আর-একটা কামড় দিয়ে ব্রুনো খানিকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে নিলে, কিন্তু এ-থেকে সহজে কোনো শিক্ষার হদিস বার করতে পারলে না।

সিল্‌ভি ফিস্ ফিস্ করে ব্রুনোকে বলে দিলে, "সদা-সর্বদা—"

ব্রুনোও প্রথমে ফিস্‌ফিস্ করে শুরু করলে, "সদা-সর্বদা—" তার পর হঠাৎ সোৎসাহে বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল, "ফেলবার সময়ে দেখে নেবে, কোথায় গিয়ে পড়ল !"

"কোথায় কী পড়ল, মানিক আমার ?"

ব্রুনো বললে, "কী আবার, কেকের শক্ত কড়্‌কড়ে ছালটা ! "যা ফেলেছি, খুঁজে পেলে—" কোথায় ফেলেছি জানলে তো আর ভাবনা নেই, খুঁজে পাওয়া যাবেই।"

ব্রুনোর এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে ভদ্রমহিলা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। কী বলবেন, ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বেসীর প্রসঙ্গেই ফিরে যেতে হল। বললেন, "বেসীর পুতুল দেখবে নাকি ? যাও, বেসী, খোকা-খুকুদের পুতুল দেখাও ; তোমার ম্যাটিল্‌ডা জেন-কে দেখিয়ে আনো।"

বেসীর তখন আর লজ্জা-টজ্জা কিছু নেই। বেশ সপ্রতিভভাবে সিল্‌ভিকে বললে, "ম্যাটিল্‌ডা জেন এই সবে ঘুম থেকে উঠল। এখন জামা-কাপড় ছাড়াব। একটু আমার সঙ্গে আসবে, ভাই। ফ্রকের দড়িগুলো বাঁধতে এত শক্ত লাগে না !"

সিল্‌ভি বললে, "আমি ঠিক বেঁধে দিতে পারব।" ওরা দুজনে ঘর থেকে চলে গেল। ব্রুনোর কোনো গ্রাহ্য নেই ; সে বড়োদের মতো গম্ভীর চালে পায়চারি করতে করতে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পুতুল নিয়ে খুকুপনা ওর পোষায় না।

তখন, আমায় একা পেয়ে, মিসেস্ হাণ্টার তাঁর আদরের মেয়ে বেসীর গুণকীর্তন করতে শুরু করে দিলেন (কোন মাই-বা না করেন) তা ছাড়া, কবে কবে তার মারাত্মক সব অসুখ করেছিল (দিব্যি গোল-গাল চেহারা আর আপেলের মতো গাল দেখলে অবশ্য বিশ্বাস হয় না) আর, কতবার যে যায়-যায় অবস্থা থেকে সে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছিল, সেই-সব কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

আদরিনী কন্যার গল্প যখন ফুরিয়ে এসেছে, তখন বললুম, "এবার কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে। ওদের ডাকবেন নাকি ? ম্যাটিল্‌ডা জেন এবার বরং একটু বিশ্রাম নিক, একদিনের পক্ষে অনেক তো হল !"

উঠতে উঠতে তিনি বললেন, "এক্ষুনি ডেকে আনছি।" তার পর ব্রুনোর দিকে চোখ পড়তে, বললেন, "আমাদের এই খুদে মশাইটি হয়তো বলতে পারেন, ওরা কোন দিকে গেছে ?"

বললুম, "ওরা কোথায় গো, ব্রুনো ?"

ব্রুনো দায়সারা গোছের উত্তর দিলে, "মাঠে নেই। কারণ মাঠে কেবল একগাদা শুয়োর রয়েছে ; সিল্‌ভি তো শুয়োর নয়। আর, দ্যাখ, আমাকে আর জ্বালাতন কোরো না ! এখন আমি এই মাছিটাকে গল্প বলছি—মোটেই মন দিয়ে শুনছে না !"

হাণ্টার-গিন্নি বললেন, "নির্ঘাৎ আপেলবাগানে আছে।" ব্রুনোর গল্প বলায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তখন আমরা আপেলবাগানে গিয়ে ওদের দেখতে গেলুম। দেখলুম, ওরা দুটিতে পাশাপাশি বেড়াচ্ছে। সিল্‌ভি ম্যাটিল্‌ডা জেনকে কোলে নিয়েছে, আর বেসী একটা বাঁধাকপির পাতা নিয়ে, ছাতার মতো করে ম্যাটিল্‌ডার মুখখানিকে রোদ থেকে আড়াল করে রেখেছে।

আমাদের দেখতে পেতেই, বেসী বাঁধাকপির পাতাটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে চলে এল ; সিল্‌ভি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল—কোলে বাচ্ছা রয়েছে তো !

বেসী সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দিলে, "আমি হলুম ম্যাটিল্‌ডার মা ; আর সিল্‌ভি হল ওর ধাই-মা ! আর সিল্‌ভি না, আমাকে কী সুন্দর একটা গান শিখিয়ে দিয়েছে ! গানটা ম্যাটিল্‌ডাকে শোনাবার জন্যে !"

সিল্‌ভির গলায় গান শোনবার বড়ো সাধ আমার। তাই সুযোগ

পেয়ে বললুম, "আর একবার গাও তো সিল্‌ভি, আমরা শুনি।" কিন্তু সিল্‌ভি লজ্জায় একেবারে জড়সড় হয়ে গেল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে খুব আকুল স্বরে আমায় বললে, "আমায় গাইতে বোলো না!' তার পর খোলা গলায় বললে, "বেসী তো বেশ ভালো শিখে গেছে। ও-ই গাইতে পারবে।"

বেসীর মা তো গর্বে ফুলে উঠলেন। বললেন, "ঠিক, ঠিক, বেসীই গাক!" তার পর চুপিচুপি জানালেন, "বলা ভালো দেখায় না, কিন্তু বেসীর গলাখানা চমৎকার!"

আবার গাইবার সুযোগ পেয়ে ম্যাটিল্‌ডার নাদুস-নুদুস মা-জননীটি খুশিতে ডগমগ হয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে বসে পড়ল। ম্যাটিল্‌ডার তো দেখলুম রূপের সীমা নেই! সেই হতকুচ্ছিৎ পুতুল-মেয়েকে কোলে নিতে, সেটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে কোলের ওপর হেলে পড়ে রইল—হাত, পা, কোমর কিছুই ভাঙে না আর-কি। তার পর, মেয়েকে কোলে নিয়ে মা-জননী আহ্লাদে ফেটে পড়ে ঘুমপাড়ানি গানটির আরম্ভেই এমন একটা আওয়াজ বার করলে যে, তার কোলের মেয়েটি রক্ত-মাংসের হলে, নির্ঘাৎ ভিমি যেত! সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি-মার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ধাই-মা অত্যন্ত সসম্ভ্রমে তার দু-কাঁধে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকে শুধরে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে রইল; কথা ভুলে গেলে খেই ধরিয়ে দেবারও দরকার হতে পারে।

শুরুর সেই বেসুরো চীৎকারটা কিন্তু সাময়িক ব্যাপার। সুরের দু-একটা পর্দা পার হতে না হতেই বেসীর গলার আওয়াজ নরম হয়ে এল; খুব ক্ষীণ হলেও; বেশ মিষ্টি গলায় গান গাইতে লাগল সে। প্রথম দিকে বড়ো-বড়ো কালো-কালো চোখ দুটি তার মায়ের মুখ থেকে কিছুতেই নড়তে চাইছিল না; কিন্তু তার পর ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি ভেসে চলতে লাগল আপেলগাছের মাথায় মাথায়। মনে হল, তার কোলের মেয়েটি আর তার ধাই-মা ছাড়া আর কোত্থাও কেউ নেই!

সিল্‌ভি মাঝে মাঝে চাপা গলায় সুর ধরিয়ে দেয়, আর বেসী গেয়ে চলে:

"ম্যাটিল্‌ডা জেন, তুমি চোখ তুলে চাও না,
পুতুল, কি বই, কিছু দেখতেই পাও না;

কত কি দেখাই আমি, মনে হয় সন্দ'—
ম্যাটিল্ডা জেন, তুমি নিশ্চয়ই অন্ধ !

"কত ধাঁধা বলি আমি, মজাদার ঘটনা,
তোমার মনের কথা শুধিয়েছি কত-না ;
একটু কওয়াতে কথা সেধে হার মানলাম—
ম্যাটিল্ডা জেন. তুমি বোবা মেয়ে, জানলাম !

"ম্যাটিল্ডা, সোনা মেয়ে, কতবার ডেকেছি,
সাড়া দেবে বলে কান খাড়া করে রেখেছি ;
চীৎকারে সারা পাড়া হল ঝালাপালা যে—
ম্যাটিল্ডা জেন, তুমি একেবারে কালা যে !

"ম্যাটিল্ডা, মনে তুমি পেয়ো নাকো কষ্ট ;
কানা, বোবা, কালা হও, বলে রাখি স্পষ্ট,
একজন তোমাকে যে তবু ভালোবাসবেই—
ম্যাটিলডা জেন, তুমি জেনে রাখো, আমি সে-ই !"

গানের প্রথম তিনটে চরণ সাধারণভাবে গাইলেও, শেষ চরণটা গাইবার সময়ে ছোট্টো মেয়ে বেসীর গলা একটা প্রবল আবেগে ভরে উঠল। হঠাৎ কেমন যেন আত্মহারা হয়ে উঠল, গলার স্বর ক্রমশই উঁচু হয়ে উঠতে লাগল, শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করবার সময়ে দুহাতে ম্যাটিল্ডাকে চেপে ধরলে তার বুকের মাঝখানে।

ধাই-মা খুব গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "এবার ওকে চুমু খাও !" পরক্ষণেই ম্যাটিল্ডার বোকা-বোকা হাসি-মাখানো নিষ্প্রাণ মুখখানা চুমোয় চুমোয় ভরে উঠল।

হাণ্টার-গিন্নী বললেন, "কী চমৎকার গান ! গানটা কে বেঁধেছে গো !"

খুব অপ্রতিভের মতো সিল্ভি বললে, "আমি বরং দেখি গে যাই, ব্রুনো কোথায় গেল !" বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল। অদ্ভুত মেয়ে ! সুখ্যাতি শুনতে, এমন-কি, কারো নজরে পড়তেও তার এত সংকোচ !

বেসী যে আমাদের চেয়ে বেশি খবর রাখে, তাতে তার ভারি গর্ব ; বললে, "গানটার কথা লিখেছে সিল্‌ভি, সুর দিয়েছে ব্রুনো—আর গেয়েছি আমি !" (শেষের খবরটা না দিলেও চলত)।

সিল্‌ভির পিছন পিছন বসবার ঘরে এসে দেখলুম, জানলার গোবরাটে কনুয়ের ভর রেখে ব্রুনো তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মাছিকে গল্প শোনাবার পালা শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হল ; এখন অন্য কী কাজে ব্যস্ত রয়েছে, কে জানে! আমরা ঘরে ঢুকতেই বলে উঠল, "জ্বালাতন কোরো না আমায়, শুয়োর গুনছি !"

জিগেস করলুম, "মাঠে ক'টা শুয়োর আছে ?"

ব্রুনো বললে, "প্রায় একহাজার চারটে !"

সিল্‌ভি বললে, "তার মানে, প্রায় হাজার খানেকই তো হল। আবার 'চার' বলবার দরকার কি ? মোটামুটি হিসেব করলে কি আর তিনটে কি চারটের কথা জোর করে বলা যায় ?"

ব্রুনো বিজয়গর্বে বলে উঠল, "আবার ভুল করলে তুমি ! চারটে শুয়োর এই জানলার তলায় ঘুর্ ঘুর্ করছে আর খাচ্ছে। কাজেই, চারটে শুয়োর যে আছে, সেটাই তো সব চেয়ে জোর করে বলা যায়! বরং ঐ 'হাজারটা' জোর দিয়ে বলা শক্ত !"

ব্রুনোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে জানলার বাইরে উঁকি মেরে সিল্‌ভি বললে, "কিন্তু, কয়েকটা শুয়োর নিশ্চয়ই খোঁয়াড়ে ফিরে গেছে।"

ব্রুনো বললে, "হ্যাঁ, তা গেছে। তবে, এত আস্তে আস্তে, আর এত কম যে, আমি সেগুলোকে ধরি নি।"

ওদের কথাবার্তার মাঝখানে বললুম, "এবার যে ফিরতে হবে গো। নাও, বেসীকে বল যে, আমরা যাচ্ছি।" সিল্‌ভি বেসীর গলা জড়িয়ে চুমু খেলে, ব্রুনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। (পরে আমায় বলেছে, সিল্‌ভি ছাড়া আর কাউকে ও চুমু খায় না)।

হাণ্টার-গিন্নী আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ; এল্‌ভেস্টনের দিকে পা চালালুম।

বাসায় ফিরে আর্থারের মুখে খুশির উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করলুম। ওর সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলুম, আমার কামনা—আর্থারের আশা—সফল হতে চলেছে। শুনলুম, বিয়ের প্রস্তাবে মিউরিয়েল রাজি !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মেইন হের্

সেদিন 'হল'-এর বাগানের দরজার সামনেই লেডি মিউরিয়েলের সঙ্গে দেখা। তার হাসি-খুশি ভাব দেখে নিশ্চিন্ত হলুম।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিউরিয়েল বললে, "ভেতরে চলুন, বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।" তখন আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। আর, হঠাৎ সেই 'ছমছমানি' ভাবটা টের পেলুম। দেখলুম, সেই রাস্তা ধরে প্রফেসর এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে! আরো আশ্চর্য ব্যাপার—মিউরিয়েলও তাঁকে দেখতে পাচ্ছে।

ব্যাপারটা কী? বাস্তব জীবন আর রূপকথার জীবন কি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল? না-কি, মিউরিয়েলেরও 'ছমছমানি' শুরু হয়েছে, সেও আমার মতো রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছে? আমার ঠোঁটের ডগায় তখন এই কথাগুলো ভীড় করে এল—"রাস্তায় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি; তোমার চেনা নয়, বোধ হয়। বলতো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।" বলতে যাচ্ছি, আর, কী আশ্চর্য! কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরোবার আগেই মিউরিয়েল বলে উঠল, "রাস্তায় আমার এক পরিচিত ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি; আপনার চেনা নয়, বোধ হয়। বলেন, তো আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

তখনো 'ছমছমানি' ভাবটা কাটে নি ; সবে যেন স্বপ্ন দেখে উঠলুম, এমনি আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে লাগলুম সেই ভদ্রলোকের চেহারাটা বারবার পালটে যেতে লাগল। একবার মনে হয় প্রফেসর, সঙ্গে সঙ্গে দেখি, না অন্য লোক! তিনি গেটের কাছে এসে পৌঁছতে, বুঝলুম, সত্যিই অন্য লোক, প্রফেসর নন। পরিচয় করানোর কাজটা মিউরিয়েলকেই দিতে হল দেখছি! মিউরিয়েল সবিনয়ে গেট খুলে তাঁকে স্বাগত জানালে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক—দেখেই বোঝা যায়, জার্মান—কেমন আচ্ছন্নের মতো চার দিকে তাকাতে লাগলেন, যেন তিনিও এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন!

না, প্রফেসর হওয়া অসম্ভব। কারণ, শেষ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার পর এই কদিনে এত বড়ো দাড়ি গজিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, তা হলে আমায় তো তাঁর চেনা উচিত ছিল ; কারণ, আমার চেহারা তো আর বদলে যায় নি।

লেডি মিউরিয়েল বললে, "আসুন, আপনার সঙ্গে মেইন হের্-এর পরিচয় করিয়ে দিই।" তখন, তিনি টুপি খুলে আমার দিকে নির্লিপ্ত-ভাবে তাকিয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে গর্বিত বোধ করছি, মশায়!" তাঁর কথায় জার্মান টান রয়েছে। বুঝলুম, আগে এঁর সঙ্গে দেখাই হয় নি কখনো।

বাগানের সেই পরিচিত কোণটায় দেখলুম, চায়ের ব্যবস্থা সব তৈরি। মিউরিয়েল আর্লকে ডাকতে গেল, আমরা দুজনে আরাম-কেদারায় বসলুম। সেলাইয়ের সরঞ্জাম পড়ে ছিল, মেইন হের্ একটা সেলাইয়ের কাজ তুলে নিয়ে বড়ো-বড়ো চশমার ভেতর দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। (প্রফেসরের সঙ্গে কী সাদৃশ্য!) আপন মনে বললেন, 'রুমাল সেলাই করছে।' ইংরেজ মহিলাদের সময় কাটাবার পক্ষে সেলাই করাটা প্রচলিত রীতি, তাই-না?"

বললুম, "মেয়েদের এই কৃতিত্বের ক্ষেত্রে এখনো পুরুষরা নাক গলায় নি!"

মিউরিয়েল তখন তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর্লের সঙ্গে মেইন হের্-এর মামুলি কথাবার্তার মধ্যে চায়ের পর্ব শেষ হতেই, মেইন হের্ হঠাৎ বলে উঠলেন, "যে-সব সময় কাজে লাগে না, অযথা নষ্ট হয়, তোমাদের দেশে সে-সময়গুলো কী হয়?"

মিউরিয়েল গম্ভীরপানা মুখ করে বললে, "কে জানে? এইটুকু বলা যায় যে, যা গেছে, তা গেছে।"

মেইন হের্ বললেন, "আমার দেশে—ইয়ে, সহজে, আমি এমন একটা দেশে গিয়েছি, যেখানে ফালতু সময়গুলো তারা জমিয়ে রাখে; বহুকাল বাদে, সেগুলো বেশ কাজে আসে! ধরো, সারা সন্ধেটা পড়ে আছে, কথা বলার কেউ নেই; করবার মতো কোনো কাজও হাতে নেই; অথচ শুতে যাবারও সময় হয় নি। তখন তুমি কী কর?"

মিউরিয়েল খোলাখুলি বলে ফেললে, "মেজাজ খিঁচড়ে যায়, ইচ্ছে করে ঘরের জিনিসপত্তর সব আছাড় মেরে ভেঙে ফেলি।"

"আমি যে দেশের কথা বলছি, সেখানকার লোকেরা কিন্তু তা করে না। খুব একটা সহজ উপায়ে তারা সেই ফালতু সময়টাকে জমিয়ে রেখে দেয়—ঠিক কী ভাবে করে, তা বোঝানো অবশ্য মুশকিল। আর, পরে যখন বাড়তি সময়ের দরকার হয়, তখন ভাঁড়ার থেকে বার করে নিয়ে কাজে লাগায়।"

মুখে অবিশ্বাসের হাসি নিয়ে আর্ল তাঁর কথা শুনছিলেন। এবার জানতে চাইলেন, "বুঝিয়ে বলা মুশকিল কেন?"

মেইন হের্ উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন, "তার কারণ হল, এ-ধরনের ব্যাপার বুঝিয়ে বলার মতো শব্দ আপনাদের ভাষায় নেই! বোঝাতে পারতুম, যদি আমি—কিন্তু সে-ভাষা তো আপনারা বুঝবেন না!"

সে-ভাষাটার নাম আর জানা হল না; লেডি মিউরিয়েল বলে উঠল, "তা তো বুঝবই না! ভালো করে শেখাই হয়ে ওঠে নি! মানে অনর্গল কথা বলতে পারার মতো শিখি নি আর-কি! যাক্ গে, আরো কিছু অদ্ভুত কথা শোনান, মেইন হের্!"

"তারা ট্রেন চালায়, কিন্তু এঞ্জিন লাগে না—থামাবার যন্ত্রপাতি ছাড়া, আর কিছুরই দরকার হয় না। কী, অদ্ভুত না?"

জিগেস না-করে পারলুম না, "কিন্তু ট্রেনটা চলবার জন্যে তো একটা শক্তির দরকার—সেটা আসে কোত্থেকে?"

মেইন হের্ চট্ করে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। তার পর চশমা খুলে খুব মন দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন। আবার একবার আমার দিকে তাকালেন, বোঝা গেল, বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে

গেছেন। বুঝতে পারলুম, তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন—আমিও করছি—আগে কোথাও না-কোথাও নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হয়েছিল।

শেষকালে বললেন, "ওরা মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তিকে কাজে লাগায়! মহাকর্ষ শক্তির কথা তোমাদের দেশে তো জানা জিনিস, তাই-না?"

আর্ল বললেন, "তা যদি হয়, তা হলে ট্রেনটা তো কেবল নীচের দিকেই যাবে। সব ট্রেনটা নীচের দিকে গেলে তো আর চলবে না!"

মেইন হের্ বললেন, "সব ট্রেনই নীচের দিকে যায়।"

"দু দিকের ট্রেনই নীচের দিকে যাবে কী করে?"

"দু দিকের ট্রেনই যায়।"

আর্ল বললে, "এবার হাল ছাড়লাম!"

মিউরিয়েল বললে, "কী করে হয়, বুঝিয়ে দিতে পারেন? তবে যে-ভাষাটা ভালো করে শেখা হয় নি আমার, সেই ভাষাটা ব্যবহার করবেন না যেন!"

মেইন হের্ বললেন, "বোঝানো মোটেই শক্ত নয়। ট্রেনের লাইন পাতা হয় সরলরেখার মতো সোজা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। তা হলে, পৃথিবীর পেটের ভেতরকার যে কেন্দ্রবিন্দু, রেলপথের মাঝ-বরাবর জায়গাটা নিশ্চয়ই দুই প্রান্তের তুলনায় সেই কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থাকবে! কেন্দ্রবিন্দুর যত কাছে হবে, টান হবে তত বেশি। কাজেই, রেল-লাইনের যে-কোনো একপ্রান্ত থেকে ট্রেন ছাড়লে, মাঝামাঝি জায়গা পর্যন্ত সেটা টানের জোরেই হু হু করে ছুটে চলবে, আর মাঝামাঝি পৌঁছবার পর সেই গতিবেগের দৌলতেই বাকি পথটুকু পার হয়ে যাবে।"

মিউরিয়েল বললে, "ধন্যবাদ, বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি জায়গায় ট্রেনের গতিবেগ যা হবে, সে তো ভয়ংকর!"

লেডি মিউরিয়েলের আগ্রহ দেখে মেইন হের্ বেশ খুশি হয়েছেন, বোঝা গেল। তাঁর মুখে এখন খৈ ফুটছে। বললেন, "আমরা কী চালে চলি, তাই তো জানো না। দড়ি-ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার দৌড় আমাদের কাছে কিছুই নয়!"

মিউরিয়েল শিউরে উঠে বললে, "আমাদের কাছে তো ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাপার!"

"তার কারণ, তোমাদের গাড়ি তো সবটাই ঘোড়ার পিছনে থাকে।

তোমাদের ঘোড়া আগে দৌড়োয়। গাড়ি পেছনে পেছনে চলে। তোমাদের ঘোড়া যদি লাগামে-পরানো লোহার খলিনটা দাঁতে কামড়ে ধরে, আর সেই অবস্থায় উদ্দাম হয়ে ছোটে, তাকে থামাবে কে? কাজেই, তোমরা হাওয়ার বেগে ছুটতেই থাক! আর শেষপর্যন্ত যা হবার তা-ই হয়, তোমরা উলটে পড়!"

"আর, আপনাদের ঘোড়াও যদি খলিনটা দাঁতে চেপে ধরতে পারে?"

"কিছুই যায়-আসে না! কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ঘোড়া গাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় জোতা আছে যে! ঘোড়াটা যেখানে আছে, তার সামনে দুটো চাকা, আর পেছনে দুটো চাকা। তলাটা ফাঁকা, মাঝখানে ঘোড়া, আর তাকে ঘিরে বসবার জায়গা। একটা বেল্টের এক মুখ গাড়ির ছাদের সঙ্গে আটকানো। বেল্টটা ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে গিয়ে উঁচুতে উঠে ছাদের ওপাশে একটা কাঠের ডাণ্ডার গায়ে জড়ানো। একটা হাতল আছে, সেটা ঘোরালে ডাণ্ডাটা পাক যায়, আর লাটাইয়ে সুতো জড়াবার মতো, বেল্টটা তাতে পাক খেয়ে খেয়ে জড়াতে থাকে। কুয়ো থেকে জল তোলবার জন্যে অনেক সময়ে এইরকম ব্যবস্থা থাকে। যাই হোক, হাতল ঘোরালেই, বেল্টটা গোটাতে থাকবে, আর সেটা ক্রমশই ছোটো হতে থাকবে, এটা বুঝতে পারছ তো? বেশ, এবার ধর, ঘোড়াটা লাগামের খলিন দাঁতে চেপে ধরেছে, তাই লাগাম টেনেও তাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। না-গেল, তো কী হল? দৌড়োক না, কত দৌড়বে? ধর, ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে দৌড়চ্ছে! থামানো দরকার! আমরা ঐ লাটাই-যন্ত্রের হাতল ঘোরাব!—পাঁচ পাক, ছ' পাক, সাত পাক—ব্যস্! বেল্টটা ছোটো হয়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে ঘোড়া তো শূন্যে উঠে গেছে! এখন হাওয়ায় যতই ঠ্যাং ছুঁড়ুক না, গাড়ি একদম নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। ওকে ঘিরেই তো বসে আছি আমরা গাড়ির মধ্যে, তাই ওর হাল-চাল দেখতেও পাচ্ছি। যেই দেখব বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে, অমনি আবার উলটো দিকে হাতল ঘুরিয়ে বেল্ট বড়ো করে দেব, আলগা পেয়ে ওর পা আবার মাটিতে ঠেকবে। আবার ও খুশি হয়ে গাড়ি টানতে থাকবে!"

আর্ল খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, "চমৎকার! গাড়ির আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে না-কি?"

"চাকায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শরীর সারাবার জন্যে আপনারা

সময়ে সময়ে সমুদ্রের ধারে কোনো জায়গায় হাওয়া বদলাতে যান ; ঢেউয়ের তালে তালে কখনো ওঠেন, কখনো পড়েন, কখনো ওলট-পালট খান—কখনো কখনো ডুবেও যান। আমরা ডাঙাতেই সব করি ; আপনাদের মতো উঠি, পড়ি, ওলট-পালট খাই, কিন্তু ডুবে যাওয়া ? কস্মিনকালেও নয় ! জলই তো নেই !"

"চাকাগুলো কেমনতরো ?"

"ডিমের মতো লম্বাটে ; তাই চলবার সময়ে গাড়ি একবার ওঠে, একবার নামে।"

"বুঝেছি, তাই একবার সামনে ঝোঁকে, একবার পেছনে হেলে। কিন্তু ওলট-পালট হয় কী করে ?"

"চাকাগুলো এমনভাবে লাগানো হয়, যাতে গাড়ির একদিকটা যখন উঁচু হচ্ছে, অন্য দিকটা তখন নিচু হচ্ছে ; এইভাবেই চলতে থাকে। নৌকোমতন অনবরতই টল্‌মল্ করছে আর-কি। আমাদের এই নাও-গাড়িতে চড়তে গেলে মাঝিগিরিতে বেশ এলেম থাকা দরকার।"

আর্ল বললেন, "তাতে কোনো সন্দেহই নেই !"

মেইন হের্ দাঁড়িয়ে উঠলেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার উঠি, আর-এক জায়গায় যাবার কথা আছে।"

তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে মিউরিয়েল বললে, "আহা রে, যদি কিছু ফালতু সময় জমিয়ে রাখতুম, তা হলে আপনাকে আর কিছুক্ষণ ধরে রাখা যেত।"

মেইন হের্ বললেন, "তা হলে আমিও খুশি হয়েই থাকতে রাজি হতুম। কিন্তু, এখন তো না-গেলেই দেখছি নয়।"

তিনি চলে যেতে মিউরিয়েলকে জিগেস করলুম, "কোথায় তাঁকে প্রথম দেখেছিলে, বল তো ? থাকেন কোথায় ? আসল নামটাই-বা কী ?"

মনে করবার জন্যে ভাবতে ভাবতে মিউরিয়েল বললে, "ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়—আলাপ হয়—ঠিক মনে পড়ছে না, আর, কোথায় যে থাকেন, সে-সম্বন্ধে কিছু জানি না। ওঁর অন্য কোনো নামও তো কখনো কানে আসে নি। সত্যি, আশ্চর্য তো ! লোকটার যে এত রহস্য, তা আগে তো কখনো ভেবে দেখি নি !"

বললুম, "আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হবে, আশা করি। ভারি মজার মানুষ।"

আর্ল বললেন, “দু সপ্তাহ পরের মঙ্গলবার আমাদের একটা বিদায়-অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাতে উনি আসবেন। তুমিও আসছ নিশ্চয়ই? এল্‌ভেস্টন ছেড়ে যাবার আগে, মিউরিয়েল চায়, পুরনো বন্ধু-বান্ধব সবাই একবার একসঙ্গে জড়ো হোক!”

মিউরিয়েল ঘরের বাইরে যেতে, তিনি ব্যাপারটা খুলে বললেন। লিণ্ডনের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যাবার পর, এল্‌ভেস্টন থেকে তিনি মিউরিয়েলকে যত তাড়াতাড়ি পারেন সরিয়ে নিয়ে যেতে চান; কারণ, তিনি চান, বিয়ে ভেঙে যাবার বেদনাদায়ক স্মৃতি মিউরিয়েল তাড়াতাড়ি ভুলে যাক। তাই ঠিক হয়েছে, মাসখানেকের মধ্যে আর্থারের সঙ্গে মিউরিয়েলের বিয়েটা চুকিয়ে দেওয়া হবে। আর, তার পরেই ওরা কিছুদিনের জন্যে বিদেশে বেড়াতে যাবে।

যখন চলে আসছি, তখন আর্ল আবার বললেন, “মঙ্গলবারের কথাটা যেন ভুলে যেয়ো না! সেই যে দুটি ফুট্‌ফুটে ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে—তাদের যদি আনতে পারতে, বড়ো ভালো হত! মেইন হের্‌-এর রহস্য আর এমন কী? ওদের কাছে কিছুই নয়! সেই অদ্ভুত ফুলগুলোর কথা কি ভোলবার!”

মুখে বললাম, “পারলে, নিশ্চয়ই আনব ওদের।” কিন্তু, বাড়ি যেতে যেতে ভাবতে লাগলুম, তা কি সম্ভব হবে? ওদের সঙ্গে দেখা-হওয়াটা তো আর আমার হাত-ধরা নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদায়ের ভোজ

মিউরিয়েলদের বাড়ির ভোজসভায় আর্থার আর আমি একসঙ্গেই গেলাম। অনেক নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। সিল্‌ভি আর ব্রুনোকে সঙ্গে আনি নি বলে মিউরিয়েলের কাছ থেকে আর আর্লের কাছ থেকে অনুযোগও শুনতে হল।

বেশ কিছুক্ষণ গাল-গল্পে কাটাবার পর, একবার এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে গিয়ে দেখলুম, সিল্‌ভি আর ব্রুনো মিউরিয়েলদের বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে কখন গুটি গুটি ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, দেখে মোটেই অবাক হলুম না। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ যেমন অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ঘটনাতেও অবাক হয় না, চমকে যায় না—পরম নিশ্চিন্তে সব-কিছু স্বীকার করে নেয়, আমারও তখন সেই দশা! কেবল, মনে মনে একটুখানি চিন্তা হচ্ছে, এই জমকালো নেমন্তন্নবাড়ির পরিবেশে ওরা দুটিতে কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। ভুলেই গেছি যে, অচিন দেশের রাজসভার জাঁকজমক আর আদবকায়দা এখানকার চেয়ে কত বেশি—সিল্‌ভি আর ব্রুনোর কাছে এ-সব তো কিছুই নয়!

চমৎকার চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পোশাক পরে দুটিকে যা মানিয়েছে, তা আর বলবার নয়। উৎসবের উল্লাসের প্রত্যাশায় ওদের মুখদুটি খুশিতে যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে; এমন হাসিখুশি, এমন চল্‌চলে আর এমন

তাজা দেখতে লাগছে ওদের!

ভাবলুম, শিগ্‌গির করে দু-একজন মহিলার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার। একজন মহিলা, (সবাই বলছিল, তিনি না-কি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারেন) তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, "আপনি নিশ্চয়ই ছোটো ছেলে-মেয়ে ভালোবাসেন?—এর নাম সিল্‌ভি; এ হল ব্রুনো।"

মহিলাটি সযত্নে সিল্‌ভির গালে চুমু খেলেন। ব্রুনো তাড়াতাড়ি পিছিয়ে না-এলে, তাকেও চুমু খাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু তার নাগাল না-পেয়ে বললেন, "নতুন মুখ দেখছি। কোত্থেকে আসছ গো তোমরা?"

এরকম কোনো বেয়াড়া প্রশ্ন উঠতে পারে, সেটা ভাবতেই পারি নি। পাছে সিল্‌ভি অপ্রস্তুতে পড়ে, তাই আমিই ওর হয়ে জবাব দিলুম, "বেশ একটু দূরে থাকে। আজকের রাতটুকুর জন্যেই শুধু এখানে এসেছে।"

তরুণীটি ছাড়বার পাত্রী নন, "কত দূর আসতে হল?"

সিল্‌ভি একটু থতিয়ে গেল, আমতা আমতা করে বললে, "দু-এক মাইল হবে।"

ব্রুনো হঠাৎ বলে উঠল, "তিন-এক মাইল হবে।"

সিল্‌ভি তাকে শোধরাতে গেল, "তিন-এক মাইল বলতে নেই।"

তরুণীটি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "সিল্‌ভি ঠিকই বলেছে, 'তিন-এক' মাইল বলাটা ঠিক চালু নয়।"

ব্রুনো বললে, "বার বার বললেই চালু হয়ে যাবে।"

এবার তরুণীটির থতিয়ে যাবার পালা। বিড়্‌বিড়্ করে বললে, "এইটুকু বয়সের পক্ষে খুব চালাক-চতুর তো!" তার পর খোলা গলায় বললেন, "তুমি কত হবে গো, মানিক? সাত হবে বোধ হয়, তাই-না?"

ব্রুনো বললে, "আমি অত নই। আমি হলুম এক। সিল্‌ভি হল এক। সিল্‌ভিতে আমাতে মিলে হলুম দুই। সিল্‌ভি আমায় গুণতে শিখিয়েছে।"

তরুণীটি হাসতে হাসতে বললেন, "আরে, আমি তোমায় গুণি নি, বুঝলে!"

ব্রুনো বললে, "তুমি কি গুণতে শেখ নি?"

তরুণীটি ঠোঁট কামড়ে আপনমনে বললেন, 'কী মুশকিল! কী অস্বস্তিকর প্রশ্ন দেখো দিকিনি!'

সিল্‌ভি একটু ধমকের সুরে বললে, "ছি, ব্রুনো, অমন করে বলতে নেই!"

ব্রুনো বললে, "কী বলতে নেই?"

"অমন কথা জিগেস করতে নেই!"

ব্রুনো দুষ্টুমি করে জের টানতে লাগল, "কেমন কথা?"

"উনি যেরকম প্রশ্নের কথা বললেন, ঐ যে—" এই পর্যন্ত বলে, সিল্‌ভি সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

ব্রুনো বিজয়গর্বে চীৎকার করে উঠল, "আমি জানতুম, কথাটা তুমি কিছুতেই উরুচ্চারণ করতে পারবে না!" তার পর তারিফ পাবার আশায় সগর্বে সেই তরুণীটির দিকে চেয়ে বললে, 'আমি ঠিক জানতুম, অথত্তিকর কথাটা ও বলতে পারবে না!"

তরুণীটি আবার সেই অঙ্কের ধাঁধায় ফিরে গেলেন; বললেন, "আমি যখন বললুম তুমি 'সাত' হবে, তখন কজন জানতে চাই নি। জানতে চাইছিলুম যে, তুমি কত বড়ো—"

ব্রুনো বলে উঠল, "যত বড়ো দেখছেন, তত বড়ো। দেখতেই তো পাচ্ছেন!"

তিনি বললেন, "জানো, বাড়িতে আমার একটি বোন আছে, একদম হুবহু সিল্‌ভির মতো দেখতে! ওদের খুব ভাব হবে নিশ্চয়ই!"

ব্রুনো একটু ভেবেচিন্তে বললে, "দুজনে একসঙ্গে হলে খুব কাজে লাগবে। চুল বাঁধবার সময়ে আয়নার দরকার হবে না।"

"কেন দরকার হবে না গো?"

ব্রুনো বললে, "এ ওকে দেখবে, ও একে দেখবে। তা হলেই তো আয়নার কাজ হয়ে যাবে!"

লেডি মিউরিয়েল একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত কথাবার্তা শুনছিল। এবার কাছে এগিয়ে এসে তাতে ছেদ টেনে দিলে। তরুণীটিকে অনুরোধ করলে আবার একটু পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতে। সিল্‌ভি আর ব্রুনো তরুণীটির পিছু পিছু চলল পিয়ানোর দিকে।

বাজনা যখন শুরু হল, আর্থার তখন আমার পাশে এসে বসেছে।

তরুণীটি বেশ অনায়াসেই বাজালেন; বাজনায় কোনো ভুলও নেই,

তবু বড়ো নিষ্প্রাণ লাগল। ভদ্রমহিলার আর সবই আছে, শুধু দরদটুকুই নেই। বাজনা শেষ হতেই চারি দিক থেকে বাহবা পড়ে যেতে অবশ্য দেরি হল না।

লেডি মিউরিয়েল আমাদের কাছে এসে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "চমৎকার বাজনা, তাই-না?"

আর্থার বলে উঠল, "মোটেই নয়!"

মিউরিয়েল আবার বললে, "কী সুন্দর করে বাজালেন বল তো!"

আর্থার বললে, "বাজানো মানে যদি পিয়ানোর ওপর হাত চালানো বোঝায়—"

মিউরিয়েল চটে উঠে বললে, "এইবার আবোল-তাবোল বকছ। তুমি তো একটু আগেই বললে যে, তুমি গান-বাজনা ভালোবাস, বললে না!"

আর্থার বললে, "গান-বাজনা ভালোবাসি কি না! আচ্ছা মিউরিয়েল, এটা কি একটা প্রশ্ন হল? গান-বাজনা ভালোবাসলে কি যে-কোনো গান-বাজনা ভালো লাগতে হবে? তা হলে তো আমায় প্রশ্ন করতে পার, 'তুমি কি মানুষ-জন পছন্দ কর?' "

লেডি মিউরিয়েল কপাল কুঁচকে, ঠোঁট কামড়ে, মেঝেতে পা ঠুকে রাগ দেখাতে চাইলে, কিন্তু সব জড়িয়ে নজরে পড়ার মতো বিশেষ কিছুই হল না। কেবল ব্রুনোই দেখা গেল একটু বিচলিত হয়েছে। ঝগড়া বাধবার উপক্রমেই দু-পক্ষকে লোকে যেমন করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে, সেইরকম মুরুব্বির মতো সে মাঝখানে এসে বললে, "আমি মানুষ-জন ভালোবাসি!"

আদর করে তার ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে আর্থার বললে, "সব লোককে ভালো লাগে?"

ব্রুনো বললে, "সব্বাইকে নয়। কেবল সিল্‌ভিকে—লেডি মুরিয়েলকে—আর ওকে (আর্লের দিকে দেখালে) —আর তোমাকে—আর তোমাকে।"

সিল্‌ভি বললে, "অমন করে আঙুল দেখাতে নেই—অসভ্যতা!"

বললাম, "ব্রুনোর পৃথিবীতে নাম করবার মতো মানুষ হল চারটিমাত্র!"

লেডি মিউরিয়েল চিন্তার সুরে বলতে লাগল, "ব্রুনোর পৃথিবী! কী

ঝল্‌মলে, আর ফুলের বাগানের মতো কী সুন্দর সে-পৃথিবী। সেখানে ঘাসগুলো সব সময়ে সবুজ থাকে, হাওয়া সব সময়ে ঝিরিঝিরি বয়, আকাশে ঝড়-বৃষ্টি নেই, হিংস্র জানোয়ার নেই; মরুভূমি নেই—"

এইখানে আর্থার বলে উঠল, "মরুভূমি থাকতেই হবে। আমার কল্পনার আদর্শ পৃথিবীতে তো অন্তত থাকবেই!"

লেডি মিউরিয়েল বললে, "কিন্তু, মরুভূমি নিয়ে হবেটা কী? যাই হোক, তোমার আদর্শ পৃথিবীতে জঙ্গল থাকবে না নিশ্চয়ই?"

মুচকি হেসে আর্থার বললে, "আলবৎ থাকবে! রেলের চেয়ে জঙ্গলের দরকার অনেক বেশি। আর সুখ-শান্তির জন্যে গির্জে-টির্জের চেয়েও জঙ্গল অনেক বেশি কাজের!"

"কী কাজে লাগবে, শুনি?"

"গান-বাজনা সাধবার কাজে। যে-সব মেয়েদের সুরের কান নেই, অথচ গান-বাজনা না-শিখে ছাড়বে না, তাদের রোজ সন্ধেবেলা জঙ্গলের মাইল দুত্তিন ভেতরে চালান করতে হবে। সেখানে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা কামরা থাকবে, সস্তার পুরনো পিয়ানোও থাকবে একটা করে। তারা সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিয়ানো বাজাক, ক্ষতি নেই; এমনিতেই তো মানুষের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই, তার উপর শাকের আঁটিটা অন্তত আর চাপবে না!"

লেডি মিউরিয়েল সন্ত্রস্ত হয়ে চারি দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে, আর্থারের এই অভব্য মন্তব্যগুলো কারুর কানে গেল কি না। কিন্তু সেই পিয়ানো-বাদিকা সুন্দরী মেয়েটি তখন বেশ খানিকটা তফাতে ছিলেন, তাই রক্ষে।

ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিতরা একে একে এসে পড়তে লাগলেন, ঘরে বেশ ভীড় হয়ে গেল। মিউরিয়েল খুব মিষ্টি করে সবাইকে আপ্যায়ন জানাতে লাগল। সিল্‌ভি আর ব্রুনো তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপ্যায়নের কায়দা-কানুন লক্ষ্য করতে লাগল।

নতুন যারা এসেছেন, মিউরিয়েল তাঁদের বললে, "আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করলে খুশি হবেন আপনারা। বিশেষ করে আমার অনেক দিনের অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষী, মেইন হের্ (আরে, কোথায় গেলেন তিনি? ঐ তো, ওখানে!) ঐ যে, চশমা চোখে ভদ্রলোক, লম্বা দাড়ি!"

ঘরের এক কোণে বসে ছিলেন মেইন হের্, বড়ো-বড়ো কাঁচওলা চশমার মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সিল্‌ভি তাঁর দিকে চেয়ে বললে, "বুড়ো দাদু ভারি চমৎকার মানুষ! আর দাড়িটা কী চমৎকার! বিকেলবেলা ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নিরোর কাছে গিয়েছিলুম, ওকে অদৃশ্য করে দিয়ে খুব মজা করা গেল! ফেরবার সময়ে বুড়ো দাদুর সঙ্গে দেখা হল।"

বললুম, "চলো যাই, সবাই মিলে ওঁকে একটু চেতিয়ে তোলা যাক।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চাঁদামামার দেশের লোক

ওরা বেশ খুশি মনেই রাজি হল। দুজনকে দুপাশে নিয়ে মেইন হের্-এর কাছে গিয়ে বললুম, "ছেলেপিলেদের আপনার খারাপ লাগে না তো?"

ভদ্রলোক একটু হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো বাছারা! আমাকে দেখে বুড়ো মনে হচ্ছে তো?"

ওঁর মুখে 'প্রফেসর'-এর অদ্ভুত আদল থাকা সত্ত্বেও প্রথম যখন দেখি, তখন বয়েসটা ওঁর সে-তুলনায় নির্ঘাৎ কম মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন, ওঁর স্বপ্ন-ভরা চোখদুটির গভীর দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তে খুব আশ্চর্য হয়েই টের পেলুম যে, ওঁর বয়সের হদিশ মেলা ভার। মনে হল যেন যুগ-যুগান্তরের পার থেকে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন।

ওঁর কথার ঢঙে সাহস পেয়ে ওরা দুজনে তখন ওঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ব্রুনো বললে, "আপনি বুড়ো কি না জানি না, তবে আপনার বয়সটা তিরাশি বছর হবে।"

মেইন হের্ বললেন, "আন্দাজ-টান্দাজের ধার ধারে না দেখছি, একেবারে সোজাসুজি তিরাশি!"

বললুম, "কাছাকাছি হয়েছে না-কি?"

মেইন হের্ মৃদুস্বরে উত্তর করলেন, "বিশেষ একটা কারণে স্থান, কাল বা পাত্র সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো কিছু বলতে আমার বাধা আছে। কারণটা বলা বারণ। একটা কথা শুধু বলতে পারি—একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো ছেষট্টি বছরের মাঝামাঝি বয়েসটাই সব চেয়ে নিরাপদ।"

বললুম, "এটা কী হিসেবে ঠিক করলেন?"

"এই হিসেবে। সাঁতার কাটতে গিয়ে কেউ ডুবে গেছে, এমন খবর যদি না-পাওয়া যায়, তা হলে সাঁতার কাটা বেশ একটা নিরাপদ আমোদের ব্যাপার বলে মনে করা যায় তো? তেমনি, একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো ছেষট্টি বছর বয়েসের মধ্যে কেউ মারা গেছে বলে শুনেছেন কি? শোনেন নি!"

বললুম, "কী বলতে চান, বুঝলুম। কিন্তু, সে-হিসেবে সাঁতার কাটা খুব যে নিরাপদ, তা প্রমাণ করা যাবে না, কারণ ডুবে যাওয়ার খবর তো হামেশাই পাওয়া যায়।"

মেইন হের্ বললেন, "আমাদের দেশে কেউ কক্ষনো ডোবে না।"

"কোথাও তেমন গভীর জল নেই বুঝি?"

"অনেক আছে! কিন্তু আমাদের পক্ষে ডোবা সম্ভব নয়। আমরা সবাই জলের চেয়ে হালকা।" আমার মুখে অবাক হবার লক্ষণ দেখে আবার বললেন, "বুঝিয়ে বলি। ধরুন আপনি বিশেষ গড়নের বা বিশেষ রঙের একজাত পায়রা চান। বংশানুক্রমে এদের ঐ বিশেষ গড়ন বা রঙ হবে, এই আপনার ইচ্ছে! কী করবেন? ঐ গড়ন বা রঙ-এর কাছাকাছি যে-সব পায়রা আছে, তাদের এক জায়গায় জড়ো করবেন, বাকিদের ছেড়ে দেবেন। দেবেন তো? বছরের পর বছর এমনি করতে করতে এমন একটা পায়রার বংশ তৈরি হবে, যাদের সব কটারই ঐ বিশেষ গড়ন বা রঙ হবে। ঠিক বলেছি?"

"ঠিকই বলেছেন। ঐরকমই করতে হয়। একে বলে কৃত্রিম নির্বাচন পদ্ধতি।"

মেইন হের্ বললেন, "ঠিক তাই। আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে ঐরকম করেছি—হালকা লোক বেছে নিয়েছি; আর, তার ফলে, এখন আমাদের সব্বাই জলের চেয়ে হালকা।"

"তা হলে সুমুদ্দুরে ডুবে যাবার ভয় নেই?"

"মোটেই না! কেবল ডাঙায় থাকলে কখনো কখনো বরং ডুবে

যাবার ভয় থাকে—যেমন থিয়েটার দেখতে গেলে।"

"থিয়েটারে ডুবে যাবার ভয় আবার কী?"

"আমাদের থিয়েটারগুলো সব মাটির নীচে। ওপরে থাকে বড়ো-বড়ো জলের ট্যাঙ্ক। থিয়েটারে যদি আগুন লাগে, তখন ট্যাঙ্কের কল খুলে দিলেই এক মিনিটের মধ্যে থিয়েটারের ছাদ পর্যন্ত জলে ভরে যায়! আগুনও নিবে যায়!"

"আর দর্শকদের কী দশা হবে?"

মেইন হের্ তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, "সে যাহয় হোক। ডুবে যাক আর নাই যাক, এটা জেনে নিশ্চিন্দি তো যে, সব্বাই জলের চেয়ে হালকা। এখনো মানুষকে হাওয়ার চেয়ে হালকা করাটা আমরা রপ্ত করতে পারি নি। তবে চেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে; আর হাজারখানেক বছর বাদে—"

ব্রুনো এতক্ষণে খুব গম্ভীরভাবে একটা প্রশ্ন করলে, "যারা খুব ভারী, তাদের কী করা হয়?"

ব্রুনোর প্রশ্ন তাঁর কানে গেল না, আপন মনে বলতে লাগলেন, 'আরো অনেকরকম কাজে ঐ একই নিয়ম আমরা খাটিয়েছি। বাছাই করে করে একরকম তুলো আমরা চাষ করেছি, সেটা এখন হাওয়ার চেয়েও হালকা হয়ে গেছে! কী কাজের জিনিস যে হয়েছে, ভাবতেই পারবেন না। আমরা তার নাম দিয়েছি 'অতৌল', অর্থাৎ যার তৌল করা যায় না, ওজন করা যায় না।"

"কী কাজে লাগে?"

"প্রধানত প্যাক করবার কাজে। ডাক মারফত কোনো জিনিস পার্শেল করতে হলে, আমরা ঐ তুলো দিয়ে প্যাক করি। তাতে জিনিসটা ফাঁকার চেয়েও হালকা হয়ে যায়, জানেন?"

"কত ডাক-মাশুল লাগবে, পোস্টাপিসের লোকেরা বোঝে কী করে?"

খুশিতে ডগমগ হয়ে মেইন হের্ বললেন, "সেইটাই তো আসল মজা! পোস্টাপিস থেকেই আমাদের পয়সা দেয়, আমরা দিই না! পার্শেল পাঠিয়ে কত বারই তো পাঁচ-পাঁচ শিলিঙ পেয়েছি আমি!"

"এতে সরকার থেকে আপত্তি ওঠে নি?"

"একটু-আধটু আপত্তি যে ওঠে নি, তা নয়। সরকার থেকে বলা হয়েছিল, ব্যাপারটা ক্রমেই বড়ো খরচা-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু

সরকারেরই নিয়ম-মাফিক জিনিসটা একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। আমি যদি এমন পার্শেল পাঠাই, যার ওজন কিছু না-এর চেয়ে এক পাউণ্ড বেশি, তা হলে আমাকে নিয়ম অনুযায়ী তিন পেনি দিতে হয়; তা হলে, আমার পার্শেলের ওজন যদি কিচ্ছ না-এর চেয়ে এক পাউণ্ড কম হয়, তা হলে আমি তিন পেনি পাব না কেন?"

বললুম, "খুবই কাজের জিনিস, সন্দেহ নেই।"

মেইন হের্ বলে চললেন, "কিন্তু, 'অতৌল' তুলোর কিছু অসুবিধাও আছে। কিছুদিন আগে খানিকটা কিনে বাড়ি নিয়ে যাব বলে টুপির তলায় ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। টুপিটা সোজা উড়ে চলে গেল!"

ব্রুনো জিগেস করলে, "আপনার টুপির তলায় আজকেও আছে না-কি সেই তুলো? আপনাকে যখন রাস্তায় দেখি, তখন আপনার টুপিটা অনেকখানি উঁচু হয়ে ছিল। তাই-না সিল্‌ভি?"

মেইন হের্ বললেন, "সেটা অন্য ব্যাপার। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল, তাই টুপিটাকে লাঠির ডগায় চড়িয়ে ছাতার মতো করে ধরে রইলুম, বুঝলে না?" তার পর আমার দিকে ফিরে বললে, "পথে আসতে আসতে একটা ব্যাপার ঘটে গেল—"

ব্রুনো বলে উঠল, "বৃষ্টি নামল?"

"না, তা নয়। অনেকটা কুকুরের ল্যাজের মতোই দেখতে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড আর দেখি নি। আমার হাঁটুর কাছে কে যেন আদর করে কী বোলাচ্ছে। হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলুম। কিছু নেই! হাত-দুয়েক দূরে দেখি, শুধ কুকুরের ল্যাজ একটা, আপনা-আপনি নড়ছে!"

ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে নালিশের সুরে বললে, "ওফ্, সিল্‌ভি! নিরোর শরীরটা আধা-খ্যাঁচড়া করে ফিরিয়ে এনেছ, পুরোটা দেখতে পাওয়ার মতো করে দাও নি!"

সিল্‌ভিকে একটু অনুতপ্ত মনে হল। বললে, "অন্যায় হয়ে গেছে! করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করতে হল। কাল গিয়ে বাকিটা সেরে ফেলব। বেচারি! রাত্তিরে হয়তো খাবারই পাবে না!"

ব্রুনো বলে উঠল, "পাবে নাই তো! কুকুরের ল্যাজকে কে আবার কবে খেতে দেয় রে!"

হতভম্ব হয়ে মেইন হের্ একবার এর দিকে আর-একবার ওর দিকে তাকাতে লাগলেন। বললেন, "কী যে বলছ, কিছুই মাথায়

ঢুকছে না আমার। রাস্তা গুলিয়ে ফেলছিলুম বলে পকেট থেকে একটা ম্যাপ বার করে দেখবার সময়ে একটা হাত-দস্তানা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। তখন—ঐ যে, অদৃশ্য সেই যে আমার হাঁটুতে গা ঘষছিল, সে আমার দস্তানাটা এনে দিলে!"

ব্রুনো বললে, "দেবেই তো। জিনিস কুড়িয়ে আনতে ওর ভালো মতন মজা লাগে!"

মেইন হের্ তখন এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন যে, মনে হল, প্রসঙ্গ পালটানো দরকার। বললুম, "পকেট-ম্যাপ জিনিসটা ভারি কাজের।"

মেইন হের্ বললেন, "ঐ আর-একটা জিনিস আপনাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি—ম্যাপ তৈরি করা। তবে এখন ও-ব্যাপারে আপনাদেরও টেক্কা দিয়েছি। সত্যিকারের কাজে লাগবার মতো একটা বড়োসড়ো ম্যাপ কী মাপের হয় আপনাদের? সব চেয়ে বড়ো?"

"ধরুন, এক মাইলের জায়গায় ছ ইঞ্চি অনুপাতে হলে, খুবই বড়ো হল।"

মেইন হের্ দাপিয়ে উঠলেন, "মাত্তর ছ ইঞ্চি! মাইলে ছ গজ হিসেবে ম্যাপ তৈরি করেছি, সে তো কবেকার কথা। তার পর করেছি মাইলে একশো গজ হিসেবে। তার পর একেবারে যাকে বলে জব্বর মতলব মাথায় এল! সারা দেশের ম্যাপ তৈরি করলুম আমরা একেবারে আসল মাপে—মানে এক মাইলকে সত্যি সত্যি এক মাইল করে কাগজে এঁকে!"

জিগেস করলুম, "সে-ম্যাপ কাজে লাগানো হয়েছে কত বার?"

মেইন হের্ বললেন, "ম্যাপটা গোটানোই আছে, পুরোটা খুলে পাতাই হয় নি। চাষীরা আপত্তি জানালে। বললে, সারা দেশটাই তো ঢাকা পড়ে যাবে, তা হলে রোদ আসবে না! তাই, আমরা দেশটাকেই ম্যাপ হিসেবে কাজে লাগাই। বিশ্বাস করুন, বেশ ভালোই কাজ হয় তাতে, প্রায় একইরকম কাজ হয়।—আচ্ছা, এবার আর-একটা প্রশ্ন জিগেস করি। সব চেয়ে ছোটো কতটুকুন পৃথিবীতে আপনি বাস করতে পারেন?"

ব্রুনো সারাক্ষণই মন দিয়ে সব কথা শুনছিল। এবার চেঁচিয়ে উঠল, "আমি জানি! বলব? আমি চাই, এইটুকু পুঁচকে একটা পিথিবি; শুধু সিল্ভিকে আর আমাকে ধরলেই হবে।"

মেইন হের্ বললেন, "তা হলে তো তোমাদের একজনকে এ-পাশে, আর একজনকে ওপাশে থাকতে হবে। তোমার দিদিকে দেখতেই পাবে না!"

ব্রুনো বললে, "আমাকে তা হলে কেউ পড়াও দিতে পারবে না!"

মেইন হের্-কে বললুম "পৃথিবীকে ছোটো করার ব্যাপারে কোনো পরীক্ষা-টরীক্ষার চেষ্টা করছেন না নিশ্চয়ই?"

"না ঠিক পরীক্ষা অবশ্য করা হচ্ছে না। গ্রহ-ট্রহ গড়ব, এমন আস্ফালন আমরা করি না। তবে আমার এক বিজ্ঞানী-বন্ধু, বেলুনে চড়ে অনেক বার আকাশে পাড়ি দিয়েছে।—সে আমাকে সত্যি সত্যি বলেছে যে, একবার এমন একটা ছোট্টো গ্রহে গিয়ে পৌঁচেছিল, যার পুরোটা চক্কর দিতে লেগেছিল মাত্র কুড়ি মিনিট। আমার বন্ধুটি যখন সেই গ্রহে পৌঁছয়, ঠিক তার আগেই সেখানে বিরাট একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধের ফলাফলটা কিন্তু ভারি গোলমেলে হয়ে গেল। যে সেনাদল হেরে গেছে, তারা তো প্রাণপণে ছুটে পালাতে লাগল। আর বিজয়ী সেনারা কুচ-কাওয়াজ করে ফিরতে লাগল ঘরের দিকে। কিন্তু হলে হবে কি, কয়েক মিনিট বাদেই দেখা গেল দু-দলে একেবারে মুখোমুখি! বিজয়ী সৈন্যরা দেখলে, তাদের সামনেও সৈন্য, পিছনেও সৈন্য; তারা সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলে! কাজেই যুদ্ধে তাদেরই হার হল, অথচ বিপক্ষের সমস্ত সৈন্যকেই তারা কিন্তু মেরে ফেলেছিল।"

ব্রুনো সন্দিগ্ধ গলায় বললে, "মেরে ফেলেছিল, তো মরা সৈন্যরা পালাচ্ছিল কী করে?"

মেইন হের্ বললেন, " 'মেরে ফেলা' একটা কথার কথা। আমি যে-গ্রহের কথা বলছি, সেখানে বন্দুকের গুলি তৈরি হয় কালো একরকমের জিনিস দিয়ে। গায়ে লাগলে কালো দাগ পড়ে যায়। কাজেই যুদ্ধের পর শুধু গুণে দেখতে হবে যে, কোন পক্ষের কত জনকে 'মারা হয়েছে' —মানে কত জনের পিঠের দিকে কালো দাগ পড়েছে, কারণ সামনের দিকে দাগ পড়লে, সেটা ধর্তব্য হয় না।"

বললুম, "তা হলে, পিট্টান না-দিলে তো দেখছি কাউকে 'মেরে ফেলা' যাবে না।"

"আমার সেই বিজ্ঞানী-বন্ধুটি কিন্তু মাথা খাটিয়ে আরো তলিয়ে দেখেছে। সে বলছে, গ্রহটা খুব ছোট্টো বলে, উলটো দিকে বন্দুক বাগিয়ে

গুলি ছুঁড়লেই হল, আপনিই সেটা চক্কর মেরে শত্রুপক্ষের পিঠে গিয়ে লাগবে। যাই হোক, যুদ্ধ শেষ হবার পর, বন্দুকের নিশানা যাদের নিরেস, তাদেরই সেরা যোদ্ধা বলে বিবেচনা করা হয়; তাদের মধ্যে আবার যে সব চেয়ে নিরেস, সে পায় ফার্স্ট প্রাইজ।"

"কে সব চেয়ে নিরেস, সেটা বোঝা যায় কী করে?"

"খুব সহজে। জানেন তো, সব চেয়ে ভালো তাগ করা মানে হল, সামনের কোনো জিনিসে গুলি বেঁধানো; কাজেই সব চেয়ে খারাপ তাগ হল, পিছনের কোনো জিনিসে গুলি বেঁধানো।"

বললুম, "ঐ ক্ষুদে গ্রহের লোকেরা ভারি অদ্ভুত তো!"

"খুবই অদ্ভুত! সব চেয়ে অদ্ভুত বোধ হয় ওদের সরকারি শাসন-ব্যবস্থা। শুনেছি, আপনাদের এই পৃথিবী-গ্রহে এক-একটা দেশে অনেক প্রজা থাকে, আর একজন রাজা। আমি যে-গ্রহের কথা বলছি, সেখানে কিন্তু অনেক রাজা, আর একজন প্রজা!"

বললুম, "এই পৃথিবী গ্রহে কী হয় না হয়, সে-সব আপনি কারো কাছে শুনেছেন বললেন। তা হলে কি, ধরে নেব যে, আপনি অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসছেন?"

উত্তেজনায় হাত তালি দিয়ে চীৎকার করে ব্রুনো বলে উঠল, "আপনি কি তা হলে চাঁদামামার দেশের মানুষ?"

মেইন হের্ একটু থতিয়ে গেলেন, দায় সারা গোছের উত্তর দিয়ে বললেন, "না গো, বাছা, তা নয়। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম; এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থার একটা সুফল আছে। এক-একজন রাজা এক-এক রকমের আইন করবেন তো; একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো মিল থাকবে না। প্রজা যাই-ই করুক না-কেন, তাকে শাস্তি দেওয়া মুশকিল, কারণ, একটা না-একটা আইনের অজুহাত সে দেখাতে পারবেই।"

ব্রুনো বলে উঠল, "আর সেইসঙ্গে কোনো না-কোনো আইন সে ভাঙছেই, কাজেই সব কাজেই তার শাস্তি পাওয়া উচিত।"

সেই সময়ে মিউরিয়েল কাছাকাছি এসে পড়েছিল, ব্রুনোর শেষ কথা-গুলো কানে যেতেই সে বলে উঠল, "আজ এখানে শাস্তি-টাস্তির বালাই নেই, এটা আজ যার-যা-খুশির আড্ডা।" তার পর ব্রুনোকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে বললে, "বাচ্চাদুটোকে একটু ধার নিচ্ছি।"

ওদের নিয়ে মিউরিয়েল চলে যেতেই মেইন হের্‌কে বললুম,

“দেখলেন তো, বাচ্চারা কেমন আমাদের ফেলে পালাল। এখন আমরা দুই বুড়োয় আসর জমাই, কী বলেন?”

বৃদ্ধ লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন “তা তো বটেই! আমরা এখন বুড়ো ছাড়া আর কী। অথচ আমি নিজেও তো একদিন ছোটো ছিলাম, কোনো একদিন—অন্তত ছিলাম বলেই তো মনে হচ্ছে।”

কী জানি কেন, ওঁর সাদা ধব্‌ধবে এলোমেলো চুল আর লম্বা দাড়ির দিকে তাকিয়ে আমার যেন ধারণা হল, উনি যে কোনো কালে ছোটো ছিলেন, তা মোটেই বিশ্বাস হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রুনোর চড়ুইভাতি

নিজেকে কেমন যেন বোকা-বোকা লাগতে লাগল। সিল্‌ভি আর ব্রুনোকে কাছে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বললুম, "এসো, ব্রুনো, তোমায় একটা গল্প বলি।"

ব্রুনো উত্তরে বললে, "আমিও বরং তোমায় একটা গল্প বলি।" পাছে সিল্‌ভি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আগে বলতে আরম্ভ করে দেয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলে। ব্রুনোর গল্পের শুরুটা এইরকম : "একটা ইঁদুর ছিল—ছোট্টো ইঁদুর—খুব ছোট্টো এইটুকুনি একটা ইঁদুর। এত ছোট্টো পুঁচকে ইঁদুর কক্ষনো দেখ নি—"

বললুম, "তা, ইঁদুরটার কী হল, সে-সব কথা কিছু তো বলবে। ইঁদুরটা খুব ছোট্টো ছিল, বেশ কথা। কিন্তু তোমার গল্পে কি আর কিছুই নেই? ইঁদুরটার কী হল তার পর?"

গম্ভীরভাবে ব্রুনো উত্তর দিলে, "কিছুই হল না।"

ব্রুনোর কাঁধে মাথা রেখে সিল্‌ভি বসে বসে মওকা খুঁজছিল, কখন সে নিজে গল্প বলার সুযোগ পায়। এবার খাড়া হয়ে বসে বললে, "কিছু হল না কেন?"

ব্রুনো চমৎকার একটা কারণ দেখালে, বললে, "বড্ডো ছোটো ছিল কিনা।"

বললুম, "ওটা কোনো কথা হল না। যতই ছোটো হোক, যা হোক কিছু তো একটা ঘটবে।"

যেন ভয়ানক বোকার মতো কথা বলে ফেলেছি, তাই খুব করুণার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ব্রুনো আবার বললে, "এক্কেবারে পুঁচকে ছিল কিনা। কিছু একটা ঘটলে কি আর বাঁচত বেচারা, মরেই যেত! এত পুঁচকে!"

সিল্‌ভি বলে উঠল, "থাক, পুঁচকের ব্যাখ্যানা যথেষ্ট হয়েছে, এবার থাম। তা, গল্পটা কি ঐ অবধিই, না আর কিছু বানিয়েছ?"

"এখনো আর কিছু বানানো হয় নি।"

"ঐটুকু বানিয়ে কেউ নাকি গল্প বলতে যায়! এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপচাপ বসো দিকিনি। আমি বরং গল্প বলি, শোনো।"

বেচারা ব্রুনো সাত-তাড়াতাড়ি গল্প শুরু করতে গিয়ে কল্পনার ঝুলি উজাড় করে ফেলেছে। হাল ছেড়ে এবার শ্রোতা হয়ে বসল। আবদারের সুরে বললে, "সেই আর-এক ব্রুনোর গল্পটা বল, ভাই!"

দুহাতে ব্রুনোর গলা জড়িয়ে ধরে সিল্‌ভি বলতে শুরু করলে :

"গাছের পাতায় পাতায় বাতাসরা ফিস্‌ফিসিয়ে কানাকানি করে ফিরছে" (ব্রুনো বাধা দিয়ে বললে, "বাতাসগুলো ভদ্দতা জানে না!" সিল্‌ভি বললে, "ভদ্রতার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না!") "সন্ধে হয়েছে—চমৎকার চাঁদের আলোয়-ভরা সন্ধে, প্যাঁচারা ডাকাডাকি করছে—"

মোটা মোটা নরম আঙুলে সিল্‌ভির গাল চাপড়াতে চাপড়াতে ব্রুনো বললে, "প্যাঁচা নয় ভাই, ধর, অন্য কিছু! প্যাঁচা আমার দুচক্ষের বিষ। বিচ্ছিরি ড্যাবা-ড্যাবা চোখ। প্যাঁচা নয়, ধর মুরগি-ছানা।"

বললুম, "ড্যাবা-ড্যাবা চোখ দেখে ভয় পাও বুঝি, ব্রুনো?"

যথাসম্ভব বেপরোয়া ভঙ্গিতে ব্রুনো জবাব দিলে, "সব কিছুতেই আমি ভয় পাই না। ড্যাবা-ড্যাবা চোখে ওদের বিচ্ছিরি দেখতে লাগে। আমি তো ভাবি, ওরা যদি কাঁদে, তা হলে ওদের চোখের জলের এক-একটা ফোঁটা—ধর, তোমার, চাঁদের মতো বড়ো-বড়ো হবে!" বলে খুব খুশি হয়ে হেসে উঠল। "প্যাঁচারা কাঁদে নাকি, মশাইবাবু?"

ব্রুনোর কথা বলার ভঙ্গি নকল করে বললুম, "প্যাঁচারা সব সময়েই কাঁদে না। ওদের তো কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই, বুঝলে কিনা।"

ব্রুনো সোৎসাহে বলে উঠল, "কিন্তু, ওদেরও দুক্ষু হয়, খুব দুক্ষু হয়। বেচারা পুঁচকে ইঁদুরটাকে মেরে ফেলেছিল বলে ওদের ভীষণ দুক্ষু হয়েছিল!"

"কিন্তু, খিদে পেলে কী আর জ্ঞানগম্যি থাকে? তখন নিশ্চয়ই আর দুক্ষু থাকে না!"

"প্যাঁচাদের তুমি কিচ্ছুই জানো না দেখছি! যখন ওদের খিদে পায়, তখন ইঁদুরটাকে মেরে ফেলেছে বলে ওদের ভালো মতন দুক্ষু হয়। কেন জানো? ইঁদুরটা থাকলে ওদের রাত্তিরের খাবার হত, তাই!"

বেশ বোঝা গেল, ব্রুনোর কল্পনার দৌড় এবার পাল্লা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে সিল্‌ভি বলে উঠল, "আমি, বাবা, গল্পটা চালিয়ে যাই।—তা, সেই প্যাঁচারা, মানে, সেই মুরগি-ছানারা তখন রাত্তিরের খাবার জন্যে বেশ মোটাসোটা একটা ইঁদুর খুঁজে বেড়াচ্ছে—"

ব্রুনো বলে উঠল, "ধর, খরগোশ খুঁজে বেড়াচ্ছে!"

"খরগোশ! খালি খালি আমার গল্প বদলে দিলে চলবে কী করে, ব্রুনো? মুরগি-ছানা কখনো খরগোশকে খেতে পারে?"

"কিন্তু, খেতে পারে কি না, চেষ্টা করে একবার দেখবার ইচ্ছেও তো হতে পারে?"

"খেতে পারে কি না চেষ্টা করে দেখবার ইচ্ছে হবে—ওফ্ সত্যি ব্রুনো! এ কথার কোনো মাথামুণ্ডু হয়! আমি বরং ফের প্যাঁচা দিয়েই গল্প বলি!"

"বেশ, তা হলে ধরে নাও, ওদের ড্যাবা-ড্যাবা চোখ নেই!"

রদ-বদলে সিল্‌ভির আর কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, ব্রুনোর কথা গ্রাহ্য না-করে সে বলে চলল, "তারা তখন হঠাৎ একটা ছোট্টো ছেলেকে দেখতে পেল। ছেলেটা ওদের বললে—একটা গল্প বল-না। প্যাঁচারা কিন্তু গল্প বললে না, ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। (ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "উড়ে চলে গেল বলতে নেই, বলতে হয়, উড়তে উড়তে চলে গেল!" কিন্তু, সিল্‌ভি সে কথায় কান দিলে না।) "তখন ছেলেটার সঙ্গে এক সিংহের দেখা হল। সে তখন সিংহকে বললে—'একটা গল্প বল-না'। সিংহ বললে, 'আচ্ছা'। সিংহ তো গল্প বলতে রাজি হল। তার পর সিংহটা গল্প বলতে বলতে করলে কি, ছেলেটার মাথাটা একটু একটু করে খুঁটে খুঁটে খেতে আরম্ভ করে দিলে—"

ব্রুনো বলে উঠল, "কক্ষনো 'খুঁটে খুঁটে' বলবে না। খুব ছোট্টোরা খুঁটে খুঁটে খায়—সরু সরু, ধারালো ধারালো সব ছোটো-ছোটো জিনিসরা—"

সিল্‌ভি বললে, "আচ্ছা, বেশ। সিংহটা "গপ্ গপ্" করে খেতে আরম্ভ করলে। তার পর, যখন সমস্ত মাথাটা গপ্ গপ্ করে খাওয়া হয়ে গেল, তখন ছেলেটা সেখান থেকে চলে গেল। একটা ধন্যবাদও দিয়ে গেল না।"

ব্রুনো বললে, "ভারি অসব্যতা হল। কথা নাহয় না-ই বলতে পারিস, ঘাড় নেড়েও তো—না, ঘাড় নাড়ার তো উপায় নেই। কিন্তু, সিংঘটার সঙ্গে 'হ্যান্‌শেক' তো অন্তত করতে পারত!"

সিল্‌ভি বলে উঠল, "ও হো, বলতে একদম ভুল হয়ে গেছে! হ্যাণ্ডশেক করেছিল তো! ছেলেটা আবার ফিরে এসেছিল সিংহের কাছে। তখন গল্প শোনাবার জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিল।"

ব্রুনো বললে, "তার মানে, আবার তার মাথা গজিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, মিনিট খানেকের মধ্যেই গজিয়েছিল। আর সিংহটা ছেলেটির কাছে মাফ-টাফ চেয়ে বলেছিল যে, আর সে কক্ষনো গপ্‌গপিয়ে ছোটো ছেলেদের মাথা খেয়ে ফেলবে না—আর কক্ষনো, কোনোদিন নয়!"

এই ভাবে গল্পটার মোড় ফিরতে দেখে ব্রুনো ভারি খুশি। বললে, "এবার গল্পটা বেশ ভালো মতন সুন্দর হয়েছে! সুন্দর গল্প, না, মশাইবাবু?"

বললুম, "খুব সুন্দর। ছেলেটাকে নিয়ে আর-একটা গল্প শোনবার ইচ্ছে করছে আমার।"

"আমারও ইচ্ছে করছে।" এই বলে ব্রুনো সিল্‌ভির গাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগল, "ব্রুনোর চড়ুইভাতির গপ্পটা বলো না গো, পেটুক দামু সিংঘ-টিংঘর কথা যেন না-থাকে!"

সিল্‌ভি বললে, "ঠিক আছে, ভয় পাচ্ছ যখন, তখন নাহয় না-ই বললুম।"

ব্রুনো বেশ চটে-মটে বলে উঠল, "ভয় পাচ্ছি! মোটেই নয়! 'গপ্ গপ্' কথাটাই বড্ডো বিচ্ছিরি!"

সিল্‌ভি বলে যেতে লাগল, "—তখন সেই ছেলেটা—"

ব্রুনো তাকে থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, "বুঝতে

পারছ তো আমি নয় কিন্তু! খবদ্দার, এমন ভাব কোরো না, যেন ছেলেটা আসলে আমিই!"

সসম্ভ্রমে মেনে নিলুম যে, সেরকম কোনো ভাব দেখাবার চেষ্টা করব না।

সিল্‌ভি বলে যেতে লাগল, "ছেলেটা মন্দ নয়, মোটামুটি ভালোই—"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুধরে দিয়ে বলে উঠল, "বেশ ভালো মতন ভালো ছেলে! যে যে কাজ করতে বলা হয় না, তা কক্ষনো করে না—"

সিল্‌ভি ওকে একটু খোঁচা মেরে বললে, "তাতে আর ভালো ছেলে কী হল!"

ব্রুনো ছাড়বার পাত্র নয়, বললে, "তাতেই ভালো ছেলে হয়!"

সিল্‌ভি এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, "বেশ, খুব ভালো ছেলে ছিল সে, একবার কোনো কথা দিলে সব সময়ে তা রাখত, কক্ষনো খেলাপ করত না। তার একটা দেরাজ ছিল—"

"কথাগুলো রাখবার জন্যে।" ব্রুনো বলে উঠল।

চোখ-ভরা দুষ্টুমি নিয়ে ব্রুনোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সিল্‌ভি বললে, "যদি সব কথা রেখে থাকে, তা হলে তো খুবই ভালো ছেলে। আমার চেনা এমন ছেলে আছে, যারা মোটেই তেমন নয়!"

ব্রুনো গম্ভীরভাবে বলে চলল, "সঙ্গে অবশ্য নুনও রাখত, কারণ নুন ছাড়া তো আর কথা রাখা যায় না। আর সে তার নিজের জন্ম-দিনটাকে রাখত দেরাজের দ্বিতীয় তাকে।"

জিগেস করলুম, "কত দিন রাখত? আমি তো আমার জন্মদিনটাকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি রাখতে পারি না।"

ব্রুনো বললে, 'আরে, চব্বিশ ঘণ্টা তো আপনা-আপনিই থাকে। জন্মদিন কী করে রাখতে হয় জানো নাকো? ছেলেটা তো এক বছর ধরে রেখে দিত।"

সিল্‌ভি বললে, "আর তখন তো পরের জন্মদিন এসে পড়বে। কাজেই সবদিনই তার জন্মদিন।"

ব্রুনো বললে, "তা-ই তো হয়। তোমার জন্মদিনে কিছু মজা-টজা হয়, মশাইবাবু?"

বললুম, "কোনো কোনো বার।"

"যখন তুমি ভালো ছেলে থাক?"

বললুম, "ভালো ছেলে থাকাটাই তো একটা মজা, তাই-না ?"

ব্রুনো বললে, "ওকে কি মজা বলে! ও তো একটা শাস্তি!"

সিল্‌ভি বললে, "ওফ্, ব্রুনো! কী করে এ কথা বললে তুমি!"

ব্রুনো হারবার পাত্র নয়। বললে, "শাস্তি না তো কী ? এই দেখ, মশাইবাবু, একে বলে ভালো ছেলে হওয়া।" বলে, গম্ভীর মুখ করে সোজা হয়ে বসল। "এইরকম করে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসতে হবে। তার পর, একে একে সব শাসনের পালা চলবে, "ও কী, ব্রুনো, চুল আঁচড়াও নি! শিগ্‌গির চুল আঁচড়ে এসো।" তার পর, "ওঃ, ব্রুনো, ডেজি-ফুলের পাপড়িগুলো অমন করে দুমড়ো না!" তার পর—ডেজি বানান জানো, মশাইবাবু ?"

বললুম, "আমি এখন সেই ছেলেটার জন্মদিনের কথা শুনব।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো গল্পের খেই ধরলে, "ছেলেটা তখন বললে, 'আজ হল আমার জন্মদিন।' তখন হল কি—আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে—" সিল্‌ভির কোলে মাথা রেখে ধপ্ করে শুয়ে পড়ে বললে, "সিল্‌ভি ভালো বলতে পারবে। ও তো আমার চেয়েও বড়ো। বল তো সিল্‌ভি, গল্পটা শেষ কর তো!"

সিল্‌ভি বিনা প্রতিবাদে গল্পটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল, তখন সে বললে, "আজ তো আমার জন্মদিন। এখন জন্মদিনটাতে কী করা যায় ?" যে-সব ছোটো ছেলেরা ভালো হয়—" (ব্রুনোকে এড়িয়ে কেবল যেন আমাকে শোনাবার জন্যেই বললে, এমনি ভান করে) "—যে-সব ছোটো ছেলেরা ভালো হয়—যারা ভালো করে পড়াশুনা করে, তারা সব জন্মদিনে মজা-টজা করে, জানো তো। তাই এই ছেলেটিও জন্মদিনে একটা মজা করল।"

নেহাতই একটা দায়সারা গোছের ভাব দেখিয়ে ব্রুনো বলে উঠল, "ইচ্ছে করলে ছেলেটাকে এখন বুনো বলতে পারো। আমি নই অবিশ্যি, তবে শুনতে ভালো লাগবে।"

সিল্‌ভি বলে যেতে লাগল, "ব্রুনো তখন নিজের মনে বললে, 'পাহাড়ের ওপর গিয়ে একা একা চড়ুইভাতি করলে সব চেয়ে ভালো হয়। একটু দুধ নেব সঙ্গে করে, খানিকটা পাঁউরুটি নেব, আর কয়েকটা আপেল নেব। প্রথমেই দুধ জোগাড় করতে হবে।" কাজেই, প্রথমে ব্রুনো করলে কী, না দুধ দুইবার একটা বালতি নিলে—"

ব্রুনো ফুট্‌ কাটলে, "—বালতি নিয়ে গোরুর দুধ দুইলে।"

"হ্যাঁ। গোরু বললে, 'হাম্বা! এত দুধ নিয়ে করবেটা কী?' ব্রুনো বললে, 'কিছু মনে কোরো না, ঠাকরুন, চড়ুইভাতি করব।' গোরু বললে, "হাম্বা! দুধটাকে ফোটাবে না তো?" ব্রুনো বললে, 'একদম ফোটাব না! টাটকা দুধ কত মিষ্টি আর কেমন গরম-গরম, ফোটাবার দরকারই হয় না। না-ফোটানোই ভালো'!"

ব্রুনো এইখানটায় শুধরে দিয়ে বললে, "না-ফোটানোর দরকার হয় না।"

"তখন ব্রুনো দুধটা একটা বোতলে ভরে নিলে। তার পর ভাবলে, 'এবার পাঁউরুটির জোগাড় দেখি!' এই বলে সে পাঁউরুটি বানাবার উনুনের কাছে গিয়ে টাটকা তাজা একখানা বড়ো পাঁউরুটি নিলে। তখন উনুন বললে—"।

ব্রুনো আর ধৈর্য রাখতে পারলে না, বলে উঠল, "পাঁউরুটিগুলো খুব হালকা আর ফাঁপা ফাঁপা! তুমি এত কথা বাদ দিচ্ছ না!"

সিল্‌ভি বিনা প্রতিবাদে দোষ স্বীকার করে নিলে। "—একটা টাটকা তাজা পাঁউরুটি, যেমন হালকা, তেমনি ফাঁপা ফাঁপা। তখন উনুনটা বললে—" এইখানে সিল্‌ভি বেশ খানিকক্ষণ থেমে রইল। বললে, "উনুন যদি কথা কয় তা হলে কী বলে শুরু করবে বলো তো, কিছুই তো মাথায় আসছে না!"

ওরা দুজনেই সাহায্যের প্রত্যাশায় করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু আমি কী আর বলি। শেষপর্যন্ত জানাতেই হল, "আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। উনুনকে কখনো কথা বলতে শুনি নি তো।"

মিনিট দুয়েক কারো মুখেই কোনো কথা জোগাল না। তার পর ব্রুনোই প্রথম মুখ খুলল, খুব শান্ত গলায় বললে, "উনুনের শুরু তো 'উ' দিয়ে।"

সিল্‌ভি উৎসাহভরে বলে উঠল, "সোনার চাঁদ ছেলে রে! বানানটা তো খুব রপ্ত করেছ!—তখন উনুন বললে, 'উ! এতখানি রুটি নিয়ে হবেটা কী, শুনি?'" ব্রুনো বললে, "কিছু মনে কোরো না"—আচ্ছা, উনুনরা 'ঠাকরুন', না 'মশাই', কী বলবে?"

প্রশ্নটা আমার দিকেই চেয়ে করা হল। উত্তরে বললুম, "দুইই

বলা যায়, মনে হচ্ছে।" এর চেয়ে নিরাপদ উত্তর আর কীই-বা দিতে পারতুম!

সিল্‌ভি বিনা দ্বিধায় আমার অভিমতটা মেনে নিয়ে বলতে লাগল, "তখন ব্রুনো বললে, 'কিছু মনে কোরো না, ঠাকরুমশাই, রুটি নিয়ে আমি চড়ুইভাতি করব।" উনুন বললে, "উ! ভালো কথা, কিন্তু সেঁকবে না তো?' ব্রুনো বললে, 'একদম সেঁকব না। টাটকা তাজা রুটি কেমন হালকা আর কেমন ফাঁপা ফাঁপা, সেঁকবার দরকারই হয় না! না সেঁকাই ভালো!' "

ব্রুনো আবার ফুট্ কাটলে, "কখ্‌খনো না-সেঁকার দরকার হয় না! তুমি এত ছোটো করে বল-না!"

সিল্‌ভি বলতে লাগল, "তখন ব্রুনো রুটিটা ঢাকা-দেওয়া চুবড়ির মধ্যে ভরে রাখলে। তার পর ভাবলে, 'এবার আপেলের জোগাড় দেখি!' তখন সে সেই চুবড়ি নিয়ে চলল আপেলগাছের কাছে। আপেলগাছ থেকে পাকা টুস্‌টুসে গোটাকতক আপেল পেড়ে নিলে। তখন আপেল-গাছ বললে—" এইখানটায় এসে আবার একবার গল্পে ছেদ পড়ে গেল।

ব্রুনো যথারীতি ভুরু কুঁচকে কপালে টোকা মেরে যেতে লাগল; আর, সিল্‌ভি উন্মুখ হয়ে উঁচুর দিকে চেয়ে রইল যেন গাছের ডালে-বসা পাখিগুলো কিচির্-মিচির্ করতে করতে ওকে একটা বুদ্ধি জুগিয়ে দিল বলে। কিন্তু কিছুই হল না।

পাখিদের দিকে চেয়ে সিল্‌ভি বিড়্‌বিড়্ করে বললে, "আপেলগাছ যদি কথা কয়, তা হলে কী বলে শুরু করবে?"

শেষপর্যন্ত ব্রুনোর পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হল। বললুম, "আপেলগাছের শুরু 'আ' দিয়ে না?"

খুশিতে ডগমগ হয়ে সিল্‌ভি বলে উঠল, "ওমা! তাই তো! তোমার কী বুদ্ধি, বাবা!"

ব্রুনো ধড়্‌মড়িয়ে উঠে পড়ে আমার মাথা চাপড়াতে শুরু করে দিলে। চেষ্টা করতে লাগলুম, যাতে আমার চোখে-মুখে গর্বের ভাব না-আসে।

সিল্‌ভি বলতে লাগল, "আপেলগাছ তখন বললে, 'আ! এত আপেল নিয়ে হবেটা কী শুনি?' ব্রুনো বললে, 'কিছু মনে কোরো না, ঠাকরু-মশাই, আপেল নিয়ে আমি চড়ুইভাতি করব।' আপেলগাছ বললে, 'আ! কিন্তু গুমো আঁচে ভাপাবে না তো?' ব্রুনো বললে, 'কখ্‌খনো

ভাপাবো না। পাকা আপেল কেমন টুস্‌টুসে আর মিষ্টি, ভাপিয়ে নরম করবার দরকারই হয় না। না-ভাপানোই ভালো।' ”

ব্রুনো বলতে যাচ্ছিল, “কখনো না-ভাপানোর—” কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই সিল্‌ভি নিজে থেকেই শুধরে দিয়ে বললে, “ ‘কক্ষনো কোনো কারণেই না-ভাপানোর দরকার হয় না!’ তখন ব্রুনো সেই ঝুবড়ির মধ্যে পাঁউরুটি আর দুধের বোতলের সঙ্গে সেই আপেলগুলোও রেখে দিলে। তার পর চড়ুইভাতি করতে চলল সেই পাহাড়ের ওপর একা একা—”

এইখানে ব্রুনো আমার গাল থাবড়ে বলে উঠল, “একা একা চড়ুইভাতি করছে বলে মনে কোরো না যেন যে, সব একা একা খেতে লোভ হয়েছে ওর। আসলে, ওর ভাই-বোন তো কেউ নেই।”

বললুম, “বোন নেই, এটা খুবই দুঃখের কথা, তাই-না?”

চিন্তার সুরে ব্রুনো উত্তর দিলে, “ঠিক বলতে পারছি না। কারণ, বোন ছিল না বলে ওকে পড়াও তো করতে হত না। তাই হয়তো ওর গায়ে লাগত না।”

সিল্‌ভি তখন বলে চলেছে, “ব্রুনো তো রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে, আর, এদিকে হয়েছে কী, পেছন পেছন একটা অদ্ভুত শব্দ এগিয়ে আসছে—ধুপ্! ধুপ্! ধুপ্! ব্রুনো ভাবলে, ‘কীসের শব্দ? ও, বুঝতে পেরেছি! আমার ঘড়িটা চলছে, তারই শব্দ!’ ”

এইখানে ব্রুনো আমায় জিগেস করলে, “আসলে কী বলো তো? সত্যিই ঘড়ির শব্দ?” ওর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক দেখলুম।

বললুম, “তা ছাড়া আর কী? নিশ্চয়ই ঘড়ির শব্দ।” তাই শুনে ব্রুনো তো হেসেই খুন।

“তখন ব্রুনো আরো বেশি করে ভাবতে লাগল। মনে মনে বললে, ‘না! ঘড়ির শব্দ তো হতে পারে না, কারণ আমার তো ঘড়িই নেই!’ ”

কথাটা শুনে আমার মুখে কী ভাবান্তর হয় দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ব্রুনো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি খুব অপ্রস্তুত হবার ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করে বুড়ো আঙুল চুষতে লাগলুম। ব্রুনো খুব খুশি।

“ব্রুনো তো রাস্তা দিয়ে চলছে। আবার সেই অদ্ভুত শব্দটা শুনতে পেলে—ধুপ্! ধুপ্! ধুপ্! ব্রুনো ভাবলে, ‘কীসের শব্দ? ওঃ হো, বুঝেছি!’ তখন ব্রুনো বললে, “আমার এক-চাকার ঠ্যালাগাড়িটা নিয়ে

ছুতোর মিস্ত্রি পেরেক ঠুকে সারাচ্ছে, তারই শব্দ ?' "

ব্রুনো ফের আমায় জিগেস করলে, "আসলে সত্যিই কি ছুতোরের হাতুড়ির শব্দ ? বল দিকিনি !"

আমি চোখ বড়ো বড়ো করে বললুম, "একশোবার হাতুড়ির শব্দ !" এমন ভাবে বললুম, যেন আমার কোনো সন্দেহই নেই।

সিল্‌ভির গলা জড়িয়ে তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ব্রুনো ঠাট্টার সুরে বললে, "সিল্‌ভি রে ! বলছে, একশোবার হাতুড়ির শব্দ !"

সিল্‌ভি তখন বলছে, "তখন ব্রুনো আরো বেশি করে ভাবতে লাগল। ভেবে ভেবে শেষকালে বললে, "না ! ছুতোর মিস্ত্রি আমার কাঠের ঠ্যালা-গাড়ি সারাচ্ছে, তা তো হতেই পারে না, কারণ ঠ্যালাগাড়িই তো নেই আমার।' "

হেরে যাবার লজ্জায় ব্রুনোর দিকে এবার আর তাকাতে পারলুম না, দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হল।

"ব্রুনো আবার হাঁটতে লাগল। খানিক দূর যেতেই, আবার সেই অদ্ভুত শব্দ—ধুপ ! ধুপ্ ! ধুপ্ ! ব্রুনো এবার ভাবলে, পেছন ফিরে একবার দেখাই যাক, ব্যাপারটা কী ! তাকিয়ে দেখে কিনা—একটা বিরাট সিংহ !"

ব্রুনো ফুট্ কাটলে, "মস্তো বিরাট একটা সিংঘ !"

"হ্যাঁ, মস্তো বিরাট একটা সিংহ। তাই-না দেখে, ব্রুনো তো ভীষণ ভয় পেয়ে প্রাণপণে দৌড়তে—"

ব্রুনো বাধা দিয়ে বলে উঠল, "মোটেই ভয় পায় নি ! ভালো করে দেখবে বলে ছুট্টে দূরে চলে গেল ; গপ্‌গপিয়ে ছোটো-ছোটো ছেলেদের মাথা খেত যে-সিংঘটা, ওটা সেই সিংঘ কি না, দেখতে হবে না বুঝি ! সিংঘটা কত বড়ো তাও দেখতে হবে না বুঝি !"

"সিংহটা ভালো করে দেখবার জন্যে ব্রুনো তো দৌড়তে লাগল, আর সিংহটা টুক্‌টুক্ করে তার পেছন-পেছন আসতে লাগল। সিংহটা পেছন থেকে খুব মিষ্টি গলায় ডাকতে ডাকতে আসছে, 'খোকনমণি, খোকনমণি ! আমায় ভয় করছ কেন। আমি এখন খুব শান্ত-শিষ্ট হয়ে গেছি, বুড়ো গোবেচারা হয়ে গেছি ! আগের মতো আর আমি গপ্‌গপিয়ে ছোটো ছেলেদের মাথা-টাথা খাই না।' তখন ব্রুনো বললে,

'সত্যিই খান না তো মশাই ? তা হলে কী খান ?' তাই শুনে সিংহ বললে—"

এইখানে আমার থুতনি টেনে ব্রুনো বললে, "দেখলে তো, মোটেই আমি ভয় পাই নি ! ভয় পেলে কি 'মশাই' বলতুম ?"

স্বীকার করতেই হল যে, কেউ ভয় পেয়েছে কি না, তা যাচাই করার এমন ভালো উপায় আর হয় না।

"সিংহ তখন বললে, 'তা, আমি রুটি আর মাখন খাই, আর চেরি খাই, আর মোরব্বা খাই, আর কেক খাই—' "

ব্রুনো তার সঙ্গে জুড়ে দিলে "—আর আপেল খাই।"

" 'হ্যাঁ, আর আপেল খাই।' তখন ব্রুনো বললে, 'আমার সঙ্গে চড়ুইভাতি করতে যাবেন নাকি ?' সিংহ বললে, 'বাঃ, সে তো খুব ভালো কথা।' তখন ব্রুনো আর সেই সিংহ পাহাড়ের দিকে যেতে লাগল।"

এই পর্যন্ত বলে সিল্‌ভি হঠাৎ থেমে গেল।

খুব হতাশ হয়ে প্রশ্ন করলুম, "আর কিছু নেই, এই শেষ ?"

সিল্‌ভি একটু সংকোচভরে বললে, "একদম শেষ নয়, আর দু-এক ছত্র বাকি আছে কেবল। তাই-না, ব্রুনো ?"

ব্রুনো খুব একটা উদাসীন ভাব দেখিয়ে বললে, "হ্যাঁ, দু-এক ছত্তর মাত্তর।"

সিল্‌ভি আবার বলতে শুরু করলে, "যেতে যেতে যেতে যেতে একটা ঝোপের আড়ালে চোখ পড়তেই দেখে কিনা, একটা কালো কুচ্‌কুচে ভেড়া ! ভেড়াটা তো ভয়ে-ময়ে তিড়িং তিড়িং করে ছুটতে লাগল—"

ব্রুনো ফুট্ কাটলে, "সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিল।"

"ভেড়াও ছুটেছে, ব্রুনোও তার পেছন পেছন ছুটেছে। ব্রুনো ছুটছে আর বলছে, 'কচি ভেড়া, কচি ভেড়া ! এই সিংহমশাইকে দেখে ভয় পেয়ো না ! ও কাউক্কে শিকার করে না। ও কেবল চেরি খায়, মোরব্বা খায়—' "

ব্রুনো বলে উঠল, "আর আপেল খায়। কেবলই তুমি আপেলের কথাটা ভুলে যাও।"

"ব্রুনো আরো বললে, 'আমাদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে আসবে নাকি ?' তাই শুনে ভেড়াটা বললে 'ওঃ। যেতে যে কী ইচ্ছে

আমার। কিন্তু মা যদি যেতে দেয়, তবেই তো যাব।' তখন ব্রুনো বললে, 'চল, তোমার মাকে জিগেস করে আসি।' তখন তারা মা-ভেড়ার কাছে গেল। ব্রুনো বললে, "আপনার বাচ্ছাকে আমার চড়ুই-ভাতিতে যেতে দিন-না।" মা-ভেড়া বললে, "আগে দেখি, পড়া করেছে কি না, তবে যাবে।" তখন বাচ্ছা-ভেড়া বললে, "সব পড়া করেছি গো, মা।'

ব্রুনো এইখানে খুব অনুনয় করে বললে, "মনে কর, ওর কোনো পড়া ছিল না।"

সিল্‌ভি বললে, "তা চলবে না। পড়ার কথা বাদ দিলে কখনো হয়। তখন মা-ভেড়া বললে, 'অ আ ই শেখা হয়েছে? বলো তো দেখি অ কেমন শিখেছ?' বাচ্ছা-ভেড়া বললে, 'শিখেছি গো, মা। অজগর তেড়ে আসছিল, দেখেই পালিয়ে এসেছি।' মা-ভেড়া বললে, 'বাঃ, বেশ বলেছ। বলো তো দেখি আ কেমন শিখেছ?' 'শিখেছি গো, মা। আম পেড়ে খেয়েছি!' 'বাঃ, বেশ বলেছ। বলো তো দেখি ই কেমন শিখেছ?' 'শিখেছি গো, মা। ইঁদুরভায়া ভয়ে মরে যাচ্ছিল ঈগল-পাখিকে দেখে।' 'বাঃ বেশ বলেছ। যাও। ব্রুনোর চড়ুইভাতিতে ঘুরে এসো।' তখন তারা আবার খেতে লাগল। ব্রুনো মাঝখানে রইল, যাতে ভেড়াটা সিংহকে দেখতে না পায়।"

ব্রুনো বুঝিয়ে দিলে, "দেখতে পেলে ভয় পাবে তো।"

সিল্‌ভি বলে চলল, "হ্যাঁ, ভয়ে কাঁপছিল বেচারা। আর খুব ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। ফ্যাকাশে হতে হতে এমন হল যে, পাহাড়ের ওপর পৌঁছতে না পৌঁছতে, কালো ভেড়াটা একেবারে ধব্‌ধবে সাদা হয়ে গেল।"

ব্রুনো বলে উঠল, "তবে, ব্রুনো তো আর ভয় পায় নি, তাই সে কালোই রয়ে গেল।'

সিল্‌ভি হেসে উঠে বললে, "মোটেই কালো রয়ে যায় নি, ব্রুনোর গায়ের রঙ গোলাপিই রয়ে গেল। তুমি যদি কালো হতে তা হলে কি আর তোমায় এমন করে আদর করতুম।"

ব্রুনো সাফ জানিয়ে দিলে, "আদর অমনি না-করলেই হল আর-কি। আর তা ছাড়া ব্রুনো তো আর সত্যিই ব্রুনো নয়—মানে, ব্রুনো তো আর সত্যিই আমি নয়—মানে—তুমি বড্ডো আবোল-তাবোল বকো সিল্‌ভি।"

সিল্‌ভি বললে, "আচ্ছা, আর বাজে বকব না, হল তো!—যেতে যেতে যেতে যেতে সিংহ বললে, "আমার বয়েস যখন আরো কম ছিল, তখন আমি কী করতুম, বলি, শোনো। গাছের আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকতুম; দেখতুম, কখন একটা ছোটো ছেলে এসে পড়ে। (ব্রুনো সিল্‌ভির কোল-ঘেঁষে সরে এসে বসল।) খুব রোগা চিম্‌সে মতন ছেলে এলে, তাকে ছেড়ে দিতুম। কিন্তু যদি বেশ গোলগাল নধর ছেলে আসত—

ব্রুনো আর সামলাতে পারলে না। প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, "মনে করো, ও গোলগাল নধর নয়।"

সিল্‌ভি ধমকে উঠে বললে, "বাজে বোকো না ব্রুনো! এক্ষুনি তো শেষ হয়ে যাচ্ছে গল্পটা!—হ্যাঁ, সিংহটা বললে, 'যদি কোনো গোলগাল নধর ছেলে আসত, তা হলে হালুম করে লাফিয়ে পড়ে তাকে কপাৎ করে খেয়ে ফেলতুম! আঃ, গোলগাল নাদুস্‌-নুদুস্‌ ছেলেদের খেতে যে কী চমৎকার যদি জানতে!' তখন ব্রুনো বললে, 'দয়া করে ছোটো ছেলেদের খেয়ে ফেলার গল্প আর বলবেন না! আমার গা শিউরে ওঠে!'"

শুনতে শুনতে গল্পের ব্রুনোর মতো আসল ব্রুনোও শিউরে উঠতে লাগল।

"তখন সিংহ বললে, 'বেশ, ও-সব কথা নাহয় না-ই বললুম তা হলে! তার চেয়ে আমার বিয়ের দিনের ঘটনার কথাই বলি, শোনো—'"

আমার থুতনি টেনে সজাগ করে ব্রুনো বলে উঠল, "গল্পের জায়গাটা খুব ভালো!"

"বিয়ের দিন সকালের জলখাবারটা যা হয়েছিল না! টেবিলের একধারে ছিল বিরাট একটা প্লাম-পুডিং। আর ও-ধারে ছিল সুন্দর করে ঝলসানো একটা গোটা ভেড়া! ওহ্‌! ঝলসানো ভেড়া যে কী সুন্দর খেতে, তা যদি জানতে!" বাচ্চা ভেড়া তখন বললে, 'দয়া করে ভেড়া খাবার কথা আর বলবেন না! আমার গা শিউরে ওঠে!' সিংহ বললে, 'বেশ, ও-সব কথা আর নাহয় না-ই বললুম তা হলে!'"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খ্যাঁকশেয়ালের বাচ্ছা

"পাহাড়ের মাথায় পৌঁছবার পর ব্রুনো তো সেই চুবড়ির ঢাকা খুলল; তার পর চুবড়ি থেকে একে একে রুটি বার করল, আপেল বার করল, দুধ বার করল; তার পর তারা তিনজনে মিলে খাবার খেল, দুধ খেল। দুধ সবটা শেষ হয়ে গেল। আপেল আর রুটি আদ্দেক খাওয়া হয়েছে, এমন সময়ে ভেড়ার ছানাটা বললে কি, 'এঃ, আমার খুরগুলো সব চ্যাট্‌চ্যাটে হয়ে গেছে! ধুয়ে আসি গে।' সিংহ বললে, 'পাহাড়ের নীচেই নদী আছে, সেখানে গিয়ে ধুয়ে এসো গে। আমরা অপেক্ষা করছি!'"

ব্রুনো খুব গম্ভীরভাবে ফিস্‌ফিস্ করে আমায় জানিয়ে দিলে, "ভেড়াটা কিন্তু আর ফিরে এল না!"

শুনতে পেয়ে সিল্‌ভি বললে, "আগে থেকে অমন চুপি চুপি বলে দিতে নেই, ব্রুনো! তাতে গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়!—ভেড়ার-ছানাটা সেই যে খুর ধুতে গেল, আর আসেই না, আসেই না। তখন সিংহ বললে, 'যাও তো, দেখে এসো তো, ভেড়ার-ছানাটার কী হল। নিশ্চয়ই রাস্তা হারিয়ে গেছে।' ব্রুনো তখন পাহাড় থেকে নেমে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল। দেখে কি, ভেড়ার-ছানাটা নদীর ধারে বসে আছে, আর তার পাশে বসে ওটা কে? না, একটা ধেড়ে খ্যাঁকশেয়াল! খ্যাঁকশেয়ালটা তখন বলছে, 'সত্যি বলছি, বাছা, দেখবে কত ভালো লাগবে তোমার

এসোই না একবার আমার সঙ্গে! ঘরে আমার তিনটি ছানা আছে! আমরা সবাই ভেড়ার-ছানা খুব ভালোবাসি!' ভেড়ার-ছানা তাই শুনে বললে, 'ভালো তো বাসেন, কিন্তু কখনো খান না তো?' খ্যাঁকশেয়াল জবাব দিলে, 'রামচন্দ্র! বল কী, ভেড়ার-ছানা খাব। স্বপ্নেও কখনো ভাবি না!' তখন ভেড়ার-ছানা বললে, 'তা হলে চলুন যাই।' তার পর দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল।"

ব্রুনো বললে, "খ্যাঁকশেয়ালটা আসলে বেশ ভালো মতন বজ্জাত ছিল, তাই-না?"

ব্রুনোর মন্তব্য শুনে সিল্‌ভি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না! খ্যাঁকশেয়ালটা পাজি বটে, তবে 'বজ্জাত' নয়!"

ব্রুনো তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, "মানে, বলছি কি, খ্যাঁকশেয়ালটা ভালো লোক ছিল না।"

"—ব্রুনো আর তখন কী করে; তাড়াতাড়ি সিংহের কাছে ফিরে এল। এসে বললে, 'শিগ্‌গির আসুন শিগ্‌গির আসুন! একটা খ্যাঁকশেয়াল ভেড়ার-ছানাটাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে! নির্ঘাৎ খাবার মতলব!' সিংহ বললে, 'দেখি, কত তাড়াতাড়ি যেতে পারি!' দুজনে তখন লাফাতে লাফাতে পাহাড় বেয়ে নীচে নামতে লাগল।"

ব্রুনো বললে, "ওরা খ্যাঁকশেয়ালটা ধরতে পারল কি? বলো তো মশাইবাবু!" আমি কোনো কথা না-বলে ঘাড় নাড়লুম। সিল্‌ভি বলে যেতে লাগল।

"খ্যাঁকশেয়ালের বাড়িতে পৌঁছে ব্রুনো জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে কিনা, তিনটে বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল টেবিলের চারধারে বেশ ফরসা খাবার পোশাক পরে চামচে হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে, আর ধেড়ে খ্যাঁকশেয়ালটা মস্ত বড়ো একটা ছুরি বাগিয়ে ধরেছে; বেচারা ভেড়ার-ছানাটাকে জবাই করবার জন্যে তার হাত নিশ্‌পিশ্ করছে—'

এইখানটায় ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে আমায় সাহস দিলে, "ভয় পেয়ো না, মশাইবাবু, ভয় পেয়ো না!"

"—যেই-না ভেড়াটাকে কাটতে যাবে, আর অমনি হালুম বলে বিকট এক চীৎকার! (ব্রুনো আমার একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরল।) সিংহটা হালুম হালুম করতে করতে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল, আর চক্ষের নিমেষে সেই ধেড়ে খ্যাঁকশেয়ালের মাথাটা টপাং করে গিলে

ফেললে! ব্রুনো তাই-না দেখে, জানলা টপ্‌কে ঘরে ঢুকে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চ্যাঁচাতে লাগল; 'কী মজা রে, কী মজা! ধেড়ে খ্যাঁকশেয়াল পটল তুলেছে! ধেড়ে খ্যাঁকশেয়াল পটল তুলেছে!' "

ব্রুনো উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি একবার লাফিয়ে লাফিয়ে বলে দেখাব?"

সিল্‌ভি বললে, "এখন নয়, পরে। এর পর তো বক্তিমে আছে। বক্তিমে শুনতে তো তুমি ভালোবাস! কে কী বক্তিমে দিলে, সেগুলো আগে শুনতে হবে তো, না কি?"

'তা তো হবে', বলে ব্রুনো আবার বসে পড়ল।

"—সিংহ তখন বক্তিমে করে বললে, 'ওহে, হাঁদাগঙ্গারাম ভেড়া! যাও, তোমার মার কাছে ফিরে যাও। আর, ধেড়ে খ্যাঁকশেয়ালের কথায় কক্ষনো কান দিয়ো না, বুঝলে? লক্ষ্মী-সোনা হয়ে থাকবে, বড়োদের কথা শুনবে।' এর পর ভেড়ার-ছানার বক্তিমে; 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, স্যার! নিশ্চয়ই শুনব স্যার!'' ভেড়ার-ছানা তো চলে গেল। এবার ব্রুনোর প্রতি সিংহের উপদেশ: " 'ব্রুনো, তুমি এখন এই খ্যাঁকশেয়ালের বাচ্ছাগুলোকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। যাতে লক্ষ্মী-সোনা খ্যাঁকশেয়াল হয়, সেই সব শেখাও-পড়াও! ঐ ধেড়ে খ্যাঁকশেয়ালের মতো যেন না হয়! ব্যাটার মাথাই নেই!' "

এইখানটায় ব্রুনো বলে উঠল, "একটাও মাথা নেই!"

"—এর পর সিংহের প্রতি ব্রুনোর উক্তি; 'নিশ্চয়ই স্যার! একশো বার স্যার!' তখন সিংহটা চলে গেল।" (ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'এইখান থেকে শেষপর্যন্ত খুব ভালো!'')

"—এর পর বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালগুলোর প্রতি ব্রুনোর উক্তি; 'শোনো হে খ্যাঁকশেয়ালের বাচ্ছারা! লক্ষ্মী-সোনা হবার প্রথম পাঠ দিচ্ছি, শুনে রাখ। আমি তোমাদের তিনজনকে আমার চুবড়ির মধ্যে রাখছি। চুবড়িতে আপেল আছে, পাঁউরুটি আছে। আপেলও খাওয়া চলবে না, পাঁউরুটিও খাওয়া চলবে না; কিচ্ছু খাওয়া চলবে না। আগে বাড়ি যাই, তার পর দেখা যাবে। বাড়ি গিয়ে রাত্তিরের খাবার খেতে দেব।' এর পর ব্রুনোর প্রতি বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালদের উক্তি: তারা চুপ করে রইল।

"তখন ব্রুনো তার চুবড়ির মধ্যে আপেল রাখলে, খ্যাঁকশেয়ালের বাচ্ছা তিনটেকে রাখলে, আর পাঁউরুটি রাখলেন—(ব্রুনো মনে করিয়ে

দিলে, 'চড়ইডাতিতে সব দুধটাই খেয়ে ফেলেছিল তো।') তার পর চুবড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে যেতে যেতে ব্রুনো ভাবলে, 'দেখি তো, খ্যাঁকশেয়ালের বাচ্চাগুলো কী করছে।' "

ব্রুনো বলে উঠল, "তখন বুনো ঢাকনা খুলে দেখলে—"

সিল্‌ভি বলে উঠল, "আঃ, ব্রুনো! তুমি গল্প বলছ, না আমি বলছি!—হ্যাঁ, তখন ব্রুনো ঢাকনা খুলে দেখে কি, ওমা! একটাও আপেল নেই! ব্রুনো আর কী করে। বললে, 'বড়ো খ্যাঁকশেয়াল, বড়ো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, তুমি কি আপেল খেয়েছ?' বড়ো বাচ্চা বললে, 'না, না, না!' তখন ব্রুনো বললে, 'মেজো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, মেজো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, আপেলগুলো কি তুমি খেয়েছ?' মেজো বাচ্চা বলে উঠল, 'না, না, না!' তখন ব্রুনো বললে, 'ছোটো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, ছোটো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, আপেলগুলো তবে কি তুমিই খেয়েছ?' ছোটো বাচ্চা বলতে চেষ্টা করলে 'না, না, না!' কিন্তু তার মুখটা ভরে রয়েছে বলে আওয়াজ বেরল, 'গা, গা, গা!' ব্রুনো তখন তার মুখের ভেতর উঁকি মেরে দ্যাখে কিনা মুখ ভর্তি আপেল!"

ঘাড় নেড়ে ব্রুনো বললে, "হায় রে, হায়! খ্যাঁকশেয়ালগুলো কী পাজি!"

সিল্‌ভি একটু থামতেই ব্রুনো বললে, "আর পাঁউরুটি?"

সিল্‌ভি বললে, "হ্যাঁ, এর পর পাঁউরুটি। ব্রুনো তো তখন চুবড়ির ডালা বন্ধ করে আবার হাঁটতে লাগল। যেতে যেতে যেতে যেতে ভাবলে, 'আর একবার দেখি তো!' খুলে দেখে কি, ওমা! পাঁউরুটি সাবাড়! ব্রুনো তখন বললে, 'বড়ো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, বড়ো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, পাঁউরুটি কি তুমি খেয়েছ?' বড়ো বাচ্চা বললে, 'না, না, না!' 'মেজো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, মেজো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়াল, পাঁউরুটি কি তুমি খেয়েছ?' মেজো বাচ্চা খ্যাঁকশেয়ালের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল, 'গা, গা, গা!' ব্রুনো তখন তার মুখের ভেতরটায় দেখলে পাঁউরুটিতে ঠাসা! তখন ব্রুনো বললে, 'হায় রে, হায়! এই পাজি খ্যাঁকশেয়ালগুলোকে নিয়ে তো আর পারা যায় না!' এই বলে ব্রুনো আবার চলতে লাগল।" (ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "এইবার সব চেয়ে মজা হবে!")

"—খানিক বাদে ব্রুনো আবার চুবড়ির ডালা খুললে। খুলে কী

দেখলে জানো? দেখলে মাত্র দুটো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল রয়েছে! ব্রুনো তখন বললে, 'বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল, বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল, ছোটো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালকে কি তুমি খেয়ে ফেলেছ?" বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল বললে, 'না, না, না!' মেজো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল, তার উত্তরে বলতে গেল, 'না, না, না!' কিন্তু আওয়াজ বেরল, 'কচম্, কচম্, কচম্!' ব্রুনো তখন তার মুখের ভেতর দেখতে পেলে আদ্দেকটা পাঁউরুটি আর আদ্দেকটা ছোটো খ্যাঁকশেয়ালে ঠাসা!

"তার পর যেতে যেতে যেতে যেতে ব্রুনো যখন বাড়ির কাছে এসে গেছে, তখন আবার একবার চুবড়ি খুলে দেখে কি—"

সিল্‌ভির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্রুনো বললে, "কেবল—" তার পর কী সুবুদ্ধি হল, থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "এবারটায় বরং তোমাকেই বলতে দিলুম, মশাইবাবু!" ব্রুনো দয়া করে আমায় সুযোগ দিলে বটে, কিন্তু আমি বললুম, "তুমিই বলো ব্রুনো। তুমি বেশ সুন্দর করে বলতে পার।" ব্রুনো খুব গম্ভীর হয়ে তখন বললে, "দেখলে, কেবল একটা মাত্তর খ্যাঁকশেয়াল রয়েছে!"

উত্তেজনার মাথায় সিল্‌ভি আখ্যান বাদ দিয়ে একেবারে কথোপকথনে চলে গেল—'বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল, বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল, তুমি গোড়া থেকে এমন লক্ষ্মী হয়ে থেকেছ যে, ভাবতেই পারি না, তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে; কিন্তু, তুমি ছাড়া তোমার মেজো বোনটিকে কে আর খাবে বল?' তখন বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালের মুখ দিয়ে আওয়াজ হল, 'কোঁৎ, কোঁৎ কোঁৎ!' তার পরেই তার গলা আটকে গেল। ব্রুনো তার মুখের ভেতরটায় চেয়ে দেখে, একদম ভর্তি!" (সিল্‌ভি এইখানটায় দম নেবার জন্যে একটু থামতেই, ব্রুনো একরাশ ডেজি-ফুলের মধ্যে আড় হয়ে শুয়ে পড়ে বিজয়গর্বে আমায় বললে, "কী? খুব সুন্দর না মশাইবাবু!" আমি খুব খুঁতখুঁতের মতো ভঙ্গি করে বললুম, "সুন্দর তো বটেই, কিন্তু বেশ ভয় করে, বাবা!" ব্রুনো তার উত্তরে বললে, "ইচ্ছে করলে আমার কাছে সরে এসে বসতে পারো!")

"—ব্রুনো আর কী করে, বাড়িতে ফিরে এল; তার পর রান্নাঘরে গিয়ে চুবড়িটা খুলে দেখে কি—" সিল্‌ভি থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বোধ হয় ভাবলে বেচারা আমিকে একবার বোধ হয়

বুদ্ধি খেলাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি কিছু বলব বলে ও অপেক্ষা করতে লাগল।

ব্রুনো সাগ্রহে বলে উঠল, "মশাইবাবু কিছু ধরতে পারে নি রে সিল্‌ভি, আমাকেই বলে দিতে হবে দেখছি। চুবড়িতে কিচ্ছু নেই—একদম ফাঁকা!" শুনে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলুম, আর ব্রুনো আনন্দে হাত-তালি দিয়ে বলে উঠল, "ভয় পেয়ে গেছে রে, সিল্‌ভি! বাকিটা বলে দে!"

সিল্‌ভি আবার বলতে লাগল, "ব্রুনো তখন বললে, 'বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল! তুমি কি শেষকালে নিজেকেই খেয়ে ফেললে, দুষ্টু কোথাকার!' বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল বললে, 'ওয়াক!' তখন ব্রুনো ভালো করে দেখলে, চুবড়ির মধ্যে খালি তার মুণ্ডুটা পড়ে রয়েছে! মুণ্ডুটাকে বার করে নিয়ে, সেটাকে হাঁ করিয়ে ব্রুনো খুব জোরে জোরে নাড়াতে লাগল! খানিক বাদে মুখের মধ্যে থেকে বড়ো বাচ্ছা খ্যাঁক-শেয়ালটা বেরিয়ে পড়ল! তখন সে বললে, 'পাজি বদমাস কোথাকার, আবার হাঁ কর!' আবার জোরে জোরে নাড়তে লাগল! এবার মেজো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালটা বেরিয়ে পড়ল! ব্রুনো তাকে বললে, 'এবার তোমার মুখটা হাঁ কর দিকিনি!' আবার ঝাঁকি দিতে লাগল! ঝাঁকি দিতে দিতে ছোটো বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল বেরল, আপেল বেরল, পাঁউরুটি বেরল!

"ব্রুনো তখন সবকটাকে দেয়ালের গায়ে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে। দিয়ে, ওদের দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে একটা বক্তিমে দিলে: 'দ্যাখ, তোমরা শুরুতেই ভীষণ দুষ্টুমি করেছ, তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে। আগে বাচ্ছাদের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পেনি পরবে। পরা হয়ে গেলে শুনতে পাবে রাত্তিরের খাবার ঘণ্টা বাজবে। তখন নীচে নেমে আসবে; কিন্তু খাবার পাবে না। তার বদলে তোমাদের চাবকানো হবে! তার পর তোমরা শুতে যাবে। তার পর সকাল হলে জলখাবারের ঘণ্টা শুনতে পাবে। কিন্তু জলখাবার-টাবার কিছু পাবে না। তার বদলে আবার চাবুক খাবে! তার পর পড়তে বসবে। আর, তার পর, যদি দেখি খুব লক্ষ্মী হয়ে থেকেছ, তা হলে হয়তো দুপুর বেলা কিছু খাবার পেতে পার, চাবুকের বদলে!'

'বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়াল তিনটে তখন ওপরের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ

পরেই হলঘরে গিয়ে ব্রুনো ঘণ্টা বাজাল। 'টুং, টুং, টুং! খাবার! খাবার! খাবার!' খেতে বসবার জন্যে দুদ্দাড়িয়ে নেমে এল বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালরা! পরিষ্কার পেনি পরেছে, হাতে চামচ নিয়েছে! কিন্তু যখন খাবার ঘরে এসে পৌঁছল, দেখলে খাবার টেবিলের ওপর কেবল সাদা ধব্‌ধবে একটা চাদর পাতা, আর তার ওপর একটা লম্বা চাবুক! ওঃ, কী মারটাই খেলে!" (আমি চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ফেললুম। ব্রুনো তাড়াতাড়ি আমার হাঁটুর ওপর চড়ে আমার গাল চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, "আর মাত্তর এক ঘা বাকি আছে। ছিঃ, অত করে কাঁদতে নেই!")

"পরের দিন সক্কালবেলা ব্রুনো আবার ঘণ্টা বাজালে। 'টুং, টুং, টুং! জলখাবার, জলখাবার, জলখাবার!' বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালরা হুড়্‌মুড়্‌ করে নীচে এল! পরিষ্কার পেনি, হাতে চামচ! কিন্তু জলখাবার-টাবার কিচ্ছু নেই, শুধু সেই চাবুকটা পড়ে রয়েছে! তার পর লেখাপড়ার পালা।' আমি তখনো চোখে রুমাল চাপা দিয়ে রয়েছি দেখে সিল্‌ভি খুব তাড়াতাড়ি করে ঐ জায়গাটা পার করে দিতে চাইলে। "বাচ্ছা খ্যাঁক-শেয়ালরা কী লক্ষ্মী হয়েই না রইল, তা আর কী বলব। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা—শেষ পাতা থেকে প্রথম পাতা; ওপর থেকে নীচে—নীচে থেকে ওপরে, খুব ভালো করে পড়া করলে। শেষকালে ব্রুনো আবার ঘণ্টা বাজালে, 'টুং, টুং, টুং! খাবার, খাবার, খাবার!' এবার যখন বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালরা নীচে নেমে এল—" (ব্রুনো জিগেস করলে, "ধোয়া পেনি পরেছিল?" সিল্‌ভি বললে, "নিশ্চয়ই!" "আর চামচে?" "সে তো ছিলই, বুঝতেই পারছ!" "তবু একবার জেনে নিলুম!")

"—এবার তারা খুব আস্তে আস্তে নীচে নামলে! বলতে লাগল, "জানি, খাবার-টাবার কিচ্ছু নেই; কেবল দেখব চাবুকটা পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর!' কিন্তু ঘরের মধ্যে এসে দ্যাখে কি, ভালো ভালো সব খাবারে টেবিলটা একেবারে বোঝাই!" (ব্রুনো হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "বান-রুটি?") "বান-রুটি, আর কেক, আর—" ("—আর জ্যাম?") "হ্যাঁ, জ্যাম—আর স্যুপ—আর—" ("—আর মোরব্বা!") ব্রুনো যে-ভাবে খাবারের তালিকাটা পুরণ করলে, সিল্‌ভি তাতে কোনো আপত্তি করলে না।

"সেই থেকে সেই বাচ্ছা খ্যাঁকশেয়ালরা খুব লক্ষ্মী হয়ে গেল! খুব

ভালো করে পড়া করত—ব্রুনো যা যা বারণ করত, কক্ষনো করত না—কেউ কাউকে খেয়ে ফেলত না—এমন-কি, নিজেকেও খেয়ে ফেলত না!"

গল্পটা এমন আচমকা থেমে যেতে আমার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়; তবু, খুব তারিফ করার ভঙ্গিতে বললুম, "বটেই তো, বটেই তো!"

নবম পরিচ্ছেদ

সেবার কাজে

মিউরিয়েলের গলার আওয়াজে চটকা ভেঙে গেল। শুনলুম, সে বলছে, "কী বলছেন—'বটেই তো, বটেই তো, !' বাবা! ঢুলতে ঢুলতে একেবারে যে পড়ে যাবার দাখিল !"

ভালো করে চারি দিকে চেয়ে দেখলুম, অতিথিরা সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। সিল্‌ভি বা ব্রুনোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর্লদের বাড়ির বসবার ঘরে শুধু বসে রয়েছি আমরা চারজন।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু হঠাৎ কী দিয়েই-বা শুরু করি! কয়েকদিন থেকে জেলেদের পাড়ায় একরকম সাংঘাতিক জ্বর দেখা দিয়েছে, মারাও গেছে কিছু লোক। সেই প্রসঙ্গ তুলে বললুম, সেই যে খুব জ্বর হচ্ছিল সমুদ্রের কিনারা অঞ্চলে, সে-সম্বন্ধে নতুন কোনো খবর আছে?"

আর্ল গম্ভীর সুরে বললেন, "সকালের দিকে যা একবার খবর পেয়েছিলুম; তার পরের খবর কিছু পাই নি। সকালেই যা শুনলুম, খুবই খারাপ অবস্থা। রোগটা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। লণ্ডন থেকে যে ডাক্তারটি এসেছিলেন, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। চিকিৎসা করবার মতো একমাত্র লোক যে আছে, সেও পাশকরা ডাক্তার নয়। কম্পাউণ্ডারি করে, ওষুধও দেয়, দাঁতও তোলে—আরো কত কী করে

কে জানে! বেচারা জেলেদের কী হাল, ভেবে পাচ্ছি না—বাচ্ছা আর মেয়েদের অবস্থা তো সব চেয়ে খারাপ।"

আর্থার জিগেস করল, "সবসুদ্ধ কত জন হবে?"

আর্ল বললেন, "সপ্তাহখানেক আগে প্রায় একশো ছিল, তার পর আরো জনাকুড়ি তিরিশ মারা গেছে।"

এই সময়ে সদর দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজা খোলার শব্দ পেলুম, কথাবার্তার আওয়াজও শুনলুম। তার পর, বাড়ির ঝি আমাদের বসবার ঘরে এসে জানালে, "ডক্টর ফরেস্টারের সঙ্গে দুজন লোক দেখা করতে চান।"

আর্থার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল। দোরগোড়ায় গিয়ে সে বললে শুনলুম, "কী ব্যাপার?" তার উত্তরে যা বলা হল, তার সবটা বুঝতে পারলুম না, শুধু কানে এল—"সকাল থেকে দশজন, আরো দুজন তো এইমাত্র—"

আর্থারকে বলতে শুনলুম, "কিন্তু, ও-পাড়ায় ডাক্তার তো রয়েছেন একজন!" তার উত্তরে একটা গম্ভীর গলার কথা কানে এল, "নেই, ঘণ্টাতিনেক আগে মারা গেছেন!"

কথাগুলো কানে যেতেই শিউরে উঠে মিউরিয়েল দুহাতে মুখ ঢাকলে। সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলুম।

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলুম না। আর্ল বাইরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসে বললেন যে, আর্থারকে ডাকতে এসেছিল দুজন জেলে। তাদের সঙ্গেই গেছে, বলে গেছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে। সত্যিই ঘণ্টাখানেক বাদে আর্থার ফিরে এল। আমরা চুপচাপ বসে। কারুরই যেন কথাবার্তা বলবার মতো মন ছিল না। সদর দরজা খোলবার শব্দ পেলুম, পায়ের শব্দে আন্দাজ করলুম আর্থার ফিরে এল। কিন্তু, এই কি আর্থারের চলার ছন্দ! অতি মন্থর, অতি মৃদু—যেন কোনো অন্ধ সন্তর্পণে পথ হাতড়াচ্ছে!

ঘরে এসে মিউরিয়েলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর্থার। টেবিলের ওপর ঝুঁকে একহাত ভর দিয়ে যখন মিউরিয়েলের দিকে তাকাল, মনে হল যেন দৃষ্টি তার কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

দু-একবার কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে গেল, কথা আটকে গেল। সামলে নিতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। বললে, "মিউরিয়েল—ওরা

আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে—আমায় যেতে হবে—ওদের মধ্যে গিয়ে আমায় চকিৎসা করতে হবে—আমার ডাক পড়েছে, মিউরিয়েল—”

মিউরিয়েলের চোখে জল। আর্থারের কাঁধে হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে শুধু বললে, “যেতেই হবে তোমায়? যেতে কি হবেই আর্থার? তোমার যদি কিছু হয়! যদি তোমায় ফিরে না-পাই!”

“ওখানে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুরই সামিল। কিন্তু, আমায় ডেকে পাঠিয়েছে ওরা, ওরা আমার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। আমার জীবন দিয়েও যদি—” আর্থারের গলার স্বর অস্ফুট শোনাল।

মিউরিয়েল অসহায়ের মতো কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; আকস্মিক এই বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে সে—যেন বুঝে নিয়েছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েও আর কোনো লাভ হবে না। একবার যেন ক্ষণিক আশার আলোয় তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে, “জীবন দেবে, কিন্তু সে-জীবন কি এখন শুধু তোমার একার?”

আর্থার বললে, “জানি, আমার বাক্‌দত্তা স্ত্রী হিসেবে আমার জীবনে তোমার অধিকার কিছু কম নয়। তাই তো তোমার কাছে অনুমতি চাইছি। তুমি কি চাও না যে, আমি যাই? ওদের সেবা করার জন্যে আমায় ছেড়ে দেবে না তুমি?”

ধীর, সংযত গলায় মিউরিয়েল বললে, “দেব, যেতে দেব তোমায়। তোমায় ছেড়ে দেব—ঈশ্বরের হাতে। কখন যেতে হবে তোমায়?”

আর্থার বললে, “কাল সকালে! তার আগে অনেক কাজ সারতে হবে আমায়।”

আর্থারের কাছ থেকে তার পর শোনা গেল যে, এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে গীর্জার পুরোহিতের কাছে গিয়ে সব আয়োজন ঠিক করে রেখে এসেছে। আগামী কাল সকাল আটটায় এখানকার ছোট্টো গির্জায় তাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হবে। আমার দিকে তাকিয়ে আর্থার আরো বললে, “আমার এই পরম বন্ধুটি হবে নিত-বর, এ তো জানা কথাই। তোমার বাবা যাবেন সম্প্রদান করতে—”

মিউরিয়েল ঘাড় নাড়লে, কোনো কথা বললে না।

“—তার পর, নিশ্চিন্ত মনে আমি চলে যেতে পারব আমার কাজে—ঈশ্বর কাজে!”

এতক্ষণে মিউরিয়েল আবার কথা বলতে পারলে, "কিন্তু, তোমার আর রাত করা তা হলে উচিত নয়। বাড়ি গিয়ে যতক্ষণ সম্ভব বিশ্রাম নাও। কাল সকাল থেকে কতটুকুই-বা বিশ্রাম পাবে তুমি।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো। আমরা এবার উঠি। কাল সময় হাতে নিয়ে আসব এখানে।—শুভরাত্রি!"

আমিও বিদায় নিয়ে আর্থারের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আর্থার যেন কিছু বলবার চেষ্টা করলে দু-একবার, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু বললে না। কয়েকবার লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, টের পেলুম। বাড়ি গিয়ে বাতি জ্বেলে যে-যার শোবার ঘরের দরজায় যখন পৌঁচেছি, আমার দিকে ফিরে আর্থার বললে, "শুভরাত্রি, বন্ধু! ভগবান তোমার ভালো করুন!"

আমারও অন্তর থেকে যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি বেরিয়ে এল, "ভগবান তোমার ভালো করুন!"

পর দিন আটটা বাজার আগেই আবার 'হল'-এ গিয়ে পৌঁছলাম। মিউরিয়েল, আর্ল আর পুরোহিত তৈরি হয়েই ছিলেন আমাদের অপেক্ষায়। গির্জায় যাওয়া হল, কাজ শেষ করে ফিরে আসা হল—নিঃশব্দে, ম্লান মুখে, বিষণ্ণ হৃদয়ে। এ কি বিয়ের আসর হল, না শ্মশানযাত্রা! মিউরিয়েলের পক্ষে শোকযাত্রাই বটে। বিবাহ-বাসর থেকেই তার স্বামীকে যেতে হচ্ছে মৃত্যুর হাতছানিতে সাড়া দিতে।

সবাই প্রাতরাশে বসলুম; প্রাতরাশ শেষ হতে-না-হতেই গাড়ি এসে হাজির। আর্থার বাড়ি যাবে, দরকারি জিনিসপত্র নেবে, তার পর ঐ গাড়িতেই যাবে সমুদ্রের কোল-ঘেঁষা সেই অভিশপ্ত গ্রামের দিকে—যেখানে মহামারীর তাণ্ডব চলেছে। যতদূর পর্যন্ত যাওয়া নিরাপদ, গাড়ি তার বেশি আর যাবে না। পথে কয়েকজন জেলে অপেক্ষা করবে। তারা জিনিসপত্র বইবে। বাকি পথ হেঁটেই যেতে হবে।

মিউরিয়েল একবার জিগেস করলে, "দরকারি জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক নিয়েছ তো? কিছু ভুল হয় নি?"

"চিকিৎসার জন্যে যা যা দরকার, সবই নেওয়া হয়েছে। আমার নিজের জন্যে কী-ই বা আর লাগবে। আমার ঘড়িটা নেব, কয়েকটা বই—দাঁড়াও দাঁড়াও, আর একটা বই নিতে হবে; ছোটো একটা বাইবেল। রোগী বা মুমূর্ষুদের শিয়রে বসে পড়ে শোনাবার দরকার হতে পারে।"

"আমারটা সঙ্গে নাও।" এই বলে মিউরিয়েল ওপর থেকে তার পকেট-বাইবেলটা আর্থারকে এনে দিলে। বললে, "এতে শুধু আমার নামটুকুই লেখা আছে। শুধু লেখা আছে 'মিউরিয়েল'। উপহার হিসেবে আর কিছু লিখে দেব?"

বইটা নিয়ে আর্থার বললে, "না, না, আর কিছু লেখবার দরকার নেই। তোমার নাম লেখা থাকা মানেই তো, বইটা আমারও।" তার পর হালকা গলায় বললে, "ব্রুনো হলে বলত, "খুব ভালো মতন আমার!"

আমার এবং আর্লের কাছে বিদায় নিয়ে আর্থার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। সঙ্গে মিউরিয়েল গেল তাকে এগিয়ে দিতে। মিউরিয়েলকে বাইরে থেকে খুবই সংযত দেখাচ্ছিল, অন্তত তার বৃদ্ধ বাবার চেয়ে অনেক সংযত তো বটেই। আমরা ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট দুয়েক বাদে গাড়ি চলার শব্দে বুঝতে পারলাম, আর্থার চলে গেল। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম; মিউরিয়েলের ধীর পদক্ষেপের শব্দ পেলাম সিঁড়িতে—সে ওপরে উঠে গেল। আর্লকে একা রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম, 'এ-জীবনে আমাদের—আমাদের এই চারজনের আর কি কখনো দেখা হবে একসঙ্গে?' দূর থেকে ঘণ্টার করুণ আওয়াজে উত্তর ভেসে এল, 'না! না! না!'

দশম পরিচ্ছেদ

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়

"ফেয়ারফিল্ড ক্রনিক্‌ল" পত্রিকার পাতা থেকে—

এল্‌ভেস্টন গ্রামের সন্নিহিত সাগরতীরবর্তী ধীবরপল্লীতে গত দুই মাস ধরে যে মহামারীর তাণ্ডব চলেছে, তার ফলে সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই প্রায় নিশ্চিহ্ন। এ-সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে যে-সব খবর প্রকাশ করে এসেছি, পাঠকরা গভীর বেদনার সঙ্গে নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। মাত্র তিন মাস আগেও এখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ১২০ জনেরও বেশি ; আজ বেঁচে আছেন মাত্র ২৩ জন। গত বুধবার এই অবশিষ্ট ২৩ জনকে স্থানীয় লোকাল বোর্ডের নির্দেশে সেখান থেকে অপসারণ করে কাউন্টি হাসপাতালে নিরাপদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পল্লীটি এখন প্রকৃতপক্ষে 'মৃত্যুপুরী'—মৃত্যুর সে-নীরবতাকে ছিন্ন করবার মতো একটি মানুষেরও সাড়া পাওয়া যাবে না।

নিকটবর্তী অঞ্চলের শক্ত-সমর্থ ছজন মৎস্যজীবী এই উদ্ধারকার্যে সাহায্য করেন। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পরিচালনাধীনে এই কাজ সম্পাদিত হয়েছে। চিকিৎসক মহাশয় এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকেন। সঙ্গে আসে বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স। অনেকেই স্বেচ্ছায় এই উদ্ধারকার্যে সহায়তা করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন ; তাঁদের মধ্যে থেকেই সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বিচার করে

ছজনকে বেছে নেওয়া হয়—কারণ, মহামারীর তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও, রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা যে নেই, এমন কথা বলা যাচ্ছে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী যা-কিছু সম্ভব, রোগসংক্রমণের বিরুদ্ধে সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। পীড়িত ব্যক্তিদের অতি সন্তর্পণে স্ট্রেচারে বহন করে একে একে অ্যাম্বুলেন্সে এনে শোয়ানো হয়। প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে একজন করে নার্স ছিলেন। হাসপাতাল পর্যন্ত ১৫ মাইল পথ শম্বুকগতিতে অতিক্রম করতে হয়, কারণ অনেকেরই অবস্থা এমন দুর্বল যে, গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। হাসপাতালে পৌঁছতে তাই বিকেল পার হয়ে যায়।

এই ২৩ জন রোগীর মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ৬ জন স্ত্রীলোক এবং ৮ জন বাচ্ছা। সকলকার পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি, কারণ বাচ্ছাদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত শিশু, এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন কেউই বেঁচে নেই। দুজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের চেতনা এমনই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে, তাঁরা কোনো প্রশ্নেরই যথাযথ জবাব দিতে পারছেন না।

দরিদ্র মৎস্যজীবী এবং তাদের পরিবার-পরিজন ছাড়া আর ৫ জন মাত্র ছিলেন, যাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত নিঃসংশয়ে জানা গেছে যে, তাঁরা কেউই জীবিত নেই। গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে সগর্বে এই শহীদদের পরিচয় আমরা উপস্থিত করছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। ইংলণ্ডের গৌরবের তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে এঁদের নাম লেখা হয়ে রইল—

রেভারেণ্ড জেম্‌স বার্জেস, এম. এ. এবং তার সহধর্মিণী এমা বার্জেস। রেভারেণ্ড বার্জেস ছিলেন এই অঞ্চলের গির্জার যাজক, বয়স তিরিশেরও কম, মাত্র দুই বছর আগে বিবাহ করেছিলেন। এঁদের দুজনের মৃত্যুর তারিখ এঁদের বাসগৃহে লিখিত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এর পরেই আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে যাঁর নাম উল্লেখ করতে চাই, তিনি হলেন, ডক্টর আর্থার ফরেস্টার। স্থানীয় চিকিৎসকের মৃত্যুর পর ইনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে, মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন এখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের ; বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় ভাগ্যের হাতে তাদের ফেলে রাখতে চান নি। কোথাও তাঁর নাম বা মৃত্যুর তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় নি, তবে মৃতদেহ থেকেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বুকের ওপর একটি বাইবেল রাখা

ছিল, তাঁর দুটি হাত জড়ো করে রাখা ছিল তার ওপর। বাইবেলটি তাঁর স্ত্রী তাঁকে দিয়েছিলেন। সমাধি দেবার জন্যে মৃতদেহটিকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা উচিত হবে না বিবেচনা করায়, অবিলম্বে বাকি চারজনের সঙ্গে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয়। কুমারী অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লেডি মিউরিয়েল ওর্ম। যেদিন তাঁদের বিবাহ হয়, সেইদিনই ডক্টর ফরেস্টার এই বিপজ্জনক হিতব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আর একজন হলেন রেভারেণ্ড ওয়াল্টার সণ্ডার্স। এঁর মৃত্যু ঘটে প্রায় দু-তিন সপ্তাহ আগে। তিনি যে-বাড়িতে থাকতেন, তার দেওয়ালে লেখা তারিখ থেকে এইরকম অনুমান করা হচ্ছে। বাড়ির দরজা-জানালা সবই বন্ধ ছিল, কাজেই বেশ কিছুদিন যাবৎ সে-বাড়িতে কারুর প্রবেশ ঘটে নি।

সব শেষে যাঁর নাম করছি, আত্মোৎসর্গ এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় তিনিও কারো চেয়ে ন্যূন নন। তাঁর নাম ফাদার ফ্রান্সিস—একজন তরুণ জেসুইট যাজক, মাত্র কয়েক মাস আগে এখানে এসেছিলেন। মৃতদেহের সন্ধান পাওয়ার খুব বেশিক্ষণ আগে তাঁর মৃত্যু ঘটে নি। তাঁর পোশাক এবং বুকের কাছে ধরে রাখা ক্রুশ থেকে তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

হাসপাতালে অপসারণের পর থেকে এ-পর্যন্ত ২ জন পুরুষ এবং একজন বাচ্ছার মৃত্যু ঘটেছে। বাকি কজন সেরে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য দু-তিন জন রোগীর জীবনীশক্তির এতই অভাব যে, অসুখের হাত থেকে রেহাই পেলেও, তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন কি-না, তা খানিকটা ভাগ্যের হাতে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরীর গান

বছর শেষ হয়ে এল। আবার একদিন যখন আমার ট্রেন স্টেশনে এসে দাঁড়াল, "এলভেস্টন! এলভেস্টন!" বলে কুলিরা যখন চেঁচাতে লাগল, তখন শীতের সেই পড়ন্ত আলোয় আমার চেনা—আমার অনেক সুখের স্মৃতি-দিয়ে-ঘেরা চেনা অনেক কিছুই ভালো করে চিনতে পারলুম না।

ফিরে আসতে কি ভালো লাগে? কয়েক মাস আগেও আমাকে আদর করে এগিয়ে নিতে আসত যে, তার সঙ্গে আর তো কখনো দেখা হবে না আমার! কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে চলছি, আর ভাবছি, এখন হঠাৎ যদি তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যদি আবার হাসিমুখে আমার কুশল প্রশ্ন করে, বোধ হয় মোটেই অস্বাভাবিক মনে হবে না।

কুলিকে বাসায় যেতে বলে আমি একাই হাঁটতে লাগলাম আর্লের বাড়ির দিকে। বাড়ি যাবার আগেই ওঁদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল। মাত্র ছমাসের আলাপ, তবু মনে হয়, যেন কতদিনের আপনার লোক!

মনে আছে, গির্জার বাগানের মধ্যে দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হয়। আগড় খুলে বাগানে ঢুকলুম। কত মৃত মানুষের দেহাবশেষ ঢাকা রয়েছে এই-সব সমাধিতে। তারই মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

মনে মনে যা খুঁজছিলুম, তার সন্ধান পেতে দেরি হল না। কয়েক পা এগোতেই দেখতে পেলুম, শ্বেতপাথরের ছোট্টো একটা ক্রুশ, আর তারই সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে মিউরিয়েল। শোকের কালো পোশাক তার দেহে, ওড়নায় মুখ ঢাকা। ক্রুশটার গায়ে একটা ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

সমান খানিকটা চৌকো মতন জমি, ঘাসে ভরা। তারই মাঝখানে ক্রুশটা পোঁতা। দেখেই বোঝা যায়, এটা শুধু স্মৃতিফলক, দেহ সমাধিস্থ হয়েছে আর কোথাও। পাথরে খোদাই করে লেখা রয়েছে :

আর্থার ফরেস্টার, এম. ডি-র
স্মৃতিতে

সাগরতীরে তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয়েছে ;
তাঁর আত্মা ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের কাছেই ফিরে গেছে।

"মানুষকে আপন ভেবে যে তাদের জন্যে জীবন
উৎসর্গ করে, তার প্রেমের তুলনা নেই।"

আমাকে দেখতে পেয়েই মিউরিয়েল তার মুখের ওড়না সরিয়ে দিয়েছিল। মুখে ম্লান হাসি নিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। শোকের ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে, মনে হল।

বললে, "আপনাকে দেখে আবার যেন সেই পুরনো দিনে ফিরে এলুম। বাবার সঙ্গে দেখা করেছেন ?"

বললুম, "না। তাড়াতাড়ি হবে বলে এদিক দিয়ে আসছিলুম। তিনি ভালো আছেন তো ? তুমি ভালো আছ ?"

"ধন্যবাদ, আমরা ভালোই আছি। আপনার খবর কী ? শরীরটা কিছু সারল ?"

"ভালো বিশেষ নয়, তবে খারাপের দিকেও যায় নি, সেটাও সৌভাগ্যের কথা।"

"আসুন, এইখানে বসে নিরিবিলিতে একটু কথা বলি।" অতি শান্ত, উদাস গলায় মিউরিয়েল যখন কথাগুলো বললে, তখন টের পেলুম কত কষ্টেই-না বেচারি নিজেকে সামলে রেখেছে।

মিউরিয়েল বললে, "এখানে ভারি শান্তি। আমি রোজ—রোজ আসি।"

বললুম, "বড়ো শান্তির জায়গা।"

"আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?"

"পেয়েছিলুম, তবে উত্তর দিতে গড়িমসি করছিলুম। কীই-বা লিখব—"

"জানি আমাদের সঙ্গে আপনিও তো ছিলেন, সেই যখন শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে ও—" মিউরিয়েল থেমে গেল। তার পর আবার বললে, "আমি নিজে কয়েক বার ওখানে গিয়েছিলুম। অত সব সমাধির মধ্যে কোনটা ওর, কেউই বলতে পারলে না। তবে, যে বাড়িতে ও থাকত, সেই বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েছিল ওরা। ওখানেই ও মারা যায়। ঐটুকুই আমার সান্ত্বনা। অন্তত সেই ঘরটাতে গিয়ে দাঁড়াতে তো পেরেছি, যে-ঘরে —ও—" কথাটা শেষ করতে পারলে না মিউরিয়েল। যে-কান্না এতক্ষণ অতি কষ্টে চেপে রেখেছিল বুকের মধ্যে, বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো এবার তা উপছে পড়ল তার দু চোখের কোল বেয়ে। ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শ্বেতপাথরের ক্রশটাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল সে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালুম। এখন ওকে একটু একা থাকতে দেওয়াই ভালো। আর্লের বাড়িতে পৌঁছে গেটের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলুম—অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে পুরনো কথা সব মনে করতে লাগলুম—সুখের স্মৃতি, দুঃখের কাহিনী।

একটু পরেই মিউরিয়েল এল। তখন বেশ শান্ত। বললে, "বাঃ, ভেতরে চলুন। বাবা ভারি খুশি হবেন আপনাকে পেয়ে।"

বৃদ্ধ আর্ল দেখলাম বড্ডো বেশি আঘাত পেয়েছেন। আমাকে দেখেই তিনি হাসিমুখে আপ্যায়ন করবার চেষ্টা করলেন, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলবার আগেই তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সেদিন বেশিক্ষণ আর বসলাম না। বাসায় যাওয়া হয় নি এখনো। কাজেই বিদায় নিলাম।

মিউরিয়েল বললে, "চলুন, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিই। আমার আজ বেড়ানো হয় নি। বেড়ালে আমার ভালো লাগে, তা ছাড়া

আপনার সঙ্গে একটু কথাও বলতে চাই। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবেন? পাকা রাস্তার চেয়ে গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে অনেক আরাম। একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে অবশ্য।"

সারি সারি গাছের খিলেনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিউরিয়েল বললে, "এখানে এলেই আমার কেবল পরীদের কথা মনে পড়ে! একটা কথা জিগেস করব? আপনি পরী বিশ্বাস করেন?"

সেই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমস্ত কথা ওকে বলে দেবার জন্য মুখটা চুল্‌বুল্‌ করে উঠল। সামলে নিয়ে বললুম, "বিশ্বাস বলতে যদি এই বোঝাতে চাও যে, পরী বলে কিছু থাকা সম্ভব কি-না, তা হলে বলব 'হ্যাঁ'। তবে, আছেই, এমন কথা বলতে গেলে প্রমাণ দরকার।"

মিউরিয়েল বললে, "একদিন আপনি বলছিলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় না, এমন সব-কিছুই আপনি বিশ্বাস করতে রাজি আছেন—অবশ্য বিশ্বাসের কিছু কারণ থাকা দরকার। আপনি এই প্রসঙ্গে ভূতের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ভূত থাকলেও থাকতে পারে। পরীদের বেলাও কি সেইরকম?"

বললুম, "তাই তো মনে হয়।" অনেক কথা এসে জড়ো হচ্ছিল জিভের ডগায়, অতি কষ্টে আবার সামলাতে হল। কী জানি, মিউরিয়েল কী ভাবে নেবে।

"আচ্ছা, যদি থাকে, তা হলে এই বিশ্বসৃষ্টিতে তাদের স্থান কোথায়? তারা কী ধরনের, কোনো ধারণা আছে? যেমন ধরুন, ওদের কি ন্যায় বা নীতিবোধ আছে? মানে, ওরা কি অন্যায় করে, পাপ করে?"

"আমার মনে হয়, ওদের মুক্তি বা বিচার বোধটা মানুষের মতো অত উঁচু নয়, শিশুর মতো সরল একটা বিচারবুদ্ধি ওদের আছে, কিন্তু সেটা তার বেশি আর বাড়ে না। নীতিবোধ আছে নিশ্চয়ই। ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু থাকবে না, তাও হতে পারে না। কাজেই, আমার সিদ্ধান্ত হল, অন্যায় করা ওদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।"

আনন্দে প্রায় হাততালি দিয়ে মিউরিয়েল বলে উঠল, "আপনি তা হলে বিশ্বাস করেন যে, পরী আছে! এবার বলুন তো, কেন বিশ্বাস করেন?"

বেশ বুঝতে পারছিলুম, যে কথাটা গোপন রাখতে এত চেষ্টা করছি,

তা আর ঠেকানো গেল না বোধ হয়। বললুম, "আমি বিশ্বাস করি যে, জীবন বা প্রাণ বলতে যা বোঝায়, তা সর্বত্রই আছে। শুধু যা আমরা দেখতে পাই, ছুঁতে পাই, তাই-ই নয়—অপার্থিব এবং অদৃশ্য সত্তাও থাকতে পারে। আমরা সবাই বলি, আমাদের এই দেহকে অতিক্রম করে আরো একটা অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে—'আত্মা' বল 'চৈতন্য' বল, যা-ই বল। তা যদি হয়, তা হলে আমাদের চারি পাশে এমন সব সত্তাও তো থাকতে পারে, যাদের সঙ্গে কোনো পার্থিব দেহ বা প্রাণীর সম্পর্ক নেই? ঈশ্বর তো কত কীটপতঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, সূর্যের আলোয় মশগুল হয়ে পরম উল্লাসে কেবল ঘন্টাখানেকর পরমায়ু নিয়ে যাদের জন্ম? 'ঈশ্বর শুধু এইগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর কিছু করেন নি' এই বলে কি কোথাও দাঁড়ি টানা যায়?"

উজ্জ্বল চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে মিউরিয়েল বললে, "ঠিক কথা, ঠিক কথা! কিন্তু, এগুলো তো হল অবিশ্বাস না-করার যুক্তি। বিশ্বাস করার পক্ষে নিশ্চয়ই কিছু যুক্তি আছে? আপনি নিশ্চয়ই জানেন!"

মনে হল, এবার বোধ হয় মিউরিয়েলকে আমার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলা যেতে পারে। বললুম, "তা যদি বল, তা হলে বলব, হ্যাঁ, জানি। সে-সব কথা শোনাবার এমন চমৎকার সময় আর এমন উপযুক্ত পরিবেশ আর কোথায় পাব? বলছি, শোনো। আমি নিজের চোখে পরী দেখেছি! এই বনের মধ্যেই!"

মিউরিয়েল কোনো কথা বলতে পারলে না। ঘাড় হেঁট করে, কোলের কাছে হাত জড়ো করে ধরে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আমি বলে যেতে লাগলাম। শুনতে শুনতে কৌতূহলে ছোটো বাচ্ছাদের মতো ওর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। যে-কাহিনী কাউকে বলি নি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সব কিছু বললুম ওকে—সাধারণ মানুষ হয়েও আমার পরীদের সঙ্গে মেশবার কথা—পরী হয়েও সিল্‌ভি আর ব্রুনোর সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশবার কথা।

ব্রুনোর দস্যিপনার কথা শুনতে শুনতে ওর ভারি মজা লাগল, হেসে উঠতে লাগল বার বার। আবার যখন সিল্‌ভির কথা বললুম—তার মধুর নম্র স্বভাবের কথা, তার স্নেহ-ভালোবাসা, তার নিঃস্বার্থপরতার কথা বললুম, তখন আনন্দে ওর গাল বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

খুব নিচু গলায় মিউরিয়েল বললে, "দেবশিশু দেখব, এ আমার বহু দিনের সাধ। সিল্‌ভিকে দেখেছি, এ আমার বড়ো সৌভাগ্য! প্রথম যখন দেখি, তখন থেকেই সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ওকে বরণ করে নিয়েছি!— তার পর হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে বললে, "ঐ শুনুন! সিল্‌ভি গান গাইছে! নিশ্চয়ই সিল্‌ভি! আপনি ওর গলা শুনে বুঝতে পারছেন না?"

বললুম, "ব্রুনোর গান শুনেছি কয়েকবার, কিন্তু সিল্‌ভিকে কখনো গাইতে শুনি নি তো।"

মিউরিয়েল বললে, "আমি কিন্তু একবার শুনেছি। সেই যেদিন আপনারা ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন, সেই দিন। ওরা দুজন তখন বাগানে চলে গিয়েছিল। এরিককে আসতে দেখে আমি জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, গাছতলায় বসে সিল্‌ভি গান গাইছে। এ-গান আগে কখনো শুনি নি। 'আমি জানি, ভালোবাসা', এই ধরনের সব কথা ছিল গানটায়। শুনে মনে হয়েছিল, যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে তার মিষ্টি গলার সুর, স্বপ্নের মধ্যে যেমন শোনায় ঠিক তেমনি! আর, সে যে কী অপূর্ব গান, তা বলে বোঝানো যায় না—কচি শিশুর মুখের প্রথম হাসির মতো—দীর্ঘ প্রবাসের পর চোখের সামনে নিজের ঘরখানিকে চকিতে একবার দেখতে পাবার মতো; শুনে সমস্ত প্রাণ-মন অপূর্ব শান্তি আর পবিত্রতায় ভরে ওঠে! ঐ শুনুন! এ সিল্‌ভি না হয়ে যায় না; ঠিক বুঝতে পারছি, সেই গানটাই গাইছে!"

কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলুম। ভাষা বুঝতে পারলুম না, শুধু একটা সুরের গুঞ্জরণ কানে এল দূর থেকে। ক্রমশই সেটা জোর হতে লাগল, যেন ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর, একটু পরেই দেখতে পেলুম, হাত ধরাধরি করে ওরা দুটিতে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের দিকেই মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। মিউরিয়েলের দিকে তাকিয়ে টের পেলুম, সেই পরিচিত 'ছম্‌ছমানি' ভাবটা ওর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। আর, আমার পক্ষে তো এটা কিছু নতুন নয়! বুঝলুম, আমরা দুজনেই ওদের দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওরা আমাদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না।

কাছাকাছি আসতেই ওদের গান থেমে গেল। কপাল ভালো, ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "সিল্‌ভি, আবার একবার গাই, আয়!" সিল্‌ভি

উত্তরে বললে, "বেশ। তোমারই তো আরম্ভ করার পালা!"

ব্রুনো শুরু করলে। এ-গলা আমার কত চেনা:

"কিচির্‌-মিচির্‌ পাখির ছানার ডাকে
কোন তাগিদে মা-পাখিরা বাসায় এসে জোটে?
ছোট্টো খুকু যখন কাঁদতে থাকে,
শ্রান্ত মা তার ক্লান্তি ফেলে অমনি জেগে ওঠে?
মিষ্টি সুরের ঘুমপাড়ানি গানে
খুকুমণির মুখে হাসি ফোটায় কোন সে জাদুর ভাষা?"

আমার জীবনের আশ্চর্য ঘটনার যে-ইতিহাস আজ লিখতে বসেছি, তার সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাটি এতক্ষণে পেলুম—বহুদিন থেকে যে-প্রতীক্ষায় আছি, তার অবসান হল—সিল্‌ভির গান শুনতে পেলুম! যেটুকু গাইলে, সেটা ছোট্টো পদ, গাইলেও খুব মৃদু নরম গলায়; কিন্তু তার মাধুর্য আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এমন অপার্থিব গান আমি আগে কখনো শুনি নি। সিল্‌ভি গাইলে:

"সেই সে জাদুর গোপন কথা বলছি কানে কানে—
রহস্যটা আর কিছু নয়, নিছক ভালোবাসা!"

সিল্‌ভির গলায় এই গান শুনে প্রথমে মনে হল, আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন উদ্বেল হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে। তার পর আমার চোখ ফেটে হু হু করে জলের ধারা নামতে লাগল, যেন সারা অন্তরটাকে চোখের জলে উজাড় করে দিয়ে সেই অনাবিল মাধুর্যের মূল্য শোধ করতে চাইছি! তার পর একটা গভীর বিস্ময়—বিরাট কোনো কিছুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যেভাবে বুক দুরু দুরু করে ওঠে, আমার মনের মধ্যেও সেই-রকম একটা ভয়মিশ্রিত বিস্ময় অনুভব করতে লাগলুম।

ওদের দুজনকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে যেন খসে পড়া তারার মতো ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠছে। কিন্তু ওদের গান তখন আগের চেয়ে কি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুজনে গলা মিলিয়ে গাইছে:

"আমার মন বলেছে তাই-ই,
হৃদয় থেকেও একই সাড়া পাই,
আমি জানি—ভালোবাসা! সন্দেহ তায় নাই!

এবার ব্রুনো আবার একলাই গাইলে :

"ফুঁসলে-ওঠা উথলে-পড়া রাগ
কোন জাদুতে মিষ্টি কথায় শান্ত হয়ে আসে ?
বুকের জ্বালা হয় যে অনুরাগ,
কোন সে জাদু সোহাগভরে বাঁধায় বাহুপাশে ?
কোন সে সুরে এই দেহে, এই প্রাণে
পলক দোলায় এমন করে সুখ-সায়রে ভাসা ?"

এবারে সিল্‌ভির গলা আরো স্পষ্ট শোনা গেল, যেন আত্মহারা হয়ে সে গাইলে :

"গোপন কথা বলছি তোমায়—কেউ তো নাহি জানে
কখন আসে, কখন-বা যায়—নামটি ভালোবাসা !"

তার পরই দুজনে একসঙ্গে গাইলে :

"আমার মন বলেছে তাই-ই,
হৃদয় থেকেও একই সাড়া পাই,
আমি জানি—ভালোবাসা ! সন্দেহ তায় নাই !"

তার পর, আবার প্রথমে ব্রুনো, তার পর সিল্‌ভি আর শেষকালে দুজনে মিলে গাইলে :

"পাহাড়, নদী সকাল-সন্ধ্যাবেলা
কিসের ছোঁয়ায় রঙিয়ে ওঠে এমন মধুর করে ?
সবুজ মাঠে আলো-ছায়ার খেলা
কোন সে সুরে ওঠে এমন সুধায় সুধায় ভরে ?
ঐ শোনা যায় আকাশ বাতাস ভরা
দেবদূতেরা গাইছে সে-সুর স্বর্গ-থেকে-আসা ।
হৃদয় যাদের পাথর দিয়ে গড়া
বুঝতে নারে সেই সে গানের অর্থ : ভালোবাসা !

আমার মন বলেছে তাই-ই,
হৃদয় থেকেও একই সাড়া পাই,
আমি জানি—ভালোবাসা ! সন্দেহ তায় নাই !"

আমাদের গা-ঘেঁষে ওরা এগিয়ে গেল। ব্রুনোকে বলতে শুনলুম, "খুব ভালো গানটা !" এত কাছ দিয়ে গেল যে, একটু সরে গিয়ে পাশ দিতে হল ওদের। একটু হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেত, কিন্তু আমরা তা করি নি।

ছায়ার অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেল ! মিউরিয়েলকে বললুম, "ওদের আটকে কোনো লাভ নেই, আমাদের তো দেখতেই পেল না !"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিউরিয়েল বললে, "না, কোনোই লাভ নেই। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে ওদের পেতে খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু তা বোধ হয় হবার নয় ; আমাদের জগৎ থেকে ওরা হারিয়ে গেছে !"

আমরা এগোতে লাগলুম। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে বাসার কাছাকাছি বড়ো রাস্তার ধারে এসে যখন পৌঁছলুম, তখন মিউরিয়েল বললে, "আমি আর এগোব না, বেশি অন্ধকার হবার আগেই ফিরতে হবে, একজনের সঙ্গে দেখাও করতে হবে ফেরার পথে। কাজেই, এইখানেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। শুভরাত্রি ! আবার যেন শিগ্‌গিরই দেখা হয়—প্রায়ই দেখা হয় !"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাছ ঢাকতে পালং শাক

আমার বাসার যিনি গৃহকর্ত্রী, তাঁর সাদর অভ্যর্থনায় এবারে যেন একটু বেশি আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলুম। এরিকের প্রসঙ্গ তিনি তুললেন না বটে, তবে বেশ অনুভব করলুম যে এরিক না-থাকায় পাছে আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করি, তাই আমার আরামের জন্যে, আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

সন্ধেবেলাটা একা লাগল—দীর্ঘ আর বিলম্বিত মনে হল। ধৈর্য ধরে তবু বসেই রইলুম। আগুনের চুল্লিটা নিবে আসছে, আর আমি সেই নিবন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে কল্পনায় আমার অতীত দিনের কত ঘটনা, কত চেনা মুখকে দেখতে পাচ্ছি সেই আলোছায়ার মধ্যে। ব্রুনোর সেই দুষ্টু-হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, সিল্‌ভির গালের লালিমার আভাস দেখতে পেলুম ক্ষণেকের জন্যে। তার পরই ভেসে উঠল প্রফেসরের প্রকাণ্ড গোলগাল হাসিখুশি মুখখানা। যেন বলছেন, "এসো বাছারা, এসো!" তার পরই নিবন্ত কয়লার লাল আভাটুকু যেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গেল, প্রফেসরের মুখটাও গেল হারিয়ে, তাঁর কথাগুলোও আর কানে এসে পৌঁছল না। আমি আগুন খোঁচাবার শিকটা নিয়ে নিবন্ত চুল্লিটা উস্কে দিলাম, আঁচ বেড়ে উঠল, আর অমনি আবার প্রফেসরের কথা শুনতে পেলাম, "এসো, বাছারা, এসো!

তোমরা আসবে, আগেই আমি জানিয়ে রেখেছি। তোমাদের ঘর-টর সব গোছানো আছে। সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী—নিশ্চয়ই খুশিই হয়েছেন! মহারানী তো বলেই ফেললেন, "আশা করি রাজকীয় ভোজসভার আগেই ওরা এসে পড়বে!" সত্যি বলছি, একেবারে হুবহু তাঁর মুখের কথা!"

ব্রুনো জিগেস করলে, "ভোজসভায় আগ্গাগও থাকবে নাকি?" দেখলুম, সেই সম্ভাবনার চিন্তায় সিল্‌ভি আর ব্রুনো, দুজনেই বেশ মুষড়ে পড়েছে।

প্রফেসর মুচকি হেসে বললেন, "বাঃ, আগ্গাগ থাকবে না তো কি? আরে, ওরই তো জন্মদিন, তা জানো না বুঝি? ওর পরামায়ু বৃদ্ধির জন্যেই তো এই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। ও না থাকলে কি চলে?"

ব্রুনো অস্ফুট গলায় বললে, "খুব চলে, বরং ভালোই চলে!" কথাটা অবশ্য সিল্‌ভি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না।

প্রফেসর আবার মুচকি হেসে বললেন, "তুমি এসে পড়েছ, ভোজসভা নিশ্চই জমে উঠবে। আবার তোমাদের দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে। উৎসবে কী কী হবে, বলি, শোনো। প্রথমেই বক্তৃতা। মহারানী একেবারে নাছোড়বান্দা, বক্তৃতা হতেই হবে। তিনি বলছেন যে, লোকে এত খাবে যে, তাদের ঢুলুনি আসতে বাধ্য। কাজেই পরে বক্তৃতা হলে, কেউই শুনবে না—খুব একটা ভুল অবশ্য বলেন নি। নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেই, প্রথমে একটা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে—মহারানীকে চমকে দেবার জন্যে এই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। মহারানীর মাথাটা যেদিন থেকে—মানে আগের মতো আর সাফ নেই আর কি—তখন থেকেই, আমরা দেখছি, মাঝে মাঝে ওকে চমকে দেবার মতো একটু-আধটু গোপন ব্যবস্থা রাখলে, ভালো হয়। এর পরে আসছে বক্তৃতার পালা—"

সিল্‌ভি বললে, "কোন বক্তৃতা? সেই যে অনেকদিন থেকে একটা বক্তৃতা তৈরি করছিলেন, সেইটা না-কি?"

প্রফেসর একটু অপ্রস্তুতে পড়ে বললেন, "হ্যাঁ, সেইটাই বটে। তৈরি করতে অনেকদিন লেগে গেল। এত সব অন্য কাজকর্ম করতে হল! যেমন ধরো, আমিই হচ্ছি রাজবৈদ্য। রাজার যত কর্মচারী, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার আমারই হাতে—এই রে, মনে পড়েছে!" বলেই তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করলেন। "আজ হল ওষুধ খাবার

দিন! সপ্তাহে একদিন করে ওষুধ দেওয়া হয়। রোজ রোজ দিলে তো বোতল খালিই হয়ে যাবে!"

সিল্‌ভি জানতে চাইলে, "কিন্তু, অন্য কোনোদিনে যদি ওদের অসুখ করে?"

প্রফেসর সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "বে-দিনে অসুখ? বলছ কি? ও-সব চলবে-টলবে না! তক্ষুনি চাকরি খতম!" তার পর তাক থেকে বিরাট একটা জাগ পেড়ে নিয়ে বললেন, "আজকের ওষুধ হচ্ছে এইটা। আজ সকালে আমার প্রথম কাজ হয়েছে, এই ওষুধটা তৈরি করা। চেখে দেখ না!" ব্রুনোর দিকে জাগটাকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "আঙুল ডোবাও! চেখে দেখ!"

ব্রুনো চাখলে। আর, আঙুলটা জিবে ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন জঘন্য মুখবিকৃতি করলে যে, সিল্‌ভি ভয় পেয়ে একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল।

মুখের চেহারা স্বাভাবিক হতেই ব্রুনো বললে, "খুব ভালো মতন বিদিকিচ্ছিরি খেতে!"

প্রফেসর বললেন, "বিদিকিচ্ছিরি? তাই-ই তো হবে! ওষুধ বিদিকিচ্ছিরি হবে না, তো আর কী হবে?"

ব্রুনো বললে, "মিষ্টি হবে।"

ব্রুনোর এমন চট্‌পট্‌ জবাব শুনে প্রফেসরের কথা আটকে গেল, "আমি বলতে চাইছিলাম আর কি—মানে—মিষ্টি ওষুধে কাজ হয় না! জানবে, বিদিকিচ্ছিরি না হলে ওষুধই হয় না। যাক, এখন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে একটা কাজ কর তো—এই জাগটা নিয়ে চাকরদের মহলে গিয়ে দিয়ে এসো। বোলো, এটা হল ওদের আজকের দাওয়াই।"

জাগটা নিয়ে যেতে যেতে ব্রুনো বললে, "ওদের মধ্যে কে ওষুধটা খাবে?"

প্রফেসর চট্‌পট্‌ জবাব দিলেন, "সেটা এখনো ঠিক করি নি! একটু পরেই নিজে গিয়ে ব্যবস্থা করছি। বোলো আমি যাবার আগে কিছুতেই যেন খেতে শুরু করে না-দেয়!" তার পর ওদের দিকে ফিরে বললেন, "অসুখ সারাবার কাজে যা সিদ্ধহস্ত হয়েছি না, শুনলে অবাক হয়ে যাবে। এই যে, কয়েকটা ঘটনা লিখে রেখে দিয়েছি।" তাকের জঞ্জাল থেকে তাড়া-বেঁধে কয়েকটা কাগজ-পত্র নামিয়ে এনে বললেন, "এই তাড়াটা

দেখ। 'তেরো নম্বরের সহকারি রাঁধুনি সাধারণ জ্বর থেকে সেরে উঠেছে।' এবার দেখ, তার সঙ্গে পিন-দিয়ে-গাঁথা কাগজটায় কী লেখা আছে। 'তেরো নম্বরের সহকারি রাঁধুনিকে দুমাত্রা ওষুধ দিলাম!' কী গর্ব করার মতো ব্যাপার নয়?"

সিল্‌ভি গোলমালে পড়ে গেল। বললে, "কিন্তু, কোনটা আগে, কোনটা পরে? অসুখ, না ওষুধ?"

উত্তর দিতে গিয়ে প্রফেসরকে উলটে-পালটে দেখতে হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার পর একটু হতাশ হয়ে বললেন, "তারিখ নেই, দেখছি। কাজেই, জোর করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে, দুটোই যে ঘটেছে, তাতে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। ওষুধটাই হল বড়ো কথা। রোগ-টোগ তো তুচ্ছ ব্যাপার, বুঝলে না। দেখ, একটা ওষুধ তুমি বছরের পর বছর ধরে রেখে দিতে পার। কিন্তু অসুখকে কি কেউ পুষে রাখতে চায়!—ভালো কথা, এসো না, মঞ্চটা কেমন হয়েছে, একবার দেখে আসি। মামণি বলেছিল, একবার গিয়ে দেখে আসি ঠিকঠাক হল কি-না। অন্ধকার হবার আগেই, চল, দেখে আসা যাক—কী বল?"

সিল্‌ভি বললে, "দেখবার তো ভীষণ ইচ্ছে করছে। এসো ব্রুনো, টুপি পরে নাও, প্রফেসরের দেরি করিয়ে দিয়ো না।"

ব্রুনো করুণ গলায় জবাব দিলে, "টুপিটা খুঁজে পাচ্ছি না যে! গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছিলুম। তার পর টুপিটা নিজেই গড়াতে গড়াতে কোথায় যেন চলে গেল।"

একটা আধ-খোলা পাল্লার ও-পাশে ঘুপ্‌সি মতন খানিকটা জায়গা। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সিল্‌ভি বললে, "গড়াতে গড়াতে ঐদিকে গেছে বোধ হয়, দেখ।" ব্রুনো দৌড়ে চলে গেল। তার পর একটু বাদেই যখন ফিরে এল, তখন তার মুখটা থম্‌থম্ করছে। পাল্লাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে, "টুপি ওখানে নেই!"

সিল্‌ভির কেমন যেন খটকা লাগল, বললে, "তা হলে কী আছে?"

বেশ-করে ভেবে-চিন্তে আঙুলের কড় গুন্‌তে গুন্‌তে ব্রুনো বললে, "মাকড়সার জাল আছে—দুটো মাকড়সা আছে—ছবির বইয়ের মলাট আছে একখানা—আর একটা কচ্ছপ আছে—একটা ডিশে বাদাম আছে—আর আছে একটা বুড়ো লোক।"

"বুড়ো লোক?" অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে প্রফেসর ঘরময় পায়চারি

করতে শুরু করে দিলেন।—"এ নিশ্চয়ই সেই অন্য প্রফেসর! উঃ, কত দিন থেকে তাঁর পাত্তাই নেই! সেই যে হারিয়ে গেলেন; আর খুঁজেই পাওয়া গেল না!"

বলতে বলতে সেই পাল্লা—বিরাট দেওয়াল-আলমারীর পাল্লাদুটো হাট করে খুলে দিলেন : দেখা গেল, একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন সেই বৃদ্ধ অন্য প্রফেসরটি। কোলের ওপর একখানা বই। তাকের ওপর-রাখা একটা ডিশ থেকে সবে একটি বাদাম নিয়েছেন। আপাতত সেইটাকে ভাঙবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, কিন্তু বাদামটা ভেঙে মুখে পোরার আগে পর্যন্ত কোনো কথা বললেন না। প্রথম মুখ খুলেই, সেই আদি-অকৃত্রিম প্রশ্নটি শুধোলেন, "বক্তৃতাটা তৈরি হয়েছে?"

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে প্রফেসর ব্যস্ত হয়ে বলতে শুরু করলেন, "উৎসব শুরু হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। প্রথমেই মহারানীকে চমকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পর রাজকীয় ভোজ—"

"রাজকীয় ভোজসভা!" বলে অন্য প্রফেসর এমন তিড়িং-বিড়িং করে উঠলেন যে, ঘরটা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল।—"তা হলে তো এক্ষুনি গিয়ে সাফ-সুতরো হয়ে নিতে হয়। এঃ! কী ছিরিই-না হয়েছে আমার!" হুড়্‌মুড়্‌ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

প্রফেসর মশাই বিচারকের ভঙ্গিতে অভিমত দিলেন, "হুম্, সাফ-সুতরো হবার নিতান্তই দরকার ওঁর।—এই নাও গো, তোমার টুপিটা নাও! ভুল করে এতক্ষণ পরে রয়েছি। খেয়ালই নেই যে, নিজের টুপিটা মাথায় চাপানোই আছে। চলো, উৎসবের মঞ্চটা দেখে আসা যাক।"

বাগানের দিকে এগোতে এগোতে ব্রুনো হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠে বললে, "আরে, সেই বুড়ো মালীটা এখনো তেমনি গান গাইছে! যখন এখান থেকে যাই, তখনো এই গানটাই গাইছিল। সেই তখন থেকে বোধ হয় গেয়েই চলেছে!"

প্রফেসর মশাই বললেন, "সত্যিই তাই। তখন থেকে কেবল গেয়েই চলেছে!" মালীর কাছাকাছি পৌঁছে বললেন, "শজারুটাকে নিয়ে কী করছ হে!" দেখা গেল, এক পায়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো মালীটা গুন্‌-গুন্‌ করে গান গাইছে, আর অন্য পায়ের তলায় একটা শজারু রেখে সেটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে এদিক-ওদিক রগড়ে চলেছে। প্রফেসর মশাইয়ের প্রশ্নের

জবাবে সে বললে, "শজারুরা কী খায়, তাই জানবার ইচ্ছে হল। তাই এই শজারুটাকে রেখেছি, দেখব, ও আলু খায় কি-না।"

প্রফেসর মশাই বললেন, "তা, বরং একটা আলু রাখলেই পারতে, দেখতে, শজারুরা সেটা খায় কি-না!"

মালী আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে বললে, "ঠিক বলেছেন, সেইটাই ভালো! মঞ্চটা দেখবেন নাকি?"

প্রফেসর মশাই বললেন, "সে কথা আর বলতে!—এরা দুটিতে আবার ফিরে এসেছে, দেখেছ?"

মালী মুচকি হেসে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তার পর সামিয়ানার দিকে এগোতে এগোতে গাইতে লাগল:

"আবার দেখে বুঝলে, আসলে তা
আঁকের নিয়ম, ত্রৈরাশিকের ধাঁধা।
বললে, "ও-সব আমার কাছে সোজা,
দিনের আলোর মতোই সরল, সাদা!"

প্রফেসর মশাই বললেন, "কমাস ধরে তো এই গানটাই গাইছ, শুনছি। এখনো শেষ হয় নি?"

মালী খুব করুণ স্বরে জানালে, "একটা স্তবক শুধু বাকি রয়ে গেছে।" তার পর সেই বাকি স্তবকটা গাইলে:

"তার মনে হয়, দেখল এমন যুক্তি,
যার জোরে সে 'পোপ' বনে যায় নিজে।
ফের তাকিয়ে দেখল, তা ঠিক নয়,
একটা সাবান, হড়্‌হড়ে আর ভিজে।
বললে ধীরে, "কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!
আশার প্রদীপ নিবল নিজে নিজে!"

গাইতে গাইতে কান্নায় তার গলা বুজে এল। তাড়াতাড়ি করে কয়েক পা এগিয়ে গেল; তফাতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলে।

সিল্‌ভি জানতে চাইলে, "সত্যিই ও শেষপর্যন্ত দেখলে, একটা সাবান?"

প্রফেসর মশাই বললেন, "সত্যিই দেখছিল। গানটা তো ওর নিজের জীবনের কথা নিয়েই লেখা।"

সমবেদনায় ব্রুনোর চোখে জল এসে পড়ল। বললে, "ও যে পোপ হতে পারল না, তার জন্যে আমার ভালো মতন দুক্ষু হচ্ছে। তোমার হচ্ছে না, সিল্‌ভি ?"

"কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, প্রফেসর মশাই, পোপ হলে কি ও বেশি সুখী হত ?"

প্রফেসর মশাই জবাব দিলেন, "তাতে পোপের সুখ কিছু বাড়ত না, এইটুকুই বলতে পারি।—মঞ্চটা ভারি সুন্দর হয়েছে, না ?" ততক্ষণে ওরা সামিয়ানার ভেতর গিয়ে ঢুকেছে।

খুব আদর করে মঞ্চটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মালী বললে, "নীচেটায় একটা বাড়তি বীম লাগিয়ে দিয়েছি। এখন এত মজবুত হয়েছে না, পাগলা হাতি লাফালাফি করলেও, টস্‌কাবে না !"

প্রফেসর বলে উঠলেন, "বেশ করেছ, অশেষ ধন্যবাদ! কতটা মজবুত হওয়া দরকার, কে জানে। তবে মজবুত হয়েছে এটা জানা রইল ভালোই।" তার পর মঞ্চের ওপর উঠে ওদের সব দেখাতে লাগলেন, "এই দেখ, এই তিনটে আসন হল মহারাজ, মহারানী আর রাজকুমার আগ্‌গাগের জন্যে।—কিন্তু, এখানে তো আরো দুটো আসন থাকার কথা !" মালীর দিকে চেয়ে বললেন, "সিল্‌ভি আর ব্রুনোর জন্যে দুটো জায়গা তো থাকা উচিত ছিল !"

ব্রুনো সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে পরম উৎসাহে বলে উঠল, "বকতিতা দেবার সময়ে দরকার হলে আমায় বলতে পারেন, আমি কয়েক রকমের ভেল্কি দেখাতে পারি।"

টেবিলের ওপর অদ্ভুত ধরনের সব যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে প্রফেসর মশাই বললেন, "ব্যাপার হল, বক্তৃতাটা ঠিক ভেল্কি-লাগানো কাণ্ড নয়। যাই হোক, কী কী করতে পার ? ধরো, টেবিল ফুঁড়ে চলে যেতে পার ?"

ব্রুনো বললে, "আকছার! পারি না, সিল্‌ভি ?"

প্রফেসর মশাই বেশ অবাক হয়ে গেলেন, তবে বাইরে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করলেন। একটা নোট-বই বার করে বিড়্‌বিড়্‌ করে বললেন, "একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে দেখছি!—হ্যাঁ, প্রথমেই কথা হল, কী ধরনের টেবিল ?"

এমন সময়ে বিকট শব্দে ভেঁপু বেজে উঠতেই ওদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ে গেল। ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে প্রফেসার মশাই বলে উঠলেন, "আরে, উৎসব শুরু হয়ে গেল যে! এতক্ষণ কেটে গেছে, বুঝতে পারি নি!"

এই ঘরটাতেই অতিথিদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেখলুম, ঘরে একটা বড়োসড় টেবিলের ওপর কেক রয়েছে, সরবৎ রয়েছে। মহারাজ আর মহারানী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অতিথিদের যাতে জায়গা হয়, তাই আসাবাবপত্র সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই কয়েক মাসে মহারাজ আর মহারানীর চেহারায় যে কী বদল ঘটেছে, তা আর কী বলব। মহারাজের মুখে সব সময়ে কেমন একটা ফ্যাল্‌ফ্যালে ভাব। আর মহারানীর ঠোঁটের কোণে একটা বোকা-বোকা ফ্যাকাসে হাসি মাঝে মাঝেই অকারণে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে!

প্রফেসর মশাই আর ওরা দুজনে বসল। মহারাজ বললেন, "যাক, শেষপর্যন্ত তা হলে এলে!" কথার ভঙ্গিতে বেশ বোঝা গেল যে, মেজাজ ভালো নেই। ভালো না-থাকার কারণটাও জানতে দেরি লাগল না। আসলে, উৎসবের আয়োজন তাঁর মোটেই পছন্দ হয় নি—তাঁর মতো মহারাজার উপযুক্ত তো নয়ই। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বুড়ো আঙুল উলটে টেবিলটা দেখিয়ে বলে উঠলেন, "হুঁঃ, মামুলি কাঠের টেবিল! সোনার টেবিলের ব্যবস্থা হয় নি কেন, জানতে পারি কি?"

প্রফেসর সবে বলতে শুরু করেছেন, "দেখুন, তাতে তো অনেক সময়—" কিন্তু তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে মহারাজ আবার হুঙ্কার ছাড়লেন; "আর, কেক! মামলি একটা প্লাম কেক! কেন, ওটা কি ইয়ে দিয়ে, মানে, ইয়ে দিয়ে—" কথা শেষ করলেন না। নতুন করে আবার শুরু করলেন, "আর, সরবৎটা! সাধারণ একটা সরবৎ! কেন, ওটা কি—" ফের বললেন, "তার পর, এই চেয়ার! সব চেয়ে খারাপ লাগছে এই চেয়ারটা। সিংহাসনের ব্যবস্থা করা গেল না? অন্য সব গলদ নাহয় মাফ করা যায়, কিন্তু এই চেয়ারের ব্যাপারটা তো কিছুতেই সহ্য করতে পারা যায় না!"

তালে তাল দিয়ে মহারানী বলে উঠলেন, "আমি তো আবার টেবিলটাকেও সহ্য করতে পারছি না বাপু!"

মহারাজের মুখ দিয়ে শব্দ বেরল, "ফুঃ!"

এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেলেন প্রফেসর মশাই। বললেন, "বড়োই দুঃখের কথা! ত্রুটি স্বীকার করছি—খুবই অন্যায় হয়ে গেছে!" তার পর সমবেত অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "সমস্ত কিছুর জন্যই আমি অনুতপ্ত!"

সারা ঘরটা "সাধু। সাধু।" রবে ভরে উঠল।

তার পর আর কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই বোকার মতো বসে আছে। প্রফেসর মশাই কী করবেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন সময়ে মহারানী টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রফেসরের কানে কানে বললেন, "দু-একটা মজাদার কথা-টথা ছাড়ুন, লোকেদের মন-টন একটু হালকা-টালকা হোক।"

প্রফেসর বললেন, "ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন!—"

কিন্তু প্রফেসরমশাই কিছু বলবার আগেই মহারানী আবার ফিস্-ফিসিয়ে বলে উঠলেন, "এবার বরং খানিকটা পালং শাক আনান, প্রফেসর! লোকে বেশ চমকে যাবে!"

প্রফেসর হেড-রাঁধুনিকে ডেকে কানে কানে কী বললেন! সঙ্গে সঙ্গে সে গট্‌মট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য রাঁধুনিরাও তার পেছন পেছন হাওয়া।

প্রফেসর মশাই ব্রুনোকে বললেন, "ঠিক মতো শুরু করাটাই হল শক্ত। একবার শুরু করে দিতে পারলে, আর ভাবনা নেই।"

ব্রুনো বললে, "তা লোকেদের যদি চমকেই দিতে হয়, তো কোলা ব্যাঙ এনে কাঁধের ওপর ছেড়ে দিলেই হত।"

ইতিমধ্যে রাঁধুনিরা আবার সার বেঁধে সবাই ফিরে এসেছে। সব পেছনে হেড-রাঁধুনি! তার হাতে একটা কিছু রয়েছে, তবে অন্য সবাই একটা করে নিশেন নিয়ে এমন ভাবে পত্ পত্ করে দোলাচ্ছে যে, কেউই ঠাহর করতে পারছে না, ব্যাপারটা কী। জিনিসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে হেড-রাঁধুনি বার বার বলতে লাগল, "খালি নিশেন, মহারানী! খালি নিশেন! বিশ্বাস করুন, খালি নিশেন, আর কিছু নেই!" তার পর সব কটা নিশেন একসঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হতেই, দেখা গেল বিরাট একটা ডিশ; রাঁধুনি তার ওপর থেকে ঢাকাটা তুলে নিলে।

ক্ষীণ কণ্ঠে না-জানার ভান করে মহারানী বললেন, "এটা আবার

কী ?" তার পর চোখে দুরবীন কষে ভালো করে দেখে বলে উঠলেন, "আরে ! এ যে দেখছি পালং শাক !"

পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর মশাই বুঝিয়ে বললেন, "মহারানীসাহেবা খুবই চমকে গেছেন !" শুনে, তারা অনেকেই হাততালি দিলে। হেড-রাঁধুনি নিচু হয়ে কুর্নিশ করলে, আর সেই ফাঁকে একটা চামচে রেখে দিলে টেবিলের ওপর যেন অসাবধানে পড়ে গেছে। চামচেটা মহারানীর নাগালের মধ্যেই ফেলা হল, অথচ মহারানী এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন দেখতেই পান নি !

মহারানী ব্রুনোর দিকে চেয়ে বললেন, "আমি খুব অবাক হয়ে গেছি ! তুমি হও নি ?"

ব্রুনো বললে, "মোটেই নয়। শুনতেই তো পেলুম যে আপনি—" তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে সিল্ভি বলে উঠল, "আসলে, ও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর ইচ্ছে, বক্তৃতাটা শুরু হয়ে যাক !"

ব্রুনো প্রতিবাদ করে বলে উঠল, "না, আমার ইচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া শুরু হোক !"

মহারানী ইতিমধ্যে যেন নিজের অজান্তেই কখন চামচেটা তুলে নিয়ে হাতের চেটোর উলটো পিঠে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় কি না, তাই পরখ করে দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। পরখ করার ছলে যেন অসাবধানেই চামচেটা পালং শাকের ডিশে পড়েও গেছে। অন্যমনস্ক ভাবেই তিনি চামচেটাকে ডিশ থেকে তুলে নিয়েছেন, এবং অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও চামচের মুখে বেশ খানিকটা পালং শাক উঠে এসেছে। "কী অদ্ভুত কাণ্ড !" বলেই তিনি নিজের মুখের মধ্যে পালং শাক চালান করে দিয়েছেন। তার পর চিবতে চিবতে বলেছেন, "একেবারে সত্যিকারের পালং শাকের মতো খেতে যে রে ! আমি মনে করেছিলুম বুঝি নকল— কিন্তু, এখন তো দেখছি এক্কেবারে খাঁটি পালং শাক !" বলেই আর-এক চামচ মুখে ভরেছেন।

এর পর ঠিক কীভাবে কী ঘটল, ঠিক ধরতে পারলুম না। তবে, একটু বাদেই টের পেলুম যে, আমরা সবাই সেই সামিয়ানার তলায় এসে জড়ো হয়েছি ; প্রফেসর মশাই সেই বহু-প্রতীক্ষিত বক্তৃতাটি আরম্ভ করলেন বলে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফেসরের বক্তৃতা

'বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের ব্যাপারে—সত্যি বলতে কি, বেশির ভাগ ব্যাপারেই—একেবারে গোড়ার দিক থেকে শুরু করাই ভালো। অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে উলটো দিক থেকে শুরু করলেই ভালো হয়। যেমন ধরুন, যদি একটা কুকুরকে ধরে তার সারা গায়ে সবুজ রঙ মাখাতে হয়, তা হলে ল্যাজের দিক থেকে শুরু করাই সুবিধের, কারণ ল্যাজ দিয়ে তো আর কামড়াতে পারবে না! কাজেই—"

ব্রুনো বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আমি একটু সাহায্য করব?"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে প্রফেসর বললেন, "কাকে সাহায্য করবে?" কথা বলতে গিয়ে হাতের খাতা থেকে মুখ তুলে চাইতে লহ, কিন্তু পাতার মাঝখানে আঙুলের নিশানটি রেখে দিলেন, পাছে পাতা ঘুলিয়ে যায়।

ব্রুনো বললে, "ঐ, কুকুরকে সবুজ রঙ করবার কাজে আপনাকে সাহায্য করিতে পারি। মুখের দিক থেকেও শুরু করতে পারেন, কারণ তখন আমি করব কি—

প্রফেসর বললেন, "না, না! হাতে-কলমে পরখ করার সময় এখনো আসে নি, সে-সব এখন নয়!" তার পর আবার খাতার দিকে চেয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, "এবারে কয়েকটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে আলোচনা করব—বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ। তার পর কয়েকটা নমুনা দেখাব। তার পর

দু-একটা প্রক্রিয়া দেখাব। আর, শেষকালে হাতে-নাতে কয়েকটা পরীক্ষা করে আপনাদের তাক লাগিয়ে দেব।—স্বতঃসিদ্ধ মানে হল, বিনা তর্কে যা মেনে নিতে হয়। যেমন ধরুন, যদি বলি, 'আমরা রয়েছি!' বিনা তর্কেই আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। কিন্তু ধরুন, যদি বলি, 'আমরা নেই!' তা হলে সেটা হবে—'

ব্রুনো চট্ করে বলে উঠল, "—ভুল!"

সিল্ভি ফিস্‌ফিস্ করে ধমকে উঠল, "আঃ, ব্রুনো! প্রফেসর যদি বলেন, তা হলে সেটাও স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে হয়!"

প্রফেসর আগের কথার জের টেনে বলে যেতে লাগলেন, "—আপনারা যদি ভদ্দরলোকের মতো প্রতিবাদ না করে কথাটা মেনে নেন, তা হলে সেটাও আর-একটা স্বতঃসিদ্ধ হবে।"

ব্রুনো বললে, "সাত-সেদ্ধ হবে, তবে সত্যি হবে না!"

প্রফেসর বলে যেতে লাগলেন, "স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে যার জ্ঞান নেই, তার জীবনই বৃথা। তাকে বিশ্বাস করবার জন্যে এক কথা বার বার বলতে গিয়ে গুচ্ছের সময় নষ্ট হয়। একটা স্বতঃসিদ্ধের কথা ধরা যাক, যেমন "কোনো জিনিসই নিজের চেয়ে বড়ো হতে পারে না।"

"এখন দেখুন, একটা জিনিসের মধ্যে যদি আর-একটা কিছুকে রাখতে হয়, তা হলে একটা আর-একটার চেয়ে বড়ো হওয়া দরকার; না হলে ধরবে কী করে? অথচ, প্রায়ই তো শোনা যায়, লোকে বলে, "উত্তেজনার আবেগে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না!" আরে! ধরে রাখতে যে পারবে না, সে তো জানা কথা। নিজের চেয়ে নিজে বড়ো হলে ধরে রাখতে না-পারাই তো স্বাভাবিক! উত্তেজনার আবেগ থাকলেই-বা কী, আর না-থাকলেই-বা কী।"

রাজাবাহাদুর উস্‌খুস্ করছিলেন। এবার আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, "ও মশাই, শুনুন তো! সবসুদ্ধ কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ ঝাড়বেন বলুন তো। এই ভাবে চলতে থাকলে, আপনার হাতে-কলমে পরীক্ষার কাজ আসতে তো হপ্তা-খানেক লেগে যাবে দেখছি!"

থতমত খেয়ে খাতা থেকে মুখ তুলে প্রফেসর বললেন, "না, না, অত দেরি লাগবে না, বিশ্বাস করুন।" খাতার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার বললেন, "আর দুটোমাত্তর বাকি, এ-দুটো খুব দরকারি!"

রাজাবাহাদুর গজ্‌গজ্‌ করে বললেন, "পড়ে নিন। তার পর নমুনা দেখাতে শুরু করুন!"

প্রফেসর গড়্‌গড়্‌ করে পড়ে গেলেন, "প্রথমটা হল, 'যা আছে, তা আছে।' আর দ্বিতীয়টা হল, 'যা নেই, তা নেই।' এবার আমরা নমুনা দেখাব। প্রথমে দেখুন, এই ট্রেতে কয়েকটা শিশির মধ্যে কিছু স্ফটিক আছে, আর আছে অন্য সব জিনিস।" ট্রেটা কাছে টেনে নিয়ে আবার খাতার দিকে তাকালেন। "সব-কটা বোতলের গায়ে লেবেল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ আঠাটা তেমন সুবিধের হয় নি—" বলতে বলতে আবার খাতার পাতা থেকে কী যেন পড়বার চেষ্টা করলেন। চশমা লাগিয়ে অনেক চেষ্টাচরিত্র করবার পর বললেন, "—বাকিটা পড়তে পারছি না! তবে যাই হোক, তার মানে হল, লেবেলগুলো সব আলগা হয়ে খুলে পড়ে গেছে; শিশির জিনিসগুলো কোনটা কী, এখন বোঝা মুশকিল। সব গুলিয়ে একাক্কার হয়ে গেছে।"

ব্রুনো বলে উঠল, "দাঁড়ান, আবার লাগিয়ে দিচ্ছি।" ডাকটিকিটের মতো সে লেবেলগুলো চেটে চেটে নিয়ে শিশির গায়ে সেঁটে দিতে লাগল। প্রফেসর পড়ি-কি-মরি করে ট্রেটা তার নাগাল থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, "আরে, আরে! কর কী! উলটো-পালটা হয়ে গেলে, তখন?"

ব্রুনো আপন মনে কী গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল, আর প্রফেসর ওদিকে একটা বোতল তুলে ধরে চশমা বাগিয়ে ভুরু কুঁচকে তার লেবেলটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার পর খানিক বাদে বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, "প্রথমে যে নমুনাটা দেখাচ্ছি, সেটা হল—" এই পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন। তার পর বোতলটা তুলে ধরে আবার তার লেবেলটা পড়তে লাগলেন। বোধ হয় ভাবলেন, ইতিমধ্যে লেখাটা পালটে গিয়ে থাকতে পারে! বোতলটা আবার টেবিলের ওপর রেখে খুব নিশ্চিন্ত স্বরে বললেন, "—সেটা হল, নির্মল বারি! মানে, সাধারণ জল! আর, আমাদের দ্বিতীয় নমুনাটি হল—" বলতে বলতে আর-একটা বোতলের ঢাকনা খুলে ধরতেই, একটা গুবরে পোকা সাঁৎ করে বোতল থেকে বেরিয়ে পড়ে ভন্‌ভন্‌ শব্দে সামিয়ানার বাইরে উড়ে পালিয়ে গেল। প্রফেসর খালি বোতলটার দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, "—নমুনাটি হল, কিম্বা বলা উচিত, নমুনাটি ছিল, একটা অদ্ভুতরকমের নীল গুবরে পোকা। যখন পোকাটা উড়ে গেল, আপনাদের কারো কী চোখে

পড়েছে, ওর ডানার নীচের দিকে তিনটে করে নীল ফোঁটা আছে ?”

কোনো উত্তর এল না। বোঝা গেল, কেউই দেখেন নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে প্রফেসর বলে উঠলেন, “বড়োই দুঃখের কথা! ও-সব জিনিস চট্ করে লক্ষ্য করতে হয়, নইলে দেখা যায় না! যাক গে। আমাদের পরের নমুনাটির উড়ে পালিয়ে যাবার অন্তত কোনো আশঙ্কা নেই। এটি হল—ছোট্টো করে বলতে গেলে, কিম্বা বরং বড়ো করেই বলা যাক—একটি হাতি। দেখলেই বুঝতে পারবেন।” বলেই তিনি সেই বুড়ো মালীকে ইশারা করতেই সে মঞ্চের উপর উঠে এল। তার পর দুজনে মিলে নানান সব টুকরোটাকরা জুড়ে যে-জিনিসটি বানালেন, সেটাকে বিরাট একটা খাঁচাই বলা চলে। তার দুদিকে কয়েকটা করে নল বেরিয়ে রয়েছে।

রাজামশাই খুঁৎ খুঁৎ করে উঠলেন, “হাতি তো আমাদের দেখা আছে।”

প্রফেসর সোৎসাহে জবাব দিলেন, “দেখা তো আছে, কিন্তু ‘মেগালোস্কোপ’-এর মধ্যে দিয়ে দেখেছেন কি কখনো ? ছোট্টো-ছোট্টো পোকামাকড় আতস কাচ ছাড়া দেখা যায় না, জানেন তো—যাকে আমরা বলি অণুবীক্ষণ যন্ত্র, অর্থাৎ, যা ছোট্টোকে বড়ো করে দেখায়। ঠিক তেমনি হাতিকে ভালো করে দেখতে হলে চাই এমন আতস কাচ, যা বড়োকে ছোটো করে দেখায়। প্রত্যেক নলের মধ্যে অমনি একটা করে কাচ লাগানো আছে পুরো যন্ত্রটা হল ‘মেগালোস্কোপ’। মালী এবার আমাদের নমুনাটিকে নিয়ে আসবে। দয়া করে ঐ শেষের দিকের পর্দা দুটো খুলে দিন তো আপনারা কেউ ; হাতি আসবে, জায়গা করে দিন তো!”

সবাই সেই সামিয়ানার নীচে দুধার ঘেঁষে দাড়ালেন। পর্দা সরিয়ে দেবার ফলে এক দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলেন, কখন হাতি আসে। মালী ইতিমধ্যে বাইরে চলে গেছে। যাবার সময় গুন্‌গুন্ করে সেই গানটা গেয়েছে—“তার মনে হয় দেখল—”

মিনিট খানেক সব চুপচাপ। তার পরেই দূর থেকে আবার তার গলা শোনা গেল—“সে এক হাতি—হ্যাট্, হ্যাট্! সরে দাঁড়ান না মশাই! হাতি আসছে, দেখতে পাচ্ছেন না!”

পরক্ষণেই দেখা গেল, সত্যিই হাতি আসছে, পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে টলতে টলতে হাঁটছে, আর সামনের দুপায়ে বিরাট এক বাঁশি বাগিয়ে মুখের কাছে ধরে আছে।

প্রফেসর মশাই তাড়াতাড়ি মেগালোস্কোপের একদিকে একটা বিরাট দরজা খুলে ধরলেন, আর হাতিটাও মালীর ইশারা মতো টুক্ করে বাঁশিটা ফেলে দিয়েই চার পায়ে গুটি গুটি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রফেসর তৎক্ষণাৎ দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তর পর একটু দম নিয়ে বললেন, "আপনারা দেখতে পারেন। সাধারণ একটা ইঁদুরের চেয়ে বড়ো হবে না!"

নলে চোখ লাগাবার জন্যে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দেখা গেল ক্ষুদে হাতিটা কেমন খেলার ছলে তার ছোট্টো লিক্‌লিকে শুঁড়টা দিয়ে প্রফেসরের আঙুলটা পাকিয়ে ধরছে, প্রফেসরের হাতের চেটোর ওপর দিব্যি উঠে দাঁড়াচ্ছে। প্রফেসরও অমনি তাকে হাতের ওপর তুলে নিয়ে রাজামশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন।

বুনোর খুব মজা। বললে, "কী মিষ্টি! একবার ওর পিঠ থাবড়াব? খুব ভালো মতন আস্তে হাত দোব!"

মহারানী তাঁর দুরবীন দিয়ে ভালো করে হাতিটাকে দেখে গম্ভীর ভাবে বললেন, "খুবই ছোটো। সাধারণ হাতির তুলনায় বেশ ছোটো বলেই তো মনে হচ্ছে আমার!"

প্রফেসর তো আনন্দে এবং বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। বিড়্‌বিড়্ করে বললেন, "আরে! ঠিক ধরেছেন তো!" তার পর সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললেন, "মহারানী একটা অত্যন্ত যুক্তিপুর্ণ কথা বলেছেন!" সবাই একসঙ্গে বাহ্‌বা দিয়ে উঠল।

বোতল-টোতলের সঙ্গে হাতিটাকেও ট্রের এক পাশে বসিয়ে রেখে প্রফেসর বললেন, "এবার যা দেখাব, সেটা হল, একটা এঁটুলি পোকা। দেখবার সুবিধের জন্যে আমরা এটাকে বড়ো করব।" ট্রের ওপর থেকে একটা ছোট্টো বাক্স নিয়ে তিনি মেগালোস্কোপের দিকে এগিয়ে গেলেন, নলগুলো খুলে আবার উলটো করে লাগালেন। তার পর মেগালোস্কোপের গায়ের ছোট্টো একটা ছ্যাঁদা দিয়ে খুব সাবধানে পোকাটাকে তার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে নলে চোখ লাগিয়ে বলে উঠলেন, "এবার তৈরি। এখন এর আকার দাঁড়িয়েছে একটা ঘোড়ার মতো!"

আবার সভাস্থলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—সবাই নলে চোখ লাগিয়ে দেখতে চায়। বাহবা আর তারিফের চোটে কান পাতা দায়। তারই মধ্যে প্রফেসরের গলা শোনা গেল, "দরজা বন্ধ রাখুন, দরজা বন্ধ রাখুন!

আরে মশাই, এইরকম অতিকায় পোকা যদি একবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে—" কিন্তু ততক্ষণে যা হবার, তা হয়ে গেছে। মেগালোস্কোপের দরজা গেছে খুলে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট এঁটুলি পোকাটি পায়ে পায়ে বেরিয়ে মণ্ডপের তলায় ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই তো আতঙ্কে চীৎকার করতে শুরু করে দিলে।

তবে, প্রফেসর মশাইয়ের উপস্থিত বুদ্ধির তো আর অভাব ঘটে নি। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "পর্দাগুলো সব খুলে দিন শিগ্‌গির খুলে দিন !" তাই দেওয়া হল, আর সঙ্গে সঙ্গে পোকাটা সব-কটা পা বাগিয়ে নিয়ে এক লাফে বাইরে হাওয়া।

চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে মহারাজ বললেন, "কোথায় গেল ?"

প্রফেসর জবাব দিলেন, "মনে হচ্ছে আমাদের পাশের রাজ্যে। যা একখানা লাফ দিয়েছে, মাইল পাঁচেকের আগে মাটি ছুঁতে হচ্ছে না !—যাই হোক, এবার দু-একটা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বোঝাব।" এই পর্যন্ত বলে তিনি আবার হাতের খাতাটার দিকে মন দিলেন। চোখ না-তুলেই বলতে শুরু করলেন, "যে প্রক্রিয়াটির কথা বলতে যাচ্ছি, তার নাম হল—নামটা হল—পড়া যাচ্ছে না, ধেবড়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। যাই হোক, এই প্রক্রিয়াটা যাতে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারেন, নিজের চোখে দেখে অনুধাবন করতে পারেন, তার জন্যে আমি কয়েকটা—কয়েকটা—"বলতে বলতে খাতার পাতার এধার ওধার আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেন, এবং শেষপর্যন্ত বললেন "—ঠিক পড়া যাচ্ছে না। কয়েকটা 'পরীক্ষা' দেখাব, না কয়েকটা 'নমুনা' দেখাব, কী লেখা আছে, বোঝা যাচ্ছে না—"

মহারাজ বলে উঠলেন, "নমুনা তো অনেক হল, ওটা 'পরীক্ষাই'—হোক।"

প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! পরীক্ষাই দেখানো যাক !"

ব্রুনো খুব আগ্রহ করে জিগেস করলে, "পরীক্ষাগুলো আমি করব ?"

শিউরে উঠে প্রফেসর বলে উঠেলেন, "ওরে বাবা রে, না রে ! তুমি পরীক্ষা করে দেখাতে গেলে কী যে ঘটবে কে জানে !"

ব্রুনো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, "আপনি করলেও যে কী হবে, তাই-বা কে জানে !"

প্রফেসর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন, "আমাদের প্রথম পরীক্ষাটির জন্যে একটি যন্ত্র লাগবে। এতে দুটি বোতাম আছে—সেরেফ দুটি—গুণে দেখতে পারেন।"

হেড-রাঁধুনি গম্ভীর ভাবে এগিয়ে এসে পরখ করে দেখলে। তার পর নিঃসন্দেহ হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

"এখন আপনারা ঐ দুটো বোতামই একসঙ্গে টিপে ধরতে পারেন—কিন্তু, তা করলে হবে না! যন্ত্রটাকে উলটো করে বসাতে পারেন—কিন্তু, তা করলে হবে না!"

ব্রুনো খুব মন দিয়ে শুনছিল, বললে, "কী করলে হবে?"

প্রফেসর একটু করুণার হাসি হাসলেন। তার পর, বললেন, "হ্যাঁ, আসল কথা হল, কী করলে হবে, কী ভাবে করতে হবে। কেমন করে করা যায়। করার নিয়মটা কী?" বলতে বলতে সাঁ করে ব্রুনোকে ধরে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে কথাটা শেষ করলেন, "সমস্ত ব্যাপারটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগে করে নেব!"

ব্রুনো ফিস্‌ফিস্ করে সিল্‌ভির দিকে চেয়ে বললে, "আমি নেমে যাই, বাবা! ভাগ করে ফেলবে বলছে যে!"

সিল্‌ভি চুপিচুপি বললে, "তোমাকে ভাগ করবে কেন? ওঁর হাতে কি ছুরি আছে? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক দিকিনি। বোতল-টোতল সব ভেঙে যাবে যে!"

মুণ্ডির মতো জিনিসদুটো ব্রুনোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "প্রথম কাজ হল, মুণ্ডিদুটো হাতে ধরে রাখা। দ্বিতীয় কাজ হল—" বলেই তিনি যন্ত্রের গায়ে-লাগানো হাতলটা বোঁ করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে "আঁক" শব্দ করে মুণ্ডিদুটো ফেলে দিয়ে ব্রুনো কনুইদুটো চেপে ধরল।

প্রফেসর আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললে, "কেমন? বেশ একটা অনুভূতি হল না?"

ব্রুনো বেশ চটেমটে বলে উঠল, "বেশ আবার কী? খুব ভালো মতন বিচ্ছিরি! কনুইদুটো ঝন্‌ঝনিয়ে উঠেছে, শিরদাঁড়ায় খট্‌কা লেগে গেছে, মাথার চুলগুলো সড়্‌সড়্ করে উঠেছে, হাড়ের মধ্যে থর্‌থরিয়ে উঠেছে!"

ব্রুনো তড়াক করে টেবিল থেকে নেমে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

প্রফেসর মশাই আবার শুরু করলেন, "আমাদের দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হল সেই অতি-বিরল-অথচ-অতি-বিস্ময়কর ব্যাপার, যাকে বলা হয়, কুচ্‌কুচে আলো। আপনারা সাদা আলো, লাল আলো, সবুজ আলো, আরো কত-রকমের আলো দেখেছেন, কিন্তু, আজকের এইরকম আশ্চর্য দিনটির আগে কখনো কুচ্‌কুচে কালো আলো দেখবার সৌভাগ্য কারোরই হয় নি—অবশ্য আমি ছাড়া।" তার পর বেশ কয়েক পুরু চাদর-দিয়ে-ঢাকা একটা বাক্স টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললেন, "এই যে বাক্সটি দেখছেন, এটি কালো আলোয় ঠাসা! কী ভাবে কালো আলো তৈরি করেছি, যদি জানতে চান তো বলি—প্রথমে একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে অন্ধকার একটা আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। পাল্লাদুটো চেপে বন্ধ করে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আলমারির ভেতরটা হলদে আলোয় ভরে গেল, বুঝতেই পারছেন। তখন করলুম কি, একবোতল কুচ্‌কুচে কালো কালি নিয়ে মোমবাতিটার ওপর উজাড় করে ঢেলে দিলুম। আর, অবাক আনন্দে লক্ষ্য করলুম, সমস্ত হলদে আলোটা কুচ্‌কুচে কালো হয়ে গেছে! নিজের সম্বন্ধে কী ভীষণ যে গর্ব হতে লাগল, কী আর বলব! তার পর, মনটা একটু শান্ত হতে, একটা বাক্সের মধ্যে খানিকটা আলো ভরে নিলুম। —এখন, বলুন, কেউ দেখবেন না-কি? এই চাদরের তলায় ঢুকে সেই কুচ্‌কুচে আলো দেখবার আগ্রহ যদি থাকে, তো বলুন!"

কোনো সাড়া-শব্দ এল না। শেষপর্যন্ত ব্রুনো বললে, "আমি চাদরের তলায় ঢুকতে রাজি। কিন্তু কনুই ঝন্‌ঝন্ করবে না তো?"

প্রফেসর তাকে আশ্বস্ত করলেন। ব্রুনো হামাগুড়ি দিয়ে চাদরের তলায় ঢুকে পড়ল। মিনিট দুয়েক বাদে যখন আবার বেরিয়ে এল, তখন তার সারা গায়ে ঘাম আর ধুলো, মাথার চুল এলোমেলো।

সিল্‌ভি ব্যাগ্র হয়ে জিগেস করলে, "বাক্সে কী দেখলে গো ব্রুনো?"

ব্রুনো জবাব দিলে, "কিছু না, বড্ডো অন্ধকার।"

তাই শুনে প্রফেসর খুব উৎসাহভরে বলে উঠলেন, "একেবারে যথার্থ বর্ণনা দিয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতে কুচ্‌কুচে আলো আর অন্ধকারের মধ্যে কোনো পার্থক্যই ধরা পড়ে না। কাজেই ব্রুনো যে 'কিছু না' বলেছে, তাতে মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না!—থাক, এবার তৃতীয় পরীক্ষার পালা।"

মঞ্চের বাইরে মাটিতে এক জায়গায় একটা খুঁটি পোঁতা ছিল, প্রফেসর সদলবলে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। খুঁটিটার একপাশে ডগা থেকে একটা

শেকল ঝুলছে, তার প্রান্তে একটা ভারী লোহা বাঁধা। ডগার আর-এক পাশে একটা তিমি মাছের বড়ো হাড় লাগানো, সেটা হাতের মতো বেরিয়ে রয়েছে। তার প্রান্তে আবার একটা কড়া লাগানো। প্রফেসর বলতে লাগলেন, "এই পরীক্ষাটা ভারি মজার। একটু সময় লাগে, তবে সেটা গ্রাহ্য না করলেও চলে। এবার লক্ষ্য করুন। এই যে লোহার ভারটা শেকলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে, এটা যদি খুলে দিই, ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যাবে।

"কেউ অস্বীকার করেন ?"

কারো আপত্তি শোনা গেল না।

"আবার দেখুন, এই পাতলা লম্বা হাড়টাকে খুঁটির গায়ে পাক দিয়ে এমনি করে বেঁকিয়ে এই হুকের সঙ্গে কড়াটা আটকিয়ে দিলুম—এমনি করে—হাড়টা বেঁকেই রইল। কিন্তু যদি হুক থেকে কড়াটা খুলে দিই, হাড়টা আবার সোজা হয়ে যাবে। কেউ অস্বীকার করেন ?"

এবারেও কারো আপত্তি শোনা গেল না।

"এখন ধরুন, এই হাড় আর ঐ ভারী লোহা, দুটোকেই যেমনকার তেমনি রেখে দেওয়া হল—অনে-ক, অ-নে-ক দিন ধরে রেখে দেওয়া হল। হাড়টা বেঁকে রইল, লোহাটা শেকলের সঙ্গে লাগানো রইল।—কী হবে ? হাড়ের সিধে হবার শক্তি যাবে ফুরিয়ে। হুক থেকে কড়াটা খুলে দিলেও, হাড়টা সোজা হবে না, বেঁকেই থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, ঐ লোহার ক্ষেত্রেই-বা সেইরকম হবে না কেন ? হাড়ের বেলা দেখছি, বাঁকা হয়ে থাকতে থাকতে বেঁকে থাকাটাই তার ধর্ম হয়ে গেছে, ছেড়ে দিলেও আর সোজা হচ্ছে না। শেকলের সঙ্গে লাগানো থাকতে থাকতে লোহাটারও তো শেকলের গায়ে লেপটে থাকাটা এমন অভ্যেস হয়ে যেতে পারে যে, খুলে দিলেও আর মাটিতে পড়ে যাবে না ? সেইটাই আমি দেখতে চাই!"

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "আমারও তাই দেখতে চাই!"

মহারাজ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "কত কাল অপেক্ষা করতে হবে ?"

প্রফেসর তাঁর পকেট-ঘড়ি দেখলেন। বললেন, "প্রথমবার অন্তত একহাজার বছর তো লাগবেই। তার পর শেকল থেকে লোহাটা খুলে দিলে যদি দেখা যায়, তখনো পড়বার দিকেই ঝোঁকটা রয়ে গেছে (তাই-

ই থাকবে বোধ হয়), তখন আরো একহাজার বছরের জন্যে আবার শেকলের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে।"

এইখানে, মহারানীর মুখ থেকে হঠাৎ এমন একটা যুৎসই বুদ্ধির কথা বেরিয়ে পড়ল যে, সবাই অবাক! তিনি বললেন, "সেই ফাঁকে অন্য কোনো একটা পরীক্ষা সেরে নেবার মতো সময় হবে বোধ হয়।"

প্রফেসর আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই হবে! মঞ্চে যাওয়া যাক, চার নম্বর পরীক্ষাটা শুরু করি।"

"এইটিই শেষ পরীক্ষা, এর জন্যে আমি এক ধরনের ক্ষার—ক্ষার না অম্ল, ঠিক মনে পড়ছে না—যাই হোক, নেব। তার পর দেখবেন, যখন সেটাকে—" এই অবধি বলে একটা বোতল তুলে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বেশ খানিকক্ষণ দেখে কথাটা শেষ করলেন "—সেটাকে একটা—এক রকমের —এক ধরনের—যাই হোক একটা কিছুর সঙ্গে মেশাব—"

মহারাজ আর বাধা না দিয়ে থাকতে পারলেন না। জিগেস করলেন, "জিনিসটার নাম কী?"

"নামটা ঠিক মনে নেই, তা ছাড়া লেবেলটাও খসে গেছে—" এই বলে থতমত খেয়ে প্রফেসর সেই বোতলটা অন্য একটা বোতলের ওপর উপুড় করে ধরতেই বিকট একটা আওয়াজ হল, বোতলদুটো চুরমার তো হলই, যন্ত্রপাতি সব ছত্রাকার, সারা সামিয়ানা কালো ধোঁয়ায় অন্ধকার। আতঙ্কে আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম, আর—আর দেখলুম, আমার ঘরের আগুন পোহাবার সেই চুল্লিটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, কেউ কোথাও নেই। ঘুমের ঘোরে আগুন ওস্কাবার শিকটা কখন হাত থেকে খসে পড়েছে গিয়ে লোহার চুল্লিটার ওপর, ধাক্কা লেগে জলের কেতলিটা পড়েছে উলটে, বাষ্পের কুণ্ডলীতে জায়গাটা ভরে উঠেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় গিয়ে শুলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাজকীয় ভোজসভা

পরদিন একেবারে অন্যরকম লাগল। চারি দিকে ঝল্‌মলে আবহাওয়ায় আমার হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুদের স্মৃতিগুলো পর্যন্ত যেন কত আনন্দময় মনে হতে লাগল। আজকেই আবার লেডি মিউরিয়েল বা তার বাবার সঙ্গে দেখা করে ওদের বিব্রত করতে মন চাইল না; সাত-পাঁচ ভেবে গাঁয়ের দিকে রওনা দিলাম বেড়াতে বেড়াতে। ফিরলাম, যখন রোদ পড়ে আসতে শুরু করেছে।

সেই বুড়োর কুটীরের পাশ দিয়ে ফেরার পথ। সেই বুড়ো, ইস্টিশানে লেডি মিউরিয়েলের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন যাকে দেখেছিলাম। যেতে যেতে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখলাম, বুড়ো এখনো আছে কি না।

আছে। এখনো বেঁচে আছে। বাইরের দাওয়ায় বসে আছে—ঠিক যেমনটি বসেছিল ফেফিল্ড স্টেশনের বেঞ্চিতে।

থমকে দাঁড়ালাম। "গুড্ ইভ্‌নিং।"

"গুড্ ইভ্‌নিং, মিস্টার!" খুশিভরা গলায় বলে উঠল বুড়ো। "ভেতরে আসবেন না?"

উঠলাম দাওয়ায়, বেঞ্চিতে বসলুম। বললুম, "আপনাকে সুস্থ দেখে ভারি ভালো লাগল। এর আগের বার যখন আপনার কাছে আসছিলাম, চোখে পড়েছিল, লেডি মিউরিয়েল আপনার এখান থেকে বের হয়ে

গেলেন। এখনো আসেন নাকি আপনার সঙ্গে দেখা করতে?"

"হ্যাঁ," ধীরে ধীরে বললে বুড়ো। "আমায় ভোলে নি। কিছুদিন পরে পরেই তার মুখখানি দেখতে পাই। সেই ইস্টিশানে দেখা হবার পর প্রথম যেদিন এখানে এল, সেদিনটির কথা কেবলই মনে পড়ে আমার। এসে বলেছিল, আমি যেন ওকে মাফ করে দিই। বেচারি! মাফ চাইতে এল কিনা আমার কাছে!"

"কিসের জন্য? কী করছিল, যে মাফ চাইতে হল?"

"ব্যাপারটা তা হলে বলি। আমরা দুজনেই ইস্টিশানে রেলগাড়ি ধরবার জন্যে অপিক্ষে করছিলুম। আমি গিয়ে বসেছিলুম বেঞ্চিতে। ইস্টিশানবাবু এসে আমায় উঠে যেতে বললে। কেন? না, আমার রানীমা বসবেন। বুঝলে?"

"বলতে হবে না, সবই তো জানি। সেদিন তো আমিও ছিলাম সেখানে।"

"ছিলে, না? তা, বোঝ একবার ব্যাপার, তাই জন্যে মেয়ে মাফ চাইতে এল আমার কাছে! ভাব একবার কাণ্ডখানা! আমি কিনা মাফ করব! একটা বুড়ো-হাবড়া গেঁয়ো ভূত, তার আবার মাফ! হুঁঃ! তার পর থেকে আরো অনেক বার এয়েছে। অত কতায় কাজ কি, কালই তো এসেছিল, তুমি যেখানে বসে, ঠিক সেইখানটিতে বসেছিল, দেখাচ্ছিল যেন পরীটি! বললে, 'তোমার মিনু তো আর নেই', বললে, 'তোমায় দেখাশুনো করবার তো কেউ আর রইল না।' মিনু হল আমার নাতনি। আমার কাছেই থাকত। কিন্তু রইল না, সগ্গে চলে গেল। মাসদুয়েক হবে—বোধ হয় তিন মাস। বেশ গোল্টাই চেহারা ছিল, ব্যাভারটাও মিষ্টি।—এখন বড়ো একা লাগে, ফাঁকা লাগে।"

দুহাতে মুখ ঢাকল বুড়ো। আমি চুপ করে রইলাম। সামলে নিক।

"তা, আমার রানীমা বললে, 'মনে কর, আমি তোমার মিনু!' বললে, 'মিনু তোমায় চা করে দিত না?' শুনে বললুম 'হ্যাঁ।' মেয়ে আমার চা করতে বসল। বললে, 'মিনু তোমার তামাক খাবার পাইপ ধরিয়ে দিত না?' শুনে বললুম, 'হ্যাঁ।' মেয়ে আমার পাইপ ধরিয়ে দিলে। বললে, 'মিনু তোমায় এই বারান্দায় চা এনে দিত না?' শুনে বললুম, 'হ্যাঁ।' বললুম, 'মা গো, মনে হচ্ছে আমার মিনুই বুঝি ফিরে

এল।' মা আমার কাঁদাকাটি করল একটুন। দুজনেই কাঁদাকাটি করলুম একটুন—"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে হল আমায়।

"যখন পাইপ খেতে লাগলুম, তখন বসে বসে আমার সঙ্গে কত গপ্পগাছা করলে—মিষ্টি মিষ্টি সব কথা, সোন্দর সোন্দর সব গপ্প। —কেমন করে ভাবব আমি যে আমার মিনু ফিরে আসে নি? তাপ্পর, যখন বাড়ি যাবে বলে উঠে দাঁড়াল, বললুম, 'যাবার আগে আমার হাতে হাত মেলাবে না একবার?' বললুম। তা, মেয়ে বললে, 'না।' বললে, 'তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করা সাজে না আমার!' বললে।"

"খুব অন্যায় কথা!" মনে মনে ভাবলুম, লেডি মিউরিয়েলের কথাবার্তা বা আচার-আচরণে সামাজিক মর্যাদার এমন নির্লজ্জ প্রকাশ আগে তো কখনো দেখি নি! ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বলে উঠল, "না, না,। ওটা ওর মানের কথা নয় গো! বললে, 'তোমার মিনু কি তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করত?' বললে, 'আমি তো এখন থেকে তোমার মিনু!' বললে, আর কাছে এসে দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে আদর করে—আর, আর কত সোহাগ করে চুমু খেতে লাগল আমায়!—ভগবান ওর ভালো করুন!" বলতে বলতে বুড়ো এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল, কথা বলতে পারলে না।

আমার মুখ দিয়েও সেই একই কথা বেরিয়ে এল, "ভগবান ওর ভালো করুন।" তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ার হাতে হাত রেখে বললুম, "আজ উঠি, গুড্ নাইট।" ফিরে আসতে আসতে মনে মনে বললুম, 'লেডি মিউরিয়েল, তুমিই ঠিক বুঝেছ, কেমন করে মাফ চাইতে হয়!'

রাত্তিরে, আগুনের সামনে বসে আমি কালকের সেই-সব অদ্ভুত দৃশ্যগুলোকে পর পর মনের মধ্যে সাজাতে লাগলুম ছবির মতো; গন্‌গনে কয়লার আলোছায়ার মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করলুম সেই প্রফেসরের সরল মুখখানা। মনে মনে ভাবলুম, ঐ যে কালো কয়লার টুকরোটার একধারে একটুখানি লাল আভা, ঐটাতেই প্রফেসরের মুখের আদল আসে খানিকটা। ভাবতে না-ভাবতেই প্রফেসরের কথা কানে এল:

"দুটো বোতলের মধ্যেকার জিনিসগুলো মেশবার ফলে কী হল, লক্ষ্য করেছেন? বিস্ফোরণ! পরীক্ষাটা আর-একবার করব না কি?"

চারি দিক থেকে রব উঠল, "না, না, আর কষ্ট করে পরীক্ষা করার

দরকার নেই, মশাই!" তার পরেই সবাই হুড়্মুড়্ করে ঢুকে পড়লুম খাবার জায়গায়—সেখানে তখন পাত পড়ে গেছে, লোকজনও বসতে শুরু করেছে যে যার জায়গায়।

প্রফেসর বলে উঠলেন, "একটা নিয়ম আমি বরাবরই মেনে চলি, সেটা হল, মাঝে-মধ্যে কিছু খাওয়া। এই-সব ডিনার পার্টির একটা গুন হল—" বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তার পর হঠাৎ আবার বলে উঠলেন, "আরে, এই যে আমাদের অন্য প্রফেসর মশাই! অথচ, দেখ দিকিনি, একটাও বসবার জায়গা খালি নেই!"

অন্য প্রফেসর মশাই বিরাট একটা বই নিয়ে চোখের প্রায় পাতার কাছে ধরে পড়তে পড়তে এগোচ্ছিলেন, এবং তার ফল হল এই যে, হোঁচট খেয়ে বেশ খানিকটা ছিট্‌কে উঠে টেবিলের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

তাঁকে ধরে তুলে বসাতে বসাতে আমাদের আগেকার প্রফেসর বলতে লাগলেন, "ছি, ছি, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!"

অন্য প্রফেসর বললেন, "যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ ছিটকে পড়ত, তা হলে কিন্তু আমার মোটেই লাগত না।"

প্রফেসর কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন, ব্রুনোর দিকে ফিরে বললেন, "সে তো বটেই, নিজে যদি অন্য কেউ হাওয়া যেত, তা হলে তো খুবই ভালো হত; কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়।"

এর জবাবে ব্রুনো শুধু বললে, "আমার প্লেট একদম খালি।"

কথাটা সত্যি কি না, দেখবার জন্য প্রফেসার তাড়াতাড়ি চশমা পরে ফেললেন, তার পর খুব দুঃখিত দুঃখিত ভাব করে ব্রুনোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবারে কী নেবে, বাবা?"

একটু ভেবে নিয়ে ব্রুনো বললে, "ভাবছি, একটু প্লাম পুডিং নিলে হয়।"

এইখানে সিল্‌ভি ফিস্‌ফিস্ করে বল উঠল, "আঃ ব্রুনো, দিতে না-এলে কোনো খাবার চেয়ে খেতে নেই!"

ব্রুনোও তার জবাবে সেইরকম ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল, "যখন দিতে আসবে, তখন চাইতে, ভুলে যেতেও তো পারি, বুঝলে-না।" তার উত্তরে সিল্‌ভি ঠোঁট ফাঁক করতে যেতেই আবার বললে, "মাঝে মাঝে আমি বড়ো ভুলে যাই তো!"

ইতিমধ্যে মহারানী আর সিল্‌ভির মাঝখানে একটা চেয়ার পাতা হয়েছে অন্য প্রফেসরের জন্য। প্রফেসার তো বসলেন, কিন্তু কারো সঙ্গে বিশেষ বাক্যালাপ করলেন না। সিল্‌ভির শুধু মনে পড়ে, খাবার সময়ে একটিমাত্রই কথাই তিনি বলেছিলেন, সেটা হল, "ডিক্‌সনারি জিনিসটা যে কী তৃপ্তি দেয়!" এর জবাবে, "ইয়েস সার" ছাড়া সিল্‌ভি আর কিছু বলার সাহস পায় নি। এবং বাক্যালাপের ঐখানেই সমাপ্তি।

"ইতিমধ্যে ব্রুনোর পাতে কী একটা খাবার দেওয়া হয়েছে, তাতে প্লাম পুডিং-এর কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

কে যে শুনছে, তার ঠিক নেই, তবু আমাদের সদাপ্রসন্ন প্রফেসর মশাই আগের কথার জের টেনে বলে উঠলেন, "ডিনার পার্টির আর-একটা উপকারিতা হল, এর দৌলতে অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যদি কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয়, কিছু নয়, তাকে শুধু খাবার নেমন্তন্ন কর। ইঁদুরদের বেলাও তাই।

ইতিমধ্যে একটা গোব্‌দামার্কা বেড়াল ঘরে ঢুকে ব্রুনোর চেয়ারের পায়ায় গা ঘসছিল। হেঁট হয়ে তার পিঠে চাপড় মারতে মারতে ব্রুনো বলল, "এই বেড়ালটা ইঁদুরদের খুব ভালোবাসে। সিল্‌ভি, তোর ডিশে একটু দুধ ঢেলে দে না ভাই। বেড়ালরা দুধ খেতে পেলেই খুশি।"

"আমার ডিশে কেন? তোর ডিশে দিলেই তো পারিস!" সিল্‌ভি বললে।

"পারি, কিন্তু পরে আরো যখন দুধ দিতে হবে তখন আমার ডিশে দেব।"

সিল্‌ভি কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না। ছোটো ভাইয়ের আবদার কোনোদিনই ঠেলে না সে, তাই নিজের ডিশে খানিকটা দুধ ঢেলে ব্রুনোর হাতে দিলে। ব্রুনো চেয়ার থেকে নেমে বেড়ালকে খাওয়াতে বসল।

প্রফেসর সিল্‌ভিকে বললেন, "এত লোকের ভিড়ে ঘরটা একেবারে গরম হয়ে উঠেছে। আমি বুঝি না, ঐ আগুন পোহাবার ঝিঁকের ওপর খানিকটা করে বরফ রাখে না কেন। শীতকালে তো বাপু কয়লা রাখিস, গরম হবার জন্যে সবাই গন্‌গনে আগুনের কাছাকাছি গিয়ে জড়ো হোস। দেখ দিকিনি, এই গরমের সময়ে তেমনি বরফের কাছাকাছি গিয়ে বসতে পারলে কেমন আরাম লাগত!"

ব্যাপারটা কল্পনা করেই শিউরে উঠল সিল্‌ভি। বললে, "বাইরে

কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। আজ আসবার সময়ে পা দুটো তো জমে যাবার জোগাড় !"

প্রফেসর সোৎসাহ বলে উঠলেন, "সেটা মুচির দোষ ! কতবার বলেছি, জুতো তৈরি করার সময়ে সোল এর তলায় একটা লোহার পাত লাগাবি লম্বা করে, ডগাটা একটু বাইরে বার করে রাখবি, যাতে তার ওপর একটা বাতি বসিয়ে রাখা যায়। তা, মাথায় ঢুকলে তো। এই সামান্য ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল করলেই ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগার বালাই থাকে না। আমি তো সারা শীতকালটাই গরম কালি ছাড়া লিখি না। এ-সব খেয়ালই করে না কেউ। অথচ দেখ, কী সহজ ব্যাপার !"

"তা তো বটেই।" খুব মিষ্টি করেই বললে সিল্‌ভি। এদিকে ব্রুনো তখন আধ-খালি ডিশটা নিয়ে ফিরে এসে চেয়ারে বসেছে। দেখে সিল্‌ভি বললে, "বেড়ালটার পেট ভরল ?"

সে কথার জবাব না-দিয়ে ব্রুনো গম্ভীর গলায় বললে, "কে যেন দরজা আঁচড়াচ্ছে। ভেতরে আসতে চায় বোধ হয়।" এগিয়ে গিয়ে দরজার গোড়ায় উঁকি মারলে সে। ফিরে আসতে সিল্‌ভি জিগেস করলে, "কে ?"

ব্রুনো বললে, "একটা ইঁদুর। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে। বেড়ালটাকে দেখতে পেলে। বললে, "আর একদিন বরং আসব।" আমি বললুম, "তোমার কি আকন্ত হচ্ছে ? ভয় পেয়ো না। বেড়ালটা ইঁদুর ভালোবাসে। ইঁদুর বললে, "আমার আজ বড্ডো কাজের তাড়া।" বললে, "আবার কাল আসব।" বললে, "বেড়ালটাকে আমার ভালোবাসা দিয়ো।"

ইতিমধ্যে লর্ড চ্যান্সেলর প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে বসলেন, "কী গোব্‌দা বেড়াল রে, বাবা। আশ্চর্য একেবারে !"

ব্রুনো শুনতে পেয়েছিল মন্তব্যটা। বললে, "যখন এল, তখনই তো গোব্‌দা ছিল। কাজেই গোব্‌দা হওয়াটা আচ্চয্যের কিছু নয়। বরং এই কয়েক মিনিটের মধ্যে একটু রোগা হয়ে গেলে সত্যিকারের আচ্চয্যের হত।"

"ও, তাই বুঝি সব দুধটা খাওয়ালে না ওকে ?" লর্ড চ্যান্সেলর প্রশ্ন করলেন।

"না, আরো বিশেষ একটা কারণ আছে। খাওয়ালুম না, তার কারণ খেতে চাইল না। বিরক্ত হল।"

"সেরকম তো কিছু দেখলুম না? কী করে বুঝলে যে, বিরক্ত হল?"

"কারণ, গর্‌গর্‌ করতে লাগল।"

এবার সিল্‌ভি বললে, "বোকা ছেলে, খুশি হলেই তো বেড়ালরা গর্‌গর্‌ করে।"

একটু থতিয়ে গেল ব্রুনো। তার পর বললে, "কী জানি বাপু। খুশি হবার এ কী রকম ঢং। আমি যদি গর্‌গর্‌ করি, তা হলে কি তুমি বুঝবে, আমি খুশি হয়েছি?"

আপন মনেই লর্ড চ্যান্সেলর বললেন, 'ছেলে বটে একখানা!'

কথাটা ব্রুনোর কান এড়ায় নি। সিল্‌ভিকে বললে, "কী বললেন উনি?"

সিল্‌ভি ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "উনি বললেন, একটা ছেলে, বেশি হলে বলতেন, দুটো ছেলে, কিম্বা তিনটে ছেলে।"

"যাক, বাবা! তা হলে ভালোই! একজনে একটা ছেলে হয়ে থাকাই ভালো। দুটো-তিনটে হলে ভারি মুশকিল। আমিই যদি দুটো-তিনটে হই, তারা আমার সঙ্গে ঝগড়া করত হয়তো, খেলতই না!"

অন্য প্রফেসর হঠাৎ এতক্ষণে বই থেকে মুখ তুলে বলে উঠলেন। "খেলবেই-বা কেন? তখন ঘুমবে হয়তো!"

"তা কী করে হবে? আমি না-ঘুমলে ওরা ঘুমবে কী করে?"

"তা হতে পারে বৈকি! ছেলেরা সব কি একসঙ্গেই ঘুমোয়? কাজেই বাকি ছেলেরা—কিন্তু, কোন ছেলেদের কথা তুমি বলছ হে?"

আমাদের বন্ধু-প্রফেসর এই সময়ে ওদের দিকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলেন, "আগে যে জিগেস করে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে কথা বলা দরকার সেটা কিছুতেই মনে থাকে না ওঁর।"

ব্রুনো সে কথায় কান না দিয়ে বিজয়গর্বে বলে উঠল, "কেন? আমরাই বাকি দুটো ভাগের ছেলেরা? মানে, যদি আমি দুটো বা তিনটি ছেলে হতুম আর কি!"

অন্য প্রফেসর ফোঁস্‌ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তার পর হঠাৎ চটকা ভেঙে বলে উঠলেন, "আর কিছু করবার আছে না কি? সব অনুষ্ঠান শেষ হল তো এবার?"

একটু আমতা আমতা করে আমাদের প্রফেসর বললেন, "ঠিক তা নয়। মানে খাওয়াটা তো অন্তত শেষ করা দরকার। তা ছাড়া,

গরমটাকেও সহ্য করে নিতে হবে। খাবারটা নিশ্চয়ই ভালো লাগছে—রান্না তো ভালোই। আর, গরমটাও নিশ্চয়ই খুব অসহ্য লাগছে না আপনার—খুবই ভ্যাপ্‌সা অবশ্য, মানে, ততটা নয় যদিও।"

"ততটা নয় মানে ?" অন্য প্রফেসর বেশ গোলমালে পড়েছেন মনে হল।

জিবের ডগায় যা হোক একটা জবাব জুগিয়ে আমাদের প্রফেসর বলে উঠলেন, "মানে, যতটা হতে পারত, বা হাওয়া উচিত ছিল, ততটা নয় আর কি!"

এবার অন্য প্রফেসরকে বেশ খুশি দেখাল। বললেন, "হ্যাঁ, এবার ঠিক বুঝতে পেরেছি। আপনার বলার ধরণটা অবশ্য খুবই গোলমেলে, তবু, মানেটা যা হোক করে ধরতে পেরেছি এতক্ষণে।" ব্রুনোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, পকেট ঘড়ির দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলেন, "সাড়ে তেরো মিনিট আগে তুমি বলেছিলে যে, বেড়ালটা ইঁদুরদের খুব ভালোবাসে। ইঁদুর ভালোবাসে যখন, তখন বলতেই হয়, অনন্যসাধারণ বেড়াল। মানে, যাকে বলে লাখের মধ্যে একখানা।"

বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে ব্রুনো বললে, "একখানাই তো।"

"কিন্তু, কী করে বুঝলে যে, ইঁদুরদের ও ভালোবাসে। মানে, ঠিক করে বলতে গেলে ইঁদুরকে ও প্রীতির চক্ষে দেখে ?"

"কারণ, ইঁদুরদের সঙ্গে খেলা করে। ইঁদুরদের ভালো লাগবে বলে।"

"কিন্তু, সেইখানেই আমার সন্দেহ। আমার ধারণা, ইঁদুরদের সঙ্গে খেলা করে সেরেফ মেরে ফেলবে বলে।"

"আহা, সেটা একটা, যাকে বলে, দুগ্‌ঘটনা।" বেশ সোৎসাহে এবং ভেবেচিন্তেই জবাব দিতে লাগল ব্রুনো। "দুধ খেতে খেতে সব কথা ও খুলে বললে আমায়। বললে, 'ইঁদুরদের আমি নতুন নতুন খেলা শেখাতে চাই ; ইঁদুররাও তো তাই চায়।' আরো বললে, 'তবে, কখনো-সখনো খেলতে খেলতে দুগ্‌ঘটনা ঘটে যায় ; ইঁদুরেরা নিজে নিজেই মরে যায় খেলতে খেলতে। মানে, আপ্তহত্যে হয়ে যায়।' বললে, 'যখন আপ্তহত্যে হয় তখন আমার খুবই ভালোরকম দুক্ষু হয়।' বললে—"

সিল্‌ভি আর থাকতে পারল না, "তাই যদি হবে, তা হলে ইঁদুররা মরে গেলে, ও তাদের খায় কেন ?"

এরকম একটা শক্ত প্রশ্নেরও জবাব দিতে আটকাল না ব্রুনোর। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "বললে, 'মরে যাবার পর ইঁদুরদের খেলে, তারা মোটেই বাধা দেয় না বা আপত্তি করে না।' বললে, 'এত ভালো যে ইঁদুর, তাদের কি শুধু-শুধু ফেলে রেখে নষ্ট করা উচিত?' বললে, 'একদিন হয়তো তোমারই মনে হবে, আমার ফেলে দেওয়া এক-আধটা ইঁদুর পেলে কী ভালোই হত।' বললে—"

সিল্‌ভি এবার বিরক্ত না হয়ে পারল না। বললে, "ঐটুকুন সময়ের মধ্যে এত কথা বললে কখন তোকে?"

"বেড়ালরা কেমন করে কথা বলে, জানো কি?" একটু ঠাট্টার সুরেই জবাব দিলে ব্রুনো, "বেড়ালরা খুব ভালো মতন তাড়াতাড়ি কথা বলে।"

প্রফেসর এইখানে হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল করলেন যে, "এবার ভোজসভার সমাপ্তি ঘটাবার সময় হয়েছে। সোৎসাহে বলে উঠলেন, "এবার আর একটিমাত্র করণীয় বাকি আছে আমাদের—সেটা হল সম্রাটের স্বাস্থ্য পান করা!"

খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে লর্ড চ্যান্সেলর বলে উঠলেন, "বটেই তো, বটেই তো!" বলে, উঠে দাঁড়িয়ে সমাগত সবাইকে যথাযথ নির্দেশ দিতে লাগলেন। "সবাই গেলাস ভর্তি করে নিন।" সবাই তৎক্ষণাৎ তাই করল। "এবার সম্রাটের স্বাস্থ্য পান করুন।" সারা হলঘর জুড়ে ঢোঁক ঢোঁক আওয়াজ উঠল। "সম্রাটের নামে থ্রি চিয়ার্স!" চীৎকারে এবার আর কান পাতা গেল না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে সবাই সম্রাটের নামে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। তারই মধ্যে কোনোরকমে চ্যান্সেলর ঘোষণা করলেন, "সম্রাট এবার একটু কিছু বলবেন।"

ঘোষণা শেষ হবার আগেই সম্রাট ভাষণ দিতে শুরু করে দিয়েছেন ততক্ষণে—"সম্রাট হতে আমার যতই অনিচ্ছা থাকুক, কী আর করব—আপনারা আমাকে সম্রাট হবার জন্যে এতই আগ্রহ দেখালেন—আপনারা তো জানেনই যে, আগেকার ওয়ার্ডেন কিসুই সামলাতে পারত না—আপনারা অবশ্য খুবই সুনাগরিক—তবু আপনাদের ওপর কতই-না অত্যাচার করেছে সে—কতরকম করের বোঝা চাপিয়েছে—আপনারা তো বোঝেনই, সম্রাট হবার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক কে—আমার ভাইটার তো কোনো বুদ্ধিসুদ্ধির বালাই ছিল না—"

এই কিম্ভূত বক্তিমে কতক্ষণ যে চলত, বলা শক্ত, কারণ সেই মুহূর্তে হঠাৎ এমন একটা ঝড় উঠল যে, সারা প্রাসাদটাই উড়িয়ে নিয়ে যাবার জোগাড়। দরজা জানালা সব ধড়াস্ ধড়াস্ করে খুলে গেল, বাতি-টাতি বেশির ভাগই গেল নিবে, চারি দিকে ধুলো উড়ে সব ঘোলাটে দেখাতে লাগল।

কিন্তু কেবল মিনিট খানেকের জন্য। তার পরই তেমনি হঠাৎ-ই আবার যেমনকার তেমন। ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই, জিনিসপত্র সব যেমনকার তেমনি, যেন কিছুই ঘটে নি। কেবল বদল দেখা গেল সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর মুখে চোখে। আগেকার সেই বোকা বোকা চাউনি কোথায় উধাও হয়ে গেছে, উধাও হয়ে গেছে সেই অর্থহীন ফ্যাল্‌ফ্যালে হাসি। মনে হল, দুজনেই কত বদলে গেছেন, ধাতস্থ হয়েছেন এতদিন পর।

সম্রাট তখনো আগের জের টেনে ভাষণ দিয়ে চলেছেন—যেন কিছুই ঘটে নি। এখন বলছেন, "আমরা এতদিন ধরে যেরকম ব্যবহার করেছি—মানে, আমি আর আমার স্ত্রী—সেটা অত্যন্ত ইতর আর নীচ। ইতর আর নীচ ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় আমাদের হওয়ার কথা নয়। আমার ভাই চলে গেল, আর আপনারা এমন একজনকে হারালেন, যাঁর মতো ওয়ার্ডেন আর আগে কখনো হয় নি। আর, এদিকে আমি, অত্যন্ত হীন এবং কপটের মতো, আপনাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে নিজে সম্রাট হয়ে বসেছি। সম্রাট। আমি। একটা মুচি হবার মতো যোগ্যতাও আমার আছে কি না সন্দেহ।"

লর্ড চ্যান্সেলর ইতিমধ্যে ব্যাপার-স্যাপার দেখে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত নেড়ে বলতে শুরু করেছেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, উনি পাগল হয়ে গেছেন—" কিন্তু তাঁর বলা আর শেষ হল না। সম্রাটের বক্তব্যও অসমাপ্ত থেকে গেল। সমস্ত সভাস্থল একেবারে নিস্তব্ধ। আর তারই মধ্যে শোনা গেল, বাইরে থেকে দরজার ওপর কার আঙুলের টোকা মারার খুট্ খুট্ শব্দ।

সভার সবাই অবাক। রব উঠল, "ব্যাপার কী?" হুড়োহুড়ি করতে লাগল সকলে। লর্ড চ্যান্সেলর সভার সমস্তরকম নিয়ম-কানুন ভুলে হলঘরের দরজার দিকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদেই যখন ফিরলেন, তখন হাঁফাচ্ছেন, সারা মুখটা ফ্যাকাশে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভিখিরি ফিরে এল

ফিরে এসে লর্ড চ্যান্সেলর হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "হে মহামহিম সম্রাট, আবার সেই ভিখিরিটা এসে হাজির হয়েছে। কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিই হুজুর ?"

সম্রাট বললেন, "এখানে ডেকে আনো।"

চ্যান্সেলর যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। "এইখানে ? মহামহিম, এইখানে বলছেন ? আপনার কথা কি বুঝতে ভুল করছি আমি !"

"এইখানেই নিয়ে এসো।" গম্‌গম্‌ করে উঠল সম্রাটের গলা। টলতে টলতে চ্যান্সেলর আবার এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। তার পরেই দেখা গেল অভ্যাগতরা দুপাশে সরে গিয়ে কার জন্য যেন পথ করে দিচ্ছে হলঘরের মাঝখান বরাবর। আর দেখা গেল, আমাদের সেই দীন ভিখিরি ধীর পায়ে ঢুকে আসছে ভোজসভার হল ঘরে।

কী দরিদ্র চেহারা ! গায়ের শতচ্ছিন্ন পোশাকের এখানে ওখানে কাদার ছোপ ; মাথার সাদা চুলে জট পড়েছে, একমুখ লম্বা দাড়িটা বিচ্ছিরিরকম এলোমেলো। তবু, শিরদাঁড়া খাড়া রেখে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে : আর সবচেয়ে আশ্চর্য, তার সঙ্গে পাশাপাশি এগিয়ে আসছে সিল্‌ভি আরা ব্রুনো। ভিখিরির দুটি হাত ধরেছে দুজন, আর

তার মুখের দিকে তকিয়ে আছে গভীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে।

লোকে তো সব অবাক! সম্রাট এখন এই ভিখিরিকে নিয়ে কী যে করবেন, কেউই আন্দাজ করতে পারছে না। মঞ্চে এসে উঠলে, ধরে ছুঁড়ে আছাড় মারবেন মাটিতে?

কিন্তু সমস্ত কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, সম্রাট নতজানু হয়ে বসলেন, ভিখিরি এগিয়ে এসে থামল তাঁর সামনে; মাথা নিচু করে সম্রাট ভারী গলায় বললেন, "ক্ষমা করুন আমাদের!"

স্বামীর পাশে নতজানু হয়ে বসে সম্রাজ্ঞীও উচ্চারণ করলেন সেই একই কথা, "ক্ষমা করুন আমাদের!"

দীন ভিখিরি মৃদু হাসলেন, বললেন, "ওঠো। ক্ষমা করেছি!" সবাই শুনতে পেল। দেখতে পেল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে সেই ভিখিরির সর্বাঙ্গে। সেই শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা আর কাদার ছোপগুলো বদলে গিয়ে দেখা দিচ্ছে রাজার মতো ঝক্‌ঝকে পোশাক আর ঝল্‌মলে নকশা—তাতে সোনার পাড়, তাতে হীরে-মুক্তোর কাজ। এতক্ষণে তাঁকে চিনতে পেরেছে সকলেই—সেই বড়ো ভাই আসল ওয়ার্ডেন। শ্রদ্ধায় মাথা নত করল সারা ঘরের মানুষ।

ওয়ার্ডেন এবার বললেন, "ভাই আমার, বোন তোমাকেও বলছি। আমি তোমাদের কাজে বাধা দেবার জন্যে আসি নি। সম্রাট হয়ে শাসন করছ, কর। কেবল, একটু বিবেচনা করে শাসন কর। তোমরা যেমন আছ, তেমনিই থাকবে। কারণ আমাকে এখন এল্‌ফ্‌ল্যাণ্ডের রাজা করে দেওয়া হয়েছে। কালই চলে যাব সেখানে। এখান থেকে কিছুই নেব না, কেবল—কেবল—" কথা শেষ না করে সিল্‌ভি আর ব্রুনোর মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। ওরা তখন দুপাশ থেকে জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে।

একটু ভাবলুতা এসে গিয়েছিল বোধ হয়, সেটকু সামলে নিয়ে তিনি সম্রাটের দিকে চেয়ে আবার বললেন, "নিজের আসনে গিয়ে বোস।" সম্রাট বসলে, ঘরের আর সকলেও যে যার জায়গায় বসল গিয়ে। এল্‌ফ্‌ল্যাণ্ডের রাজা আর তাঁর ছেলে-মেয়ে দুজনের জন্যও জায়গা করে দেওয়া হল। লর্ড চ্যান্সেলরকে আবার একবার উঠে ঘোষণা করতে হল, "এবার যার নামে আমাদের অভিনন্দন জানাবার কথা, তিনি হলেন —আরে, সে গেল কোথায়?" ভ্যাবাচাকা খেয়ে থেমে গেলেন তিনি।

হায় ভগবান! রাজকুমার আগাগের কথা এতক্ষণ খেয়ালই করে নি কেউ।

সম্রাট বললেন, "ওকে ভোজসভার খবরটা জানানো হয়েছিল নিশ্চয়ই?"

চ্যান্সেলর জবাব দিলেন, "অবশ্যই! খবর দেওয়াটা তো ওর খাস পরিচারকের কাজ।"

"ডেকে পাঠাও সেই খাস পরিচারককে", গম্ভীর স্বরে হুকুম দিলেন সম্রাট।

পরিচারক এগিয়ে এল সামনে। কাঁপা কাঁপা গলায় আমতা আমতা করে বললে, "আমি তো বিপুলার্ণবের কাছে খবর দিয়েছিলুম, হুজুর! আমি বক্তৃতা আর ভোজ, দুয়েরই কথা বলেছি—"

কথা শেষ করতে পারছে না দেখে সম্রাট আবার শুধালেন, "তার পর কী হল?"

উত্তর হল, "বিপুলার্ণব কৃপা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তার পর কৃপা করে আমার কান মলে দিলেন। বিপুলার্ণব আরো বেশি করে কৃপা দেখিয়ে বললেন, 'ও-সব সভা-টভার ধার ধারি না!' "

সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেন, "মহামহিম বিপুলার্ণবকে দেখে তোমার কী ধারণা হল?"

"আমার ধারণা হল, তিনি যেন আরো—"

"আরো কী?"

সবাই এর উত্তর শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

"আরো তিরিক্ষি!"

"এক্ষুনি ডেকে পাঠাও তাকে!" সম্রাটের এই হুকুম পেয়েই তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল পরিচারক। এল্‌ফ্‌ল্যাণ্ড, অর্থাৎ ক্ষুদে পরীদের দেশের রাজা আপন মনেই বলে উঠলেন, "লাভ নেই, কোনো ফল হবে না আর। ভালোবাসা নেই, মনে এক ফোঁটাও ভালোবাসা নেই ওর!"

ফ্যাকাসে মুখে, কাঁপতে কাঁপতে বোবার মতন ফিরে এল পরিচারক।

"কী হল? রাজকুমার এলেন না যে?" গর্জে উঠলেন সম্রাট।

পরিচারক বললে, "দয়া করে শুনুন, মহারাজ! বিপুলার্ণব এখন—" আর একটা কথাও বেরল না তার মুখ থেকে।

এবার রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন স্বয়ং মহারানী। বললেন, "চলো,

নিজেরা একবার গিয়ে দেখি। এগিয়ে চললেন তিনি। আর সবাইও হুড়োহুড়ি করতে লাগল দরজার দিকে।

চেয়ার থেকে টুক্ করে নেমে পড়ল ব্রুনো। "আমরাও কি যেতে পারি।" মহারাজ এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। কারণ প্রশ্নটা তাঁর কানেই যায় নি। প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন। প্রফেসর বলছিলেন, "ও বোধ হয় আগে থেকে কোনো কাজ হাতে নিয়ে মত্ত হয়ে আছে তাই আসতে পারে নি। এখন আপনার হুকুম পেয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে বেচারা।"

ব্রুনো বুঝতে পারলে না মানুষ কী করে কাঁটা হয়ে যেতে পারে। সুযোগ পেয়ে মহারাজের দিকে চেয়ে আবার বলল, "আমরাও দেখতে যেতে পারি?"

সম্মতি পেয়ে সিল্‌ভি আর ব্রুনো দুজনেই ছুটে বেরিয়ে গেল সরেজমিনে আগ্গাগকে দেখে আসতে। ফিরতেও দেরি হল না। কিন্তু ছুটে নয়, খুব ধীর পায়ে, আর থম্‌থমে মুখে।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন, "কী হল? রাজকুমারের খবর কী?"

প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে ব্রুনো জবাব দিলে, "আপনি যা বলেছিলেন, তাই।" বলে সিল্‌ভির দিকে চাইলে।

সিল্‌ভি জবাব দিলে, "কাঁটা।"

"কাঁটা মানে? আমি তো বলেছিলুম 'ভয়ে কাঁটা।' তার মানে কি সত্যিই কাঁটা?"

"কিন্তু সত্যিই তাই হয়ে গেছে আগ্গাগ। ভয়ে কি না জানি না, তবে কাঁটাই হয়ে গেছে সে। সর্বাঙ্গে কাঁটা।" জবাব দিলে সিল্‌ভি।

ব্রুনো তার সঙ্গে যোগ দিলে, "তার মানে, শজারু।"

আমরা সবাই তখন হুড়্‌মুড়্ করে হলঘর থেকে বেরিয়ে ছুটলুম সিঁড়ির দিকে। আমার দিকে অবশ্য কেউই লক্ষ্য করলে না। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ আমি জানি, এই ভোজসভার শুরু থেকেই আমি অদৃশ্য এদের কাছে, এমন-কি, সিল্‌ভি আর ব্রুনোর কাছেও।

রাজকুমার আগ্গাগের ঘর পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত চলন-পথ আর বারান্দা লোকে লোকারণ্য; গোলমালে কান পাতা দায়। রাজকুমারের ঘরের দরজাটা তিন-তিনটে জোয়ান লোক হাত দিয়ে চেপে

ধরে রেখেছে, কিন্তু পুরো বন্ধ করতে পারছে না, ভিতর থেকে বেশ বড়োসড় গোছের একটা জানোয়ার কেবলই বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্য ঠ্যালা মারছে। এইভাবে দরজাটা একবার একটু ফাঁক হতেই চোখে পড়ল একটা ক্ষ্যাপা বিকটাকার জানোয়ারের মুখ—তার চোখদুটো ভীষণ, দাঁতগুলো যেন ধারালো তলোয়ার। গলার আওয়াজও শোনা গেল—খানিকটা সিংহের গর্জন, খানিকটা ষাঁড়ের ডাক, আর মাঝে মাঝে কাকাতুয়ার তীক্ষ্ণ চীৎকারের মতো কর্কশ।

প্রফেসর উত্তেজিত। তড়্‌বড়্‌ করে বলে উঠলেন, "আওয়াজ শুনে তো কিছুই বোঝবার উপায় নেই।" তার পর দরজার গায়ে লেপটে-থাকা লোকগুলোকে জিগেস করলেন, "কোন জানোয়ার হে?" সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে জবাব এল, "শজারু! শজারু! রাজকুমার আগ্‌গাগ শজারু হয়ে গেছেন।"

প্রফেসর তাই শুনে হঠাৎ উল্‌সে উঠলে, "বাঃ, নতুন একটা জাতের জানোয়ারের সন্ধান পাওয়া গেল। ভাই দয়া করে আমাকে একবার ভেতরে যেতে দিন। এক্ষুনি ওর গায়ে একটা লেবেল সেঁটে দেওয়া দরকার।"

জবাবে সেই জোয়ান লোক তিনটে প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল, "হ্যাঁ, লেবেল মারবেন বৈকি! একবার গিয়ে দেখুন-না, টপ্‌ করে গিলে খেয়ে ফেলবে।"

ভীড় ঠেলে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন স্বয়ং সম্রাট। প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন, "লেবেল-টেবেল মাথায় থাক, প্রফেসর! বরং বলুন, কী করে ওকে সামলে রাখা যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর জবাব দিলেন, "বেশ বড়োসড় একটা খাঁচা; একটা বড়ো দেখে খাঁচা নিয়ে আসুন।" তার পর ভীড়ের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, "আনুন, খাঁচা আনুন। মজবুত লোহার শিক লাগানো, আর খাঁচা-কলের মতো একটা দরজা যেন থাকে; ওপরে তোলা যায়, আবার ঝপ্‌ করে নামিয়ে দেওয়া যায়! এই ধরনের খাঁচা কারো কাছে আছে?"

এমন একটা বস্তু কারো কাছে সাধারণত থাকাটাই অস্বাভাবিক; তবু, দেখা গেল কে যেন একজন খানিকক্ষণের মধ্যেই এনে হাজির করে ফেলল একটা বড়ো গোছের খাঁচা। খাঁচাটা—আশ্চর্যের ব্যাপার—বারান্দারই এককোণে পড়ে ছিল।

"খাঁচার মুখটা খোলা দরজার সঙ্গে সেঁটে ধরো। তার পর দরজাটা ওপরে উঠিয়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হল।

"এবার বেশ কয়েকটা চাদর চাই!" চীৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, "এবার একটা আশ্চর্য পরীক্ষা করব।"

দেখা গেল, একগাদা চাদর ডাঁই করে রাখা রয়েছে দরজার পাশেই। প্রফেসরের কথা শেষ হতে না-হতেই বেশ কয়েকজনে একটা করে চাদর নিয়ে খুলে মেলে ধরল দুহাত দিয়ে—চারি দিকে বেশ একটা ঘেরা পর্দার মতো ব্যাপার হয়ে গেল। প্রফেসর তাদের এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাতে, ঘরের দরজা আর খাঁচার দরজার দুপাশে বেশ একটা অন্ধকার আড়াল তৈরি হয়ে গেল।

"এবার ঘরের দরজা খুলে দাও!" প্রফেসরের এ হুকুমটা তামিল করা মোটেই কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। জোয়ান লোক তিনটে চট্ করে দরজার পাশে সরে দাঁড়াতেই, ধড়াম্ করে দরজা গেল হাট হয়ে খুলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক জানোয়ারটা ইঞ্জিনের সীটের মতো তীব্র আওয়াজ তুলে খাঁচার মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

"এবার খাঁচার দরজাটা নামিয়ে দাও!" বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ। খাঁচার ভিতর সেই বিরাট শজারুটাকে আটকে পড়তে দেখে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

খুশিতে ছেলেমানুষের মতো দুহাত ঘষতে লাগলেন প্রফেসর "সফল আমার পরীক্ষা। এখন বাকি রইল শুধু ওকে খাওয়ানোর কাজটা—দিনে তিনবার—গাজর কুচি আর—"

"থাক, এখুনি ওর খাবার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, প্রফেসর!" সম্রাট বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। "চলুন, আমরা আবার ভোজসভায় ফিরে গিয়ে বসি। দাদা, তুমি আগে আগে চল!"

সিল্‌ভি আর ব্রুনোকে দুপাশে নিয়ে চললেন সেই বৃদ্ধ সকলের আগে আগে, পিছনে সার বেঁধে সবাই। হলঘরে গিয়ে ব্রুনোর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "ভালোবাসাহীন জীবনের পরিণাম কী, দেখলে তো?" জবাবে ব্রুনো বললে, "আমি তো বরাবরই সিল্‌ভিকে ভালোবাসি; কাজেই আমার গায়ে কক্ষনোই কাঁটা গজাবে না। আমি কক্ষনো তিলিক্কি হব না।"

ব্রুনোর কথার মধ্যে থেকে 'কাঁটা' শব্দটাই কেবল কানে গেছে প্রফেসরের। তাই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, কাঁটা তো বটেই, যাকে বলা যায় কণ্টকিত একেবারে। তবু, রাজবংশের অবতংশ তো ? খাওয়া-দাওয়া শেষ হলেই আমি একটা কিছু উপহার নিয়ে যাব রাজকুমার আগ্গাগের কাছে, একটু সান্ত্বনা দেওয়া আর কি। খাঁচার মধ্যে থাকা তো, নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে !"

"জন্মদিনের উপহার হিসেবে কী দেবেন বলে মনে করেন ?" ব্রুনো প্রশ্ন করলে।

"এক ডিশ কুচোনো গাজর। জন্মদিনের উপহার দিতে গেলে আমি কেবলই একটা ব্যাপার খেয়াল রাখি, সেটা হল খরচের কথা ; মানে যত সস্তায় সারা যায়। এতে করে, আমার ধারণা, বছরে কিছু না-হোক, পাউণ্ড চল্লিশেক আমার বাঁচে—ওফ্, আবার আমার সেই পুরনো ঝামেলাটা—"

আশঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সিল্‌ভি, "কী ঝামেলা ?"

কোঁকাতে কোঁকাতে প্রফেসর বললেন, "সেই পুরনো আপদ আমার ! বাতের ব্যথা। একটু শুয়ে থাকি বরং।" কোঁকাতে কোঁকাতেই চলে গেলেন তিনি।

পরীর দেশের রাজা প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "খুব শিগ্‌গিরই ঠিক হয়ে যাবে।" তার পর সম্রাটের দিকে ফিরে বললেন, "ভাই ! আজ রাত্তিরে তোমার সঙ্গে কিছু কাজের কথা আছে। তোমার গৃহিনী-ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করুন, চল আমরা যাই। হাত ধরাধরি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুজনে।

সম্রাজ্ঞী দেখলেন, ছেলে-মেয়ে দুজন কেমন মুষড়ে পড়েছে। "আহা, বেচারা প্রফেসর ! বড়ো কষ্ট পাচ্ছে গো !" এ ছাড়া মুখে আর কথা নেই। শুনতে শুনতে শেষপর্যন্ত বলেই ফেললেন তিনি, "চল, ওঁকে দেখে আসি।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন ওদের দিকে। সিল্‌ভি আর ব্রুনো হাত ধরলে। এগিয়ে চলল প্রফেসরের ঘরের দিকে। আমিও চললুম সঙ্গে সঙ্গে। গিয়ে দেখি, সোফার ওপর কম্বল জড়িয়ে শুয়ে রয়েছেন ; শুয়ে শুয়ে হাতে লেখা কী একটা রচনা পড়ছেন।

সামনে ঝুঁকে সম্রাজ্ঞী জিগেস করলেন, "এখন কেমন আছেন, প্রফেসর ?"

মুখ তুলে ম্লান হাসলেন প্রফেসর। "আগের মতোই আপনাদের প্রতি একান্ত অনুগত, মহারানী। আমার সবটাই কেবল আনুগত্যে ভরা—কেবল ঐ বাতটা ছাড়া।"

প্রফেসরের কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় জল এসে গেল সম্রাজ্ঞীর চোখে।

মিষ্টি গলায় সিল্‌ভি বললে, "আপনাকে আমরা সমুদ্রের ধারে কোথায় নিয়ে যাব, চলুন। সমুদ্রের কী মহিমা!"

"পাহাড় আরো সুন্দর!" ব্রুনো ফুট্ কাটলে।

"সমুদ্রের মধ্যে মহিমার কী আছে?" প্রফেসর বলে উঠলেন। আরে বাবা, একটা চায়ের কাপের মধ্যেই তো সুমুদ্দুরকে ভরে রাখা যায়।"

"খানিকটা।" সিল্‌ভি শুধরে দিলে।

"আহা, নাহয় বেশি করে কাপ লাগবে; তা হলে তো সুমুদ্দুরে সবটাই ধরে যাবে, না কী? তা হলে আর মহিমাটা কী হল? আর ঐ পাহাড়ের কথা যে বললে, সেই-বা কী এমন? কয়েকটা ঠ্যালা-গাড়ি হলেই তো পুরো একখানা পাহাড় বয়ে আনা যায়, মানে, বেশ কয়েক বছর ধরে আনা-নেওয়া করলে অবশ্য।"

সিল্‌ভি বললে, "ঠ্যালা গাড়ির ওপর টুকরো পাহাড়ে অবশ্য কোনো মহিমাই থাকে না।"

ব্রুনো ফুট্ কাটলে, "কিন্তু আবার সব টুকরোগুলোকে এক করে ফেললেই—"

প্রফেসর বলে উঠলেন, "বড়ো হলে বুঝবে, এক-একটা টুকরো জুড়ে জুড়ে গোটা পাহাড় বানানো অত সোজা নয়। যত দিন বাঁচবে, ততদিন নতুন নতুন জিনিস শিখবে।"

"হয়তো নয়। কিন্তু ঠিক আগের মতোই যে দেখতে হবে, তারই-বা দরকার কী? অন্যরকম হলেই-বা?" ব্রুনো বললে। "ধরুন, আমি বাঁচব, আর সিল্‌ভি শিখবে। তা হলে কেমন হয়?"

সিল্‌ভি বললে, "বেঁচে না-থাকলে শিখব কী করে?"

ব্রুনো বললে, "না-শিখে আমি যেমন বেঁচে আছি?"

প্রফেসর বললেন, "আমি, মানে, বলতে চাইছিলুম যে, তোমরা তো জানো যে, তোমরা সব-কিছু জানো না!"

ব্রুনো বললে, "এ আবার কী কথা। আমরা যা জানি, তা তো সবই

জানি। কত কী জানি। যেগুলো জানা নেই, সেইগুলোই কেবল জানি না। সেগুলো সব সিল্‌ভি জানে!"

লম্বা নিশ্বাস ফেলে হাল ছাড়লে প্রফেসর। বললেন, "বুজাম কাকে বলে জানো?"

ব্রুনো কী একটা অদ্ভুত জবাব দিতে যাচ্ছিল, প্রফেসর আবার কথা আরম্ভ করলেন, "একদা এক বুজাম ছিল।" তার পরই হঠাৎ থেমে গেলেন। খানিক বাদে আবার বললেন, "গল্পের বাকিটা মনে নেই। গল্পের একটা নীতি-উপদেশও ছিল। মুশকিল হচ্ছে, সেটাও বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছি।"

ব্রুনো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি একটা গল্প বলতে পারি। একদা এক পঙ্গপাল আর এক ম্যাগ্‌পাই পাখি বাস করত, আর বাস করত এক ইঞ্জিন-ড্রাইভার। এর নীতি-উপদেশ হল, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা দরকার!"

বেশ ভুরু কুঁচকেই সিল্‌ভি বলে উঠল, "মোটেই কিছু শোনাবার মতো গল্প নয়। তা ছাড়া, এত তাড়াতাড়ি নীতি-উপদেশ হয় নাকি?"

প্রফেসর বললেন, "গল্পটা বানালে কবে? গত সপ্তাহে?"

"না।" জবাব দিলে ব্রুনো। "আরো কম দিন আগে। আন্দাজ করে বলুন আবার।"

"আন্দজ আর কী করব। তুমিই বল-না!"

"আসলে পুরোটা বানানোই হয় নি এখনো! তবে, আর-একখানা গল্প পুরোটাই বানানো হয়ে গেছে। বলব?"

"যদি সত্যিই বানানো হয়ে গিয়ে থাকে, বলতে পার।" সিল্‌ভি বললে। "আর, এবারে নীতি-উপদেশটা যেন হয়—"একবার না-পারিলে দেখ শতবার।"

"না।" বেশ গম্ভীর গলায় জবাব দিলে ব্রুনো। "নীতি-উপদেশটা আসলে হল, "একবারের বেশি চেষ্টা করার দরকার নেই! একদা একজন চীনেমাটির পুতুল ছিল, তাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত। দাঁড়িয়েই থাকত। হঠাৎ একদিন টাল খেয়ে পড়ে গেল. কিন্তু কিছু হল না। তার পর আবার দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু দুবার চেষ্টা করতেই হল মুশকিল। এবার যে পড়ল, তাতে বেশ খানিকটা চটা উঠে গেল তার গা থেকে!"

সম্রাজ্ঞী জিগেস করলেন, "কিন্তু প্রথমবার পড়ার পর, তাকের ওপর উঠল কী করে?"

"আমিই তুলে রেখেছিলুম। বিজয় গর্বে জবাব দিলে ব্রুনো।

প্রফেসর বললেন, "আবার কেন পড়ল, সেটাও তোমার জানার কথা। তুমিই ঠেলে দিয়েছিলে মনে হচ্ছে।"

ব্রুনো খুব গম্ভীর মুখ করে জবাব দিলে, "বেশি জোরে অবশ্য ঠেলি নি!"

ইতিমধ্যে পরীর দেশের রাজা কখন এসে ঢুকেছেন প্রফেসরের ঘরে। বললেন, "এসো গো, শোবার আগে তোমাদের সঙ্গে একটু গল্পগাছা করি।" সিল্‌ভি আর ব্রুনো ওঁর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েই, ফিরে এল আবার।

প্রফেসরের হাত ধরে বললে ব্রুনো, "গুড্‌ নাইট, প্রফেসর।" সিল্‌ভি নিচু হয়ে তাঁর কপালে ছোট্টো করে একটু চুমু খেলে।

ওদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে প্রফেসর বললেন, "গুড্‌ নাইট। এবার শুতে যাও তোমরা, আমি বসে বসে পুরনো কথা ভাবতে থাকি।"

এবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

"আরে! একটা দুম্‌ দুম্‌ শব্দ হচ্ছে না, সিল্‌ভি?" কান পেতে শোনা গেল, ব্রুনোর কথাই ঠিক, কোথাও যেন কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে।

একটু শঙ্কিত কণ্ঠে সিল্‌ভি জবাব দিলে, "সেই সজারুটা দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে না তো!"

"তা হলে আর দেরি করে কী হবে, চল, দেখিগে যাই!" তড়্‌বড়্‌ করে বলে উঠল ব্রুনো।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু থেকে প্রাণে

দরজায় সেই ধাক্কা মারার শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল; শেষপর্যন্ত বেশ কাছেই কোনো একটা দরজা খোলার শব্দও পেলুম। আমার বাসা-বাড়ির কর্ত্রীর বিনীত কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, "মনে হল, যেন দরজায় টোকার শব্দ পেয়ে আপনি আমায় ঘরে ঢুকতে বললেন— বললেন তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসুন। কী ব্যাপার?" চট্‌কা ঝেড়ে উত্তর দিলুম আমি।

"যে ছেলেটা রোজ রুটি দিয়ে যায়, সে একটা ছোটো কাগজ দিয়ে গেছে—কোনো খবর পাঠিয়েছেন কেউ। বললে, লেডি মিউরিয়েলদের বাড়ির কাছ দিয়ে যখন আসছিল, তখন সেই বাড়িরই কে যেন কাগজটা ওর হাতে দিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছে।"

কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখলুম পাঁচটি মাত্র শব্দ: "দয়া করে অবিলম্বে আসুন, মিউরিয়েল।"

আতঙ্কে আমার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। মনে মনে ভাবলুম, মিউরিয়েলের বাবা নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খুব। হয়তো মারাত্মক অসুখ। কোনোরকমে পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলুম।

যখন বেরুচ্ছি, বাসার কর্ত্রী উৎকণ্ঠিত স্বরে জিগেস করলেন,

"কোনো খারাপ খবর নয় তো? ছেলেটি তো বললে কে যেন হঠাৎ এসে পড়েছেন ওঁদের বাড়িতে—"

"সেইরকমই কিছু হবে বোধ হয়।" মুখে বললুম বটে, কিন্তু আশঙ্কাটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলুম না। অবশ্য ওদের বাড়িতে পৌঁছে খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল; সদর ঘরে দেখলুম কিছু মাল-পত্র পড়ে আছে এককোণে, গায়ে নামের টিকিট ঝুলছে—'ই. এল.'।

'ও, তা হলে এরিক লিণ্ডন এসেছে!' নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে আশ্বস্তও হলুম যেমন, তেমনি একটু বিরক্তও লাগল। 'আবার সেই এরিক! তার জন্যে আমায় ডেকে পাঠাবার কী ছিল?'

চলন-পথেই লেডি মিউরিয়েলের সঙ্গে দেখা। চোখে তার উজ্জ্বল দীপ্তি—আনন্দের। ফিস্‌ফিসে গলায় বললে, "একটা খবর শুনলে আপনি চমকে যাবেন!"

মনের তিক্ততা যথাসম্ভব গোপন করার চেষ্টা করে বললুম, "এরিক লিণ্ডন এসেছে তো?" মনে মনে বললুম, 'কারো সর্বনাশ, কারো পোয়া মাস!' বুঝি নি, মিউরিয়েলকে কতখানি ভুল বুঝেছিলুম তখন।

"না, না, শুধু তাই নয়!" ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল মিউরিয়েল, "এরিক এসেছে, ঠিকই, কিন্তু—" গলাটা কেঁপে উঠল ওর, "—সেই সঙ্গে আরো একজন!"

আর কোনো প্রশ্ন না করে এগিয়ে চললুম তার সঙ্গে। ঘরে ঢুকলুম।

খাটের ওপর শুয়ে রয়েছে সে—ফ্যাকাসে, ক্ষীণ—আগের চেহারার যেন একটা ছায়া—আমার পুরনো বন্ধু। মৃত্যুর যবনিকা সরিয়ে ফিরে এসেছে আর্থার।

"আর্থার!" প্রবল আবেগে আর কোনো কথা বেরুল না আমার মুখ থেকে।

"হ্যাঁ, ভাই, আবার ফিরে এলুম!" ম্লান হেসে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলে সে। হাত ধরলুম তার। এরিকের দিকে ইঙ্গিত করে আর্থার বললে, "ও-ই আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। ও-ই ফিরিয়ে এনেছে আমায়। ঈশ্বরের পর, ওকেই ধন্যবাদ দিতে হয়।"

চুপচাপ শেকহ্যাণ্ড করলুম এরিক আর মিউরিয়েলের বাবার সঙ্গে। তার পর ইঙ্গিতে প্রস্তাব করলুম একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াবার, যাতে

অসুস্থ আর্থারের শান্তিভঙ্গ না হয়। সে তখন তার স্ত্রী মিউরিয়েলের হাতখানি পরম পরিতৃপ্তিতে ধরে রয়েছে নিজের দুর্বল হাতে—দৃষ্টিতে ভালোবাসার স্থির, স্নিগ্ধ আলো।

চাপা স্বরে এরিক বলতে লাগল, "কাল পর্যন্ত বেশ ঘোরের মধ্যে ছিল, ভুল বকছিল। আজও কয়েকবার ঠিক স্বাভাবিক বা সচেতন অবস্থায় ছিল না। কিন্তু মিউরিয়েলকে দেখবার পর থেকে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে ও।" তার পর এরিক আরো অনেক কথা বললে। বলবার সময়ে নিজের আবেগ চেপে রাখার জন্য যথাসাধ্য সহজভাবেই উচ্চারণ করতে লাগল কথাগুলো—আমি তো জানি, বড়ো চাপা স্বভাবের মানুষ সে। বললে, কেমন করে সে বার বার অনুমতি চেয়েছে এলভেস্টন গ্রামের কাছাকাছি সেই মহামারী অধ্যুষিত ধীবর-পল্লীতে গিয়ে দুর্গত মানুষের সেবা করতে। আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল 'বিশেষ একজনের' সন্ধান করা; আশা ছিল, সন্ধান পেলে তাকে হয়তো সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা করতে পারবে। আশা ছিল, চিকিৎসকরা তাকে মৃত্যু-পথযাত্রী ভেবে ছেড়ে চলে গেলেও, হাসপাতালে পৌঁছে দিলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। এ-সবই তার অসম্ভব প্রত্যাশা, তবু হাল ছাড়ে নি সে। আরো বললে, প্রথম যখন খুঁজে পেলে সে আর্থারকে, অচেনা ভেবে কেমন করে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছিল—তার অসুস্থ কঙ্কালসার শরীরে পরিচিত চেহারার প্রায় কোনো লক্ষণই খুঁজে পায় নি তখন। পরে, আন্দাজে চিনতে পেরে সেই মুমূর্ষু দেহটিকে সযত্নে নিয়ে আসে হাসপাতালে। মাসখানেক পর চেনবার মতো চেহারা ফিরে পায় আর্থার। ডাক্তার বলেছিলেন, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার এই আশ্চর্য ঘটনার কথা যেন প্রকাশ না-করা হয় আর্থারের কাছে, তাতে সে মারাত্মক মানসিক আঘাত পেতে পারে। দিনের পর দিন ছায়ার মতো আর্থারের রোগশয্যার পাশে বসে পরিচর্যা করেছে এরিক, অথচ একবারও জানতে দেয় নি যে, সেই অসংখ্য মৃত এবং মুমূর্ষুদের মাঝখান থেকে সেই উদ্ধার করে এনেছে ওকে, জানতে দেয় নি আর্থারের জন্যই দিন-রাত বসে থেকেছে সে হাসপাতালে।

সব শোনার পর মনে মনে ভাবলুম, 'আশ্চর্য! এই এরিক-ই ছিল আর্থারের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই আর্থারই এরিককে নিরাশ করে পত্নীত্বে বরণ করেছিল লেডি মিউরিয়েলকে!'

খোলা জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে মিউরিয়েল বললে, "সূর্য অস্ত যাচ্ছে ; পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন একবার! কী অপূর্ব লালিমা। কালকের দিনটা খুব ভালো দিন হবে— ।" ওর অনুসরণ করে আমরাও জানালার কাছাকাছি একজায়গায় জড়ো হয়ে নিরালায় চাপা গলায় কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময়ে অসুস্থ অর্থারের গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে ঘুরে তাকালুম। বিড়্‌বিড়্‌ করে কী বলছে আর্থার। ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

"আবার ভুল বকছে!" বলতে বলতে আর্থারের বিছানার পাশে ফিরে গেল মিউরিয়েল। আমরাও একটু কাছাকাছি এসে দাঁড়ালুম। না, ভুল বকছে না আর্থার। কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে অস্ফুট কণ্ঠে বলছে, "হে ঈশ্বর! যত কিছু মঙ্গল তুমি আমার করলে, তার বদলে কীই-বা আমি দিতে পারি তোমায়?—আমি—আমি" বাইবেলের উদ্ধৃতির বাকি কটা কথা মনে পড়ল না তার, আস্তে আস্তে চুপ করে গেল।

সেবাপরায়ণা স্ত্রীর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পরম আদরে আর্থারের শীর্ণ ফ্যাকাশে একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিলে মিউরিয়েল ; সেই নির্জীব হাতের ওপর সস্নেহে একটা চুম্বন এঁকে দিলে। ভেবে দেখলুম এই সুযোগে যদি আস্তে আস্তে এখান থেকে অলক্ষ্যে বিদায় নিই, তা হলে ওদের দুজনকে বিব্রত করতে হয় না। মিউরিয়েলের বাবা আর এরিকের দিকে বিদায়ের ইশারা জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে দেখলুম, এরিক পিছু পিছু আসছে। বাইরেও এল সে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

বাড়ির বাইরে বাগানে বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে এসে প্রশ্ন করলুম এরিককে, "বেঁচে উঠবে?"

"নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে!" বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিলে এরিক। "ডাক্তাররা সবাই সে বিষয়ে নিশ্চিত। তাঁদের মতে, এখন প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম এবং শান্তি আর পরিচর্যা। এখানে বিশ্রাম এবং শান্তি তো পাবেনই উনি। তা ছাড়া, আমার তো ধারণা—" (এইখানে বাকি কথাগুলো বলবার সময়ে খুব সহজ হবার চেষ্টা করলে সে) "—পরিচর্যারও কোনো ত্রুটি হবে না!"

"ঠিক কথা!" জবাবে বললুম আমি।

"ডাক্তারদের মতামতটা জানবার বড়ো দরকার ছিল। শোনবার

জন্যে আপনাকে এতদূর টেনে আনলুম, কিছু মনে করবেন না। অশেষ ধন্যবাদ!" হাত বাড়িয়ে দিলুম তার দিকে। করমর্দন করতে করতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে এরিক বললে, "হ্যাঁ, আরো একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। আপনি শুনলে খুশি হবেন যে, আমি—মানে, আমার মনের বা বলতে পারেন, মতের খানিকটা বদল হয়েছে। অবশ্য এ কথা বলছি না যে, আমি ক্রিশ্চিয়ান ধর্মবিশ্বাসকে পুরোপুরি মেনে নিতে পেরেছি—এখনো পর্যন্ত অন্তত তা পারি নি। কিন্তু এই-সব ঘটনাগুলো এমন আশ্চর্যভাবে ঘটে গেল! মিউরিয়েল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, জানেন তো। আমিও জানিয়েছিলাম। আর—আর—" এরিকের গলাটা ভেঙে এল এবার, "—আর, আর, এখন মনে হয়, একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি প্রার্থনা শোনেন! সে সম্বন্ধে আর এখন আমার কোনো দ্বিধা নেই।" এই পর্যন্ত বলে, আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে বাড়ির দিকে ফিরে গেল সে। এর আগে কখনো তাকে আবেগে এমন বিহ্বল হতে দেখি নি।

আসন্ন সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় ধীর পায়ে বাসার দিকে এগোতে লাগলাম আমি: মনে আমার নানানরকম সুখস্মৃতি। আনন্দ আর চরিতার্থতায় হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরপুর তখন। যা কিছু পাবার জন্য, যা কিছু ঘটার জন্য কামনা করেছি, প্রার্থনা করেছি, সবই যেন সফল হয়ে উঠল আজ।

বাসায় ফিরে যেরকম হালকা পায়ে উজ্জ্বল ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম, ব্রুনোর পক্ষেও বোধ হয় তা সম্ভব হত না। অন্ধকারেই আন্দাজে ঘরের দরজার কাছে এসে পৌঁছলাম। আলো জ্বালি নি এতক্ষণ। মনে আছে, বসবার ঘরে আলোটা জ্বেলে রেখেই বেরিয়েছিলুম।

কিন্তু ঘরে ঢুকে যে আলো আমি দেখতে পেলুম, তা সাধারণ বাতির আলো নয়। কোন জাদুস্পর্শের মায়ায় এক আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আমার সেই পরিচিত বসবার ঘরটিতে! জানালা দিয়ে কত উজ্জ্বল, কত সোনালি একটা আলোর আভা ঢুকে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে, যা এর আগে কোনোদিন আমার চোখে পড়ে নি। আর, সেই অপার্থিব আলোর মধ্যে আবছায়া দেখা যাচ্ছে তিনটি অবয়ব। ক্রমশই যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তারা—একজন গম্ভীর বয়স্ক ব্যক্তি, পরনে রাজার

পোশাক, আরাম-কেদারায় আড় হয়ে রয়েছেন ; তাঁর দুপাশে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে।

বয়স্ক লোকটি প্রশ্ন করলেন, "সেই পাথরের লকেটটা এখনো রেখেছ কি তোমার কাছে, মামণি ?"

"হ্যাঁ, রেখেছি বৈকি !" সাগ্রহে জবাব দিল সিল্‌ভি। "তোমার কি ধারণা, জীবনে কখনো ওটার কথা ভুলে যেতে বা হারিয়ে ফেলতে পারি ?" গলার ফিতেটা খুলে বাপের হাতে তুলে দিল সে।

লকেটটার দিকে চেয়ে তারিফের ভঙ্গিতে ব্রুনো বলে উঠল, "কী ঝক্‌ঝকে আর জ্বল্‌জ্বলে। মনে হচ্ছে যেন ছোট্টো একটা লাল তারা ! একবার হাতে নেব ?"

ঘাড় নাড়ল সিল্‌ভি। ব্রুনো সেই হীরের লকেটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল জানলার কাছে। আকাশ তখন নীল, তারায় তারায় ভরা। আকাশের দিকে সেই লাল পাথরটা তুলে ধরল সে। কিছুক্ষণ দেখল, তার পর খুব উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল ওদের কাছে। "দ্যাখ, দ্যাখ, সিল্‌ভি ! আকাশের দিকে তুলে ধরলে, পাথরটার ভেতর দিকে পরিষ্কার সব দেখা যায় রে ! আর, তখন দেখলুম, লাল নয়, কী ঝক্‌ঝকে নীল ! আর সেই লেখাগুলোও একদম পালটে গেছে, দেখলুম ! দ্যাখ, দ্যাখ !"

সিল্‌ভিও উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তখন। ভাই-বোনে মিলে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে তুলে ধরল পাথরটাকে। তার মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে পড়তে লাগল ভেতরের লেখাটা :

"সবাই সিল্‌ভিকে ভালোবাসবে !"

"তার মানে, এটা অন্য পাথর, সেই পাথরটা নয় ! মনে আছে, সিল্‌ভি, তুই দুটোর মধ্যে থেকে যেটা বেছে নিয়েছিলি ? এটা অন্যটা রে !"

ওর কাছ থেকে পাথরটা চেয়ে নিলে সিল্‌ভি। একটু থতমত খেয়ে পাথরটাকে আকাশের দিকে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল বারবার। তার পর বললে, "একদিক লাল, আর একদিক নীল ! আশ্চর্য ! আমি একটাকেই দুটো পাথর ভেবেছিলুম, বাবা !" তার পর বাবার হাতে পাথরটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "এখন বেশ বুঝতে পারছি, গোড়া থেকেই ঐ একটা পাথরই ছিল, আমরা দুটো মনে করে এসেছি !"

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "ঠিক বলেছ, মা, একই পাথর। তবে, তোমার নির্বাচন ঠিকই হয়েছিল।" লকেট লাগানো ফিতেটা আবার তিনি পরিয়ে দিলেন সিল্‌ভির গলায়।

ডিঙি মেরে উঁচু হয়ে সেই পাথর—লাল তারার মতো পাথরটাকে একটু চুমু খেয়ে ব্রুনো বিড়্‌বিড়্‌ করে বলে উঠল, "সিল্‌ভি সবাইকে ভালোবাসবে—সবাই ভালোবাসবে সিল্‌ভিকে!" তার পর বললে, "যখন পাথরটাকেই দেখবে, তখন দেখবে সূর্যের মতো লাল—আর, যখন পাথরটার মধ্যে দিয়ে দেখবে, তখন আকাশের মতো শান্ত আর নীল!"

আবেশভরা গলায় সিল্‌ভি বললে, "ঈশ্বরের আকাশ!"

"ঈশ্বরের আকাশ!" পুনরাবৃত্তি করলে ব্রুনো। রাতের আকাশের দিকে চেয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। "কিন্তু, সিল্‌ভি, আকাশ কেমন করে এমন সুন্দর নীল হয়? কিসের গুণে?"

উত্তর দেবার জন্য সিল্‌ভির ঠোঁটদুটো একটু নড়ে উঠতে দেখলুম, কিন্তু ওর গলার স্বর বড়ো মৃদু, বড়ো দূরাগত মনে হতে লাগল। সমস্ত দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে ততক্ষণে ঝাপসা হয়ে যেতে আরম্ভ হয়েছে; তবু কেন যেন মনে হয় সেই সরল সোনালি চোখের দৃষ্টি মেলে নীল আকাশের দিকে যে মেয়েটি আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, সে সিল্‌ভি নয়, সে কোনো এক দেবদূত; খুব মৃদু যে কথাটা তার পর আমার কানে এল ব্রুনোর শেষ প্রশ্নের জবাবের মতো, তাও সিল্‌ভির মুখ থেকে নয়, কোনো এক দেবদূতের! সে জবাব আজও আমার কানে বাজে:

"ভালোবাসা।"

—

১৮৬৭ সালে রুশ-ভ্রমণের দিন-পঞ্জিকা

জুলাই ১২, শুক্রবার—সুলতান আর আমি প্রায় একই সময়ে লণ্ডনে পৌঁচেছিলাম, তবে দুজন দু জায়গায়। আমি পৌঁচেছিলাম প্যাডিংটন রেল স্টেশনে আর সে এসেছিল চ্যারিং ক্রসে। অবিশ্যি এটুকু মানতেই হবে যে ঐ শেষের জায়গাটিতে ভিড় হয়েছিল বেশি। তৃতীয় একটা আকর্ষণীয় জায়গা ছিল ম্যান্শন হাউস, সেখানে বেল্জিয়ান স্বেচ্ছা-সেবকদের জন্য একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল আর সেখান থেকে সন্ধ্যা ছটার পর থেকে, সারি সারি বেল্জিয়ান বীর বোঝাই অমনিবাস, একটার পর একটা ক্রমাগত পুবমুখো যাত্রা করছিল। এর ফলে আমার কেনা-কাটা করতে বেজায় দেরি হয়ে গেল, রাত সাড়ে আটটার আগে চ্যারিং ক্রস্ থেকে ডোভার মুখো রওনাই হতে পারলাম না ; অবশেষে 'লর্ড ওয়ার্ডেন' নামক হোটেলে পৌঁছে দেখি লিডন সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে।

জুলাই ১৩, শনিবার—যেমন কথা ছিল সকাল আটটায় ব্রেক্ফাস্ট খাওয়া হল—অন্তত ঠিক ঐ সময়ে টেবিলে গিয়ে বসে রুটি-মাখন চিবুতে লাগলাম, যতক্ষণ-না চপ্গুলো তৈরি হয়। সে মহা ব্যাপারটি হতে সাড়ে আটটা বাজল। ততক্ষণ কি না করলাম, ভ্রাম্যমান ওয়েটারদের কাছে করুণভাবে আপীল করলেই, ওরাও সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, "এই যে এল বলে!" মাঝে মাঝে কড়া সুরে জবাবদিহি করলে, আরেকটু আহত কণ্ঠে ওরাও বলতে লাগল, "এই যে এল বলে!" শেষটা বারবার ঐরকম আবেদন করার ফলেই হয়তো, যে-যার নিজের আস্তানায় গিয়ে ডুলি, তাক, বাসন-ঢাকার পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে রইল, তবু ছাই চপের দেখা

নেই! আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ওয়েটারদের যতরকম গুণ থাকতে পারে, তার মধ্যে ওদের ঐ গা-ঢাকা দেবার স্বভাবটিই হল সব চাইতে কম বাঞ্ছনীয়! তার পর আমি দুটি মহান প্রস্তাব করেছিলাম—উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে দুটিই অবশ্য বাতিল হয়ে গেছিল—প্রথম প্রস্তাব, ঐ টেবিল পরিত্যাগ করা হোক এবং চপের দাম দিতে অস্বীকার করা হোক। দ্বিতীয় প্রস্তাব, হোটেলের মালিককে খুঁজে বের করে সব ওয়েটারদের বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক অভিযোগ আনা হোক। বলা বাহুল্য তার ফলে চপ পাওয়া না গেলেও, একটা হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি হত!

সে যাই হোক গে, বেলা নটার মধ্যে জাহাজ চাপা গেল, তার পর দুটি গোটা ট্রেনের ভিতরকার যাবতীয় যাত্রী ও দ্রব্যাদি খালি করে, জাহাজে চাপিয়ে, ডেকের ওপর মিশরের বড়ো পিরামিডের একটা সার্থক নকল সৃষ্টি করা হল; সেই কৌতূহলোদ্দীপক কীর্তিতে আমরাও সগর্বে দুটি সুটকেস জুগিয়েছিলাম। তার পর জাহাজ ছাড়ল। সেই নব্বুই মিনিটের শান্তিপূর্ণ সাগর পার হবার সময় যাত্রীদের কারো কারো অমানুষিক কষ্টের বর্ণনা দিতে আমার কলম একেবারে নারাজ। আমার নিজের মনে হল—এরই জন্য কি এতগুলো টাকা খরচ করলাম? প্রায় সারা পথই বেজায় বৃষ্টি পড়ল; বড়োমানুষি করে একটা আলাদা ক্যাবিন ভাড়া করেছিলাম, তার ভিতরটা দেখলাম ভারি আরামের, ভারি সংরক্ষিত আর বাইরের ডেকটার মতোই খোলা মেলা। ক্যালেতে নেমে দেখি অমায়িক চেহারার স্থানীয় লোকেদের সেই চেনা ভিড়, তারা নানারকম সাহায্য ও পরামর্শ দিতে উদ্‌গ্রীব। তাদের সব কথার আমার একটিমাত্র উত্তর হল, "নঁ!" অর্থাৎ না। হয়তো উত্তরটা সব ক্ষেত্রে ঠিক প্রয়োজ্য ছিল না, কিন্তু ফল ভালোই হল, সবাই বিদায় হল। আমার নঁ শব্দের প্রতিধ্বনি করতে করতে সবাই আমাদের ছেড়ে গেল, সুরগুলো নানারকম হলেও, সমান বিরক্তিব্যঞ্জক। লিডন আমাদের মালপত্রের একটা বন্দোবস্ত করে ফেলবার পর বাজারের মধ্যে একটু বেড়ালাম, মহিলাদের মাথায় সাদা টুপি থাকাতে বাজারটা সাদায় সাদা আর কাংস্য-কণ্ঠে সরগরম।

ব্রাসেল্‌স্ যাত্রাটা ছিল ঘটনাশূন্য, একঘেয়ে। পথে যেতে মাত্র দুটি দ্রষ্টব্য জিনিস চোখে পড়ল, সেন্ট ওমেরের মিনার আর টুর্ণের পাঁচ-চূড়োওয়ালা গির্জা। লিল্ থেকে টুর্ণে অবধি সহযাত্রী পাওয়া গেল এক পরিবারকে, ছয় বছরের আর চার বছরের দুটি ছেলেমেয়ে। ছোটোটা তো

সারা রাস্তা বকবক করে চলল, একবারও থামল না। আমি তার একটা ছবি এঁকে ফেললাম, পরিবারসুদ্ধ সবাই সেটাকে পরীক্ষা করল, ছবির বিষয়বস্তুটি মুক্তকণ্ঠে সমালোচনা এবং যদ্দূর বুঝলাম অনুমোদন করল। ওরা গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় ওর মা ওকে আমাদের 'বঁ সোয়ার' বলতে আর আদর খেতে পাঠিয়ে দিলেন।

বেলজিয়ান সীমান্তে বুঁদ্যা স্টেশনে আমাদের মালপত্র টেনে নামিয়ে, একবার উঁকি মেরে দেখে, আবার টেনে তুলে দেওয়া হল। কোনো খরচ লাগল না ; এই প্রথম ফী না দিয়েই একটা পরীক্ষা পাস করা গেল।

সেখান থেকে ব্রাসেল্‌স্‌ যেতে কয়েকজন জার্মান সহযাত্রী জুটল। এখানকার দৃশ্যপটে সব চাইতে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল গাছগুলোকে কেমন মাইলের পর মাইল লম্বা সারি দিয়ে পোঁতা হয়েছে। তার ওপর গাছগুলো সব এক দিকে বেঁকে থাকাতে, দেখাচ্ছিল যেন সমতল ভূমির ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা সারি বেঁধে ক্লান্ত সৈনিকরা ইদিক-উদিক চলেছে ; কেউ কেউ চৌকো ব্যূহ রচনা করেছে, কেউ-বা তৈরি হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে। তবে বেশির ভাগই যেন কোনো অদৃশ্য অশরীরী বোঝার ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, হতাশভাবে এগিয়ে চলেছে।

ব্রাসেল্‌সে আমরা হোটেল বেলভিউতে উঠেছিলাম। সেখানে সাদা-সিধে নৈশ-ভোজন সেরে—তাতে মাত্র সাতটি পদ ছিল—আমরা একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। জনসাধারণের জন্য একটা পার্ক থেকে বাজনা শুনতে পেয়ে, সেখানে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমরা এক ঘণ্টারও বেশি বসে বসে চমৎকার উচ্চাঙ্গের বাদ্য-সঙ্গীত শুনলাম। গাছতলায় ছোটো-ছোটো টেবিল ঘিরে শত শত লোক বসেছিল, সমস্ত জায়গাটা প্রদীপের আলোতে আলোকিত।

জুলাই ১৪, রবিবার—সকাল দশটায় সেন্ট গুদুলের গির্জায় গেছিলাম এটাই ব্রাসেল্‌সের সব চাইতে সুন্দর গির্জা! খুব একটা ভালো লাগল না, কারণ যদিও উপাসনায় যোগ দেবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, ভালো করে কিছু শোনাই যাচ্ছিল না, এখানে ওখানে দুটো-একটা কথা কানে যাচ্ছিল মাত্র ; তাছাড়া অনেক সময়ই দেখলাম দুটো অনুষ্ঠান একই সময়ে হচ্ছে, যেমন গায়করা যখন সমবেত কণ্ঠে ভজন গাইছে, পাদরি

তখন আলাদাভাবে তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন আর অন্যান্য পাদরিরা দল বেঁধে ক্ষুদে ক্ষুদে শোভাযাত্রা করে গিয়ে, বেদীর সামনে এক মুহূর্তের জন্য হাঁটু গেড়ে বসে, (অত অল্প সময়ের মধ্যে কেউ প্রার্থনা করতে পারে না) অমনি উঠে পড়ে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছিলেন। উপাসনার প্রধান জায়গাগুলো সম্পর্কে লোকে যাতে অবহিত হয়, তাই থেকে থেকে খন্‌খনে সুরে ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিল, যতক্ষণ ঘণ্টা বাজছিল তার শব্দের চোটে আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমাদের আশেপাশে যারা ছিল তারা কেউ কেউ আপন মনে প্রার্থনা করে চলেছিল। আমার পাশের লোকটির চেয়ার-টেয়ার না থাকাতে, মেঝের ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসে মালা জপছিল। কেউ কেউ শুধু তাকিয়ে দেখছিল আর সমস্তক্ষণ লোকে যাওয়া-আসা করছিল। আমি এদিকে যখনি কি ব্যাপার হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম, তখনি উপাসনায় যোগ দিচ্ছিলাম, কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যে লিডন প্রার্থনার বইতে ঠিক জায়গাগুলো খুঁজে দিলেও, কথাগুলো প্রায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এই উপাসনায় যে উপস্থিত উপাসকদের যোগ দেবার কথা সেটা বোঝা বাস্তবিকই মুশকিল ছিল—মনে হচ্ছিল তাদের করবার কিছু নেই, সবই তাদের হয়ে করে দেওয়া হচ্ছে।

বাদ্য-সঙ্গীতটি কিন্তু বড়োই সুন্দর আর ধূপাধার দোলানো দেখবার মতো জিনিস। লাল সাদা পোশাক পরা দুটি অল্পবয়সী ছেলে বেদীর সামনে সেই দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে, একসঙ্গে বাজনার তালে তালে ধূপাধার দোলাচ্ছিল।

এর পরের অনুষ্ঠানটি হয় বছরে মাত্র একবার। মস্ত বড়ো শোভাযাত্রা করে গির্জার পবিত্র প্রসাদ শহরময় ঘুরিয়ে আনা হয়। আমরা শোভাযাত্রার রওনা হওয়া দেখলাম, তার পর তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। ফিরতে লাগল এক ঘণ্টার বেশি। সবার আগে একদল ঘোড়সোয়ার। তার পর লম্বা এক লাইন ছোটো-ছোটো ছেলে, বেশির ভাগের লাল সাদা পোশাক, কারো কারো মাথায় কাগজের ফুলের মালা জড়ানো, হাতে নিশান, কারো হাতে রঙীন কাগজের কুচি দিয়ে ভরা টুকরি, কাগজগুলো বোধ হয় পথে ছড়ানো হয়—এদের পর লম্বা এক সারি ছোটো মেয়ে, পরনে সাদা পোশাক, মাথায় লম্বা সাদা ভেল্; তার পর গান গাইতে গাইতে অনেক পুরুষ ও পাদরি, তাদের পোশাক ভারি জমকালো, হাতে পতাকা; শোভাযাত্রার শেষের দিকের

পতাকাগুলো ক্রমে আরো বড়ো আরো জমকালো হয়ে উঠেছিল ; তার পর কুমারী মেরির বিশাল মূর্তি তাঁর কোলে শিশু যীশু—মূর্তির পায়ের নীচে মস্ত পাদপীঠ, গোলার্ধের আকার, তবে আরো চ্যাপ্টা, সেটি আবার নকল ফুল দিয়ে ঢাকা ; তার পর আরো পতাকা—তার পর চারটে ডাণ্ডার ওপর ধরা একটা চাঁদোয়া, তার তলায় পাদরিরা পবিত্র প্রসাদ নিয়ে চলেছেন। পাশ দিয়ে শোভাযাত্রা চলে যাবার সময় অনেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছিল। এমন জাঁকজমকের অনুষ্ঠান আমি এর আগে কখনো দেখি নি, দেখতে ভারি চমৎকার লাগছিল, তবে সবটাকেই বেজায় নাটকীয় আর অবাস্তব মনে হল। বেজায় ভিড়, কিন্তু বেশ সংযত—মনে হয় অনেক হাজার লোক জমেছিল।

বিকেলে লিডন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে গেল, আমি গ্রাঁদ্ প্লাস্ নামক জায়গাটিতে বেড়িয়ে এলাম, সুন্দর 'ওটেল দ্য ভিল্'টা ভালো করে দেখলাম। শোনা যায় এই স্কোয়ারটাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গথিক গৃহ-স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

জুলাই ১৫, সোমবার—সকাল সাড়ে নটায় কলোন যাত্রা, বেলা চারটেয় পৌঁছনো। পথে কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে নি। এখানে আমাদের মালপত্র আরেকবার পরীক্ষা করা হল, আগের চাইতেও নমোনম ভাবে, আমার সুটকেস্‌টা তো কেউ খুললই না। এখানকার বিখ্যাত গির্জায় এক ঘণ্টা কাটালাম। গির্জার বিষয়ে শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে আমি যত অপূর্ব সুন্দর গির্জা দেখেছি, কিম্বা কল্পনা করতে পারি, তার চাইতেও এ গির্জা সুন্দর। ভক্তির ভাবকে যদি কোনো বাস্তব রূপে ধরা যেত, এইরকম গির্জাতেই সেটা সম্ভব হত।

বিকেলে আবার বেড়াতে গেলাম, নদী পার হয়ে, অন্য তীর থেকে শহরটার অপরূপ দৃশ্য দেখলাম। তার আগে অতি উপাদেয় ডিনার খেয়েছিলাম, এ যাবৎ যত ডিনার ইত্যাদি খেয়েছি, সবই তাই। তার ওপর এক বোতল লাল পানীয়, সেটি পরিবেশন করবার সময় হাসিখুশি বেঁটে ওয়েটার বোতলটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বলেছিল, "এ জিনিসটা মনে হয় খুব ভালো।" কথাগুলি ঠিক। আমাদের হোটেলের নাম 'দু নর'।

জুলাই ১৬, মঙ্গলবার—অনেকগুলো গির্জা ঘুরে দেখলাম, ফলে কোনোটার সম্বন্ধেই মনে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা হল না। ঐ গির্জাগুলো হল 'সেন্ট উরসুলা ও এগারো হাজার কুমারীর গির্জা', সেখানে সামনে কাচ বাঁধানো আধারে তাঁদের হাড়গোড় রক্ষিত আছে, অবিশ্যি প্রায় কিছুই দেখা যায় না। আর দেখলাম সেন্ট জেরিয়নের মন্দির এবং আরো একটা যেখানে হাড়গোড় জমা করা আছে, তার ওপরে একটা অদ্ভুত দশ-কোণা গম্বুজ তাছাড়া যীশুর অ্যাপস্‌ল্‌ বা বিশেষ শিষ্যদের গির্জা আর সেন্ট পিটরের গির্জা, তার বেদীর ওপর রুবেন্সের আঁকা ক্রুশ-বিদ্ধ সেন্ট পিটরের ছবি আছে। এর কাছেই একটা বাড়িও দেখলাম, তার গায়ে একটা ফলকে লেখা যে ঐখানে রুবেন্স জন্মেছিলেন। তার পর 'সেন্ট মেরি ইন কাপটলিও'র গির্জা দেখলাম।

বেলা দেড়টায় লিডন সকলের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে গেল, আমি সেই সুযোগে অ্যাপস্‌ল্‌দের গির্জায় ফিরে গিয়ে একটা বিয়ে দেখে এলাম। অনেক লোক হয়েছিল, মেলা ছেলেপুলে, তারা ইচ্ছেমতো গির্জাঘরে ছুটোছুটি করছিল, তবে নিঃশব্দে, ইংরেজ ছেলেমেয়েদের মতো করে নয়। বিয়েবাড়ির লোকরা বেড়ার ভিতরে ঢুকে, খুচরা ডেস্কের পিছনে হাঁটু গেড়ে আগাগোড়া বসে রইল। যতদূর বুঝলাম কিছু প্রার্থনা ও প্রশ্নোত্তর দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। তার পর পুরোহিতমশাই আরাম করে বেদীতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাতের পুঁথিটা বন্ধ করে, লম্বা এক উপদেশ দিলেন, সেটি বোধ হয় মনগড়া। তার পর ওদের মাথার ওপর কি যেন নাড়লেন, দেখে মনে হল এক পাত্র জর্দান নদীর পবিত্র জল। তার পর একজন পাদরি একটা বই এনে, কালি-কলমসুদ্ধ বেদীর ওপর রাখলেন এবং পুরোহিতমশাই অনেকক্ষণ ধরে তাতে কি সব লিখলেন। এই সময় দুজন ভদ্রলোক উঠে এসে তাঁর কানে কানে কিছু বলতে লাগলেন, বোধ হয় তাঁরা বিয়ের সাক্ষী হয়ে নাম-ধাম লিখলেন। তার পর পুরোহিতমশাই বর ও কন্যাযাত্রীদের দিকে ফিরে মাথাটা একটু নিচু করলেন, ব্যস্‌, বিয়ে হয়ে গেল।

গির্জাগুলিতে ঘুরবার সময় একটা জিনিস খুব চোখে পড়েছিল, কত লোক ভিতরে গিয়ে নিজেদের মনে প্রার্থনা করছিল। একটা গির্জায় দেখলাম তিনজন মহিলা, তিনটি স্থানে একই সঙ্গে পাপ-স্বীকার করছে। মহিলাদের মুখ-হাত আড়াল করা ছিল আর পাদরিও নিজের মুখের সামনে

একটা রুমাল ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু পরদা-টরদার বালাই ছিল না। কত ছেলেপিলেও একা এসে প্রার্থনা করছে দেখে আশ্চর্য লাগল। কারো কারো সঙ্গে বই ছিল, তবে সকলের নয়। আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেদিকে অনেকে তাকিয়ে দেখছিল, তবে একটু পরেই আবার প্রার্থনায় মন দিচ্ছিল। তার পর একে একে উঠে বাইরে চলে যাচ্ছিল, মনে হল ওরা খুশিমতো গির্জায় যাওয়া-আসা করে। কোনো বয়স্ক পুরুষ কিম্বা কিশোরকে এ ভাবে প্রার্থনা করতে দেখলাম না, তবে ব্রাসেল্‌সে রবিবারের উপাসনায় অনেকে যোগ দিয়েছিল।

বিকেলে ক্যাথিড্রালের চুড়োয় উঠেছিলাম, সেখান থেকে শহরটাকে অপূর্ব দেখতে লাগছিল, রাশি রাশি সাদা দেয়াল, ছাই রঙের ছাদ আর মাইলের পর মাইল ধরে রাইন নদী বয়ে চলেছে। আমরা স্থির করেছিলাম রাতের গাড়িতে বার্লিন যেতে কেমন লাগে দেখব। তাই সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় গাড়িতে গিয়ে বসলাম, বার্লিন পৌঁছলাম পরদিন সকাল আটটায়। কামরার সীটগুলো টেনে একসঙ্গে জুড়ে বেশ বড়োসড় একটা খাট বানিয়ে ফেলা গেল, ইচ্ছে হলে বাতির ওপর সবুজ রেশমী ঘেরাটোপ টেনে কামরা অন্ধকার করার ব্যবস্থা ছিল। মোটের ওপর ভারি আরামের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, লিডন একটুও ঘুমোল না।

জুলাই ১৭, বুধবার—বার্লিনে নেমে একটা ঠিকে গাড়ি ডাকতে বললাম, তাকে ওরা বলে 'ড্রশ্‌কি', আমাদের 'হোটেল ডি রুশী'তে নিয়ে যাবে। ওরা আমাদের হাতে একটা নম্বর লেখা টিকিট দিল, গাড়ির আড্ডায় গিয়ে ঐ নম্বরের গাড়ি নিতে হবে। এ-সব নিয়ম ইংল্যাণ্ডে বেশি দিন চলত না। সেদিন এক সময় আমরা রাউখের তৈরি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের চমৎকার ঘোড়ায় চড়া মূর্তিটি দেখলাম, 'কিসের' বিখ্যাত 'অ্যামেজন ও বাঘ' দেখলাম আর তাড়াহুড়ো করে দুটি ছবির গ্যালারিও দেখলাম, সম্ভব হলে ও দুটিকে আরেকবার ভালো করে দেখতে হবে। সকলের সঙ্গে বসে বেলা তিনটেয় ডিনার খেলাম! বিশেষ দ্রষ্টব্য—'পোটাজ আ লা ফ্লামান্দ' মানে মটনের সুরুয়া। হাঁসের সঙ্গে চেরি খেতে হয়। খাবার মধ্যিখানে পরিষ্কার ছুরি-কাঁটা চাওয়াটা ভদ্রতা নয়।

সন্ধ্যায় ঘুরতে ঘুরতে দেখি সেন্ট পিটরের গির্জায় উপাসনা হচ্ছে।

ভিতরে ঢুকে মিনিট কুড়ি জর্মান ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতিতে, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করা উপদেশ-বাণী শুনলাম। তার পর দীর্ঘ এক মনগড়া প্রার্থনা এবং বাইবেল কথিত প্রার্থনা দিয়ে শেষ করে, পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেও উঠে দাঁড়াল, পুরোহিত দু হাত বাড়িয়ে সকলকে আশীর্বাদ করলেন—তার পর অর্গ্যান বেজে উঠল, পুরোহিত অন্তরালে গেলেন আর উপাসক-মণ্ডলী আবার বসে পড়ে লম্বা এবং সুরেলা একটা ভজন গাইল।

জুলাই ১৮, বৃহস্পতিবার—বড়ো ছবির গ্যালারিতে আবার গেলাম, এখানে ১২৪৩টি ছবি আছে, স্বনামধন্য চিত্র-সমালোচক ওয়েগেন ছবিগুলি সাজিয়েছেন। কিন্তু তাঁর তালিকায় ছবির মূল্যায়ন প্রায় কিছুই নেই, ছবিতে কি কি আছে শুধু সেই কথা বলা হয়েছে। বেশির ভাগ ছবিই নানান ধর্মীয় বিষয়ে, নানান কায়দায় আঁকা যীশু ও তাঁর মায়ের অনেকগুলি ছবি ; কতকগুলিতে সেন্ট সেব্যাস্টিয়নকেও দেখা যাচ্ছে, এরই মধ্যে তিনি তীর-বিদ্ধ হয়ে আছেন। কয়েকটি ছবিতে মেরি-মাতা যীশুকে মাটিতে নামিয়ে, তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছেন। একটি অপরূপ রঙীন ছবিতে দেখা যাচ্ছে যীশুর পিতা যোসেফ ঘুমিয়ে আছেন আর দেবদূত তাঁর কানে কানে কথা বলছে। বেবেলের মিনারের চমৎকার একটা ছবি আছে, তাতে হাজার হাজার মানুষ। আরেকটিতে ইডেন-উদ্যানে নানারকম পশুপাখির ভিড়। আরো চেনা ছবিও আছে, সেগুলির নকল দেখে দেখে লোকের কাছে খুবই চেনা হয়ে গেছে, যেমন সেন্ট অ্যান্টনির প্রলোভনের ছবি। ভ্যান ওয়েডেনের একসঙ্গে তিনটি ছবি দেখলাম, এর চাইতে ভালো 'ফিনিশ' আমি কোথাও দেখি নি। ছবিগুলির বিষয়বস্তু হল যীশুর মৃত্যুর পরের তিনটি দৃশ্য। একটি দৃশ্যে মা মেরি কাঁদছেন, প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু হল সযত্নে আঁকা একেকটি গোলার্ধ, কিম্বা তার চাইতেও বেশি, তাতে আলাদা করে আলো-ছায়া পড়েছে, মাটিতে একটা বই পড়ে আছে ; তার পৃষ্ঠাগুলো এলোমেলো ভাবে খুলে রয়েছে ; ঠিক যেখানে বই বন্ধ করবার 'ক্লাস্প' ঝুলে আছে, সেখানে পাতার ধারে ধারে তার ছায়া পড়েছে; ছায়াটা হয়তো এক ইঞ্চিও লম্বা নয়, তবু পাতা যেখানেই এতটুকু ফাঁক হয়ে আছে, সেখানেই নীচের পৃষ্ঠার ওপরেও ছায়া দেখা যাচ্ছে।

মোটের ওপর ছবিগুলি দেখে খুব একটা সৌন্দর্যের ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু একটু নজর করে দেখলে এমন একটিও ছবি খুঁজে পাওয়া দায়, যার অপরূপ কারিগরি দেখে আশ্চর্য হতে না হয়। এই গ্যালারিটার প্রতি সুবিচার করতে হলে, দিনের পর দিন ধরে খুঁটিয়ে দেখতে হয়।

সকলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সারার পর এমনি ঝেঁপে বৃষ্টি এল যে কাছাকাছি একটু ঘুরে বেড়ানোর বেশি কিছু করা গেল না, আমরা সেন্ট নিকোলাসের প্রাচীন গির্জা দেখে এলাম।

জুলাই ১৯, শুক্রবার—অ্যালার্ম ঘড়ির সাহায্যে ভোর সাড়ে ছটায় ওঠা গেল, সাড়ে সাতটার পরেই ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল। সকালে আবার সেন্ট নিকোলাস দেখে এলাম—সেখানে একটা নতুন জিনিস দেখলাম—প্রান্তে একটি থিলানওয়ালা ধনুকাকৃতি নিভৃত জায়গা, তাকে অ্যাপ্‌স্ বলে, তার বাইরে থাম দেওয়া যাবার পথ যাকে 'এইল' বলা হয়। মধ্যিখানে বেদী, তাকে ঘিরে থামের বৃত্ত, বেদীর পিছনে এক গাদা শ্বেতপাথরের কারুকার্য যেমন থাকে, তারও পিছনে বাইবেল বিষয়ক পুরনো ছবি দিয়ে ঢাকা একটা যবনিকা। প্রত্যেকটি ছবির উদ্দেশ্য কোনো মৃত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা করা। এখানে পুফেনডর্ফের সমাধিও দেখলাম।

গির্জা দেখে আমরা রাজপ্রাসাদে গেলাম, তাকে বলা হয় 'শ্লস্'। একদল দর্শনার্থীর সঙ্গে আমাদেরও একটার পর একটা জমকালো ঘর, মস্ত একটা গোল উপাসনা-ঘর ইত্যাদি দেখানো হল। লক্ষ্য করলাম যেখানেই একটুখানি গিল্টি ধরে, সেখানটাই গিল্টি করা। যে বিশাল সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢুকেছিলাম, তাতে কোনো ধাপ কাটা নেই, বরং একটা বাঁধানো পথ খানিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। অনেকটা হুইটবির কোনো কোনো রাস্তার মতো। ঘর দেখা আর পথ-প্রদর্শককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে পর, কেউ আমাদের দিকে আর নজর দিল না, যেমন করে পারি নিজেদের পথ খুঁজে, পিছন দিকের এক ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে, মেরামতের কাজে রত মিস্ত্রিদের ও তাদের বাল্‌তি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। এর থেকে একটা নীতিশিক্ষাও লাভ করা যায় ; 'রাজা-রাজড়ার এমনি কপাল...ইত্যাদি।'

সকালের বাকি সময়টুকু সেই দুটি ছবির গ্যালারিতে কাটালাম।

ডিনার খেয়ে, অমনিবাসের ছাদে চড়ে, পশ্চিম দিকে চার মাইল দূরে কার্লটেন্সবুর্গ গেলাম, যাবার পথে 'উণ্টার ডেন লিণ্ডেনের' বহুদূরব্যাপী চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। ওখানে আরেকটি প্রাসাদ আছে, আর ভারি সুন্দর উদ্যান ইত্যাদি, তবে যে উপাসনা-মন্দিরে রাজকুমারীর সমাধি আছে, সেটিই একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু। পালঙ্কের ওপর রাজকুমারীর অপূর্ব মর্মর-দেহ শায়িত রয়েছে, ছাদে কয়েকটি জানলা আছে, তাতে ফিকে বেগুনী রঙের কাচ বসানো হয়েছে, তার জন্য মর্মর-মূর্তিটিকে অবর্ণনীয় রূপে কোমল স্বপ্নালু বলে মনে হয়।

আরো সন্ধ্যায় আমরা হেঁটে ইহুদীদের সিনাগগ্ দেখে এলাম, লোকে বলে সেটি দেখবার মতো জিনিস, খাবার সময়ে নিউইয়র্কের এক ভদ্রলোকের ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল, এ কথা তাঁর কাছে শোনা, তাঁদের ভারি সজ্জন বলে মনে হল। এক বর্ণ জর্মান না শিখেই তাঁরা এখানে এসেছেন, কাজেই এখানকার জীবনযাত্রা তাঁদের ভারি জটিল বলে মনে হচ্ছে।

জুলাই ২০, শনিবার—ইহুদীদের সিনাগগে যাওয়া দিয়ে দিন শুরু করা গেল। সেখানে উপাসনা হচ্ছিল, শেষ অবধি শুনলাম; সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে নতুন এবং অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। বাড়িটা অতি জমকালো, ভিতরের সমস্তটাই হয় গিল্টি করা, নয়তো অন্য কারুকার্য করা—খিলানগুলি প্রায় সবই অর্ধ-বৃত্তাকার, অবশ্য অন্য আকারেরও কয়েকটি আছে। পুব দিকের ছাদটি গোল গম্বুজাকার, তার ভিতর থামে বসানো একটা ছোটো গম্বুজ, তার নীচে পরদায় আড়াল করা একটা সিন্দুক, তাতে ইহুদীদের পবিত্র নিয়মাবলী। তার সামনে পুবমুখী একটা পড়বার ডেস্ক, তার সামনে পশ্চিমমুখী আরো ছোটো একটা ডেস্ক, সেটি মাত্র একবার ব্যবহার হয়েছিল। ঘরের বাকি অংশটি খোলা বেঞ্চিতে ভরা। অন্যান্য উপাসকদের দেখাদেখি আমরা টুপি পরেই রইলাম। পুরুষদের মধ্যে অনেকে, নিজেদের জায়গায় পৌঁছে, নকশা-করা থলি থেকে সাদা রেশমী শাল বের করে, চারকোণা করে গায়ে জড়াল। দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগছিল, ওপর দিকের পাড়ে সোনালি জরির কাজ করা, খুব সম্ভবত মন্ত্র লেখা। এরা মাঝে মাঝে

উঠে গিয়ে, প্রার্থনার অংশবিশেষ পাঠ করে আসছিল। যা কিছু পড়া হচ্ছিল সবই জর্মান ভাষায়, তবে অপূর্ব বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিছু কিছু হিব্র তেও বলা হচ্ছিল। এই-সব গানগুলির কিছু বহু প্রাচীনকাল থেকে গীত হয়ে আসছে, হয়তো ডেভিডের সময় থেকে। প্রধান পুরোহিত বা রাবাই বাজনা ছাড়াই একা একা অনেকখানি সুর করে পাঠ করলেন। উপাসকমণ্ডলী কখনো দাঁড়াচ্ছিল, কখনো বসছিল। কাউকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখলাম না।

পট্‌স্‌ড্যামে বিকেলটা কাটালাম, প্রাসাদ আর বাগানে ভরা জায়গা। এখানকার নিউ প্যালেস যেখানে আমাদের রানী ভিক্টোরিয়ার বড়ো মেয়ে থাকেন—বার্লিনের 'শ্লস্' থেকেও আরো চমৎকার! ফ্রেডারিক দি গ্রেটের ঘরগুলি দেখলাম, তাঁর লিখবার টেবিল, একটা চেয়ার দেখলাম, তার গদীটা তাঁর প্রিয় কুকুরের নখ দিয়ে ফালা ফালা করে ছেঁড়া। যে গির্জায় তাঁর সমাধি হয়েছিল, সেটিও দেখে এলাম—সাদাসিধে সমাধি, তার ওপর খোদাই করে কিছু লেখা নেই, তিনি এইরকমই চেয়েছিলেন। এ জায়গার মধ্যমণি হল তাঁর প্রিয় প্রাসাদ 'সাঁ সুসি'। তার চার দিকের বাগানে ঘুরে বেড়ালাম, প্রাচীন মামুলী নিয়মে সাজানো, একেকটি কেন্দ্র থেকে বেরিয়েছে সোজা সোজা বীথিকা আর অপূর্ব সুন্দর ধাপে ধাপে সাজানো কমলালেবুর বাগান। এই পট্‌স্‌ড্যাম অঞ্চলটাতে যেরকম শিল্প-কর্মের ছড়াছড়ি, দেখে অবাক হতে হয়, একেকটা প্রাসাদের ওপরটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন মূর্তির পাদপীঠের একেকটি বন! মোট কথা আমার মতে বার্লিনের স্থাপত্যের দুটি নিয়ম হল : 'বাড়ির ছাদে সুবিধা-মতো জায়গা পেলেই একটা করে মানুষের মূর্তি দাঁড় করাতে হবে, এক পায়ে দাঁড় করাতে পারলে সব চাইতে ভালো। নীচের মাটিতে খানিকটা জায়গা পেলেই, হয় বৃত্তাকারে ভিতর দিকে মুখ করে, থামের ওপর কতকগুলো আবক্ষ মূর্তি রাখতে হবে, নয়তো অতিকায় একটা মানুষের মূর্তি রাখতে হবে, মানুষটা কোনো বুনো জানোয়ারকে হয় মারছে, নয় এইবার মারবে, কিম্বা আগেই মেরে ফেলেছে, বর্তমানে মারলেই সব চাইতে ভালো আর জানোয়ারটার গায়ে যত বেশি কাঁটা-কাঁটা থাকে ততই বাঞ্ছনীয়—বাস্তবিক ড্রাগন হলেই সব চাইতে ভালো। তবে সেটা যদি শিল্পীর ক্ষমতার বাইরে হয়, তা হলে সিংহ কিম্বা শুয়োর হলেও হবে।'

নির্মম একঘেয়েমির সঙ্গে এই জানোয়ার মারার ব্যাপারটা সব

জায়গায় দেখানো হয়েছে। তার ফলে বার্লিনের কোনো কোনো পাড়া দেখলে মনে হয় বুঝি জীবাশ্মের কসাইখানা। পট্‌স্‌ড্যাম দেখতে ছয় ঘণ্টা লেগেছিল।

জুলাই ২১, রবিবার—লিডন গেল ডম-কার্চে জর্মান ভাষায় উপাসনা শুনতে। আমি শুধু সকালবেলায় একটা ঘরে ইংরিজিতে উপাসনায় গেলাম। মনবিজন প্যালেসে ঐ উদ্দেশ্যেই ঘরটিকে দেওয়া হয়েছিল। লিডন যখন সান্ধ্য উপাসনায় গেছিল, আমি লুস্ট-গার্ডেনে বেড়াচ্ছিলাম, সেখানে বেঞ্চির ওপর, কিম্বা জাদুঘরের সিঁড়ির ওপর ছোটো-ছোটো দল বেঁধে লোকে জটলা করছিল। অনেকগুলি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে খেলা করছিল: ওদের সব চাইতে প্রিয় খেলা হল হাত ধরাধরি করে, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নাচা আর গাওয়া, তবে গানের কথাগুলো ধরতে পারলাম না। একটা মস্ত কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখে, ওরা তাকে ঘিরে নাচতে লাগল আর তাকেই গান শোনাতে লাগল, এবার তারা ভিতর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই নতুন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা দেখে কুকুরটা প্রথমে বেজায় অবাক হয়ে গেল, তার পর অল্প সময়ের মধ্যেই ঠিক করল এ আর সহ্য করা যায় না এবং যেমন করেই হোক এখান থেকে সরে পড়তে হবে। তার পর এক জর্মান ভদ্রলোককে দেখলাম, তিনি আমারই মতো ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন। মানুষটি ভারি অমায়িক, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ একটু গল্প ধরনের করলাম, তিনি অমায়িকভাবে আন্দাজে আমার কথার মানে ধরে নিতে লাগলেন, আমার জর্মান বাক্যগুলো দিব্যি শুধরেও দিতে লাগলেন, তাঁর সাহায্য না পেলে বেজায় অশুদ্ধ জর্মান বলতাম, হয়তো তাকে জর্মানই বলা চলত না। সে যাই হোক, এ-ও সত্যি যে আমি যেরকম জর্মান বলি, সেটা প্রায় যেরকম ইংরিজি শুনতে হচ্ছে, তারই মতো। আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে, একটু ঠাণ্ডা হ্যাম ফরমায়েস করেছিলাম। অন্যান্য পদ-গুলো নিয়ে এসে, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওয়েটার বলল, "আই ব্রিংস্‌ ইন্‌ মিনিট্‌স্‌ জি কোল্ড হ্যাম।"

রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিটে ডান্‌জিগ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম, সেখানে পরদিন বেলা দশটায় অক্ষত দেহে পেঁছনো গেল।

জুলাই ২২, সোমবার—সেদিনের বাকি অংশটি ডম-কার্চ আর এই উদ্ভট এবং অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক শহরটি দেখে কাটালাম। সরু সরু আঁকা বাঁকা পথ, উঁচু উঁচু বাড়ি, প্রায় প্রত্যেকটার ছাদে আশ্চর্য একটা কারিকুরি করা তেকোণা অংশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, তার গায়ে অদ্ভুত সব আঁকিবুঁকি কাটা। গির্জাটি দেখে বড়ো আনন্দ হল। তার ভিতরে তিন ঘণ্টা কাটালাম, চুড়োর মাথায় আরেক ঘণ্টা। চুড়োটা ৩২৮ ফুট উঁচু, সেখান থেকে পুরনো শহরটার অপূর্ব দৃশ্য আর মোলডান্ আর ভিস্টুলা নদী কেমন এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে সব দেখতে পেলাম। বল্টিক সাগরেরও অনেকখানি দেখা গেল।

গির্জার ভিতরে মেমলিঙের আঁকা 'শেষ বিচারে'র প্রকাণ্ড ছবিটি দেখলাম; যতরকম শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, এ-ও তার একটি; শত শত মানুষের চেহারা দেখা যায়, প্রত্যেকের মুখ এমন নিখুঁতভাবে আঁকা যেন 'মিনিয়েচার' ছবি বিশেষ। কয়েকটা পাপাত্মার চেহারা দেখলে শিল্পীর কল্পনা-শক্তিকে বাহবা দিতে হয়; চেহারাগুলো এতই অদ্ভুত যে বিকট বলা চলে না। গির্জায় অনেকগুলি বেদী আর বেদীর নানান সজ্জা, যদিও এখানে এখন লুথেরান ব্যবস্থা। বেদীর ওপর প্রায়ই দেখলাম একটি বিশেষত্ব, সেটি হল ভাঁজ করা দরজা, তার ভিতরে বাইরে কারিকুরি করা লিপি; তার পিছনে উঁচু উঁচু করা রিলিফ চিত্র, তাতে রঙের আর গিল্টির একরকম বাড়াবাড়িই বলা যায়, প্রায় সব-গুলির বিষয়বস্তু হল যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া। একটি ছবিতে যীশু ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে একটা নতুন জিনিস দেখলাম। মাটিতে একটা খুঁটি গাড়া, তার মাথার ওপর একটা 'স্ক্রু', সেটি ক্রুশের সব চাইতে উঁচু কোণটিকে ভেদ করে গেছে, স্ক্রুর ডগায় একটা 'নাট', একটা ক্ষুদে ভূত সেটিকে আরো এঁটে দেবার চেষ্টা করছে, যাতে ক্রুশ বহন করা আরো কষ্টকর হয়ে ওঠে। গির্জার যে অংশটিকে 'চ্যান্সেল' বলে, প্রায় তার ওপরকার ছাদের কাছে, কড়িকাঠের ওপর বিশাল একটি ক্রুশ খাড়া করা আছে, তার পাশে অনেকগুলি নারীমূর্তি যেন কাঁদছে, মূর্তিগুলি মানুষের চাইতেও মাপে বড়ো।

গির্জার বাসনপত্র ও বস্ত্র রাখবার দুটি আধারে পুরনো পোশাক-আশাক, স্মৃতিচিহ্ন, বাদ্য-যন্ত্র ইত্যাদির মূল্যবান সংগ্রহ দেখলাম। উপাসনার সময় আচার্য যে হাত-কাটা আঙরাখা পরেন, তাই দেখলাম গোটা

প্যাঁচাত্তর রয়েছে। তাছাড়া দুটি বিরল 'ভেলিকা' দেখলাম, জিনিসটি হল বাঁকানো শিক দিয়ে তৈরি একরকম আধার, ভিতরে যীশুর কুমারী মায়ের মূর্তি। মুখোমুখি প্রত্যেক জোড়া শিক নাকি মাছের প্রতীক। এই জিনিসগুলিকে চ্যান্সেলের ছাদ থেকে শিকল দিয়ে ঝোলানো হত। গির্জার ভিতরটি সব জায়গায় সাদা ও সোনালি রঙ করা, খুব উঁচু ছাদ, অতি সুন্দর বিশাল সব থাম আছে।

সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোলাম ; সরু গলি দিয়ে আবছায়াতে বাড়ি ফেরার সময়ে দেখি বেয়নেট উঁচিয়ে ক্ষুদে মাপের এক সৈনিক রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। সে আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাল, কিন্তু নিরাপদে যেতে দিল।

হোটেলে দেখলাম দাঁড়ের ওপর সবুজ টিয়াপাখি ; তাকে আমরা 'প্রিটি পল্‌' বলে ডাকলাম, সে-ও এক দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করল, কিন্তু মনের কথা কিছু পেশ করল না। ওয়েটার এসে পাখির নীরবতার কারণ বুঝিয়ে বলল, "ও পাখি ইংরিজিও বলে না, জর্মানও বলে না।" পরে শুনলাম পাখি মেক্সিকান ভাষা ছাড়া কিছু বলে না। সে ভাষার এক বর্ণও জানা না থাকাতে, ওর জন্য দুঃখ ছাড়া কিছু করা গেল না।

জুলাই ২৩, মঙ্গলবার—ঘুরে ঘুরে কয়েকটা ফটো কেনা গেল, বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে কোনিগ্‌স্‌বার্গ রওনা হলাম। স্টেশনে যাবার পথে 'ন্যায় বিচারের মহিমা'র যে দৃষ্টান্ত দেখলাম, তেমন আর কখনো দেখি নি। একটা ছোটো ছেলেকে হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, নয়তো জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সম্ভবত পকেটমারার জন্য। আগাগোড়া ইউনিফর্ম পরা দুজন সেপাইকে এই কর্মটি করতে দেওয়া হয়েছিল। গম্ভীর মুখে তাদের একজন ক্ষুদে বেচারার সামনে, একজন পিছনে মার্চ করে চলেছিল ; অবশ্যই তাদের বেয়নেট বাগিয়ে ধরা ছিল, শেষটা যদি দুষ্কৃতকারী পালাবার চেষ্টা করে।

ডানজিগ্‌ আর কোনিগ্‌স্‌বার্গের মধ্যিখানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে কিছু দেখবার মতো নেই। ডানজিগের কাছেই একটা কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, ছাদে কোনো লম্বা-ঠ্যাং পাখি বাসা বেঁধেছে, সারস বোধ হয়। জর্মান শিশুপাঠ্য বইতে আছে ঐ পাখিরা যে বাড়ির ছাদে

বাসা বানায়, তার একটা নৈতিক উদ্দেশ্য থাকে; সেটি হল যে দুষ্টু ছেলে-মেয়েদের ওরা ধরে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যা সাতটায় কোনিগ্‌স্‌বার্গ পৌঁছে, 'ডয়েৎ হাউস্' নামক হোটেলে উঠলাম।

রাত সাড়ে দশটা। রাস্তা থেকে একটা ক্কিচ্‌-ক্কিচ্‌ শব্দ শুনে, বাইরে তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশম্যান, কিম্বা ঐ ধরনের কেউ, রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে মার্চ করে চলেছে, কয়েক গজ হেঁটেই একবার করে সে থামছে, মুখে একটা ছোটো আকারের বাদ্য-যন্ত্র তুলে, অবিকল ছোটো ছেলেদের এক পয়সার বাঁশির মতো শব্দ করছে। ডান্‌জিগেও রাত দুপুরে এইরকম শব্দ শুনেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম বুঝি ভবঘুরে ছোঁড়াদের কাজ।

জুলাই ২৪, বুধবার—একা একা খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম, কারণ লিডনের শরীর খারাপ। অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে আল্‌ডস্টাট্‌ গির্জার চুড়োর মাথায় উঠে, শহরটার চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। পাহারাদারের কাছে চাবি, তাকে খুঁজে বের করে, চুড়োয় তুলে, দৃশ্যবস্তুগুলোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই আমার জর্মান ভাষার দৌড় শেষ হয়ে এল। মামুলী সব জায়গা ঘুরে দেখলাম ; পরে শুনেছিলাম শহরের সব চাইতে প্রাচীন অংশটিকেই বাদ দিয়েছি।

সন্ধ্যাবেলায় বুর্স-গার্টেনে গিয়ে খানিকটা চমৎকার বাজনা শুনলাম, দেখলাম স্থানীয় লোকরা কেমন আনন্দে সময় কাটাচ্ছে, প্রাণ ভরে মজা করছে! ছোটো-ছোটো টেবিলের চার পাশে চার-ছয় জন বসবার জায়গা হয়, বড়োরা সেখানে বসেছে, মহিলারা সেলাই-টেলাই এনেছে, ছেলে-পুলেগুলো চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রায়ই চার-পাঁচজন একসঙ্গে দল বেঁধে, হাত ধরাধরি করে। ওয়েটাররাও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে কি ফরমায়েস দেয় সেদিকে চোখ রেখে, তবে পানীয়-টানীয় খুব একটা চলছিল না। লণ্ডন শহরের কোনো ভদ্রলোকের বসবার ঘরের মতো সবাই চুপচাপ, কেতাদুরস্ত। মনে হল সবাই সবার চেনাজানা, ব্রাসেল্‌সে যেমন দেখেছিলাম, তার চাইতে এখানে অনেক বেশি ঘরোয়া ভাব।

ঐ হোটেলে ওঠাতে, একটা সুবিধা পাচ্ছি যা সচরাচর পাওয়া যায় না : যতক্ষণ খুশি, যতবার খুশি ঘণ্টি বাজানো যায়। তার শব্দ বন্ধ

করবার কোনো চেষ্টাই করা হয় না। একটা ঘণ্টির উত্তর আসতে লাগে ৫ থেকে ১০ মিনিট আর প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেতে আধ ঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা।

জুলাই ২৫, বৃহস্পতিবার—আজ ঘুরে বেড়াবার দিন, তবে লিখবার মতো কিছুই পাই নি, এটুকু বাদে যে অনেকগুলো দোকানে দেখলাম জর্মান নামগুলোর পাশে হিব্রু হরফেও নামগুলো লেখা। সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখতে গেলাম, মোটের ওপর সব দিক দিয়ে ভালোই মনে হল, গানগুলি আর অভিনয়ের কিছু কিছু অংশ তো খুবই ভালো। নাটকের নাম "৬৬ সাল", তবে গল্পাংশটার বলতে কিছুই বুঝতে পারলাম না, কারণ সংলাপগুলো খাবলা-খাবলা শুনতে পাচ্ছিলাম। একটা চরিত্র ছিল, 'কোনো ইংরিজি সংবাদ পত্রের সংবাদ-দাতা'। এই অদ্ভুত ব্যক্তিটি সাডোয়ার যুদ্ধের আগে সৈনিক শিবিরে দেখা দিলেন, পরনে প্রায় সবই সাদা, লম্বা একটা ফ্রক্-কোট, মাথার পিছনে উঁচু টপ্-হ্যাট—এ দুটি জিনিসও প্রায়-সাদা। এসেই লোকটি জনসাধারণকে বললেন, 'মর্নিং', পরে মনে হল ভাঙা ভাঙা জর্মান ভাষায় সংলাপ চালালেন! সৈনিকরা বোধ হয় ওঁকে একটি পরিহাসের পাত্র বলে জ্ঞান করছিল, পরিসমাপ্তিতে লোকটি একটা ড্রামের মধ্যে পড়ে গেলেন।

কোনিগ্‌স্‌বার্গে যে দুটি জিনিসের সব চাইতে বেশি চাহিদা তা হল দস্তানা ও বাজি—অন্তত তাই হওয়াই উচিত—কারণ অর্ধেক দোকানে তা-ই বেচে। তবু এমন বহু ভদ্রলোকও দেখলাম যাদের হাতে দস্তানা নেই; হয়তো শুধু বাজি পোড়াবার সময় হাত রক্ষা করবার জন্যই দস্তানা পরা হয়।

জুলাই ২৬, শুক্রবার—সকালে ডম-গির্জায় গেলাম, সুন্দর প্রাচীন বাড়ি তার পর ১২টা ৫৪র ট্রেনে সেন্ট পিটার্সবার্গ—এখানে প্রায় সকলেই বলে পিটার্সবার্গ—রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছলাম পর দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, অর্থাৎ সাড়ে আঠাশ ঘণ্টার যাত্রা। দুঃখের বিষয়, আমাদের কামরায় মাত্র চারজনের শোবার জায়গা ছিল। আমরা দুজন ছাড়া, দুটি মহিলা এবং আরেকজন ভদ্রলোক থাকাতে, আমি মাটিতে শুলাম। একটা ব্যাগ আর কোট দিয়ে বালিশ বানালাম, খুব একটা

বিলাসিতার মধ্যে না হলেও, দিব্য আরামে সারা রাত গভীর ঘুমে কাটালাম। দেখলাম অন্য ভদ্রলোকটিও ইংরেজ, তিনি ১৫ বছর যাবৎ পিটার্সবার্গে থাকেন, এখন প্যারিস, লণ্ডন বেড়িয়ে ফিরছেন। ভারি সদয় ভাবে তিনি আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন, পিটার্সবার্গ দেখা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানালেন, কি করে রুশ ভাষা উচ্চারণ করতে হয় তাও বললেন, কিন্তু আমাদের আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ নৈরাশ্যের কারণ হলেন, কারণ ওঁর মতে খুব কম লোকই রুশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বলে। রুশ ভাষায় বেজায় লম্বা লম্বা সব শব্দ আছে, তার একটা দৃষ্টান্তও দিলেন বানান সুদ্ধ। ইংরিজি হরফে লিখলে সে শব্দটি দাঁড়ায় :

ZASH TSH EESH TSH A YOUSH TSH EEKHSYA

এই ভয়াবহ শব্দটির মানে হল 'আত্মরক্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা'।

উনি থাকাতে আমাদের দলটি জমল বেশ ; ওঁর সঙ্গে পর দিন তিন দফা 'চেস্' খেললাম ; ভাগ্যিস্ তার কোনো বর্ণনা লিখে রাখি নি, কারণ প্রত্যেকবার হেরে গেছিলাম।

রুশ সীমান্ত থেকে পিটার্সবার্গ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার মতো কিছু নেই, ঐ যা শুধু মাঝে মাঝে লোমের টুপি, টিউনিক, বেল্ট-আঁটা চাষীভাই, এখানে ওখানে গোল গম্বুজ যুক্ত গির্জা, তার ওপর আবার ঘিরে আছে চারটি ছোটো-ছোটো গম্বুজ, তাদের ওপর দিকটা সবুজ রঙ করা ! নতুন বন্ধু বললেন ওগুলো দেখতে লাগে ঠিক যেন নুন-গোলমরিচ দানি !

একটা স্টেশনে লাঞ্চ খাবার জন্য থামা গেল, সেখানে একটা লোক অদ্ভুত এক গিটার বাজাচ্ছিল, তার ওপর দিকে বাঁশির মতো কয়েকটা চোঙা লাগানো, কোথাও আবার ঘণ্টা ঝোলানো, অথচ সমস্তটাকে লোকটা সুর-তাল ঠিক রেখে দিব্যি বাজিয়ে যাচ্ছিল। এই জায়গাটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল যে এখানেই আমরা প্রথমে স্থানীয় সুরুয়া খেয়েছিলাম, তার নামটা হল 'চট্শী', মন্দ খেতে নয়, যদিও কিঞ্চিৎ টক-মতো, হয়তো রুশরা সেইরকম স্বাদই চায়। গন্তব্য স্থলে পেঁৗছবার আগে, নতুন বন্ধুকে ধরে আমাদের হোটেলের নামটি লিখে নিলাম। নামটি হল 'গোস্টি-নিট্সা রুী', বন্ধুর ধারণা আমাদের ঠিকা গাড়ির চালক নিশ্চয় রুশদেশী হবে। কিন্তু সেখানে পেঁৗছে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ 'হোটেল ডি রুশী'র একজন লোক দেখলাম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাদের জর্মান ভাষায় অভিবাদন করে, তাদের নিজেদের অমনিবাসে

চড়িয়ে আমাদের মালপত্র উদ্ধার করতে গেল।

ডিনারের পর কাছাকাছি একটু বেড়াবার সময় পেলাম, কিন্তু নানান বিস্ময়কর ও নতুন জিনিস দেখতে পেলাম। রাস্তাগুলো বেজায় চওড়া, ছোটো রাস্তাগুলোও লণ্ডনের বড়ো রাস্তার চাইতে চওড়া ; দ্রশ্‌কি নামক ক্ষুদে-ক্ষুদে গাড়িগুলো কেমন বেপরোয়া ভাবে, অন্য পথচারীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তোয়াক্কা না করে, ছুটে বেড়াচ্ছে; একটু পরেই বুঝলাম চার দিকে চোখ রেখে চলতে হবে, কারণ আমাদের প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়লেও চালকরা চ্যাঁচায় না ; দোকানের সামনে প্রকাণ্ড বড়ো আলোকিত সাইন-বোর্ড ; বিশাল বিশাল মন্দির, তাদের গম্বুজগুলো নীল রঙ করা, তার ওপর সোনালি তারা আঁকা ; স্থানীয় পথচারীদের অবিরাম বকবকানি, সব একসঙ্গে মিলে, সেন্ট পিটার্সবার্গে আমাদের ঐ প্রথম বেড়ানোটিকে রঙে-রসে ভরপুর করে তুলেছিল। একটা বেদীর সামনে দিয়ে গেছিলাম, ভিতরে বাইরে চমৎকার কারিকুরি করা, গিলিট লাগানো ; তার মধ্যে ছিল একটা ক্রুশ, কতকগুলো ধর্মীয় ছবি ইত্যাদি। গরিব মানুষরা বেদীর সামনে দিয়ে যাবার সময় মাথা নিচু করে, নিজেদের বুকের ওপর বারবার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছিল—সেই কর্মব্যস্ত ভিড়ের মাঝখানে এইরকম দৃশ্য বিস্ময়কর বটে।

জুলাই ২৮, রবিবার—সকালে বিখ্যাত আইজাক চার্চে গেলাম কিন্তু সমস্ত উপাসনা আগাগোড়া স্লাভনিক ভাষায় হওয়াতে, কিছু বুঝবার কোনো আশাই ছিল না। গানের সঙ্গে কোনো বাজনার ব্যবস্থা ছিল না, তবু খালি গলায় গান গেয়েই আশ্চর্যরকম জমিয়ে ফেলল। গির্জা একটা বিশাল চারকোণা বাড়ি, চারটি সমান অংশে ভাগ করা, যথাক্রমে চ্যান্সেল বা পূর্বাংশ, 'নেভ' বা মূল অংশ, 'ট্র্যান্সেপ্ট' বা আড়া-আড়ি অংশ দুটি। মধ্যিখানটার মাথার ওপরেই বিশাল গম্বুজটি, সেটির বাইরের দিকটা গিলিট করা, কিন্তু জানলার সংখ্যা এতই কম যে চার দিকে আইকন বলে ছোটো-ছোটো ছবি ও মূর্তির সামনে যদি মোমবাতি না জ্বলত তা হলে গির্জাঘরটি প্রায় অন্ধকার দেখাত। গোড়ায় একেকটি আইকনের সামনে মাত্র দুটি করে বড়ো মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল, কিন্তু ছোটো মোমবাতির জন্য অনেকগুলি দীপাধারের ব্যবস্থাও করা ছিল। যারা মূর্তির সামনে প্রার্থনা করছিল তারা ঐ দীপাধারে মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছিল, প্রত্যেকে একটি করে সঙ্গে

এনে, সেটি জ্বালিয়ে আধারে গুঁজে দিচ্ছিল। উপাসনার সঙ্গে উপাসকমণ্ডলীর শুধু এইটুকু সম্বন্ধ যে থেকে থেকে তারা মাথা নিচু করছিল, নিজেদের বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকছিল আর মাঝে মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে কপাল ঠেকাচ্ছিল। এটুকু আশা করা যেতে পারত যে ঐ সময় তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করে নিচ্ছিল, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তারও সম্ভাবনা ছিল না; লক্ষ্য করেছিলাম যে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরাও ঐরকম করছিল এবং তাদের মুখের ভাব দেখে মোটেই মনে হচ্ছিল না যে ওদের কাছে তার কোনো অর্থ আছে। একটা ছোট্টো ছেলেকে বিকেলে কাজান ক্যাথিড্রেলে দেখেছিলাম, তার মা তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে, তার মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়েছিল, সে ছেলেটার বয়স তিনের বেশি ছিল না। তার ওপর ওরা মূর্তিগুলির সামনেও মাথা নিচু করে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছিল। শুধু তাই নয়, উপদেশ শুরু হতেই বাইরে দাঁড়িয়ে লিডনের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে গির্জার সামনে দিয়ে যাবার সময় অসংখ্য লোকও ঐরকম করছিল, এমন-কি, ঐরকম বেজায় চওড়া রাস্তার অন্য পার থেকেও। গির্জার দরজা থেকে শুরু করে, সরু এক ফালি শান-বাঁধানো জায়গা রাস্তার ও-পার পর্যন্ত চলে গেছিল, যাতে সবাই টের পায় কখন তারা দরজার ঠিক সামনে এসে পেঁাচেছে।

তবে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকাটা ঐ নামের যোগ্য কি না বলতে পারছি না, কারণ ওরা যা করছিল সেটি হল ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপাল, বুক, ডান কাঁধ, বাঁ কাঁধ স্পর্শ করছিল। সাধারণত এটা তিনবার করা হয়, প্রত্যেকবার তার পর নিচু হয়ে 'বাও' করতে হয়, তার পর চতুর্থ বার ক্রুশ চিহ্ন এঁকে আর 'বাও' করতে হয় না।

যে আচার্যরা উপাসনায় যোগ দিচ্ছিলেন, তাঁদের অত্যন্ত জমকালো পোশাক পরা ছিল; তাছাড়া অত শোভাযাত্রা আর ধূপ-জ্বালা দেখে ব্রাসেল্‌সের রোমান ক্যাথলিক গির্জার কথা মনে পড়ছিল। আমার মতে কিন্তু যতই এ-সব উপাসনার জাঁকজমক আর রাজসিক ব্যবস্থা দেখা যায়, ততই ইংল্যাণ্ডের গির্জাগুলির সাদাসিধা উপাসনার নিয়ম ভালো লাগে; আমার কাছে সেগুলিরই বেশি তাৎপর্য।

বড়ো দেরিতে শুনলাম এখানে একবার মাত্র ইংরিজিতে উপাসনা হয়, তাও আবার সকালে। কাজেই বিকেলে এই আশ্চর্য শহরের মধ্যে এদিক-ওদিকে বেড়ালাম। এরকম শহর আর দেখি নি, মনে হচ্ছিল

দিনের পর দিন আর কিছু না করে, শুধু এখানে ঘুরে বেড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকা যায়। আমরা নেভ্স্কির এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত, প্রায় তিন মাইল মতো হাঁটলাম। কি চমৎকার সব বাড়ি এই রাস্তায় ; এটা নিশ্চয় পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর রাস্তার একটি। রাস্তাটা শেষ হয়েছে একটা পার্কে, সেটা হয়তো পৃথিবীর সব চাইতে বড়ো পার্ক ; এর নামটি হল অ্যাড্মিরেল্টি প্লাট্স্, প্রায় এক মাইল লম্বা, পার্কের এক ধারের প্রায় সবটুকু জুড়ে রয়েছে অ্যাড্মিরেল্টির সামনের দিকটা।

এর কাছেই পিটার দি গ্রেটের চমৎকার ঘোড়ায়-চড়া মূর্তি। নীচের দিকটা ঠিক পাদপীঠের মতো নয়, কেমন রুক্ষ অসমান, ঠিক যেন সত্যিকার পাথর। ঘোড়াটা পিছনের দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, একটা সাপ পিছনের পায়ে জড়িয়ে রয়েছে, মনে হল ঘোড়া তার ওপর পা রেখেছে। এটা যদি বার্লিন হত, পিটার নিঃসন্দেহে সাপটাকে মারতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, কিন্তু এখানে উনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করছেন না ; সত্যি কথা বলতে কি হত্যার নিয়ম এখানে স্বীকার পায় না। বিশাল দুই সিংহের মূর্তি দেখলাম, সে দুটো এমনি বেদনাদায়ক রকমের অমায়িক যে একটা মস্ত বল নিয়ে, বেড়ালছানার মতো খেলা করছে!

সকলের সঙ্গে বসে ডিনার খেলাম। এখানেও প্রথমে সেই 'শ্চি' নামক সুরুয়া দিল, তবে খেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে যেমন ভয় করেছিলাম, জিনিসটা আসলে সব সময় এবং অত বেশি টক নয়।

জুলাই ২৯, সোমবার—আজকের দিনটা শুরু করলাম পিটার্সবার্গের একটা ম্যাপ, একটা অভিধান আর রুশ শব্দ-তালিকা কিনে। দ্বিতীয়টি যে আমাদের অনেক কাজে লাগবে সে তো বোঝাই যাচ্ছে—এই একটা দিনের মধ্যে—যার বেশির ভাগ সময় কেটেছিল এখানে ওখানে বৃথা দেখা করতে গিয়ে—চারবার ড্রশ্কি ভাড়া করেছিলাম। তার মধ্যে দুবার হোটেল থেকে গাড়ি ডাকিয়েছিলাম, তখন দরোয়ান গাড়োয়ানের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে দিয়েছিল। কিন্তু বাকি দুবার নিজেদের বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। তার প্রাথমিক আন্দোলনের একটা নমুনা দিচ্ছি :

আমি—গস্টোনিটিয়া ক্লী (অর্থাৎ ক্লী হোটেল)

গাড়োয়ান—গড়গড় করে কি যেন সব বলে গেল, তার মধ্যে বুঝলাম

শুধু—ত্রি গ্রোশেন—(ত্রিশ কোপেক কি ?)

আমি—কুড়ি।

গাড়োয়ান—(রেগে) ত্রিশ।

আমি (দৃঢ়ভাবে)—কুড়ি।

গাড়োয়ান (ফুসলিয়ে)—ডোয়াটজাট্ পাইট ? (পঁচিশ কি ?)

আমি, (যেন যা বক্তব্য বলে ফেলে, ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক) কুড়ি।

এই বলে লিডনের কনুই ধরে, গাড়োয়ানের চ্যাঁচামেচি অগ্রাহ্য করে রওনা দিলাম। কয়েক গজ যেতে না যেতেই দ্রশ্‌কির ঘড়্‌ঘড়ানি শুনতে পেলাম, গাড়োয়ান এসে পাশে থেমে, হাঁক ডাক করতে লাগল।

আমি (গম্ভীর গলায়)—কুড়ি ?

গাড়োয়ান (এক গাল হেসে)—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুড়ি।

এক আধবার এরকম হলে মজা লাগতে পারে, কিন্তু ধরুন লণ্ডনে যদি গাড়ি ভাড়া করতে হলেই এইরকম করতে হত, তা হলে কি বিরক্তিকর ব্যাপারই-না হত।

ডিনারের পর বাজারে গেলাম, মস্ত মস্ত বাড়ি, তার চার দিকে সারি সারি গাছতলায় ছোটো-ছোটো দোকান। মনে হল পর পর চল্লিশ—পঞ্চাশটাতে দস্তানা, কলার কিম্বা ঐ ধরনের জিনিস বিক্রি হয়। ছোটো-ছোটো পবিত্র প্রতিকৃতির ডজন খানেক দোকান, এক ইঞ্চি দু ইঞ্চি যেমন তেমন করে আঁকা ছবি থেকে এক ফুটের চাইতেও বড়ো সযত্নে আঁকা ছবিও আছে। সেগুলোর মুখ-হাত ছাড়া, সব-কিছু সোনালি রঙে আঁকা। তবে ও-সব কেনা খুব সহজ ব্যাপার হবে না, কারণ শুনলাম দোকানদাররা নাকি রুশ ছাড়া কিছু বলে না।

জুলাই ৩০, মঙ্গলবার—অনেক দূর বেড়িয়ে এলাম, হয়তো পনেরো-ষোলো মাইল, এখানকার দূরত্বগুলো বড্ডো বেশি, ঠিক যেন অসুরদের শহরে বেড়াচ্ছি। কেল্লার ভিতরকার ক্যাথিড্রাল চার্চ দেখলাম, সোনা, মণি-মানিক্য, মর্মর-পাথরের সে কি বাহার! খুব জমকালো, কিন্তু খুব সুন্দর বলা যায় না। আমাদের গাইড হল একজন রুশ সৈনিক—মনে হয় বেশির ভাগ সরকারি কাজই সৈনিকরা করে থাকে—নিজেদের ভাষায় সে যে কি সব বোঝাতে লাগল, সে আর আমাদের বিশেষ কাজে

লাগল না। পিটার দি গ্রেটের পর থেকে, একজন বাদে, সব সম্রাটদের সমাধি আছে এখানে ; অবিকল একরকম দেখতে, শ্বেতপাথরের তৈরি, চারকোণে চারটি সোনালি সাজ, ওপরে বিশাল ভারী একটা ক্রুশ আর সোনার পাতে নাম লেখা—আর কোনো কারিকুরি নেই।

গির্জার চার ধারে মেলা আইকন, সেগুলির সামনে মোমবাতি জ্বলছে, দান গ্রহণের জন্য বাক্সও রয়েছে। দেখলাম ছোটো রুগ্ন শিশু কোলে নিয়ে, একজন গরিব মহিলা সেন্ট পিটরের ছবির সামনে গিয়ে, প্রথমেই যে সৈনিক ডিউটি দিচ্ছিল, তাকে কিছু টাকা দিলেন ; সে টাকাটা ঐ বাক্সে রেখে দিল। তার পর মহিলা অনেকক্ষণ ধরে মাথা নিচু করে, বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতেও লাগলেন। ওঁর ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখে যেন লেখা ছিল যে ওঁর বিশ্বাস এতে সেন্ট পিটর প্রসন্ন হয়ে ওঁর শিশুর ওপর দয়া করবেন।

কেল্লা থেকে আমরা ওয়াসিলি অস্ট্রফ বা ব্যাসিল দ্বীপে, পার হয়ে গিয়ে, অনেকখানি হেঁটে ঘুরে দেখলাম। দোকানপাটের নাম ইত্যাদি প্রায় সবই রুশ ভাষায় লেখা। কাজেই একটা ছোটো দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় রুটি আর জল দরকার হওয়াতে, সেই অভিধানটিতে দেখে নিলাম রুটি হল 'খ্লাইব', জল হল 'ভাদা', তাতেই কাজ হয়ে গেল।

আজ রাতে হোটেলের ঘরে এসে দেখি সকালের প্রয়োজনের জন্য জলও নেই, তোয়ালেও নেই ; উপরন্তু পরিস্থিতির উত্তেজনা বাড়াবার জন্যে বোধ হয়, জর্মান ওয়েটারকে ডাকবার ঘণ্টাটাও বাজল না। এই সুখের সঙ্কটে, নীচে গিয়ে একজন চাকরকে খুঁজে বের করলাম ; সৌভাগ্যের কথা যে, সে-ই আমাদের প্যাসেজের তত্ত্বাবধান করে। অনেক আশা নিয়ে তার সঙ্গে জর্মান ভাষায় কথা বললাম, সে শুধু পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত অভিধানের সাহায্য নিয়ে রুশ ভাষায় অনুরোধ জানানো ছাড়া উপায় রইল না। তাই করলাম, অত্যন্ত সরল ভাষায়, প্রধান শব্দগুলো ছাড়া বাকি কথা বাদ দিয়ে।

জুলাই ৩১, বুধবার—আমাদের সহযাত্রী, মিঃ আলেকজাণ্ডার মিওর, দেখা করতে এলেন। আগামীকাল তাঁর পার্টনারের হেপাজতে পিটারহফ দর্শন ও নৈশ-ভোজনে নেমন্তন্ন করলেন।

সারাদিন 'হার্মিটেজে'র চিত্র-সংগ্রহ আর উইণ্টার প্যালেস্ আর

আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কি মঠ দেখে কাটালাম। ভেবেছিলাম 'হার্মিটেজে' ছবি-দেখা ছাড়া আর কিছু করব না। কিন্তু একজন গাইডের পাল্লায় পড়ে গেলাম, তার কাজ মূর্তি ইত্যাদি দেখানো ; তাকে ইঙ্গিতে যতই-না বললাম যে আমরা ছবির গ্যালারিতে যেতে চাই, সে তবু জোরজার করে আমাদের ওর নিজের বিভাগ দেখিয়ে, পারিশ্রমিক আদায় করে ছাড়ল। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি প্রাচীন শিল্পের এই সংগ্রহটি অতি চমৎকার, এ-সব জড়ো করতে নিশ্চয় দেদার খরচ হয়েছিল।

ছবিগুলিকে তাড়াতাড়ি করে আংশিকভাবে দেখতে হল, কিন্তু ঐ মূর্তিগুলোর মতোই এই সংগ্রহটিও একেবারে অমূল্য। বড়ো ঘরগুলোর একটা শুধু মুরিলোর আঁকা ছবিতেই প্রায় ভরতি। আরেকটি ঘরে শুধু টিশিয়ানের ছবি। সব কেন, অর্ধেক দেখবারও সময় ছিল না আমাদের, এগিয়ে গেলাম ডাচ্ ঘরানার ছবি দেখতে, পল্ পটারের আঁকা 'মাস্টার পিস্' দেখলাম, 'মারে' এর বর্ণনা দিয়েছেন। এই ছবিতে আশ্চর্য নৈপুণ্যের আর সরসতার সঙ্গে, আলাদা আলাদা খোপে একেক রকম জানোয়ার শিকারের দৃশ্য আছে, সিংহ শিকার, বুনো শুয়োর শিকার ইত্যাদি। পরিশেষে সমস্ত জানোয়াররা মিলে, শিকারীকে আর তার কুকুরদের বিচার করে, প্রাণদণ্ড দিচ্ছে।

সব চাইতে আগে মনে পড়ে র‍্যাফেলের আঁকা গোল একটি ছবি, তার বিষয়বস্তু 'পবিত্র পরিবার', অর্থাৎ যীশু ও তাঁর মা-বাবা।

উইণ্টার প্যালেস্ থেকে ড্রশ্কি ভাড়া করে মন্যাস্টারিতে গেলাম। সেখানে শুধু গির্জাটাই দেখা হল, সেখানকার বেদী ইত্যাদি শুধু সোনা-রুপো-মণি-মানিক্যে ঠাসা। সান্ধ্য-উপাসনা শুনে এলাম, অনেকটা আইজাক-চার্চের মতো, তবে বলা বাহুল্য, জনসমাগম অনেক কম।

আগস্ট ১, বৃহস্পতিবার—সাড়ে দশটা নাগাদ মিঃ মেরিলিস্ আমাদের নিতে এলেন এবং বাস্তবিক সহৃদয়তার সঙ্গে নিজের কাজকর্ম ছেড়ে, সারা দিন কাটালেন কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত পিটার হফে আমাদের নিয়ে গিয়ে, দর্শনীয় যা কিছু সব দেখিয়ে। গেলাম স্টীমার চড়ে, ফিন্ল্যাণ্ডের উপসাগরের ওপর দিয়ে। এ জলে জোয়ার আসে না, নোনতা স্বাদও নেই। যেখানে আমরা জল পার হলাম, সে জায়গাটা এপার-ওপার মাইল পনেরো হবে, খুব কম গভীর, কোথাও কোথাও মাত্র ছয় ফুট

আট ফুট হবে। প্রত্যেক বছর শীতকালে এই সমুদ্র আগাগোড়া জমে দুই ফুট গভীর বরফ হয়ে যায়; সে সময় এই সমুদ্র একটা নিরাপদ উপত্যকায় পরিণত হয়, তার ওপর দিয়ে লোকে নিয়মিত যাতায়াত করে যদিও যে-সব গরিব মানুষরা যথেষ্ট গরম কাপড়-চোপড় গায়ে না দিয়ে, পায়ে হেঁটে, থাকবার খাবার ব্যবস্থাবিহীন ঐ অতখানি পথ পার হবার চেষ্টা করে, তাদের যথেষ্ট বিপদের ভয় আছে। মিঃ মেরিলিস বললেন, তাঁর এক বন্ধু গত শীতকালে এই পথে যেতে বরফে জমে মরা আটটি মৃতদেহ দেখেছিলেন।...আমরা যাবার সময় ফিন্‌ল্যাণ্ড আর কন্‌স্টাটের চমৎকার দৃশ্য দেখলাম।...পিটার হফে পেঁীছে দেখি মিঃ মিওরের ঘোড়ার গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাতে চড়ে এবং থেকে-থেকেই নেমে, যে-সব জায়গায় গাড়ি চলে না, সেখানে পায়ে হেঁটে, সম্রাটদের দুটি প্রাসাদ আর তার সঙ্গে অনেকগুলি ছোটো-ছোটো গ্রীষ্মাবাস ঘুরে দেখলাম। ঐ গ্রীষ্মাবাসগুলো ছোটো হলেও অর্থ এবং সুরুচি দিয়ে যতখানি সম্ভব সুন্দর করে সাজানো এবং ব্যবস্থাদিও এত চমৎকার যে মনে হল এর যে-কোনোটিতে খুব আরামে বসবাস করা যায়। আমার তো মনে হল বিচিত্র সৌন্দর্যের আর প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের এমন নিখুঁত সাহচর্যের দিক থেকে দেখতে গেলে, এই বাগানগুলি 'সাঁ সুসি' থেকেও ভালো।

প্রত্যেক বাঁকে, কিম্বা যেখানেই একটি বীথিকা বা পথের শেষ হয়েছে এবং সুযোগ্যভাবে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব মনে হয়, ঠিক সেখানেই হয় ব্রোঞ্জের নয় শ্বেতপাথরের মূর্তি চোখে পড়বেই। শ্বেতপাথরের মূর্তির অনেকগুলোর পিছনে একটা গুহার মতো জায়গা তৈরি করা আছে, তার ভিতর দিকটা নীল রঙ করা, যাতে মূর্তিটি আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কোথাও দেখলাম পাথর দিয়ে ধাপের মতো তৈরি করা রয়েছে, তার ওপর দিয়ে জলস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; আবার কোথাও দেখলাম লম্বা একটা পথ ঢালু হয়ে নেমেছে বা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে, তার ওপরটা আগাগোড়া খিলানের মতো জাফ্রি করে লতাপাতা দিয়ে ঢাকা; আবার কোনো জায়গায় প্রকাণ্ড একটা পাথর মাটিতে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে আছে, শুধু তার ওপর বিশাল মুখ মাথা খোদাই করা হয়েছে। চোখদুটি স্ফিঙ্ক্‌সের চোখের মতো শান্ত, যেন কেউ কোনো বিশাল অসরকে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল, সে এখন নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। কোথাও দেখলাম একটির ভিতর একটি বৃত্তের মতো

সাজানো পাইপ দিয়ে ফোয়ারা বানিয়েছে, তার এমনই কলাকৌশল যে ফোয়ারা খুলে দিলে বাইরের বৃত্তের জলধারার চাইতে ভিতরের গুলি ক্রমে উঁচু হয়ে পড়ছে, তাতে সবটাকে দেখাচ্ছে যেন ঝক্‌ঝকে জলধারায় তৈরি নিরেট একটি পিরামিড। কখনো দেখলাম আমাদের পায়ের নীচে, বনের ফাঁকে একটি ঘাস-জমি, তার ওপর টুক্‌টুকে লাল জেরেনিয়ম ফুল ফুটে রয়েছে, দূর থেকে দেখাচ্ছে যেন প্রকাণ্ড এক ছড়া প্রবাল। তাছাড়া চার দিকে সুদীর্ঘ বীথিকা, কখনো তিন চারটি সমান্তরাল ভাবে, কখনো একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে তারার মতো ছড়িয়ে পড়ে, কতদূর যে চলে গেছে, দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়।

আমরা সেদিন কি দেখে এসেছিলাম, এই বিবৃতি থেকে অন্য লোকের একটা স্পষ্ট ধারণা হয়তো হবে না, কিন্তু আমার নিজের সব কথা মনে পড়ে যাবে।

বেড়াতে বেড়াতে একটুক্ষণের জন্য মধ্যাহ্ন-ভোজনের আশায় মিঃ মিওরের বাড়ি গেলাম, মিসেস্ মিওর আর ভারি মিষ্টি কটি ছেলেমেয়ে দেখলাম। বিকেল, পাঁচটায় আবার যখন গেলাম, মিঃ মিওরকেও পেলাম। আরো কজন বন্ধু ডিনার খেতে এলেন, অবশেষে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন মিঃ মেরিলিসের সঙ্গে পিটার্সবার্গ ফিরে এলাম। তার পর সারাদিনের এত পরিচর্যার চরম কাজ করলেন তিনি, একটা দ্রশ্‌কি ডেকে, গাড়োয়ানের সঙ্গে অপরিহার্য দর কষাকষি করে আমাদের হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ অন্ধকারে, এক দঙ্গল গাড়োয়ান আর কান ঝালাপালা করা কর্কশ চ্যাঁচামেচির মধ্যিখানে, এ-কাজটি আমাদের সাধ্যাতীত ছিল।

আগস্ট ২ শুক্রবার—বেলা আড়াইটার গাড়িতে মস্কো রওনা হলাম, পৌঁছিলাম পরদিন সকাল দশটায়। বাড়তি দুই রুব্‌ল্ দিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তার ফলে রাত এগারোটায় গার্ড এসে জটিল এক জাদুকরের খেলা দেখিয়ে গেল। সীটের পিঠটা ওপর দিকে ঘুরে গিয়ে, একটা তাক হয়ে গেল। সীটগুলো আর হাত রাখার জায়গাগুলো মিলিয়ে গেল, কুশন আর বালিশ দেখা দিল, ঐ তাকটি একটা চমৎকার বিছানায় পরিণত হল, তাতে শুয়ে আমরা আরামে রাত কাটালাম। মেঝের ওপর আরো তিনজনের জায়গা হতে পারত; সুখের বিষয়, কারো দেখা পাওয়া গেল না। আমি রাত একটা অবধি জেগে ছিলাম, গাড়ির পিছন দিকের

খোলা বারান্দার মতো জায়গাটাতে বেশির ভাগ সময় একাই বসে ছিলাম। রেলিং দিয়ে ঘেরা বারান্দা মাথার ওপরে ছাদ, বাতাসের বেগে চলতে চলতে চমৎকার দৃশ্যপট দেখা যায়। অসুবিধা শুধু এই যে ভিতরের চাইতে এখানে ঝাঁকানি আর শব্দ অনেক বেশি।

গার্ড মাঝে-মধ্যে বেরিয়ে আসছিল, ওখানে অন্ধকারে আমাকে একা বসে থাকতে দেখে সে কোনো আপত্তি জানায় নি, হয়তো তারও একা লাগছিল। কিন্তু সকালে যখন আবার ঐ কর্ম করার চেষ্টা করেছিলাম, স্বেচ্ছাচারী রাজার মতো দিল আমাকে কামরায় ভাগিয়ে!

মস্কোতে 'ডুসো হোটেলে' আমাদের জায়গা ঠিক করা ছিল, পৌঁছে দেখি একটা গাড়ি আর বেহারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরে বেড়ালাম এই শহরে; আশ্চর্য শহর, বাড়িগুলোর সাদা আর সবুজ ছাদ; মোচার মতো আকারের সব চুড়ো, বোঁচা দুরবীনের মতো একটার ভিতর থেকে একটা বেরিয়েছ; সোনালি রঙ করা ফোলা-ফোলা গম্বুজ, তাতে শহরের নানান দৃশ্যের বিকৃত চেহারা দেখা যায়, আয়নায় দেখার মতো; কত গির্জা, বাইরে থেকে সেগুলোকে দেখায় যেন নানারকম মনসাগাছের তোড়া, কতকগুলোর ভাগে সবুজ কাঁটা-কাঁটা কুঁড়ি, কতকগুলিতে নীল, সাদা কিম্বা লাল। গির্জাগুলির ভিতরে চার দিকে আইকন আর প্রদীপ ঝোলানো, দেয়াল জুড়ে একেবারে ছাদ পর্যন্ত রঙীন বিচিত্র ছবি; তাছাড়া ফুটপাথগুলো চষা জমির মতো উঁচু-নিচু এবং দ্রশ্‌কির গাড়োয়ানরা শতকরা ত্রিশ পয়সা বেশি চাইল কারণ আজ নাকি সম্রাজ্ঞীর জন্মদিন।

ডিনারের পর আমরা গাড়ি করে 'স্প্যারো হিল'-এ চড়লাম, সেখান থেকে চুড়ো আর গম্বুজের জঙ্গলের সুদূরব্যাপী দৃশ্য দেখলাম, তার সামনে দিয়ে মস্কয়া নদী বয়ে চলেছে—এই ছোটো পাহাড়টি থেকে নেপোলিয়নের সৈন্যদল মস্কো শহরের প্রথম দর্শন পেয়েছিল।

আগস্ট ৪, রবিবার—সকালে অনেকক্ষণ ধরে ইংলিশ উপাসনাগৃহ খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হলাম। তার পর একা বাড়ি ফিরে গেলাম, সৌভাগ্যবশত একজন রুশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি ইংরিজি জানেন, তিনিই সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে ঐ উপাসনা গৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানকার পাদরি, মিঃ পেনি, বাড়িতেই ছিলেন, বার্গনের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র

এনেছিলাম এবং পাদরি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

ওখানকার সান্ধ্য-উপাসনায় লিডন আমার সঙ্গে গেছিল, সমস্ত সন্ধ্যাটা সেখানে কাটালাম, এখানে কি করব না করব সে বিষয়ে নানান মূল্যবান উপদেশ লাভ করলাম, স্থানীয় কৌতূহলোদ্দীপক জিনিসপত্র কেনাকাটা সম্বন্ধেও তাঁরা সাহায্য করতে চাইলেন।

আগস্ট ৫, সোমবার—আজ দৃশ্য দেখে বেড়িয়েছি। দিন শুরু হল ভোর পাঁচটায় উঠে, পেট্রোভ্স্কি মন্যাস্টারিতে ছয়টার উপাসনা শুনে, আজ ছিল মন্দির-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব, কাজেই অনুষ্ঠানে বিশেষ জাঁকজমক দেখা গেল। দেখতেও যেমন চমৎকার, গান-বাজনার ব্যবস্থাও তেমনি অপূর্ব, তবে আমার কাছে অনুষ্ঠানের বেশির ভাগই দুর্বোধ্য। মনে হল বিশপ লিওনাইডি উপস্থিত ছিলেন এবং 'কমিউনিয়ন', অর্থাৎ পবিত্র যোগের সময়ে তিনিই প্রধান ভূমিকা নিলেন, একটিমাত্র শিশু প্রসাদ গ্রহণ করল, উপস্থিত আর কেউ নয়! উপাসনা শেষ হয়ে গেলে, ভারি চিত্তাকর্ষক এক দৃশ্য দেখলাম: বেদীর সামনে বিশপ তাঁর জমকালো পোশাক খুলে ফেললেন, তার পর সাদাসিধা একটা কালো জোব্বা পরে সকলের সামনে বেরিয়ে এলেন, লোকরাও তাঁর হাতে চুমো খাবার জন্য, তাঁর চারি দিকে ভিড় জমাল।

ব্রেক্‌ফাস্টের পর যখন মনে হল সারা দিন বৃষ্টি পড়বে, আমরা ঠিক করে ফেললাম মন্দির অট্টালিকা ইত্যাদির ভিতর দিকটা দেখব। সামান্য কথা দিয়ে তার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। সেন্ট ব্যাসিলের গির্জা দিয়ে শুরু করলাম; বাইরেও যেমন, এখন ভিতরটাও তেমনি উদ্ভট এবং যে গাইড আমাদের সব দেখাচ্ছিল, তার মতো বিশ্রী গাইডও আমি কখনো দেখি নি। গোড়ায় তার মতলব ছিল যে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে আমাদের সব দেখিয়ে দেবে। তার পর যখন দেখল অত তাড়াতাড়ি হাঁটা আমাদের দিয়ে হবে না, তখন সে চাবি ঝন্‌-ঝন্ করতে, শুনিয়ে শুনিয়ে উস্‌-খুস্ করতে, জোরে জোরে গান গাইতে আর রুশ ভাষায় আমাদের চুটিয়ে গাল পাড়তে আরম্ভ করল। একরকম বলতে গেলে আমাদের কলার ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া সব করল। কিন্তু স্রেফ্ ট্যাঁটামি করে আর কালা সেজে আমরাও দিব্যি আরাম করে গির্জাটি আর শুধু একটা গির্জা কেন, একই ছাদের তলায়

বেশ কয়েকটি গির্জা দেখে নিতে পারলাম। প্রত্যেকটির নিজস্ব কতকগুলো বিশেষত্ব ছিল, তবে ঐ সোনালি স্ক্রীন, গম্বুজ পর্যন্ত দেয়াল জুড়ে রঙ-চঙে ফ্রেস্কো সব জায়গাতেই দেখলাম।

তার পর আমরা ট্রেজারি অর্থাৎ ধনাগারে গেলাম। সেখানে এত সিংহাসন, মুকুট আর গয়নাগাটি দেখলাম যে মনে হতে লাগল কোনো বনে এত ফুল হয় না। কয়েকটা সিংহাসন ইত্যাদিতে বাস্তবিকই বৃষ্টির মতো মুক্তোর ঝালর ঝুলছিল।

এর পর আমাদের রাজপ্রাসাদ দেখানো হল, সেটি দেখবার পর বোধ হয় আর সব রাজবাড়িকেই ক্ষুদে গরিবখানা মনে হবে। পা ফেলে ফেলে একটা সভাঘরের মাপ নিলাম, আমার হিসাবে মনে হল আশি গজ লম্বা আর পঁচিশ-ত্রিশ গজ চওড়া। এই মাপে অন্তত দুটি ঘর ছিল, তাছাড়া বড়ো ঘর আরো ছিল, খুব উঁচু উঁচু সব ঘর, জমকালো করে সাজানো, মেঝেতে স্যাটিন কাঠের নকশা বসানো, ছাদে ফ্রেস্কো করা, সব জায়গায় প্রচুর সোনার জল লাগানো ; বাস করবার ঘরগুলোর দেয়ালে নকশা করা কাগজের বদলে রেশম কিম্বা স্যাটিন লাগানো ; সব ঘরে এমন সব আসবাব আর সাজসজ্জা যে মনে হল তাদের মালিকের ঐশ্বর্যের শেষ নেই।

সেখান থেকে "স্যাক্রিস্টি" দেখতে গেলাম, এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্র তৈজসপত্রাদি থাকে। সেখানে পুরু করে মণিমুক্তো বসানো অসীম মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, ক্রুশ, আইকন ছাড়া আরো দেখলাম তিনটি বিশাল হাঁড়ি তাতে করে পবিত্র তেল তৈরি করা হয়, খৃস্টধর্মে দীক্ষার সময় এই তেলের দরকার হয়, এখান থেকে আরো ষোলোটি বিশপের গির্জায় এই তেল জোগান দেওয়া হয়।

ডিনারের পর আগে থেকেই যেমন ঠিক করা ছিল, মিঃ পেনির কাছে গেলাম, তিনি আমাদের একটা রুশ বিয়ে দেখতে নিয়ে গেলেন। ভারি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে ক্যাথিড্রালের গাইয়েদের মস্ত দল খুব লম্বা আর ভারি চমৎকার ভজন গাইল। চার্চ অফ্ দি অ্যাসাম্পশনের ডীকন অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করলেন, এমন সুন্দর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ আমি কখনো শুনি নি, আস্তে আস্তে ক্রমে গলা চড়তে লাগল, একেবারে হয়তো সাতটি সুরের একেকটির অর্ধেকটুকু, তাই যদি সম্ভব হয়, যেমন পরদাও চড়ছিল

গলার আওয়াজও বাড়ছিল, শেষ সুরটি সমস্ত গির্জাঘরে এমন গম্-গম্ করতে লাগল যে মনে হল বুঝি অনেকগুলি কণ্ঠের ঐকতান শুনছি। একটি মাত্র মানুষের গলা থেকে এমন স্বরের বাহার শোনা যেতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে ছিল।

অনুষ্ঠানের একটি অংশকে, যেখানে বর-কনের মাথায় মুকুট পরানো হল, আমার প্রায় উদ্ভট বলে মনে হল। দুটি জমকালো সোনার মুকুট আনা হল, পুরোহিতমশাই প্রথমে দুটোকে শূন্যে নাড়লেন, তার পর বর-কনের মাথায় চাপালেন, অন্তত হতভাগ্য বরকে মুকুট পরতে হল, কিন্তু কনে ভারি বুদ্ধি করে চুলগুলোকে মাথার ওপর জড়ো করে, তার ওপর ওড়না পরাতে, তার মাথায় মুকুট পরানো সম্ভব হল না, কাজেই এক বন্ধু সেটিকে ওর মাথার ওপর ধরে রাখল।

এদিকে বর বেচারা, সাধারণ সান্ধ্য-পোশাক পরে, মাথায় রাজার মতো মুকুট চড়িয়ে, হাতে একটা মোমবাতি ও মুখে পরাজয়ের হতাশার ভাব নিয়ে চলেছে। অতটা হাসি না পেলে তাকে দেখে সকলের করুণা হত।

সবাই চলে গেলে পর পাদরি সোনার ফটকের পিছনে গির্জার পুব দিকটা দেখতে আমাদের ডাকলেন। তার পর সহৃদয়ভাবে করমর্দন ও শান্তি-চুম্বন করে আমাদের বিদায় দিলেন এবং যদিও আমার পরনে ছিল সাধারণ পোশাক, তবু ঐ আদরের ভাগ পেলাম। বাকি সন্ধ্যাটুকু বন্ধুবর মিঃ পেনি ও মিসেস্ পেনির সঙ্গেই কাটালাম।

আগস্ট ৬, মঙ্গলবার—মিঃ পেনি এত ভালো যে আমাদের সঙ্গে বাজারে গেলেন, কোথায় ভালো আইকন ইত্যাদি পাওয়া যায়, দেখিয়ে দিতে। তার আগে আইভান টাওয়ারে চড়ে মস্কো শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম, চার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, রোদ লেগে চুড়ো গম্বুজ ঝকমক্ করছে। সাড়ে পাঁচটার সময়, ওয়ার নামক দুজনের সঙ্গে নিজ্নি নভগরড রওনা হয়ে গেলাম। আরম্ভ থেকে শেষপর্যন্ত বড়োই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু পৌঁছে মনে হল সব কষ্ট সার্থক হয়েছে। বন্ধুরা তাদের সরকার-মশাইকে নিয়ে এসেছিলেন, সে ফরাসী আর রুশ দুটো ভাষাই জানত, ওখানকার মেলায় জিনিসপত্র কেনার সময় তাতে আমাদের ভারি সুবিধা হয়েছিল। এই লাইনের গাড়িতে শোবার জায়গার ব্যবস্থা বলে কোনো

জিনিস নেই, কাজেই সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যেমন করে পারি নিজেরাই বন্দোবস্ত করে নিলাম। যাওয়ার সময় এবং ফিরবার সময়, দুবারই আমি মাটিতে বিছানা পেতে শুলাম।

একদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে পর দিন বেলা বারোটার পর অবধি লম্বা যাত্রার একঘেয়েমি কাটাবার সুযোগ মাত্র একবারই হয়েছিল, যখন এক জায়গায় রেলের পুল স্রোতে ভেসে যাওয়াতে, গাড়ি থেকে নেমে একটা সাময়িক সাঁকোর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। তার মানে মুষল-ধারে বৃষ্টি মাথায় করে দুই-তিনশো লোক মাইলখানেক পথ ট্যাঙস্-ট্যাঙস্ করে হেঁটেছিলাম। একটা দুর্ঘটনার দরুন আমাদের গাড়ির দেরি হয়ে গেছিল, যদি আমাদের পূর্ব পরিকল্পনামতো কাজ করতাম, তা হলে মেলা দেখবার জন্য হাতে মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় থাকত। আমরা সকলেই একমত যে এত খরচ করেই যখন আসা হয়েছে, এর কোনো মানে হয় না, কাজেই কোথাও রাতে শোবার বন্দোবস্ত করে, আরেকটা দিন থেকে যাওয়াই ভালো।

আমরা স্মেরনোভায়া কি ঐরকম নামের একটা হোটেলে গেলাম, অতি জঘন্য জায়গা, যদিও নিঃসন্দেহে ওখানকার শ্রেষ্ঠ হোটেল। খাওয়া-দাওয়া চমৎকার, বাকি সব-কিছু সাংঘাতিক। তবে এই মনে করে খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে যখন খেতে বসলাম, ওখানকার ছয়-সাতজন ওয়েটারের সজীব কৌতূহলের কারণ হয়ে উঠেছিলাম। এই ওয়েটারদের গায়ে সাদা টিউনিক, সাদা পেন্টেলুন আর কোমরে বেল্ট আঁটা। তারা সকলে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে ভোজনরত এই কটি অদ্ভুত জীবকে মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। থেকে থেকে ওদের একটু বিবেক দংশন করছিল, ওরা ভাবছিল যে আর যাই করুন ওয়েটারদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য এতে সাধিত হচ্ছে না, তখন ওরা সকলে দল বেঁধে ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে একটা বড়ো দেরাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল, তাতে আবার কাঁটা চামচ ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হল না। আমরা কিছু চাইলে, প্রথমে ওরা শঙ্কিতভাবে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছিল, তার পর যখন স্থির করে ফেলল আমাদের ফরমায়েস কে সব চাইতে ভালো বুঝবে, তখন সকলে তার উদাহরণ অনুসরণ করছিল, অর্থাৎ প্রত্যেকবার সেই বড়ো দেরাজের কাছে ব্যস্ত হচ্ছিল। বিকেলের বেশির ভাগ সময় মেলায় ঘুরে, আইকন ইত্যাদি কিনে কাটানো গেল।

মেলাটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার। পারস্যদেশীয়, চীনে ইত্যাদিদের জন্য জায়গা আলাদা করা ছিল, তবু কত যে অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত দেখা হতে লাগল সে আর কি বলব, তাদের গায়ের রঙ অস্বাস্থ্যকর, পোশাক অভূতপূর্ব। পারস্যদের মুখ কোমল, বুদ্ধিদীপ্ত, টানা টানা দুই চোখের মাঝে অনেকখানি ফাঁক, কালো চুল, হলদেতে মেটেতে রঙ, মাথায় কালো পশমের ফেজ্ টুপি, অনেকটা গ্রেনেডিয়ার গার্ডদের টুপির মতো, সকলের মধ্যে এই পারস্যরাই সব চাইতে চিত্তাকর্ষক। কিন্তু সেদিনের সমস্ত নূতনত্বের মোহ, আমাদের সন্ধ্যা-বেলাকার অভিজ্ঞতার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সেই সময় ওখানকার একমাত্র তাতার মস্কের একজন কর্মচারি আজান ডাকবার জন্য মসজিদের ছাদে বেরিয়ে এলেন, আমরাও ঠিক তখনি সেখানে পৌঁছলাম। এ ব্যাপার সেরকম কিছু অভূতপূর্ব না হলেও, এর নূতনত্বের ও বিরলতার জন্যই আমাদের কাছে ভারি চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। ঐ আজান ডাকটির মতো কিছু আমি কোনোদিনও শুনি নি। প্রত্যেকটি বাক্য শুরু হচ্ছিল দ্রুত একটানা সুরে, শেষের দিকে গলা চড়তে চড়তে দীর্ঘ একটা একটানা তীক্ষ্ণ বিলাপের মতো শোনাচ্ছিল। নিস্তব্ধ শূন্যে সেই সুরটাকে অবর্ণনীয় রকম করুণ আর ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল। রাতে শুনলে পেত্নীর চীৎকারের মতো গায়ে কাঁটা দিত।

একটু পরেই উপাসকরা ঐ ডাক শুনে দলে দলে এসে উপস্থিত হল, ভিতরে প্রবেশ করার আগে প্রত্যেকে জুতো খুলে রাখল। প্রধানমন্ত্রী আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার অনুমতি দিয়ে-ছিলেন। উপাসনার পদ্ধতি দেখলাম মক্কার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো, তার পর হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে গলিচের ওপর কপাল ঠেকানো, এইরকম বার দুই করে আবার কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি। বাড়ি ফেরার পথে একটা গির্জায় গেলাম, সেখানে ওখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক আইকন, মোমবাতি, ক্রুশ চিহ্ন আঁকা আর মাথা নিচু করা সহকারে সান্ধ্য-উপাসনা হচ্ছিল।

সন্ধ্যাবেলায় ওয়ার ভাইদের ছোটোজনের সঙ্গে নিজ্নি থিয়েটারে গেলাম, এমন নিরাভরণ থিয়েটার হল্ দেখি নি, চুণকাম ছাড়া থিয়েটারের ভিতরে কোনো সাজসজ্জা ছিল না। খুব বড়ো হল্, তার দশ ভাগের এক ভাগও ভরে নি, কাজেই বিশেষ আরামে ঠাণ্ডায় বসা গেল।

অভিনয় হল আগাগোড়া রুশ ভাষায়, কাজেই আমাদের বুঝবার ক্ষমতার বাইরে, তবে যখনি বিরতি হচ্ছিল, তখনি একটা ছোট্টো অভিধানের সাহায্যে প্রোগ্রামটার মানে উদ্ধার করে, বিষয়বস্তুটি খানিকটা বোধগম্য হয়েছিল। সেদিনের প্রথম ও সব চাইতে ভালো নাটক ছিল "আলাদীন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ", একটি প্রহসন, কেউ কেউ বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করেছিল, নাচ-গানের অংশও বেশ উপভোগ্য। অভিনেতাদের সকলের মন নাটকের এবং অন্যান্য চরিত্রের দিকে নিবদ্ধ, দর্শকদের সম্বন্ধে উদাসীন, এরকম আমি কখনো দেখি নি। যে আলাদীনের ভূমিকায় নেমেছিল, তার নাম লিয়েন্স্কি, তাকে আর অন্য একটি নাটকে সরোলিনা বলে একজন অভিনেত্রীকেই আমাদের সব চাইতে ভালো বলে মনে হয়েছিল। অন্য নাটক দুটির নাম "কোচিন চায়না" আর "হুশার কন্যা"।

আগস্ট ৭, বুধবার—রাত কাটালাম যে বিছানায় সেগুলি হল একেকটা তক্তার ওপর এক ইঞ্চি পুরু তোষক, একটি করে বালিশ, একটি চাদর, একটি লেপ। সকালে ব্রেকফাস্টের প্রধান পদ ছিল স্টারলেট বলে ভারি সুস্বাদু একরকম মস্ত মাছ, তার আবার প্রায় কাঁটাই ছিল না বলতে গেলে। তার পর ক্যাথিড্রাল আর মিনিন টাওয়ার দেখতে গেলাম। ক্যাথিড্রালে দেখলাম ঘটা করে ভোরের অনুষ্ঠান চলছে, সাদা বাড়িটি মিলিটারিতে ঠাসা; একটুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, খুব ভালো গান শুনলাম।

মিনিন টাওয়ার থেকে সমস্ত শহরটার চমৎকার দৃশ্য আর ভল্‌গা নদী কেমন এঁকে-বেঁকে অস্পষ্ট সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, দেখলাম। তার পর আরেকবার বেড়িয়ে, বেলা তিনটের সময় বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আগের বারের চাইতে সম্ভব হলে এ-যাত্রাটা যেন আরো বেশি কষ্টকর মনে হল। পরদিন সকালে নয়টার সময় মস্কো পৌঁছলাম, ক্লান্ত দেহে, কিন্তু যা দেখেছি যা শুনেছি তার ফলে আনন্দিত চিত্তে।

আগস্ট ৯, শুক্রবার—আজকের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সিমনফ্ মন্যাস্টারি যাওয়া, এবারও ওয়াররা সঙ্গে ছিল। ৩৮০ ধাপ সিঁড়ি উঠে, একটা চুড়োর মাথা থেকে—আমার মতে স্প্যারো হিলের চাইতেও মস্কোর চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। মন্যাস্টারির প্রার্থনাগৃহ,

সমাধিক্ষেত্র, ভোজনাগার দেখলাম। প্রার্থনা-গৃহগুলিতে চমৎকার ফ্রেস্কোর সাজ দেখলাম, একটিতে একটা অদ্ভুত ছবি দেখলাম, প্রায় উদ্ভটও বলা যায়। তার বিষয়বস্তু হল বাইবেলে লেখা সেই কথা: "আমরা অপরের চোখের ধূলিকণাটুকু দেখতে পাই, কিন্তু নিজেদের চোখের লক্ষ লক্ষ ধূলিকণাযুক্ত সূর্যকর দেখতে পাই না।"

সাধুদের ব্রাউন রুটি খেয়ে দেখলাম, খুব একটা উপাদেয় না হলেও বেশ খাওয়া যায়। সন্ধ্যায় জ্যেষ্ঠ ওয়ার আমার সঙ্গে মস্কোর লিট্‌ল্ থিয়েটারে গেল—আসলে সেটি একটা চমৎকার মস্ত বাড়িতে। অনেক দর্শক ছিল, নাটকগুলোর নাম "বার্গোমাস্টারের বিয়ে" আর "নারীর গোপন কথা।" এগুলি দেখে দর্শকরা খুব খুশি, কিন্তু আমার মতে "আলাদীনের" ধার-কাছে যায় না। সবই রুশ ভাষায় হল।

আগস্ট ১০, শনিবার—পরিচয়-পত্র নিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা করে সকালটা কাটালাম। কিন্তু কেউ বাড়ি ছিল না। বিকেলে গাড়ি চড়ে পেট্রোভ্‌স্কি প্যালেসে গিয়ে, ওখানকার পার্কে বেড়ালাম। প্রাসাদটার রঙ উগ্র লাল আর সাদা, ফলে দেখতে হয়েছে অতি কদাকার।...মিঃ আর মিসেস কোম্ব আর তাঁদের ভাগ্নী মিস্ নেটলির সঙ্গে আলাপ করার উদ্দেশ্যে মিঃ পেনির সঙ্গে ডিনার খেলাম। পরে সকলে মিলে সিমনফ্ মন্যাস্টারিতে গেলাম। সেখানে অতি লম্বা কিন্তু চমৎকার অনুষ্ঠান শুনলাম। একটা নতুন জিনিসও দেখলাম: প্রধান আচার্য গস্পেলের গ্রন্থটি এনে তুলে ধরলেন আর প্রথমে উপাসকরা সকলে, তার পর সাধরা এগিয়ে এসে গ্রন্থটিকে চুম্বন করলেন। তার পর আচার্য বইটিকে একটা ডেস্কের ওপর রেখে, তার পাশে দাঁড়ালেন আর বাকি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে প্রথমে বইটিতে, তার পর তাঁর হাতে চুমো খেলেন।

আগস্ট ১১, রবিবার—সকালে ইংলিশ চার্চে উপাসনায় গেলাম, লিডন আচার্যের আসন নিয়েছিল। সেখান থেকে মিঃ পেনির সঙ্গে বিশপ লিওনাইডির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি মস্কোর একজন বিশেষ বিশপ, প্রিন্স অরলফ তাঁকে দেবার জন্য লিডনের হাতে একটা পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। তাঁর সাদর অভ্যর্থনায় আর কোমল চিত্তাকর্ষক ব্যবহারে আমরা একেবারে মুগ্ধ। এরকম ব্যবহার পেলে মুহূর্তের

মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক ছিলাম ; বিদায় নেবার আগে কাল তাঁর সঙ্গে ট্রয়ট্সা যাবার কথা হল, এই আশাতে যে হয়তো প্রধান বিশপ, আর্চ-বিশপ ফিলোরেটের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তার পর আমাদের অতিথিবৎসল বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার খেতে ফিরে এলাম। তাঁদের সঙ্গে ট্র্যাস্নয়ের নান্দের মঠে গেলাম। দেখলাম নান্দের হাতেই সঙ্গীতের সমস্ত ভার—অবশ্য বলাই বাহুল্য অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ অংশ পুরোহিত নিজে সম্পাদন করলেন। কিন্তু পাঠগুলি সবই নান্‌রা করলেন ; অনেকগুলি পাঠ ছিল, মাঝে মাঝে গাইয়ের দল থেকে উঠে এসে নান্‌রা পাঠিকাকে ঘিরে বসছিলেন। কয়েকজনকে দেখে তো খুব কমবয়সী মনে হল, একজনের বয়স তো বারোর নীচে বলে মনে হল। সঙ্গীতাংশটুকুকে অন্যান্য যে-সব গির্জায় গেছিলাম, সেইরকমই মনে হল, তফাত হল যে খালি গলায় শুধু মেয়েদের গান অপূর্ব শুনতে হয়েছিল। পেনিদের সঙ্গে চা খেলাম এবং সেখানেই সান্ধ্য-উপাসনায় যোগ দিলাম, অবশেষে ক্রেম্লিনের ছাদে ঘুরে বেড়ালাম, সেখান থেকে শীতল সন্ধ্যা, অপূর্ব দৃশ্য, চার দিকে সুদূর-বিস্তৃত চমৎকার সব বাড়ি দেখে বড়ো ভালো লাগল।

আগস্ট ১২, সোমবার—আজ নানান কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস দেখলাম। সাড়ে পাঁচটায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে, সাতটার পর রেলে ট্রয়ট্সা মন্যাস্টারি দেখতে রওনা হয়ে গেলাম, সঙ্গে বিশপ লিওনাইডি আর মিঃ পেনি। বিশপ খুব বেশি ইংরিজি জানতেন না, তবু সহযাত্রী হিসাবে ভারি গপ্পে আর আমুদে। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন ক্যাথিড্রালের উপাসনা শুরু হয়ে গেছিল, কিন্তু বিশপ আমাদের সেই ঘন ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, পাশের একটা ছোটো ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখান থেকে চ্যান্সেলে যাবার পথ ছিল ; উপাসনার সময় আমরা সেখানেই রইলাম এবং একটি বিরল সুযোগ পেয়ে গেলাম, পাদরিদের যোগ করার দৃশ্য দেখতে পেলাম, এই ক্রিয়ার সময় সর্বদা চ্যান্সেলের দরজা বন্ধ করে, পরদা টেনে দেওয়া হয়, সাধারণ উপাসকরা কিছু দেখতে পায় না। ভারি জটিলতাপূর্ণ ক্রিয়া, ক্রমাগত বুকে ক্রুশ আঁকা, যা কিছু তৈজসপত্র ব্যবহার করা হবে, তার সামনে ধূপদানি দোলানো ; কিন্তু ওদের প্রগাঢ় ভক্তি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে একজন পাদরি একটি

পাত্রে করে ছোটো-ছোটো রুটি নিয়ে এসে, আমাদের প্রত্যেককে একটি করে দিলেন। এই রুটি ছিল মন্ত্রপুত এবং আমাদের ঐ রুটি দেওয়ার অর্থ হল যে প্রার্থনার সময় তাঁরা আমাদের স্মরণ করেছেন।

ক্যাথিড্রাল থেকে বেরিয়ে আসতেই, সাধুদের একজন আমাদের স্যাক্রিস্টি আর ছবি, ফটোগ্রাফের ঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলেন। অনেকগুলি ছেলে এই দুটি জিনিস শিখে, তাদের সমস্ত বিদ্যা গির্জার কাজে নিবেদিত হয়। আমাদের সঙ্গে একজন রুশ ভদ্রলোক গিয়েছিলেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে গির্জার মধ্যে ছিলেন; এই ভদ্রলোক আমাদের কাছে ফরাসী ভাষায় সব-কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা আইকন ইত্যাদি কিনতে চাইলে, দাম জেনে রেজকি মিলিয়ে দিচ্ছিলেন। উনি আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলে পর, তবে আমরা শুনলাম কে আমাদের এত সাহায্য করলেন, আমার তো মনে হয় কোনো ইংরেজ কখনোই বিদেশীকে এত সৌজন্য দেখাত না। তাঁর নাম প্রিন্স চিরকফ্।

ছবি আঁকার ঘরে অনেকগুলি অপূর্ব সুন্দর আইকন দেখলাম, কতকগুলো কাঠের ওপর আঁকা, কতকগুলো ঝিনুকের ওপর। সবই এত সুন্দর যে কোনটা ফেলে কোনটা কিনব সেই হল এক সমস্যা। শেষ পর্যন্ত একেকজন তিনটি করে কিনলাম, সংখ্যার সীমানা ধরার কারণটি সুবুদ্ধি নয়, সময়ের অভাব।

স্যাক্রিস্টিটি একটি রত্নের খনি বিশেষ—গহনা, সূচিকর্ম, ক্রুশ, বাসনপত্র ইত্যাদি। সেখানে একটি বিখ্যাত পাথর দেখলাম, পালিশ করে সেটিকে আইকনের মতো করে বাঁধানো হয়েছিল। ঐ পাথরের পরতের মধ্যে দেখে মনে হয় ঠিক যেন একজন সাধু একটি ক্রুশের সামনে প্রার্থনা করছেন। আমি জিনিসটি খুব মন দিয়ে দেখলাম, কিন্তু এমন একটা জটিল ব্যাপার যে স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকে সম্ভব হতে পারে, এ আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।

বিকেলে আর্চ-বিশপের প্রাসাদে গেলাম, বিশপ লিওনাইডি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর্চ-বিশপ রুশ ভাষা ছাড়া আর কিছু জানতেন না। কাজেই তাঁর সঙ্গে লিডনের কথাবার্তাটি এক-ঘণ্টাব্যাপী এবং ভারি কৌতূহলের ব্যাপার হলেও, ভারি অভিনব ভাবে সম্পন্ন হল। আর্চ-বিশপ রুশ ভাষায় কোনো মন্তব্য করলেন, বিশপ সেটিকে ইংরিজিতে তর্জমা করে লিডনকে বললেন; লিডন উত্তর দিল ফরাসী ভাষায়, বিশপ তার

রুশ তর্জমা আর্চ-বিশপকে বললেন। কাজেই দুই ব্যক্তির কথাবার্তা তিনটি ভাষায় সম্পন্ন করতে হল।

বিশপ সদয়ভাবে একজন ফরাসী-জানা থিয়লজির ছাত্র জোগাড় করেছিল, সে আমাদের ঘুরিয়ে সব দেখাল। ভারি যত্ন করেই দেখাল, ঋষিদের ভূ-গর্ভস্থ সেল্-এ নিয়ে গেল, তাঁরা অনেকে সেখানে বহু বছর আছেন। দুটি সেল্-এর বন্ধ দরজা দেখলাম, সেই দুটি সেল্ই মানুষের বাস। ভাবতেও অদ্ভুত এবং অস্বস্তিকর লাগছিল যে অন্ধকার ঘুট্ঘুটে সরু একটা প্যাসেজে, যাতে ঢুকতে হলে মোমবাতির দরকার হয়, তার মধ্যেও মানুষ বাস করেন, ছোটো একটি প্রদীপের আলোয় তাঁরা একাকী নীরবে দিন-রাত কাটান।

রাতের গাড়িতে বিশপের কাছে ফিরে গেলাম, আমাদের বিদেশ-ভ্রমণের মধ্যে এই দিনটি স্মরণীয়।

ট্রয়ট্সা ইন্-এ ডিনার খাবার সময়, রুশ-দেশের দুটি বিশেষ জিনিস জোগাড় করা গেল। একটি হল পাহাড়ি গাছের ছোটো বেরি থেকে তৈরি একরকম তেতো পানীয়, খাবার আগে সেটি পান করলে নাকি খাওয়ায় রুচি হয়। পানীয়টার নাম "পি হোবো" (রুবিনফ্)। দ্বিতীয়টি হল "শচি" বলে একরকম সুরুয়া। তার সঙ্গে এক জগ্ টক দই গুলে খেতে হয়।

আগস্ট ১৩, মঙ্গলবার—আজ হল 'জল আশীর্বাদের' দিন, খুব বড়ো অনুষ্ঠান, খানিকটা ক্যাথিড্রালে, খানিকটা নদীর ধারে সম্পন্ন হয়। সকাল নয়টায় শুরু, আমার তো সাড়ে নটার আগে কাপড়চোপড় পরাই হয়ে উঠল না, কাজেই ব্রেকফাস্ট বাদ দিলাম। আগে গেলাম গির্জায়, কিন্তু সেখানে এমনি ভিড় যে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে, নদীর ধারে অপেক্ষামান জনতার মাঝখানে জায়গা করে নিলাম, শোভাযাত্রা দেখা উদ্দেশ্য। এগারোটার আগে শোভাযাত্রা পৌঁছল না, তার পর সেটি ফেরা অবধি অপেক্ষা করলাম। নদীর ধারের অনুষ্ঠানের কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু শোভাযাত্রাটি দেখবার মতো বটে। আগে আগে এক সারি পতাকা—অবশ্য তাকে যদি পতাকা বলা যায়—চলল, একেকটি বইতে তিনজন লোক লাগল, ডাণ্ডাগুলো পনেরো ফুট উঁচু, পতাকাগুলো অনেকটা গোল গোল ঢালের মতো করে তৈরি, তার চার দিক ঘিরে সূর্য কিরণের মতো ছটা আঁকা, মধ্যিখানে একটি ক্রুশ কিম্বা আইকন।

এইরকম ত্রিশ চল্লিশটি পতাকা দেখলাম। তার পর লম্বা সারি বেঁধে পাদরি, ডীকন ইত্যাদি, সকলের গায়ে কারুকার্য করা লম্বা লম্বা "ক্লোক" এবং অন্যান্য সাজসজ্জা, কেউ কেউ বুকের ওপর আইকন ঝুলিয়ে চলেছেন—তার পর বড়ো-বড়ো মোমবাতি আর আইকনধারীরা—তার পর পুরো সাজগোজ করা চারজন বিশপ এবং অনুচর পাদরিরা—তার পর লাল নীল ইউনিফর্ম পরা দলে দলে পুরুষ ও কিশোর গান গাইতে গাইতে চলেছে। দেখবার জন্য বহু লোক জমায়েত হয়েছিল, কিন্তু সবাই সভ্য-ভব্য, হাসিখুশি। একবার মাত্র কিছুটা অনিয়ম দেখেছিলাম, যখন শোভাযাত্রার একেবারে শেষের দিকে একজন ডীকন নদী থেকে এক ঘড়া জল তুলে এনেছিলেন। কাছাকাছি যারা ছিল, সকলে হুড়্মুড়্ করে এগিয়ে এসেছিল, ঘড়াকে ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করবার জন্য, ফলে চার দিকে জল ছিটোল, দর্শকদের গা ভিজল এবং প্রায় সবটাই পড়েও গেল। যখন ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য হাজির হলাম, তখন প্রায় সাড়ে বারোটা।

সারা দিনটাকে উৎসবের মতো পালন করা হল, বিকেলে হেঁটে মেলা দেখতে গেলাম। মেলায় কোনো রুশভাব দেখতে পেলাম না, এক যদি যে-সব লোকরা মস্ত এক চাকায় ঝোলানো কাঠের ঘোড়ার পিঠে চেপে মহানন্দে—যদিও নির্বোধের মতো ঘুরছিল, তাদের বয়সটা ধরা যায়। গুরুগম্ভীর আধাবয়সী লোকরা তাদের মধ্যে কারো কারো গায়ে মিলিটারি পোশাক—ঐ মস্ত এক-সময় ঘোড়ার মতো দেখতে কাঠের জন্তুর দুদিকে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে, নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে ভারি মজা লাগছে। অনেকগুলো ছোটো-ছোটো সার্কাস ছিল, তার বাইরে মস্ত মস্ত ছবি টানানো, তাতে লোকে এমন সব ভঙ্গি করছে, হাত-পার সব জোড়া খুলে গেলেও যা কখনোই সহজে সম্ভব হত না, অবশ্য ছবি দেখেও তাই মনে হচ্ছিল। ছোটো-ছোটো দোকানে খাবার জিনিস বিক্রি হচ্ছিল, তাই দেখে মনে হচ্ছিল উৎসবের দিনে কাঁচা মাছ আর শুকনো নিম-বিচি খেতে হয়।

বিকেলে চিড়িয়াখানায় গেলাম, পশু-পাখি দেখা হলে, প্রদীপের মালা দিয়ে সাজানো গাছতলায় বসে টিরলের গাইয়েদের গান শুনলাম। বড়ো ভালো লাগল।

আগস্ট ১৪, বুধবার—সকালে ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে গেলাম মস্কো ট্রাকটিরে রুশ পানীয় সহকারে পাকা রুশ খানা খেলাম। তার পদগুলির বর্ণনা দিচ্ছি :

সুরুয়ার নাম 'সুপ-ঈ-পিরাশকি'। টলটলে সুরুয়া, তাতে তরকারির কুচি আর মুরগির ঠ্যাং দেওয়া ; সেই সঙ্গে 'পিরাশ্‌কি' খেতে হয়, অর্থাৎ শক্ত করে সেদ্ধ করা ডিমের প্যাটি।

তার পর এল 'পারাসাইনক', অর্থাৎ টুকরো ঠান্ডা পোর্ক, তার সঙ্গে মুলো বাটা আর ক্রীম দিয়ে তৈরি একটা সস্‌।

তার পর খেলাম 'অ্যাসেট্রিনা', স্টার্জন মাছ, এও ঠান্ডা খেতে হয়, সঙ্গে থাকে ছোটো-ছোটো চিংড়ি, জলপাই, লংকা ইত্যাদি আর খানিকটা ঘন ঝোল।

কাটলেট খেলাম, বোধ হয় ভীলের। তার পর খেলাম মারাজেন্‌সি, অর্থাৎ আইস-ক্রীম—অতি উপাদেয় সামগ্রী, একটাতে লেবু, একটাতে ব্লাক্‌-কারেন্ট দেওয়া, এরকম কখনো খাই নি।

ক্রাইমিয়ার পানীয়গুলি ভারি সুস্বাদু। বাস্তবিকই ঐ স্টার্জন মাছের ব্যাপারটা বাদ দিলে, অতি উপাদেয় ডিনার।

আজকাল যেমন প্রায় রোজ করে থাকি, সন্ধ্যাটা আমাদের অতিথি-পরায়ণ বন্ধু মিঃ আর মিসেস্‌ পেনির সঙ্গে কাটালাম। ওঁদের বাড়ি যাবার আগে স্ট্র্যাট্‌স্‌নি মন্যাস্টারি দেখতে গেলাম, সেখানকার সমাধি-ক্ষেত্রটি বড়ো সুন্দর। সব সমাধিই সৌন্দর্য ও সুরুচির পরিচয় দিচ্ছিল, একটিতে কাচে ঢাকা একটা সত্যিকার প্রদীপ জ্বলছিল।

আগস্ট ১৫, বৃহস্পতিবার—নিউ জেরুসালেমের মন্যাস্টারি দেখতে যাব ভোরের ট্রেনে তাই ছয়টা নাগাদ ব্রেকফাস্ট খেলাম। মন্যাস্টারির পিছনে তাঁর বাড়ি যাবার পথে, মিঃ স্মিয়ার বলে মিঃ পেনির এক বন্ধু আমাদের সঙ্গে যাবেন বলেছিলেন। ভেবেছিলাম ব্যাপারটা একদিনেই সারতে পারব, কিন্তু দেখা গেল এ ধারণাটা একেবারে ভুল।

রেলযাত্রাটুকু বেলা দশটা নাগাদ শেষ হল। তার পর একটা 'টারাণ্টাস' ভাড়া করলাম। পুরনো বারুশ-গাড়ির বডিটা যদি দ্বিগুণ লম্বা করে দিয়ে, স্প্রিংগুলো খুলে নেওয়া যে, তা হলে অনেকটা টারাণ্টাসের মতো হত। এই গাড়িতে চড়ে আমার অভিজ্ঞতায় সব চাইতে জঘন্য

রাস্তার ওপর দিয়ে আমরা ঘটর্‌-ঘটর্‌ করে চললাম। কোথাও চাকা বসার দাগ, কোথাও নালা-নর্দমা, কোথাও হাঁটু অবধি কাদা, কোথাও সাঁকো বলতে কতকগুলো এবড়ো-খেবড়ো গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে জুড়ে রেখেছে। তিনটে ঘোড়ার সাহায্যেও ঐটুকু যেতে তিন ঘণ্টা লাগল।

মিঃ ম্যুরি বলে এক ভদ্রলোকের পরামর্শ মতো, পথে এক চাষীর বাড়িতে দুধ রুটি খেতে চাইলাম এবং সেই সুযোগে তাদের বাড়িঘর ও জীবনযাত্রার ধরনধারণ দেখে নিলাম। ঐ কুটিরে দুজন পুরুষ, একজন বুড়ি আর ছয়-সাতটি নানান বয়সের ছেলে থাকে। ওদের বাড়ির কালো রুটি আর দুধ বড়োই ভালো। রুশ চাষীর ঘরদোর নিজের চোখে দেখে ভালো লাগল। দুটি নকশা এঁকে নেবার চেষ্টা করেছিলাম, বাড়ির ভিতরের একটা, বাইরের একটা; বাইরের ছবিতে ছটি ছেলেকে আর একটি ছোটো মেয়েকে বসিয়ে দিয়েছিলাম। ফটো তুলতে পারলে খুব ভালো হত, আমার হাতে আঁকা ছবি তেমন উতরল না।

বেলা দুটোর আগে মন্যাস্টারি সংলগ্ন গ্রামটিতে পৌঁছতে পারলাম না। সেখানে গিয়েই শুনলাম যে সেই রাত্রের মধ্যে মস্কো পৌঁছতে হলে, আবার তিনটের সময় রওনা হয়ে যেতে হবে। কাজেই তাড়াতাড়ি করে 'চার্চ অফ্ দি হোলি সেপাল্‌কার'টি দেখে নিলাম। সেখান থেকে গাড়ির আড্ডায় খবর পাঠালাম যে গাড়িতে তাজা ঘোড়া জুতে রাখতে। শুনেছিলাম ওখানে তাজা ঘোড়া পাওয়া যায়। এইখানে আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। গাড়ির আড্ডায় ফিরে দেখি ফেরার কোনো বন্দোবস্তই হয় নি—তাজা ঘোড়া-টোড়া নেই। আছে শুধু আমাদের ক্লান্ত ঘোড়া তিনটে, যারা আমাদের এত দূর টেনে এনেছে। গাড়ির চালক আর আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই একবাক্যে বলল—হড়বড় করে রুশ ভাষায়, যা একমাত্র মিঃ স্পিয়ারই বুঝলেন—যে ফেরার ব্যবস্থা আজ হতে পারে না। কাজেই ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে, আমরা মিঃ স্পিয়ারকে ধরে হোটেলে এনে, আমাদের জন্য ডিনার, চা, রাতে শোবার ব্যবস্থা, ভোর তিনটেয় ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করিয়ে নিলাম।

উনি আমাদের আশ্বাস দিলেন যে এখানে নাকি এমন একজনও নেই যে রুশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বলে। উনি যখন হোটেলের দরজায় আমাদের ছেড়ে, গাড়ি চেপে চলে গেলেন, তখন আমাদের মনের ভাব যতটা রবিনসন ক্রুসোর মতো হতাশায় পূর্ণ হয়েছিল, তেমন এ যাত্রায়

আর কখনো হয় নি। হোটেলের চাকর আমাদের পথ দেখিয়ে আবার গির্জায় নিয়ে গিয়ে, একজন রুশ সাধুর হাতে সঁপে দিল, একেবারে খাঁটি পদার্থ ইনি, রুশ ছাড়া অন্য ভাষা সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁকে আমার অভিধানের একটা বাক্য দেখালাম, "এখানে কি এমন কেউ আছেন, যিনি জর্মান, ফরাসী কিম্বা ইংরিজি জানেন?" ঐ ছোট্টো বাক্যটার ফলেই আমাদের ভাগ্য ফিরে গেল। উনি তখুনি আমাদের আরেকজন সাধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, যিনি ভারি আশ্চর্য কিন্তু বেশ বোধগম্য ফরাসী ভাষা বলেন। এই সাধুই আমাদের দেখাশুনা করতে লাগলেন, প্রায় সারাদিন ধরে।

চার্চ অফ্ দি হোলি সেপাল্‌কার আগাগোড়া তিনি দেখিয়ে দিলেন: এর সব চাইতে কৌতূহলের বিষয় হল যে গির্জাটি জেরুসালেমের গির্জার প্রায় হুবহু নকল। তাছাড়া গ্রন্থাগার আর স্যাক্রিস্টিও দেখলাম, ভারি কৌতূহলোদ্দীপক সবই, তবে বিরল কিম্বা বিস্ময়কর কিছু নয়, এক যদি স্যাক্রিস্টিতে রাখা একটা নকল উটপাখির ডিমকে তাই বলা যায়। ডিমটার এক মাথায় একটা ফুটো, তার মধ্যে দিয়ে আলোর দিকে তাকালে একটা প্রায় নিরেট রঙীন ছবি দেখা যায়, একজন মহিলা একটি ক্রুশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন।

এবার হোটেলে ফিরে ডিনার খাবার সময় হয়ে গেল, যাবার আগে ঐ সহৃদয় সাধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে গেলাম যে খাবার পর ফিরে এসে আবার ওঁর খোঁজ করব।

ফিরে এলে সাধু আমাদের তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মরা মানুষের খুলি আর আড়াআড়ি রাখা দুটো হাড় দিয়ে সাজানো একটা খুপরি ঘরের বদলে দেখলাম ভারি আরামের একটি বসবার ঘর, সেখানে একটা চা-পার্টি চলেছে, তাতে যোগ দিয়েছেন দুজন মহিলা, মা মেয়ে, একজন ভদ্রলোক, সম্ভবত মেয়ের বাপ। মা বেশ ফরাসী বলেন, মেয়ে চমৎকার ইংরিজি বলে। সে বলল মস্কোর একটি বিদ্যালয়ে সে ফরাসী ভাষা শেখায়; দেখেই বোঝা গেল মেয়েটি উচ্চশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। এ-রকম পরিবেশ ভারি উপভোগ্য এবং একেবারে সহসা-ঘটিত ও অপ্রত্যাশিত যেন স্বপ্নের মতো। চায়ের পর, সকলে মিলে আবার মন্যাস্টারি দেখতে গেলাম। রাজ-পরিবার এখানে এলে যে-সব ঘর ব্যবহার করেন, সে-সব দেখলাম। এখানে আসেন ওঁরা মাঝে মাঝে। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে

'বেথ্‌লিহেম' বলে একটি জায়গা দেখলাম, ছোটো একটি খুপরি ঘর, যীশু যে-ঘরে জন্মেছিলেন বলে শোনা যায়, তারই অনুকরণে তৈরি। সাধু আমাদের বনের মধ্যে দিয়ে 'হার্মিটেজ' দেখতে নিয়ে গেলেন, বিশপ নিকন যখন স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছিলেন, তখন তিনি এখানে থাকতেন। প্রবেশ পথের পাশে সাধুদের তত্ত্বাবধানে একটা ছোটো দোকান আছে, সেখান থেকে আমরা ত্রিভুজা ম্যাডনার আইকনের ছোটো-ছোটো অনুকরণ কিনলাম। মূল বিশাল আইকনটি ওখানকার একটি প্রার্থনা গৃহে আছে, স্বপ্নে দেখা কুমারী মেরীর আঁকা চিত্র, নীচের দিকে তৃতীয় বাহু ও হাতটি দেখা যাচ্ছে।

বনের মধ্যে 'জর্দান নদী' আর 'বেথেসদার পুষ্করিণী' দেখলাম, ছোটো একটি বাড়ি, মাঝখানে একটি সত্যিকার পুকুর, তাতে ঘাটের সিঁড়ি নেমে গেছে। আরেকটি ছোটো বাড়ি বা বেদী দেখলাম, তার নাম 'সামারিয়ার কুয়ো'। কিন্তু এতাবৎ যা দেখেছি, 'হার্মিটেজ' তার সব-কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। বাইরে থেকে মনে হয় ছোটো একটি বাড়ি, ভিতরে কিন্তু অনেক ঘর, এত ছোটো যে ঘর বলা যায় কি না সন্দেহ, মাঝে মাঝে সরু লম্বা দালান, ঘোরানো সিঁড়ি: শোবার-ঘরটি লম্বায় চওড়ায় ছয় ফুট করে, খাটটি পাথরের তৈরি, বালিশও পাথরের। খাটটি মাত্র পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা, পায়ের দিকে দেয়ালে খোঁদল করা নইলে পা রাখার জায়গা হয় না। বিশপ নিকন ছিলেন লম্বা মানুষ, নিশ্চয় তাঁকে সর্বদা গুড়িশুড়ি দিয়ে শুতে হত। সত্যিকার বাড়ির চাইতে যেন সবটা দেখে একটা খেলার বাড়ি বলে মনে হয়। বিশপের জীবনটাও নিশ্চয় ক্রমাগত কৃচ্ছ্র-সাধনায় পূর্ণ ছিল, আর তাঁর চাকরবাকরদের দুর্দশা ছিল আরো বেশি, কারণ তাদের থাকতে হত ক্ষুদে একটা কুঠরিতে, তার দরজা মাত্র চার ফুট উঁচু, আর ঘরে দিনের আলো আসবার পথ খুব সামান্য।

বনের মধ্যে বাকি সকলের সঙ্গে মিলিত হলাম, তার কিছুক্ষণ পরে, তাঁদের সৌজন্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, নতুন বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। হোটেলের নৈরাশ্যের মধ্যে আবার ফিরে গেলাম, জানতাম সেখানে কেউ নেই যে রুশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে।

কিন্তু ভাগ্যদেবী আবার দয়া করলেন; দরজার সামনেই দেখি হোটেলের মালিক, তিনি অনেকবার 'বাও' করে, হাত-পা নেড়ে একজন রুশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তিনিও ঐ হোটেলেই

উঠেছেন এবং ফরাসী বলেন। ভারি সজ্জন ব্যক্তি, আমাদের যা কিছু দরকার, সব করিয়ে দিলেন, রাত বারোটা অবধি আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করলেন। হোটেলের মালিককে দেখে মনে হল অতিরিক্ত পান করাতে ঠিক প্রকৃতিস্থ নন, বরং কিছু বিভ্রান্ত, তবু তিনিও থেকে থেকে এসে আমাদের করমর্দন করে, তাঁর সৌহার্দ্য সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছিলেন। রুশ ভদ্রলোক আমাদের জানালেন যে মালিক আসলে বেশ উচ্চবংশীয়, যদিও তৃতীয় শ্রেণীর, দশ লক্ষ রুব্‌ল্‌ মূল্যের সম্পত্তি হারিয়ে আপাতত তাঁর খানিকটা মতিভ্রম হয়েছে।

মালিকের সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা রাতে যখন তিনি আমাদের বিল্‌টা নিয়ে এসে বললেন সেটি রাতেই মিটিয়ে দিলে ভালো হয়, কারণ আমরা তো রওনা হয়ে যাচ্ছি। এক টুকরো কর্কশ কাগজে পেনসিল দিয়ে বিল্‌টা তিনি লিখে দিলেন, একেকটি জিনিস জোরে জোরে উচ্চারণ করে, তার পর টুকে রাখতে লাগলেন, শেষে মোট অঙ্ক জুড়বার জন্য বিল্‌টা আমার হাতে দিলেন।

তাই করলাম, তার ওপর আরেকটা আইটেম্‌ও জুড়ে দিলাম, 'আপ্যায়নের জন্য।" টাকা পেয়ে মালিক উঠে পড়ে, ঘরের কোণায় ঝোলানো আইকনের সামনে "বাও" করে, ক্রুশ চিহ্ন এঁকে, লিডনের হাত ধরে তার দুই গালে আর হাতে চুমো খেলেন। আমাকেও ঐরকম সস্নেহ বিদায়-গ্রহণের পালা সইতে হল। অতঃপর সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী রাতটুকু যতটা সম্ভব উপভোগ করবার জন্য আমাদের ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। সাড়ে তিন ঘণ্টাটা কমে আড়াই ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছিল, কারণ আমাদের রুশ বন্ধুও শেষ একবার গল্প করতে এসেছিলেন।

আগস্ট ১৬, শুক্রবার—ভোর তিনটেয় আমাদের ডেকে দেওয়া হয়েছিল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বৃথাই গাড়ির জন্য বসে থেকে, অবশেষে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়া গেল। দেখি গাড়ি-আড্ডা থেকে সবে সেটি রওনা হচ্ছে, কাজেই ভোর চারটের সময়, তিন ঘণ্টার ঝাঁকানি খাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তবে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আর আমাদের পিছনে একটা ঘোড়া-গাড়ির ঘোড়ার গলার ঘণ্টার মিষ্টি শব্দ শুনে, মন খানিকটা ভালো হয়ে গেল, সে গাড়িটা প্রায় সারা রাস্তা আমাদের পিছন পিছন এসেছিল।

মস্কো ফিরে দেখি মিঃ পেনি অপেক্ষা করছেন, লিডনকে নিয়ে গিয়ে একজন বিশিষ্ট পাদরির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। তাঁর সঙ্গে গল্প খুব জমেছিল।

পরে আরেকবার ডিভরে আর-একটা অনাথ-আশ্রমে গেলাম। আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন না, কাজেই সবটা দেখা হল না, বড়ো ছেলে-মেয়েদের অনেকেই শহরের বাইরে গেছিল, অতএব আমরা লম্বা লম্বা বড়ো-বড়ো দালান, সারি সারি খাট, নার্স, অগুন্তি ছোটো শিশু ছাড়া বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। ছোটো শিশুদের দেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সযত্ন লালিত আর সুখী বলে মনে হল। বিকেলে পেট্রোভ্‌স্কি পার্কে গেলাম গাড়ি করে, খানিকক্ষণ বসে মিলিটারি ব্যাণ্ড শুনলাম।

আগস্ট ১৭, শনিবার—আজ ট্রয়ট্‌সাতে জয়ন্তী-উৎসব, এরই জন্য আমরা মস্কোতে থেকে গেছিলাম আর অপূর্ব সব দৃশ্য দেখব বলে আশা করেছিলাম—বলা বাহুল্য হতাশ হয়েছিলাম। বিশপ লিওনাইডি কথা দিয়েছিলেন আমাদের গির্জার ভিতরে চ্যান্সেলের পাশের যে-ঘরে আমরা গতবার বসেছিলাম, সেইখানে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁকে খুঁজেই পেলাম না। গির্জায় ঢুকেছিলাম, তবু কি হচ্ছে না হচ্ছে তার বিশেষ কিছুই দেখতে পেলাম না। শেষে গত বারের ঘরটার উলটো দিকে একটা ঘরে ঢুকেও ছিলাম, কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে এসে, ঘুরে, অন্য দিকের ঘরটার কাছে গেলাম। সেখানে পেঁাছে, স্রেফ এতটুকু সুযোগ পেলেই ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেছিলাম। সেখানে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম, আমি ছাড়া সকলেরই পাদরির পোশাক। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল ওখানে যাবার আমার কোনো অধিকারই ছিল না তবু কেউ কিছু বলল না, আমিও থেকে গেলাম, খুব ভালো করে স্বয়ং বিশপদের আর অনুষ্ঠানের কোনো কোনো অংশ দেখলাম। কিন্তু বিশপ লিওনাইডির কোনো পাত্তা পেলাম না। পরে শুনেছিলাম উনি অন্য জায়গায় আচার্যের কাজ করছিলেন।

সেদিনের ব্যর্থতা মোচন করবার উদ্দেশ্যে কি আর করি, অগত্যা অন্য একটা মন্যাস্টারি দেখলাম।

আর ট্রয়ট্‌সার বড়ো চুড়োয় উঠে চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। সেখান থেকে আমার টেলিস্কোপ দিয়ে দূর দিগন্তে একসঙ্গে অনেকগুলি চুড়ো

দেখতে পেলাম, ঐ বোধ হয় চল্লিশ মাইল দূরের মস্কো-ই হবে।

আগস্ট ১৮, রবিবার—সকাল নয়টায় "চার্চ অফ্ দি অ্যাসাম্প্‌শনে" গেলাম, সেখানে বিশপ লিওনাইডির প্রধান আচার্যের পদ নেবার কথা। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এই আশায় যে তিনি আমাদের সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যাবেন। তিনি আসবার আগেই, এক ভদ্রলোক তাঁর নাম করে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে, চ্যান্সেলের দক্ষিণের ছোটো ঘরটিতে বসালেন। লিডন অনুষ্ঠানের শেষ অবধি ছিল, আমি মাঝখানে উঠে পড়ে ইংলিশ চার্চে চলে গেলাম। পেনিদের সঙ্গে ডিনার খেলাম, সান্ধ্য-উপাসনার পর চা-ও খেলাম। বাড়ি ফেরার পথে ক্রেমলিনের ভিতর দিয়ে গেলাম, এই ভাবে সব চাইতে সুন্দর পরিবেশে—শীতল জ্যোৎস্নার প্লাবনে—সব চাইতে সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণীর শেষ দেখা পেলাম। দেওয়ালের, মিনারের বিশুদ্ধ শুভ্রতা আর সোনালি রঙ করা গম্বুজের ঔজ্জ্বল্য চাঁদের আলোয় যেমন ফুটে উঠেছিল, সূর্যের আলোতে তেমন কখনোই সম্ভব হত না। কারণ তা হলে তো আর অন্ধকারের বুকে এভাবে সে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হত না, আমরা আজ যেমন দেখে গেলাম।

আগস্ট ১৯, সোমবার—কফি রুমে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় একজন মার্কিনী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছোটো ছেলেও ছিল, ভারি ভালো লাগল তাদের। বিদায় নেবার সময় তাঁর কার্ড দিলেন—"আর. এম. হান্ট ; ১৮৬৭ সালের নিখিল বিশ্ব প্রদর্শনীর আন্তর্জাতিক বিচারক-মণ্ডলীর সদস্য ; স্টুডিও বি ৮, ৫১ পশ্চিম-১০ম স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক।" কখনো যদি নিউইয়র্ক যাই, তা হলে হয়তো এই রহস্যময় ঠিকানার অর্থ উদ্ধার করতে পারব। সকালে আর বিশেষ কিছু করলাম না, যাত্রার তোড়জোড় করা ছাড়া, বেলা দুটোয় পিটার্সবার্গ রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের পাদরি বন্ধুরা তাঁদের নানান সৌজন্যের ওপর চূড়ান্ত সৌজন্য দেখিয়ে আমাদের বিদায় দিতে স্টেশনে এলেন এবং পথে মন ভালো করবার জন্য এক বোতল অতিশয় সুস্বাদু 'কিমেল' দান করলেন।

আমরা শোবার বার্থের বন্দোবস্ত করেছিলাম, আমাদের গাড়িতে আর একজন মাত্র ভদ্রলোক ছিলেন। কাজেই জানলা খুলে রাখলে

সব সখ ভালোভাবে হয়ে যেত। কিন্তু সহযাত্রীর সর্দি, তাঁর তাতে আপত্তি ; মনে হল তিনি একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। বয়সে যে সব চাইতে ছোটো, অর্থাৎ বর্তমান লেখক, তার ভাগ্যে পড়ল তৃতীয় বার্থটি, সেটি আড়ভাবে বসানো, নাড়াচাড়া যায় না, মাথাটা একটা বার্থের নীচে, পা অন্য বার্থের নীচে। কাজেই গুমোট ঘরে বিশ্রামের চাইতে, কামরার এক মাথার প্লাটফর্মের মুক্ত বাতাসেও ক্লান্তিকেই শ্রেয় মনে হল। ভোর পাঁচটা থেকে ছয়টা ঘরে এসে একটু ঘুমিয়ে নিলাম, ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। বেলা দশটার আগেই আমরা আবার "গস্টিনিট্সা ক্লী"তে স্থান পেলাম।

আগস্ট ২০, মঙ্গলবার—পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে, লিডনকে বিশ্রাম নিতে ও চিঠিপত্র লিখতে ছেড়ে দিয়ে, আমি কেনাকাটা করতে বেরোলাম। প্রথমেই ৬১ নং গ্যালার্ন উলিট্সাতে মিঃ ম্যুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটা দ্রশ্‌কি নিয়েছিলাম, গাড়োয়ান গোড়ায় চল্লিশ কোপেক চাইছিল, ত্রিশে রফা হয়েছিল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে এক কাণ্ড হল, আমার দ্রশ্‌কি চড়ার অভিজ্ঞতায় এটার নূতনত্ব ছিল। আমি নামতেই গাড়োয়ান প্রথমেই বলল "সরক", অর্থাৎ চল্লিশ। আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত ; আমি সেটা গ্রাহ্য না করে ত্রিশ কোপেক দিলাম। সে ক্ষোভ ও ঘৃণার সঙ্গে হাতের তেলোয় টাকাটা নিয়ে, রুশ ভাষায় বিশেষ বাগ্মিতার সঙ্গে এক বক্তৃতা দিল, তার প্রধান বিষয় হল 'সরক'। মুখে কৌতূহল ও আমোদের ভাব নিয়ে কাছেই এক মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হয়তো বক্তার মানে বুঝেছিলেন। আমি বুঝি নি। গম্ভীরভাবে হাত বাড়িয়ে ত্রিশ কোপেক ফেরত নিয়ে, ব্যাগে ভরে, গুণে গুণে পঁচিশ কোপেক দিলাম। মনে হল বুঝি ধারা-স্নানের কল খুলে দিচ্ছি, হলও তাই, সে তো রেগে চতুর্ভুজ হয়ে, আগের বারকেও ছাপিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করল।

অতিশয় অশুদ্ধ রুশ ভাষায় তাকে বললাম যে একবার ত্রিশ কোপেক দিতে চেয়েছি, আর চাইব না : তাতে কিন্তু সে মোটেই ঠাণ্ডা হল না। অনেকক্ষণ ধরে মিঃ ম্যুরের চাকর তাকে সেই কথাই বোঝাল, অবশেষে মিঃ ম্যুর নিজে বেরিয়ে এসে সংক্ষেপে এবং কড়া ভাষায় ঐ কথার সারাংশ বললেন। সে কিন্তু কিছুতেই কথাটা ভালোভাবে নিল না। কাউকে কাউকে খুশি করা বড়ো শক্ত।

গ্রেট মর্সকয়:তে বরেলের রেস্তোরাঁয় খুব ভালো ডিনার খেলাম, এক বোতল বার্গাণ্ডি সহ দাম পড়ল মাত্র পাঁচ রুব্‌ল্‌।

আগস্ট ২১, বুধবার—ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই কাউণ্ট পণ্টিয়াটিন লিডনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি যেই শুনলেন আমরা 'হার্মিটেজ' দেখতে চাই, ভারি সদয়ভাবে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। শুধু যে গ্যালারিটা দেখালেন, তা নয়, উপরন্তু শীতাবাসও দেখিয়ে দিলেন, এখানে যুবরাজের থাকবার ঘর আছে, প্রার্থনাগৃহ আছে, সাধারণ দর্শকদের এ-সব দেখতে দেওয়া হয় না।

এবার গ্যালারির একটা বিভাগ দেখলাম, যেটা গতবার দেখি নি। এটি হল "একোল রুশি"। এই বিভাগে কয়েকটি বাস্তবিক আশ্চর্য ছবি আছে। একটি বিরাট ছবিতে মোসি মরুভূমিতে বাইবেল বর্ণিত একটা সাপ তুলে ধরেছেন, ব্রুনির আঁকা ছবি, সাতাশ ফুট চওড়া, আঠারো ফুট উঁচু। পরিকল্পনার বিশালত্বে, দলে দলে ইজ্‌রেলীদের মুখের ভাবের বিচিত্রতায়—ভক্তি, ভীতি, হতাশা—আহতদের ও মরণোন্মুখদের ভাবে, এই ছবিটি একটি মহাকাব্যের সমান। যে প্রতিকৃতিটি আমার সব চাইতে স্পষ্ট মনে পড়ে সেটি হল ছবির সামনের দিকে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে আর একটা বিশাল সাপ তার ঝক্‌ঝকে দেহ দিয়ে তাকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে। তবে রুশ ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সমুদ্রের দৃশ্য। এটি হালে কেনা হয়েছে, এখনো সংখ্যা দেওয়া হয় নি। ঝড়ের ছবি, সামনে একটা ডুবন্ত জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন যাত্রীর প্রাণ বেঁচেছে, তারা মাস্তুল আঁকড়ে ভাসছে; পিছনে বাতাসের আক্রোশে ঢেউগুলি পর্বতের মতো ফুলে উঠেছে, বাতাসের বেগে ঢেউয়ের মাথার ফেনাগুলো চূর্ণ হয়ে উড়ছে—স্তিমিত সূর্যালোক উঁচু ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে, ফিকে সবুজ রঙ ধরে চিক্‌চিক্‌ করছে; সেই আলো যেভাবে যেন জলরাশিকে ভেদ করে আসছে, তাই দেখে চোখের বিভ্রান্তি ঘটে। এ জিনিস অন্য ছবিতে অনেক শিল্পী চেষ্টা করছেন, কিন্তু এমন অপূর্ব সাফল্য কোথাও দেখি নি।

বিকেলে আইজাক চার্চের চুড়োয় চড়লাম আর সেখান থেকে এই মহান শহরের অপূর্ব দৃশ্য অত্যন্ত উপভোগ করলাম। সবুজ লাল ছাদ-

ওয়ালা বাড়িগুলি একটা বনের মতো, পরিষ্কার সূর্যের আলোতে সে যে কি আশ্চর্য শোভা ধারণ করেছে। নেভস্কিতে ডমিনিকের রেস্তোরাঁতে ডিনার খাওয়া হল, পরে নানান দ্বীপে বেড়ালাম, সেদিকে ধনী লোকদের বাস—ছোটো-ছোটো সুন্দর সব 'ভিলা', তাদের চার দিকের সুন্দর করে সাজানো বাগানগুলি সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে, শীতের আগমনের আভাস পেলেই প্রত্যেকটি ফুলগাছ ঘরে তুলতে হবে। আমরা যে-পথে যাচ্ছিলাম সেটাই বোধ হয় ওখানকার ফ্যাশানেব্‌ল্ রাস্তা, অনেকটা আমাদের রট্‌ন্ রো'র মতো।

আগস্ট ২২, বৃহস্পতিবার—মিঃ ম্যাক্‌সুইনির সাদর নিমন্ত্রণে আমরা বেলা নটার সময় "ক্রন্‌স্টাটে' গেলাম, সেখানে দিনটা ভারি চিত্তাকর্ষক ব্যাপারের মধ্যে কাটল। প্রথমে মিঃ ম্যাক্‌সুইনি আমাদের বন্দরের আর অস্ত্রাগারের ভিতরে নিয়ে গেলেন, যদিও খুঁটিয়ে দেখবার মতো সময় আমাদের হাতে ছিল না, এখানকার শিল্পকর্ম কি বিশাল পরিকল্পনা-মতে চলেছে, আমাদের মনে তার একটা মোটামুটি ধারণা হল। যদি কখনো যুদ্ধ বাধে তা হলে অঢেল সরঞ্জাম এঁদের হাতে থাকবে। অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ দয়া করে আমাদের সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে অদ্ভুত একটা "ট্রোফি" দেখলাম ব্রিটিশদের কাছ থেকে জয় করে নেওয়া একটা কামান। "ভালচার" নামক গানবোটের কামান, ঐ জাহাজ রুশ তীরে এসে পড়ে, যুদ্ধে বিজিত সামগ্রী হয়ে গেছিল।

তার পর গেলাম 'ম্যাগ্‌নেটিক অবজারভেটরি'তে, সেখানকার অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ হল। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে তিনি তাঁর বিষয়-বস্তুর নীতি ও প্রয়োগের কথা ব্যাখ্যা করলেন—প্রাচীন স্লাভনিক ভাষাতে বললে যতটুকু বুঝতাম, তার বেশি কিছুই বুঝি নি ; ব্যাপারটা আমার বিদ্যার বাইরে। বিদায় নেবার সময় ঐ বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা বই উপহার দিলেন ; হায়, সেগুলি আবার রুশ ভাষায় লেখা!

এর পর একটি নৌকো নিয়ে বন্দরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম, মাঝে একবার ডাঙায় নেমে দেখলাম বিরাট একটা 'ডক-ইয়ার্ড' তৈরি হচ্ছে। নিরেট গ্র্যানাইটের চাংড়া দিয়ে তার দেয়াল হচ্ছে, একজন কর্মচারির তত্ত্বাবধানে, সিমেণ্টের ভিতের ওপর এইরকম একটা চাংড়া বসানো হচ্ছে দেখলাম। অবশ্য প্রচুর চ্যাঁচামেচি এবং উত্তেজনা ছাড়া এ কাজটি

সমাধা হয় নি। মোটের ওপর জায়গাটা দেখতে অনেকটা পিঁপড়ের বাসার মতো। মধ্যিখানে বিরাট এক গর্ত, তার এপার-ওপার চলেছে পিঁপড়ের সারি ; চার দিকে ক্রমাগত হাতুড়ির ঠং-ঠং। পিরামিড তৈরির সময় সেখানকার অবস্থাটা কেমন হয়েছিল এই-সব দেখে তার একটা ধারণা করা যায়। এই ডক্ তৈরি হতে বোধ হয় সাড়ে ত্রিশ লক্ষ রুব্‌ল্ খরচ হবে।

পরে মিঃ ম্যাকসুইনির গির্জার ঘণ্টা-চুড়োর মাথায় উঠেছিলাম, সেখান থেকে চমৎকার দৃশ্য দেখলাম। তাঁর বাড়িতে ডিনার খেলাম ; আমাদের সেখানে রেখে তাঁকে আগে রওনা হয়ে যেতে হল, কারণ তাঁর জাহাজটি আগে ছাড়ল। সকালের দিকে লিডন তার ওভারকোটটি একজন পরিচারিকার হাতে দিয়েছিল, যাবার আগে সেটি উদ্ধার করা দরকার, অথচ পরিচারিকা রুশ ভাষা ছাড়া কিছু বোঝে না। এদিকে আমার অভিধানটি আনি নি, ছোটো শব্দ-তালিকাটিতে 'কোট' শব্দ নেই। বেশ মুশকিলেই পড়া গেল। হাত-পা নেড়ে, গায়ের কোটটি অর্ধেক খুলে, লিডন প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। মনে হল বুঝেছে, আমরা তো ভারি খুশি! ও মা! এক মিনিট পরে সে মস্ত একটা কাপড় ঝাড়া ব্রাশ্ এনে হাজির করল!

এবার লিডন আরেকবার আরেকটু কষ্টকর খেল দেখাল। কোট খুলে সে মেয়েটির পায়ের কাছে রেখে, নীচের দিকে দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল যে তার অভিপ্রেত বস্তুটি নীচের তলায় আছে, তার পর লিডন আবার কোটটা গায়ে দিল। মেয়েটির সাদামাটা কিন্তু ভাবপ্রবণ মুখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। অনেক বেশি সময় নিল এবার, তার পর হতাশার সঙ্গে দেখলাম একটা বড়ো কুশন ও বালিশ এনে কৌচের ওপর বিছানা পাতবার উদ্যোগ করল, ওর বিশ্বাস হয়েছিল এই বোবা ভদ্রলোক নিশ্চয় একটু ঘুমোতে চান। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, টপ্ করে একটা ছবি এঁকে ফেললাম, তাতে লিডন একটা কোট গায়ে দিয়ে, একজন হাসিখুশি রুশ চাষীর হাত থেকে আরো বড়ো একটা কোট নিচ্ছে। আর সব যেখানে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে আমার ভাষা-চিত্র সাফল্যলাভ করল। আমরা পিটার্সবার্গে ফিরে এলাম এই লজ্জাকর জ্ঞান নিয়ে যে আমাদের সভ্যতার মান এখন নেমে প্রাচীন নিনেভের সমান হয়ে গেছে।

আগস্ট ২৩, শুক্রবার—বিবিধ ব্যাপারে দিনটা কাটালাম। কাউণ্ট টল্‌স্টয়ের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম, কাউণ্ট নিজে অন্য জায়গায় গেছিলেন। ট্রিয়ট্‌সা মন্যাস্টারি আর 'অ্যানন্‌সিয়েশনে'র মন্যাস্টারি দেখলাম ; চমৎকার করে অলঙ্কৃত জায়গা দুটি। আরমানী গির্জায় গেলাম ; সেখানে গ্রীক্ গির্জার সঙ্গে একটা তফাত দেখলাম যে এঁদের গির্জার বেদী স্ক্রীন দিয়ে ঘেরা থাকে না। অবশ্য স্ক্রীন একটা ছিল, কিন্তু সেটা বেদীর পিছনে।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটি শিশুর ফটো দেখে, ছোটো মাপের এক কপি কিনলাম, বড়ো মাপের একটা ফরমায়েস করলাম, দোকানে যেগুলি ছিল তার সবই বাঁধানো। পরে ঐ শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ততক্ষণে ছবিটার এনলার্জমেণ্ট তৈরি হয়ে গেছিল, কিন্তু দোকানদার মহা ফাঁপরে পড়েছিল, কারণ শিশুর বাপকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ছবি বিক্রির ব্যাপারে তাঁর আপত্তি জানিয়েছিলেন। অতএব নিরুপায় হয়ে কেনা ছবিটি ফেরত দিলাম, সেই সঙ্গে বাপকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে ছবি ফিরিয়ে দিয়েছি, একটু আশাও প্রকাশ করলাম যে ছবি কেনবার অনুমতি পেলে সুখী হই।

সূর্যাস্ত দেখতে 'পয়েণ্ট' নামক স্থানে গেলাম, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছিল, কিন্তু নির্মল আকাশে সে কি রঙের খেলা, লাল, সবুজ ; উপসাগরের জল কাচের মতো স্থির ; এখানে ওখানে নলখাগড়া গজিয়েছে, তার ছায়া জলে পড়েছে ; পরপারের কালো রেখা; আকাশপটে সেখানকার বাড়িঘরের কালো আকৃতি ; জলের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তারই মধ্যে দিয়ে দুটি-একটি নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে, যেন কোনো অচেনা জলের পাখি।

আগস্ট ২৪, শনিবার—যদি সেটা সম্ভব হয়, আজকের দিনটি কালকের চাইতে বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে কেটেছে। বেশ কয়েকটা জায়গায় দেখা করতে গিয়ে বিফল হলাম। একটা মন্যাস্টারি দেখলাম, কয়েকটা গির্জা দেখলাম, কোথাও বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই, একটা গির্জায় ছাড়া। সেখানকার ভিতরে দেয়ালগুলোতে রাশি রাশি সামরিক স্মৃতি-চিহ্ন ঝোলানো; বাইরেও একটু দূরে দূরে কামান বসানো, এমন-কি, সমাধি ক্ষেত্রের চার দিকের রেলিংটি পর্যন্ত কামান আর শিকল জুড়ে তৈরি।

সন্ধ্যায় 'ডুসো'র রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গেলাম, কিন্তু মিনিট দুই অপেক্ষা করার পর শুনলাম আমাদের ফরমায়েসী ডিনারটি পাওয়া যাবে না; তার যথেষ্ট কারণও ছিল; বাড়িতে আগুন লেগেছিল! হয়তো একটা চিমনিতেই লেগেছিল, কারণ আধ ঘণ্টার মধ্যে সেটিকে নেবানো গেল। তার আগেই রেস্তোরাঁর সামনে মেলা লোকের ভিড় আর খান কুড়ি দমকল জমায়েত হয়েছিল। দমকলগুলো ধীরে-সুস্থে নিয়মমাফিক কায়দায় এসে হাজির হয়েছিল, তাদের প্রধান বিশেষত্ব হল যে সব-কটা মাপে বেজায় ছোটো। কয়েকটাকে দেখে মনে হল পুরনো জল-সরবরাহের গাড়ি থেকে তৈরি। ইতিমধ্যে আমরা রাস্তার উলটো দিকে, 'বরেলের' রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়ে, জানলা দিয়ে মজা দেখতে লাগলাম; বরেলের প্রবেশ-পথে তাদের ওয়েটাররা ভিড় করে প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্দশা দেখছিল, তাদের যতটা কৌতূহল, ততটা সহানুভূতি দেখা গেল না।

পরে আমরা অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার নেভ্‌স্কি মন্যাস্টারিতে সান্ধ্য-উপাসনা শুনতে গেলাম। কোনো গ্রীক গির্জায় এর চাইতে সুন্দর অনুষ্ঠান শুনি নি। অপূর্ব সঙ্গীত; সাধারণত যেমন একঘেয়ে হয়, তেমন নয়। বিশেষ করে একটি অংশের বারবার পুনরুক্তি হচ্ছিল, অন্তত সুরটার পুনরুক্তি হচ্ছিল, তবে কথাগুলি ভিন্ন হতে পারে। এই সুরটি এতই মধুর যে আরো কয়েকবার বাজালেও আনন্দের সঙ্গে শুনতাম। দুজন বিশপ উপস্থিত ছিলেন; উপাসনার শেষের দিকে একজন গিয়ে মন্দিরের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়ালেন; তাঁর হাতে একটি ছোটো ব্রাশ্, সম্ভবত পবিত্র তেলে ডোবানো। উপাসকরা একে একে উঠে এসে, প্রথমে ডেস্কে রাখা বইগুলিকে চুমো খেল, তার পর বিশপ তাদের কপালে ব্রাশটা দিয়ে ক্রুশ্-চিহ্ন আঁকার পর, অনেকে তাঁর হাতেও চুমো খেল।

আগস্ট ২৫, রবিবার—কাউণ্ট পণ্টিয়াটিন তাঁর কথামতো আমাদের তুলে, গাড়ি করে গ্রীক গির্জায় নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা স্ক্রীনের পিছনে গেলাম; সেখানে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ হল। উপাসনা আগাগোড়া গ্রীক ভাষায়, কিন্তু কতকগুলো বইয়ের সাহায্যে অনুষ্ঠান অনুসরণ করতে পারলাম, যদিও উচ্চারণগুলো কিঞ্চিৎ গোলমেলে; আগাগোড়া উপাসনায় যোগ দিতেও পারলাম, শুধু দু-এক জায়গায় ছাড়া,

যেখানে কুমারী মেরির কথা ছিল। উপাসনার পর কাউণ্ট আমাদের অ্যালেক্জ্যাণ্ডার নেভ্স্কি মন্যাস্টারিতে নিয়ে গেলেন, সেখানকার আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়টি দেখালেন। বিদ্যালয়ে আশিজন ছাত্র পাদরি হবার জন্য অনুশীলন করছিল। চারটার সময় আবার এই মন্যাস্টারিতে গেলাম, উপাসনা শুনতে। নদীর ধারে বেড়িয়ে সন্ধ্যা কাটালাম, সূর্যাস্তের মহিমা-মাখা নিকোলাস ব্রিজ্ দেখলাম; দেখে মনে হচ্ছিল লাল সবুজ সাগরের ওপর একটি রেখা টানা, তার ওপর দিয়ে মানুষজন চলেছে যেন একেকটি কালো ফুট্কি।

আগস্ট ২৬, সোমবার—যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুর সময় পেলাম না। ৪নং গ্রেট্ মর্সকয়ের সেই ফটোগ্রাফার ছবিগুলি নিয়ে এল, কারণ শিশুর বাপ, প্রিন্স গোলিচেন, সেগুলি আমাদের কাছে বিক্রি করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বেলা দুটোয় রেলগাড়িতে চড়লাম; ওয়ারস' যাবার পথটি বড়োই ক্লান্তিকর। উঠে দেখি হাণ্ট পরিবারও ঐ গাড়িতে উঠেছেন, অবশ্য একই কামরাতে নয়। তাঁরা যাচ্ছেন বার্লিন, কাজেই উইল্না অবধি একসঙ্গে যাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছলাম সন্ধ্যা ছয়টায়। সারা বিকেল এ-ওর কামরায় যাতায়াত করে সময় কাটালাম, আমার ভ্রাম্যমান চেস্-বোর্ডটি খুব কাজে লাগল। শোবার জায়গার বন্দোবস্ত করা হয় নি, কিন্তু গাড়ি প্রায় খালি ছিল বলে আরামেই রাত কাটল।

আগস্ট ২৭, মঙ্গলবার—আজ সন্ধ্যা ছটায় ওয়ারস' পৌঁছলাম, সোজা গেলাম 'হোটেল দ্য আঙল্তেরে', দেখে মনে হল একেবারে থার্ড ক্লাস ব্যাপার। আমাদের ঘরের দালানে একটা প্রকাণ্ড এবং বন্ধুভাবাপন্ন গ্রে-হাউণ্ড বাস করে এবং দু-এক সেকেণ্ডের জন্যেও দরজা খোলা পেলেই আমাদের ঘরে ঢোকে। যে কারণেই হোক, যেই-না একটা চাকর আমাদের স্নানের জল এনে দিল অমনি কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে সব জল খেয়ে ফেলে, তার কাজ পণ্ড করে দিল।

আগস্ট ২৮, বুধবার—সারাদিন ওয়ারস'তে ঘুরে বেড়ালাম, অনেক-গুলো গির্জা দেখলাম, বেশির ভাগই রোমান ক্যাথলিক, অন্য জায়গার

মতো এখানেও প্রচুর ধনসম্পদ এবং কুরুচির সাক্ষ্য দেখলাম। চার দিকে সোনালি রঙের গিল্টি, শ্বেতপাথরের স্তূপ কেটে গাদা গাদা কদাকার শিশুর ঢিপি—ঢিপিই বলব, গ্রুপ বলা যায় না—ওগুলো নাকি দেবশিশু! তবে কয়েকটি সুন্দর ম্যাডনামূর্তি ও বেদীর কারুকার্যও দেখলাম। মোটের ওপর এমন হট্টগোল আর নোংরা কম শহরেই দেখেছি।

আগস্ট ২৯, বৃহস্পতিবার—অ্যালার্ম দিয়ে ভোর চারটেয় উঠলাম, পাঁচটায় কফি আর রোল্ দিয়ে গেল, সাড়ে ছটার মধ্যে ব্রেসল' অভিমুখে রওনা হলাম। রাত সাড়ে আটটায় সেখানে পৌঁছলাম। যতই প্রাশিয়ার ভিতরে ঢুকছি, ততই বসতি আর সংস্কৃতির প্রমাণ দেখে খুশি হচ্ছি। কর্কশ, হিংস্র চেহারার রুশ সৈনিকের জায়গায় এখন দেখছি কোমল বুদ্ধিদীপ্ত প্রাশিয়ান সৈনিক। এখানকার চাষীদের পর্যন্ত আরো অভিজাত, স্বকীয়তা বিশিষ্ট আর স্বাধীনচেতা বলে মনে হচ্ছে। রুশ চাষীদের কোমল, সূক্ষ্ম, অনেক সময়ই উন্নত শ্রেণীর যোগ্য মুখাবয়ব দেখে আমার মনে হত এরা সব পোষমানা পশুর মতো ক্রমাগত নির্যাতন আর অন্যায় নীরবে সয়ে যাচ্ছে, যে-পুরুষ নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম এবং প্রস্তুত, তার মতো নয়।

বেছে বেছে 'গোল্ডেন গূস' হোটেলে উঠলাম, সেখানে এক থাক সোনার ডিম না পেলেও, সব শ্রেণীর লোকের সুবর্ণময় সুখ্যাতির যোগ্য।

আগস্ট ৩০, শুক্রবার—সকালের রোদটি নির্মল, বাতাস বড়ো মধুর। আমরা এই সুন্দর প্রাচীন শহরটি দেখে বেড়ালাম। অনেকগুলি গির্জার ভিতর গেলাম; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অপূর্ব সুন্দর; এত উঁচু যে ইঁটের তৈরি চুড়ো, ঠেক্‌নো, সরু লম্বা জানলাগুলি এক অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, কোনো সাজ-সজ্জার অপেক্ষায় থাকে নি।

সেন্ট মেরি মডলীনের গির্জা, সেন্ট ক্রিস্টফারের গির্জা, তার পর সেন্ট ডরথির গির্জা দেখলাম, শেষেরটি বেজায় উঁচু। মন্দির প্রদক্ষিণ করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম পিছনের প্রাঙ্গণ থেকে বেরোবার পথ নেই। ওটি হয়তো মেয়েদের স্কুলের খেলার জায়গা, ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার পক্ষে স্থানটি বড়ো লোভনীয়। রুশ ছেলে-মেয়েদের মুখগুলো সাধারণত কুশ্রী, দু-একটি সাদামাটা, তার জায়গায়

এই-সব জর্মান ছেলেমেয়েদের বড়ো-বড়ো চোখ আর কাটা-কাটা মুখাবয়ব দেখেও আরাম লাগে।

সেন্ট ডরথি দেখা হলে, আমরা 'রিং' ঘুরে দেখলাম। মস্ত একটা স্কোয়ার, মধ্যিখানে ওদের বিচিত্র টাউন্-হল, অন্যান্য বাড়ি-ঘর, মূর্তি আর তার চার দিকে অদ্ভুত গড়নের পুরনো সব উঁচু ছাদের সারি, যাকে গেব্‌ল্ বলে, তার কোনো দুটি একরকম দেখতে নয়। তার পর গেলাম সেন্ট এলিজাবেথের গির্জায়, তার চুড়োটি প্রাশিয়ার মধ্যে সব চাইতে উঁচু। অনেক কষ্টে ওপরে ওঠা গেল, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই শহর, চার দিকের পাড়াগাঁ আর আঁকা-বাঁকা ওডের নদীর দৃশ্য দেখা গেল।

বিকেলে লিডন একা গিয়ে কয়েকটা গির্জা দেখে এল, আমার শরীরটা তত ভালো না থাকায় অত হাঁটা অসম্ভব। সন্ধ্যাবেলায় গাড়ি করে উইণ্টার গার্ডেনে গিয়ে অল্পক্ষণ খোলা আকাশের তলায় ঐকতান বাদ্য শুনলাম, জর্মানরা এ জিনিস বড়ো ভালোবাসে।

আগস্ট ৩১, শনিবার—ক্রয়ট্স্ কার্চের চুড়োয় উঠে একেবারে সমস্ত ব্রেসল' শহর দেখতে পেলাম। তাছাড়া একটি নতুন রোমান ক্যাথলিক গির্জা সেন্ট মাইকেল্স্ তৈরি হচ্ছে দেখলাম। বিকেলে ড্রেসডেন গেলাম, রাত সাড়ে দশটায় সেখানকার 'হোটেল ডি স্যাক্স'-এ গিয়ে উঠলাম।

সেপ্টেম্বর ১, রবিবার—গাইড বইতে এবং ম্যাপে দেখলাম 'ইংলিশ চার্চ' বলে তিনটি গির্জা আছে। ভাবলাম তার মধ্যে দুটি নিশ্চয়ই রোমান বিরোধী পক্ষীয়, কাজেই কোনোটাতেই গেলাম না। লিডন রোমান ক্যাথলিক গির্জায় গেল, সেখানে আমিও বাজনা শুনবার জন্য অল্পক্ষণের জন্য জুটেছিলাম। কয়েকটি বাগানে বেড়ালাম, সব জায়গায় দেখলাম আগন্তুকদের ভাগিয়ে 'কাফে'গুলোর বাগানে ঢোকাবার চেষ্টা, কারণ সেখানে পয়সা দিতে হয়। বিনা পয়সার বাগানের বেঞ্চিগুলো সংখ্যায় খুব কম এবং তাদের পিঠ নেই।

সেপ্টেম্বর ২, সোমবার—সকালে বড়ো ছবির গ্যালারি দেখতে গেলাম। দু ঘণ্টা তাকিয়ে থাকাই আমার পক্ষে যথেষ্ট! ঐ সময়টা বিখ্যাত

সিস্টিন ম্যাডনা দেখে কাটালেও হত। বিকেলে শহরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ালাম। পরে আমি 'রয়েল গার্ডেন' থিয়েটারে গেলাম, ফিরবার সময় অন্ধকারে এক মাইল হাঁটতে হল, খানিকটা পাড়াগেঁয়ে জায়গা দিয়ে। বলা বাহুল্য পথ হারিয়েছিলাম। আশ্চর্য অনুষ্ঠান-অবিশ্যি অভিনয় একেবারে মামুলী। দ্বিতীয় নাটকের সময় আমি ঢুকেছিলাম, প্রথমেই যে জিনিসটা অদ্ভুত লাগল সেটা হল পরদা পড়ল কিন্তু দর্শকরা কেউ বাহবা দেবার চেষ্টাও করল না। এর ঠাণ্ডা প্রভাব অর্কেস্ট্রার বাজনাতেও দূর হল না; বাদকরাও আয়েস করে তাদের বাতির সল্‌তে ছাঁটতে লেগে গেল। নাটকটা শেষ হলে, পাঁচ-দশ মিনিটের বিশ্রী নীরবতার পরে যখন বাজনা বেজে উঠল, তখন মনে হল বরং সল্‌তে ছাঁটাই ছিল ভালো; কোনো থিয়েটারের ভিতরে কিম্বা বাইরে এমন বদ্‌ বাজনা শুনি নি!

শেষ নাটক ছিল 'জাদু ফোয়ারা', তার জন্য হলের সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। জিজ্ঞাস্য: ড্রেসডেনে কি একজনও পকেটমার নেই? বাতি নিবলে দেখলাম মধ্যিখানে একটা ফোয়ারা, তাকে গোল করে ঘিরে অনেকগুলি জলধারা, সবটার ওপর আলো পড়ছে, রঙ বদলাচ্ছে, দেখতে ভারি চমৎকার লাগছে; তবে 'ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ' আর 'ক্রোমাটোপ' থাকলে এ-সবই করা যায়। একটু পরে মধ্যিখানের ফোয়ারাটি বন্ধ হয়ে গেল; তার বদলে পর পর উঠে এল অ্যাপলো, মহাকাল আর ছোটো একটা ফোয়ারা ধরে কয়েকটা মূর্তি। প্রত্যেকটি মূর্তি উঠেই একবার আস্তে আস্তে চার দিকে ঘুরে এল, ঠিক যেন যন্ত্রে চলছে। এটাই বোধ হয় অনুষ্ঠানের চরম দৃশ্য। অন্তত এটা দেখেই ধৈর্যশীল নিষ্প্রাণ দর্শকবৃন্দ যথাসাধ্য উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাল, কোনো একটি বক্তৃতা শুনে ইংরেজ শ্রোতারা যত হাততালি দেয়, প্রায় তার সমান হাততালি পড়ল।

সেপ্টেম্বর ৩, মঙ্গলবার—ছবির গ্যালারিতে আরেকবার গেলাম করে-জিয়োর বিখ্যাত 'লা নট্‌' ছবিটি দেখবার উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে আমি এমন কিছু বলতে পারছি না, যাতে চিত্র-সমালোচক হিসাবে আমার খ্যাতি বাড়ে! বিকেলে লেপ্‌জিগ গেলাম; পেঁৗছে, একটু সান্ধ্য-বিহারের সময় পেলাম। ভালো ভালো গাছে ভরা, পর পর কতকগুলি

বাগানের ভিতর দিয়ে পুরনো শহরটিকে বেড় দিলাম। 'ডি প্রুসি' হোটেলে উঠেছিলাম।

সেপ্টেম্বর ৪, বুধবার—শহরে বেড়াবার জন্য একটু সময় পেলাম, বাইরে থেকে দ্রষ্টব্য কিছু নেই, কেল্লার চুড়ো থেকে পরিদর্শক আমাদের কবে কোথায় কোন যুদ্ধ হয়েছিল, সেই-সব জায়গাগুলো দেখিয়ে দিলেন, বিশেষ করে যে বাড়িতে লুথার আর একে'র মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে সেই বিখ্যাত বাক্-যুদ্ধ হয়েছিল।

ওখান থেকে আমরা গিসেন্ গেলাম, সে রাতের মতো 'র‍্যাপ্ হোটেলে' উঠলাম। ইংরিজি ভাষী একজন সহানুভূতিশীল ওয়েটারের কাছে ভোরবেলায় ব্রেকফাস্ট দেবার কথা বললাম। সে মহা খুশি হয়ে বলল, "কফি! আহা, কফি বড়ো ভালো।" এমনভাবে কথাগুলো সে লুফে নিল, যেন ভারি অভিনব কিছু। "আর ডিম। ডিমের সঙ্গে হ্যাম দেব? খুব ভালো।" আমি বললাম, "হ্যামটা যদি 'ব্রয়ল্' করে দাও, অর্থাৎ শুকনো খোলায় ভেজে দাও, বেশ হয়। অবিশ্বাসের হাসি হেসে ওয়েটার বলল, "বয়ল্ করব?" আমি বুঝিয়ে বললাম, "না, না, বয়ল্ না, ব্রয়ল্।" ওয়েটার এই পার্থক্যটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উড়িয়ে দিয়ে, তার আগের প্রস্তাবে ফিরে এল, "হ্যাঁ, হ্যাম দেব।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাম। কিন্তু কেমন করে বানাবে?" সে বলল, "হ্যাঁ, কেমন করে বানাব।" হালকাভাবেই বলল, যেন নিজের ভালোমানুষির জন্যেই রাজি হচ্ছে, কথাটার যাথার্থ্যের জন্যে নয়।

সেপ্টেম্বর ৫, বৃহস্পতিবার—বেলা বারোটায় এম্‌স্ পৌঁছলাম, ঘটনাহীন যাত্রা, তবে দৃশ্য দেখে কৌতূহল হয়। চার দিকের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে উপত্যকা চলে গেছে; পাহাড়ের চুড়ো অবধি গাছপালা; যেখানেই লুকিয়ে থাকার মতো একটু আরামের জায়গা পেয়েছে, সেখানেই একটি সাদা রঙের গ্রাম। গাছগুলি এত ছোটো, একই রঙের এবং অবিচ্ছিন্নভাবে গজিয়ে উঠেছে যে দূরের পাহাড় দেখলে মনে হয় বুঝি পাড়ির ওপর শ্যাওলা জমেছে। এই দৃশ্যপটের মধ্যে সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হল যে গাছপালার মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে উঁচু পাথুরে ভূমিখণ্ডের ওপর যে-সব পুরনো কেল্লা দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল

সেগুলো আপনা থেকেই ওখানে গজিয়েছে, কেউ বানায় নি। এইরকম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একান্ত ভাবে মিল রেখে, কোথাও কোনো স্থাপত্যকে গড়ে উঠতে দেখি নি। নিজেদের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে প্রাচীনকালের স্থপতিরা আকৃতি, রঙ, ছুঁচলো মুখ চুড়োর গুচ্ছ আর ঐ দুটি নিরপেক্ষ রঙ, ফিকে ছাই আর মেটে দিয়ে দেয়াল আর ছাদগুলি চার দিকের বনভূমি আর বুনো ফুলের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে সবটাকে মনে হচ্ছে প্রকৃতির অঙ্গ। এবং ঐ ফুল আর পাথরের মতোই কেল্লাগুলিও শান্তি আর নীরবতায় পরিপূর্ণ।

হোটেল দ্য-আঙ্‌ল্‌তেরে গেলাম। বাকি দিনটা এই মনোহর স্থানে ঘুরে বেড়ালাম, এখানকার লোকদের করবার কিছু নেই আর তার জন্য সমস্ত দিনটাই পড়ে রয়েছে। আলস্য উপভোগ করতে হলে এখানে আসতে হয়।

বিকেলে কন্‌সার্ট শুনতে গেলাম; দেখলাম পাশের ঘরে জুয়োখেলা চলছে; আমাদের মতো আন্‌কোরা কাঁচা দর্শকের পক্ষে দৃশ্যটি ভারি কৌতূহলোদ্দীপক। জুয়াড়ীদের মুখগুলো প্রায় ভাবশূন্য, বেজায় হেরে গেলেও তাই; নেহাত যদি কোনো ভাব প্রকাশ করে, সেও মুহূর্তকের জন্য; কিন্তু চাপা বলেই আরো তীব্র বলে মনে হল। মেয়েদের দেখে আরো কৌতূহল হল; পুরুষদের চাইতে এদের আরো শোচনীয় অবস্থা; কেউ বুড়ি, কেউ-বা যুবতী, কিন্তু সকলের মুখে একই নিবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন ভাব, যেন কোনো হিংস্র জানোয়ার ওদের জাদু করেছে।

সেপ্টেম্বর ৬, শুক্রবার—মনে হল বড়ো তাড়াতাড়ি এম্‌স্ ছেড়ে যেতে হচ্ছে; স্টীমার চেপে, বেলা দশটায়, রাইন-নদীর ওপর দিয়ে বিঙ্গেন পর্যন্ত যাওয়া। চমৎকার দিন। টিকিট কিনেছিলাম জাহাজের পিছন দিকের সীটের জন্য, (কেন জানি না সকলের ধারণা সেগুলিতেই বেশি আরাম,) আমি কিন্তু সমস্তক্ষণ, অর্থাৎ চার-পাঁচ ঘণ্টা, জাহাজের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে, দেখছিলাম নদীটা কেমন এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছে। অবশ্য সবই একরকম, বলতে গেলে একঘেয়ে, রাশি রাশি ছুঁচলো-মাথা-পাহাড়, তাদের গায়ে আঙুরের ক্ষেত, কিম্বা ছোটো-ছোটো গাছ, পায়ের কাছে এখানে ওখানে গ্রাম, কিম্বা

পাথরের ওপর অদ্ভুত চেহারার একটা কেল্লা, ঐ পাথরটার আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে গড়া ; প্যারিসের দোকানদাররা হয়তো একে বলত "উদ্ভট, জোর-জবরদস্তির স্থাপত্য", কিন্তু যে যাই বলুক এরকম দৃশ্য দেখে দেখে সহজে ক্লান্তি আসে না। বিঙ্গেন পৌঁছে, 'হোটেল ভিক্টোরিয়া'তে উঠলাম। পরদিন ভোরে প্যারিস অভিমুখে রওনা ; এই আমাদের ভ্রমণের শেষ অংশ। প্যারিস পৌঁছতে প্রায় রাত দশটা বাজল।

সেপ্টেম্বর ৮, রবিবার—মিঃ আর্থার গার্ণির গির্জায় গিয়ে খামখেয়ালী কিন্তু কিঞ্চিৎ ভারি চিত্তাকর্ষক উপদেশ শুনলাম। যাবার পথে ওয়াড্‌হ্যামের থর্লির সঙ্গে দেখা এবং একসঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বেরোবার ব্যবস্থা করা। বিকেলে 'তুইলের' বাগান আর 'শঁসেলিসে' হয়ে 'বোয়া বুলোনে' পৌঁছলাম। এর ফলে এই সুন্দর শহরটির মধ্যে পার্ক, বাগান জলাশয় ইত্যাদির রূপ নিয়ে কত যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরা আছে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল। দেখে দেখে বুঝতে পারলাম প্যারিসের লোকরা লণ্ডনকে কেন 'ত্রিস্ত', অর্থাৎ 'বিষন্ন' বলে। বিকেলে তিন জনে 'দিনের ইয়োরোপিয়েঁ'তে খেয়ে, মিঃ গার্ণির গির্জায় গেলাম।

সেপ্টেম্বর ৯, সোমবার—এগ্‌জিবিশন্ দেখে দিনটা কাটালাম, অবশ্য আমি নিজে ছবি ছাড়া বিশেষ কিছু দেখলাম না ; আধুনিক শিল্পের এমন নিদর্শন বিরল ; এত বড়ো সংগ্রহের মধ্যে প্রায় একটিও নিকৃষ্ট ছবি বা মূর্তি নেই। বর্ণনা দেবার অসাধ্য কাজে হাত দেব না, শুধু ফ্লরেন্সের 'কারনি'র নাম করব। তাঁর মূর্তিগুলিকে আমার অপূর্ব সুন্দর বলে মনে হল। একটিতে একজন শিশু একটা সিংহের সঙ্গে খেলা করছে, আরেকটির নাম 'এস্‌ক্লেভ ও মার্শ' তৃতীয়টি 'ওফিলিয়া'। সবগুলি শ্বেত-পাথরে তৈরি। শেষেরটিতে ওফিলিয়া পাগল হয়ে, চার দিকে ফুল ছড়াচ্ছে। বলা বাহুল্য ফরাসী ছবিই বেশি, এবং সেগুলিই সব চাইতে ভালো। দেখে মনে হল আমাদের ইংরেজ শিল্পীরা কে কত দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি পাঠাতে পারেন, তাই নিয়ে রেষারেষি করেছেন ! সামান্য কটি অ্যামেরিকান ছবির মধ্যেও অপূর্ব কয়েকটি আছে।

সন্ধ্যায় থর্লি আর আমি 'থিয়েটার ভডেভিলে' 'বঁভিট পরিবার' নামক নাটক দেখতে গেলাম ; চমৎকার অভিনয় ; প্রত্যেকটি ভূমিকা সযত্নে ও

সুদক্ষভাবে দেখানো হয়েছে। ফ্যান্‌ফ্যানের ভূমিকায় যে ছোটো মেয়েটি নেমেছিল, তার মতো বুদ্ধিমতী শিশু আমি কম দেখেছি ; প্রোগ্র্যামে তার নাম দেওয়া আছে কামিল্‌, বয়স ছয়ের বেশি হবে না।

সেপ্টেম্বর ১০, মঙ্গলবার—বিবিধ কাজের দিন। ক্যাণ্ড্‌লার আর পেজের সঙ্গে দেখা ও প্রথমে তাদের সঙ্গে, পরে একা বেড়ানো। একা ঘুরে ফটোগ্রাফ কিনতে গিয়ে দেরি হল, এগ্‌জিবিশনে যাবার সময় রইল না। রোজ যেখানে খাই সেখানে লিডন আর আমি ডিনার খেলাম, তার পর 'শঁসেলিসে'তে মুক্ত-অঙ্গনে সামরিক কন্‌সার্ট শুনতে গেলাম।

সেপ্টেম্বর ১১, বুধবার—লুভ্‌র্‌ হোটেলটি এত বড়ো যে সেখানে আরাম পাওয়া যায় না। পেজ আর আমি অনেকগুলো হোটেল দেখে শেষে মিসেস্‌ হাণ্টের অনুমোদিত 'ওতেল দে দো মণ্ড'-টিকে সব চাইতে ভালো মনে করলাম ; সেখানে দুটি ঘর ঠিক করলাম। বিকেলে আরেকবার এগ্‌জিবিশনে গেলাম, ফিরে এসে নতুন হোটেলে খেলাম। সেখানকার খাবার-ঘরটি একটা রেস্তোরাঁও বটে, অর্থাৎ বাইরের লোকও খেতে পারে। খুব ভালো খাওয়া।

সেপ্টেম্বর ১২, বৃহস্পতিবার—কেনাকাটা, তার পর ফের এগ্‌জিবিশন। বাইরের হাতায় ঘুরতে ঘুরতে, একটা প্যাভিলিয়ন থেকে চীনে বাদ্য শুনতে পেলাম। আধ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে ভিতরে গেলাম, কাছে থেকে শুনব বলে ; ভিতরও বাইরের তফাতের ঐটুকু দাম তো হবেই। তবে বাইরে থেকেই বেশি ভালো। অমন সঙ্গীত একবার শুনলে আর শুনতে ইচ্ছা করে না। সন্ধ্যায় 'অপেরা কমিকে' গিয়ে 'মিনিয়ন' শুনে তার শোধ নিলাম। ভারি চমৎকার দৃশ্যপট, অপূর্ব গান-বাজনা। নায়িকার নাম মাদাম গ্যালিমারি, তিনিই উভয় সাফল্যের অনেকখানি কারণ।

সেপ্টেম্বর ১৩, শুক্রবার—ঘুরলাম, কেনাকাটা করলাম। বিকেলে রু দ্য সেভ্‌র্‌-এ সেন্ট টমাসের কনভেণ্টে একটা মলমের চেষ্টায় গেলাম, ওখানকার নান্‌রা করেন। দুজন নানের সঙ্গে আর বয়স্কা একজনের

সঙ্গে—তাঁকেই ওখানকার কর্ত্রী মনে হল—কথা হল। তিনি আমাকে সাবলীল ফরাসী ভাষায়—যার বেশির ভাগই বুঝলাম না—বুঝিয়ে দিলেন যে ঐ মলম ওঁরা কখনো বিক্রি করেন না, নিজেদের এলাকার গরিবদের দান করেন। হতাশ হয়ে প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিলাম, হঠাৎ আঁচ করলাম যে মলম জোগাড় করবার অন্য উপায়ও আছে। কাজেই বেশি ভূমিকা না করে সরাসরি বললাম, "বেশ, বিক্রি না হয় নাই করলেন, আমাকে একটু দান করুন, আমিও আপনাদের দরিদ্রদের জন্য কিছু দান করব।" উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়।" এই ভাবে শেষপর্যন্ত মিষ্টি কথায় ঢাকা দিয়ে রফা করে ফেলা গেল।

সন্ধ্যা সাতটায় হোটেল ছেড়ে ক্যালের অভিমুখে রওনা হলাম। শান্তিতে ও আরামে ঘুমিয়ে, রাত দুটোয় সেখানে পৌঁছলাম। ইংলিশ চ্যানেল স্থির শান্তিপূর্ণ। নির্মল জ্যোৎস্নালোক উপভোগ করতে করতে, সহজেই পার হয়ে গেলাম। চাঁদের বাহার এখন দেখে কে, ঠিক যেন চার ঘণ্টা আগের চন্দ্রগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। প্রায় সমস্তক্ষণ জাহাজের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, কখনো পাহারারত নাবিকের সঙ্গে গল্প করে, কখনো আমার এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণের শেষ প্রহরে দূর থেকে ডোভার শহরের আলো দেখে সময় কাটালাম। দিগন্তে দেখলাম সেই আলো ক্রমে প্রশস্ত হচ্ছে, যেন আমাদের প্রাচীন মাতৃভূমি দুই হাত প্রসারিত করে ঘর-ফেরা ছেলেদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তার পর স্পষ্ট দেখা গেল উঁচু পাড়ির ওপর দুটি লাইটহাউস আর এতক্ষণ যাকে মনে হচ্ছিল কালো জলের ওপর ছায়াপথের প্রতিবিম্বের মতো ক্ষীণ একটি আলোর রেখা, সে তীরের ওপরকার এক সারি বাড়ির আকার নিল। আর তারও পিছনে যে অস্পষ্ট সাদা রেখাকে দিগন্তে ছড়ানো কুয়াশা বলে মনে হচ্ছিল, ভোরের আলোয় তাকে প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের সাদা পাড়ি বলে চেনা গেল।

—

বিচিত্র

লুইস ক্যারলের এমন কিছু রচনা আছে, তাঁর অন্যান্য সুপরিচিত রচনার সঙ্গে যার জাতের মিল বিশেষ নেই ; এবং যা বিশেষ করে ছোটোদের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা নয়। এর অনেকগুলিই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, কিম্বা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর পর। সেই-সব রচনারই কিছু কিছু অনুবাদ গ্রথিত হল এই অংশে—লেখক হিসাবে লুইস ক্যারলের পরিচয়কে যথা-সম্ভব সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে।

নতুন খেলা

"অ্যাকিলিসকে কচ্ছপ কি বলেছিল"

দৌড়ে অ্যাকিলিস কচ্ছপকে ধরে ফেলে, আরাম করে তার পিঠে চেপে বসেছিলেন।

কচ্ছপ বলল, "তা হলে তুমি আমাদের ঘোড়দৌড়ের মাঠের শেষ পর্যন্ত পেঁছিলে? যদিও মাঠটা হল একটা শেষ-হীন দূরত্বের পারম্পর্য। আমার তো বিশ্বাস ছিল কোথাকার কোন পণ্ডিত প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তা হতেই পারে না।"

অ্যাকিলিস বললেন "নিশ্চয় পারে। হয়েছেও। বুঝলে কিনা ঐ দূরত্বগুলো ক্রমশ কমতে থাকে, কাজেই—"

কথার মধ্যিখানে কচ্ছপ বলল, "কিন্তু যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকত, তা হলে কি হত?"

বিনীতভাবে অ্যাকিলিস তার উত্তরে বললেন, "তা হলে আমি এখানে থাকতাম না আর তুমি এতক্ষণে পৃথিবীর চার দিকে বেশ কয়েকবার বেড় দিয়ে আসতে।"

কচ্ছপ বলল, "ও হল গিয়ে চাটু-বাদ, অর্থাৎ চ্যাপ্টা-বাদ, কারণ তোমার ওজনটি কিছু কম নয় বাপু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, তা হলে কি এবার এমন একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠের কথা শুনতে চাও, যেটিকে দেখে বেশির ভাগ লোকই ভাবে বুঝি তিন-চার পদক্ষেপে

পার হয়ে যাবে, অথচ আসলে সেটি একটি শেষ-হীন দূরত্বের পারম্পর্য দিয়ে তৈরি, আর শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি দূরত্ব তার আগেরটির চাইতে খানিকটা করে বড়ো ?”

গ্রীক যোদ্ধা অ্যাকিলিস তখন তাঁর হেল্‌মেটের ভিতর থেকে মস্ত একটা নোট-বই আর পেনসিল বের করলেন ; বলা বাহুল্য সেকালের গ্রীক যোদ্ধাদের বড়ো একটা পকেটের বালাই ছিল না। অ্যাকিলিস বললেন, “এবার বল, কিন্তু ধীরে ধীরে, মনে থাকে যেন এখনো শর্ট-হ্যাণ্ড আবিষ্কার হয় নি।”

স্বপ্নাবিষ্টের মতো কচ্ছপ বলল, “ইউক্লিডের প্রথম অপরূপ প্রতিপাদ্য। তুমি ইউক্লিডের ভক্ত ?”

“বেজায়। অন্তত যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে এখনো বেশ কয় শতক বাকি আছে, তার যতখানি ভক্ত হওয়া সম্ভব।”

“বেশ, তা হলে প্রথম প্রতিপাদ্যের বিতর্কের একটুখানি ধরা যাক, মাত্র দুটি যুক্তি আর তার থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। দয়া করে এ-সব তোমার খাতায় টুকে রাখ। আর পরে উল্লেখ করার সুবিধার জন্য ওগুলোকে এ, বি আর জেড্ নাম দেওয়া যাক।

(এ) যে-সব জিনিস অন্য কোনো একটি জিনিসের সমান, তারা পরস্পরের সমান।

(বি) এই ত্রিভুজের দুটি বাহু হল এমন জিনিস যা অন্য একটি জিনিসের সমান।

(জেড্) এই ত্রিভুজের দুটি বাহু পরস্পরের সমান।

আশাকরি ইউক্লিডের পাঠকরা সকলে মেনে নেবেন যে এ আর বি থেকে যুক্তিযুক্তভাবে জেডে পৌঁছনো যায়, কাজেই যাঁরা এ আর বি-কে সত্যি বলে মানেন, তাঁদের জেড্-কেও সত্যি বলে মানতে হবে ?”

অ্যাকিলিস বললেন, “নিঃসন্দেহে। হাইস্কুলের সব চাইতে ছোটো ছেলেও—মানে—যেই-না হাইস্কুল আবিষ্কৃত হবে, অর্থাৎ হাজার দুই বছর বাদে—ও কথা মানবে।”

কচ্ছপ বলল, “এবং কোনো পাঠক যদি এখন পর্যন্ত এ আর বি-কে সত্যি বলে নাও মেনে থাকে, তা হলেও উদ্ভূত ফলটিকে সে অকাট্য যুক্তি সিদ্ধ বলে স্বীকার করবে, আশা করি ?”

অ্যাকিলিস বললেন, "তা, সেরকম পাঠকও থাকতে পারে। সে হয়তো বলবে, "আমি এই প্রকল্পিত যুক্তিটিকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছি যে এ আর বি যদি সত্যি হয়, তা হলে জেড্ও সত্যি ; তবে কিনা, আমি এ আর বি-কে সত্যি বলে মানি না।" এই ধরনের পাঠক যদি ইউক্লিড ছেড়ে ফুটবল খেলা ধরে, তা হলে বোধ করি বুদ্ধির কাজ হবে।"

কচ্ছপ বলল, "তা হলে তো এমন পাঠকও থাকতে পারে, যে বলবে, "আমি এ আর বি-কে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছি, কিন্তু ঐ প্রকল্পিত বিষয়টি মানতে পারছি না!"

"সেরকম লোক তো খুবই থাকতে পারে। তারও ফুটবল ধরা উচিত।"

কচ্ছপ বলে চলল, "এখন পর্যন্ত এই দুই পাঠকের মধ্যে কেউই যুক্তির বাধ্যকতায় জেড্-কে সত্যি বলে মেনে নিতে বাধ্য নয়!"

অ্যাকিলিসও কথাটা সমর্থন করে বললেন, "ঠিক তাই।" কচ্ছপ বলল, "তা হলে আমি চাই যে তুমি আমাকে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক বলে ধরে নাও এবং যুক্তির সাহায্যে, জেড্‌কে সত্যি বলে মেনে নিতে আমাকে বাধ্য কর।" অ্যাকিলিস সবে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, "কচ্ছপের পক্ষে ফুটবল খেলা হল—"

কচ্ছপ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, "—নিয়মবহির্ভূত, সে তো ঠিক কথা। দেখ, প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে সরে যেয়ো না। জেডের কথা আগে হোক, তার পর ফুটবলের কথা।"

অ্যাকিলিস কি যেন ভাবতে ভাবতে বললেন, "জেড্‌কে সত্যি বলে গ্রহণ করতে তোমাকে বাধ্য করতে হবে, এইতো? আর বর্তমানে তুমি বলছ তুমি এ আর বি-কে সত্যি বলে মানছ, কিন্তু প্রকল্পটাকে মানছ না?

কচ্ছপ বলল, "ওটার নাম দেওয়া যাক সি।" অ্যাকিলিস বললেন, "তুমি সি-কে মানছ না অর্থাৎ এ কথা মানছ না যে এ আর বি যদি সত্যি হয়, তা হলে জেড্‌ও সত্যি।"

কচ্ছপ বলল, "বর্তমানে আমার ঐ অবস্থা।"

অ্যাকিলিস বললেন, "সে ক্ষেত্রে তোমাকে অনুরোধ করি সি-কেও মেনে নাও।" কচ্ছপ বলল, "তাই করব, যেই তুমি সে কথা তোমার খাতায় লিখে নেবে, অমনি করব। খাতায় আর কি লিখেছ?" ভয়ে ভয়ে পাতা ফড়্-ফড়্ করে, অ্যাকিলিস বললেন, "এই কতকগুলো

স্মারকলিপি—কোথায় কোন যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখিয়েছিলাম, এই-সব।"

উৎফুল্ল হয়ে কচ্ছপ বলল, "অনেকগুলো পাতাই তো খালি দেখছি। আমাদের সবগুলোই দরকার হবে।" অ্যাকিলিস শিউরে উঠলেন। কচ্ছপ বলল,

"যেমন যেমন বলছি, তেমনি লিখে নাও দিকিনি :

(এ) যে-সব জিনিস একই জিনিসের সমান, তারা পরস্পরের সমান।

(বি) এই ত্রিভুজের দুটি বাহু একই জিনিসের সমান।

(সি) এ আর বি যদি সত্যি হয়, তা হলে সি-ও সত্যি।

(জেড্) এই ত্রিভুজের দুই বাহু পরস্পরের সমান।"

অ্যাকিলিস বললেন, "ওটাকে জেড্ না বলে, ডি বলা উচিত। অন্য তিনটির পরেই ওটি আসছে। এ আর বি আর সি-কে মেনে নিলে, জেড্‌কেও মেনে নিতে হবে।"

কচ্ছপ বলল, "কেন মেনে নিতে হবে?"

অ্যাকিলিস বললেন, "যেহেতু যুক্তিসংগত ভাবে ওগুলো থেকে এটি আসছে। এ আর বি আর সি সত্যি হলে, জেড্‌কেও সত্যি হতে হবে। আশা করি তাতে তুমি আপত্তি করছ না?" চিন্তিতভাবে কচ্ছপ কথাগুলোর পুনরুক্তি করল, "যদি এ আর বি আর সি সত্যি হয়, তা হলে জেড্‌কেও সত্যি হতে হবে। ওটাও তো আরেকটা প্রকল্প, কেমন কি না? আর যদি ওটাকে সত্যি বলে বুঝতে না পারি, তা হলে এ আর বি আর সি-কে মেনে নিয়ে, তবু জেড্‌কে নাও মানতে পারি, তাই কি না?" আমাদের স্পষ্টবাদী নায়ক বললেন, "তা পারো, যদিও এমন মূঢ়তার আর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু ওটা সম্ভব বৈকি। কাজেই তোমাকে আরেকটা প্রকল্প মেনে নিতে বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

কচ্ছপ বলল, খুব ভালো। তুমি ও কথা লিখে নিলেই, আমিও মেনে নিতে রাজি আছি। ওটির নাম দেওয়া যাক ডি।

ডি হল : যদি এ আর বি আর সি সত্যি হয়, জেড্‌ও সত্যি। এ কথা খাতায় তুলেছ?"

আনন্দের সঙ্গে অ্যাকিলিস বলে উঠলেন, "লিখেছি বৈকি।" তার পর পেন্‌সিল খাপে ভরে বললেন, "অবশেষে এই আদর্শ ঘোড়দৌড়ের শেষ

অবধি পৌঁছনো গেল। তুমি যখন এ আর বি আর সি আর ডিকে মেনে নিচ্ছ, তখন জেড্‌কে-ও মেনে নিচ্ছ নিশ্চয়ই?"

ভালোমানুষের মতো কচ্ছপ বলল, "তাই নিচ্ছি নাকি? দেখি, কথাটাকে স্পষ্ট করে বুঝে দেখি। আমি এ আর বি আর সি আর ডি-কে মেনে নিয়েছি। ধর তবু যদি জেড্‌কে না মানি?"

বিজয়গর্বে অ্যাকিলিস বললেন, "তা হলে তর্কশাস্ত্র তোমার ঘাড় ধরে তোমাকে মানতে বাধ্য করাবে। তর্কশাস্ত্র বলবে, 'তোমার অন্য পথ নেই। যখন এ আর বি আর সি আর ডি-কে মেনে নিয়েছে, জেড্‌কেও মানতেই হবে'।"

কচ্ছপ বলল, "তর্কশাস্ত্র দয়া করে আমাকে যে কথা বলেন, সেটি লিখে রাখার যোগ্য। কাজেই ও কথাও খাতায় তোল, ওর নাম দেওয়া যাক ই।"

ই হল যদি এ আর বি আর সি আর ডি সত্যি হয়, তা হলে জেড্‌ও সত্যি।

যতক্ষণ না ওটা মেনে নিচ্ছি, ততক্ষণ জেড্‌কে মেনে নেবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই এটাও একটা প্রয়োজনীয় পদ, বুঝলে কি না?"

অ্যাকিলিস বললেন, "বুঝলাম।" তাঁর গলার স্বরে একটু বিষণ্ণতার সুর শোনা গেল।

এই অবধি বলে গল্পকারকে ঐ দুটি সুখী প্রাণীকে ছেড়ে রেখে চলে যেতে হল, কারণ ব্যাঙ্কে তাঁর বড়ো জরুরি কাজ ছিল। এর পর কয়েক মাস তাঁর ও দিকে যাবার দরকার হয় নি। শেষটা যখন গেলেন, দেখলেন অ্যাকিলিস তখনো পরম-সহিষ্ণু কচ্ছপের পিঠে বসে বসে নোট-বইতে কি যেন লিখছেন, নোট-বইটিও প্রায় ভরে এসেছে। কচ্ছপ বলছিল, "ঐ শেষের পদটি টুকে রেখেছ তো? আমার যদি গুণতে ভুল না হয়ে থাকে, ওটা হল এক হাজার এক। আরো কয়েক কোটি বাকি আছে। এবার আমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ করবে কি? কারণ ভেবে দেখ আমাদের এই সংলাপ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তর্কবিদ্‌রা কতখানি জ্ঞান অর্জন করবেন—কাজেই বিশেষ অনুগ্রহ করে কি আমার মাসতুতো ভাই নকল-কাছিম সে-সময়ে যে কথার-খেলা করবেন, সেটি গ্রহণ করে নিজের নাম পালটে 'ট'ট্‌-আস্' নাম নিতে রাজি হবে?"

পরিশ্রান্ত যোদ্ধা তখন হতাশায় ভগ্ন কণ্ঠে, দুই হাতে মুখ ঢেকে বললেন, "তুমি যেমন বল। অবিশ্যি তা হলে তোমার দিক থেকে তুমিও নকল-কাছিম যে কথার-খেলা কখনো করে নি, সেটি গ্রহণ করে নিজের নাম নেবে "এ কিল ঈজ।"

এখানে গল্পকারের ব্যাখ্যানার দরকার আছে। কচ্ছপকে ইংরিজিতে বলে 'টর্টয়স্', কিন্তু ইংরেজরা তার উচ্চারণ করে 'ট'ট্-আস্' এবং 'কিল্-ঈজ্' তাকে বলে যে অন্য লোকের আরাম নষ্ট করে।

অর্ধগোলকের সমস্যা

পৃথিবীর অর্ধেকটা, অন্তত প্রায় তাই, সর্বদা সূর্যের আলো পায়। পৃথিবী যেমন ঘুরতে থাকে, ঐ আলোর অর্ধগোলকটিও ঘুরতে থাকে আর পর পর পৃথিবীর সব জায়গায় পড়ে।

ধর মঙ্গলবার দিন, লণ্ডনে সকাল হল; এক ঘণ্টা বাদে ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম অংশে মঙ্গলবার সকাল হবে; যদি সমস্ত পৃথিবীটা শুকনো ডাঙা হত, তা হলে আমরা হয়তো মঙ্গলবার সকালের পায়ে পায়ে এগোতে পারতাম। এর সব চাইতে সহজ উপায় হল কল্পনায় সূর্যের সঙ্গে হাঁটা দেওয়া আর পথে যত বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা হবে, তাদের জিজ্ঞাসা করা, "বলুন তো আজ কোন দিনের সকাল হল?" যদি মনে করে নেওয়া যায় যে ঐ লোকরা পৃথিবীর চার দিক ঘিরে বাস করে আর সবাই এক ভাষা বলে, তবু কেমন অসুবিধা হবে সে তো বোঝাই যাচ্ছে।

সে যাই হোক মঙ্গলবার সকালটাকে ধাওয়া করে চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘুরে, আবার লণ্ডনে ফিরে আসা গেল। কিন্তু আমরা তো জানি যে মঙ্গলবার সকালের চব্বিশ ঘণ্টা পরে হয় বুধবার সকাল। তা হলে পৃথিবীর চার দিকে বেড় দেবার সময়, ঠিক কোন জায়গায় দিনটার নাম বদলায়? কোথায় সে তার পুরনো পরিচয় হারায়?

আসলে কিন্তু কোনো অসুবিধাই হয় না, কারণ পৃথিবীর চার দিকে ঘুরতে হলে, বেশির ভাগই জলের ওপর দিয়ে যেতে হয় আর জলের ওপর কি কাণ্ড হয়, কে তার খবর রাখে? তাছাড়া এতরকম আলাদা

ভাষা আছে যে সারা বছরের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ দিনের নামের পিছন পিছন ছুটে কোনো লাভ হবে না। তবু এটা কি কল্পনা করা যায় না যে একই দেশ, একই ভাষা, পৃথিবী ঘিরে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে? কেন হতে পারে না ভেবে পাচ্ছি না। আর ওরকম যদি হত, তা হলে সপ্তাহের সাতটা দিনে কোনো তফাত থাকত না, সপ্তাহে-সপ্তাহে, মাসে-মাসেও তফাত থাকত না। কাজেই ওয়াটারলু যুদ্ধের তারিখ বলতে হলে, বলতে হত, "ওয়াটারলু যুদ্ধ কুড়ি লক্ষ ঘণ্টা আগে আজকে হয়েছিল।" নয়তো একটা রেখা ঠিক করে নিতে হত যেখানে দিনের নাম বদলে যেত। তার ফলে লাইনটার এক পাশের বাড়ির লোকরা সকালে উঠে হাই তুলে বলত, "মঙ্গলবার সকাল হল!" আর লাইনের অন্য পাশে কয়েক মাইল দূরের বাড়ির লোকরা কয়েক মিনিট বাদেই উঠে বলত, "বুধবার সকাল হল।"

কিন্তু যারা ঠিক ঐ লাইনটার ওপর বাস করত তাদের কেমন গণ্ডগোলের ব্যাপার হত সে আর না-ই বললাম। হয়তো সে দিনটার কি নাম রাখা যাবে, তাই নিয়ে রোজ সকালে এক পালা ঝগড়া হত। আর তো তৃতীয় কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি না, এক যদি সকলকে যার যা খুশি বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হত; কিন্তু তাতে অবস্থাটা আরো খারাপ হত।

আমি জানি এ কথা আরো অন্য লোকের এর আগেও মনে হয়েছে—যেমন সেই যে লোকটি খাসা এক কবিতা লিখেছিলেন:

সারা দুনিয়াটা যদি হত পিঠে-পুলি,
সব সাগর হত যদি কালি,
সব গাছ যদি হত লুচি-ছোকা,
জলের কলসি হত, হায়! খালি!

তবে এখানে যে-সমস্ত অসুবিধার কথা বলা হল, সে-সব বোধ হয় তাঁর মনেই পড়ে নি, কারণ তিনি অবশ্যম্ভাবী জলের অভাব নিয়েই চিন্তিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এ বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য হল যে ঐ-সব কথা লেখার পর প্রায় একশো বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে পৃথিবীর

পণ্ডিতরা সত্যি-সত্যিই একটা আন্তর্জাতিক-তারিখ-রেখা স্থির করে ফেলে, সেই মতে কাজ করছেন। রেখাটার এক দিকে বুধবার, অন্য দিকে মঙ্গলবার। আরো আশ্চর্য কথা ধরো কলকাতা বন্দর থেকে বেরিয়ে অন্যান্য দেশ-টেশ এড়িয়ে ক্রমাগত পুবে যেতে যেতে, এক সময় ঐ আন্তর্জাতিক-তারিখ-রেখায় পেঁাছে গেলে, তার পর দেখবে আরো পুবে গেলে শেষটা সুদূর পশ্চিমের দেশ অ্যামেরিকায় পেঁাছে গেছ! সুখের বিষয় রেখাটা মাঝ-সমুদ্রে পড়াতে সত্যি সত্যি কারো কোনো অসুবিধা হয় না।

দিন কোথায় শুরু হয়?[1]

মহাশয়, দিন কোথায় শুরু হয়, এই প্রশ্ন নিয়ে আজকাল আপনাদের পত্রিকায় কিছু লেখা লিখি হচ্ছে লক্ষ্য করলাম। অনেক বছর আগে এ প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একটা সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাই নি। আপনাদের পত্র-লেখকরা যাতে প্রশ্নটির আসল জটিলতা কোথায় সে বিষয়ে সচেতন হন, সেদিক দিয়ে আমার আগ্রহ আছে।

লিচ্‌ফীল্ডের টি. জে. বাক্‌টনের মতে দেখছি পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোনো না কোনো জায়গায় সব সময়ই দিন শুরু হচ্ছে। তা হলে চব্বিশ ঘণ্টায় যদি কেউ পৃথিবীর চার দিক ঘুরে এসে, সব জায়গায় ঠিক রাত বারোটায় পেঁাছতে পারত, তা হলে প্রত্যেক জায়গাতেই দেখত বার পালটাচ্ছে। কিন্তু যদি রাত বারোটায় না পেঁাছে বেলা বারোটায় পেঁাছনো যেত, সঙ্গে সঙ্গে মুশকিলে পড়ে যেতাম।

সংক্ষেপে অবস্থাটা এইরকম দাঁড়াত: ধরুন আপনি মঙ্গলবার বেলা বারোটায় লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে চললেন; তা হলে বুধবার বেলা বারোটায় আবার এসে লণ্ডনে পেঁাছে গেলেন।

যাত্রাকালে যদি প্রত্যেক ঘণ্টার শেষে যেখানে পেঁাছলেন, সেখানকার

---

[1] 'দি ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ'কে ক্যারল এই চিঠি লিখেছিলেন। তারিখ ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৭।

ইংরেজ অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন, "আজ কি বার?" তা হলে এক সময়ে না এক সময়ে এমন একটা জায়গায় আপনাকে পেঁছিতে হবে যেখানকার অধিবাসীরা বলবে "বুধবার"। কিন্তু তার এক ঘণ্টা আগেও যে জায়গা ছেড়ে এসেছিলেন সেখানে ছিল মঙ্গলবার। কাজেই ঐ দুটি জায়গার মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের দূরত্ব হলেও, একই দিনকে দুজনে দুটি বারের নাম দিচ্ছে। তাও রাত দুপুরে নয়, তখন তো বারের নাম বদলানোই স্বাভাবিক, এ-ব্যাপার হচ্ছে যখন এক জায়গায় দুপুর ১২টা আর অন্য জায়গায় বেলা ১টা। এমন দুটি জায়গা আছে কি না আর থাকলেও, অশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করে তাদের মধ্যে খবরাখবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, সেটা আমার জানা নেই। কেউ যদি এই সমস্যার একটা যুক্তি সংগত সমাধান করে দিতে পারেন তা হলে বড়ো সুখী হই। ইতি।

দুই ঘড়ি

কোনটা বেশি ভালো, যে ঘড়ি বছরে মাত্র একবার ঠিক সময় দেখায় নাকি যে-ঘড়ি রোজ দুবার ঠিক সময় দেখায়?

তুমি হয়তো বলবে, "নিশ্চয় দ্বিতীয়টি।" তা হলে শোন :

আমার দুটি ঘড়ি আছে, তার একটি মোটে চলেই না আর অন্যটি রোজ এক মিনিট 'স্লো' হয়ে যায়; কোনটি তোমার পছন্দ? তুমি হয়তো বলবে, "নিঃসন্দেহে যে ঘড়িটা স্লো হয়ে যায়।" এবার দেখ, যে ঘড়ি রোজ এক মিনিট করে স্লো হয়, ঠিক সময় দেখাবার আগে, তাকে ১২ ঘণ্টা, অর্থাৎ ৭২০ মিনিট স্লো হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ দুই বছরে ঐ ঘড়িতে মাত্র একবার ঠিক সময়টা দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু যে ঘড়ি চলে না, সে যতটা বেজে থেমে আছে, দিনে দুবার করে ঠিক সেই সময়টি হয়, অর্থাৎ দিনে দুবার সে ঠিক সময় দেখায়।

কাজেই বুঝতে পারছ নিজের কথা নিজেই একবার অস্বীকার করলে!

তুমি বোধ হয় বলবে, "কিন্তু দিনে দুবার ঠিক হয়েই-বা কি সুবিধা হচ্ছে, যদি ঐ ঠিক হবার সময়টাই জানতে না পারি?"

আচ্ছা, ধর ঘড়িটা আটটা বেজে থেমে আছে, বুঝতে পারছ যে

আটটা বাজলেই ঘড়িটি ঠিক সময় দেখায় ? কাজেই যেই আটটা বাজবে, তোমার ঘড়িও ঠিক সময়ই দেখাবে।"

তার উত্তরে তুমি বলবে, "সে না হয় বুঝলাম।"

বেশ, তা হলে দুবার নিজের কথা নিজে অস্বীকার করলে। এখন এই অসুবিধা থেকে যেমন করে পারো নিজেকে উদ্ধার করো আর পারো যদি তা হলে আর কখনো নিজের কথা নিজে অস্বীকার কোরো না।"

তুমি হয়তো তবু জানতে চাইবে : "কিন্তু সত্যি সত্যি কখন আটটা বাজল, টের পাব কি করে ? আমার ঘড়ি দেখে তো বোঝা যাবে না।" ধৈর্য ধর ; তুমি তো জানই যে যখনি আটটা বাজবে তোমার ঘড়িতে ঠিক সময় দেখা যাবে ; ভালো কথা, তা হলে এই নিয়ম কর ; ঘড়ির ওপর চোখ রাখ, যেই-না ঠিক সময় দেখাবে অমনি আটটা বাজবে।"

তুমি বলতে পারো, "কিন্তু—" ব্যস্, ব্যস্ ঐ হল। যতই-না তর্ক করবে, ততই বিষয়টা গুলিয়ে যাবে, কাজেই থেমে যাওয়াই ভালো !"

ধাঁধা

(১)

চারজন লোক আর তাদের স্ত্রীরা নৌকো করে একটা নদী পার হতে চায়, কিন্তু নৌকোতে দুজনের বেশি ধরে না।

দুটি শর্ত রক্ষা করতে হবে ; (১) স্ত্রীদের কাউকে একা, কিম্বা শুধু অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে তীরে ফেলে রাখা চলবে না। (২) প্রত্যেকবার কাউকে নৌকো ফিরিয়ে আনতে হবে।

ওরা কি ভাবে পার হল ?

(২)

এক বন্দিনী রানী, তাঁর ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে একটা উঁচু মিনারের মাথার ঘরে বন্ধ ছিলেন। জানলার বাইরে একটা কপি-কল ছিল, তাতে একটা দড়ি পরানো ছিল, আর দড়িটার দুই মাথায় দুটি সমান ওজনের ঝুড়ি বাঁধা ছিল।

ওরা এই কপি-কলটার আর ঘরে একটা বাটখারা ছিল তার সাহায্যে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

কয়েকটা অসুবিধা ছিল। নিচু ঝুড়ির জিনিসের চেয়ে উঁচু ঝুড়ির ওজন ১৫ পাউণ্ডের বেশি হলে মুশকিল, কারণ তা হলে ঝুড়ি বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি নামবে, তার অনেক বিপদ, ওদিকে কম ওজন হলেও চলবে না।

একটা ঝুড়ি নামলেই অন্যটা কিন্তু উঠবে। তা হলে ওরা পালাল কেমন করে?

রানীর ওজন ১৯৫ পাউণ্ড, মেয়ের ওজন ১৬৫, ছেলের ওজন ৯০, বাটখারার ওজন ৭৫।

এই ধাঁধার আরো খানিকটা আছে।

ছেলে মেয়ে আর বাটখারাটা ছাড়া, ঐ ঘরে রানীর আরো কটা জিনিস ছিল; ৬০ পাউণ্ডের একটা শুয়োর, ৪৫ পাউণ্ডের একটা কুকুর, ৩০ পাউণ্ডের একটা বেড়াল। এদেরও ঐ আগের নিয়ম অনুসারে নামানো হয়েছিল। ওজনটা অবশ্য যে কোনো ভাবে নেমে আসতে পারে।

আরেকটু অসুবিধাও ছিল; জানোয়ারগুলো ঝুড়িতে ভরতে আর ঝুড়ি থেকে বের করতে, ওপরে ও নীচে কাউকে থাকতে হয়েছিল।

মনের খোরাক

সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে বা বিকেলে ডিনার, রাতে টি; কিম্বা খুব বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সকালে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে লাঞ্চ, সন্ধ্যায় ডিনার, তার পর চা, বেশি রাতে সাপার, আবার ঘুমোতে যাবার সময় গেলাস ভরা গরম পানীয়। বাবা! শরীরটার কি ভাগ্য! কি যত্নই-না করি তার! কিন্তু মনের জন্যে অতখানি কে করে? এই তফাতের কারণটা কি? শরীরটার কি তা হলে গুরুত্ব বেশি?

মোটেই না: তবে শরীরটাকে খাইয়ে-দাইয়ে পুষ্ট না রাখলে, প্রাণটা থাকে না, অপর পক্ষে মনটাকে অযত্নে উপোসী করে ফেলে রাখলেও প্রাণ ধারণ করা যায়, অবিশ্যি জানোয়ারের মতো করে, মানুষের যোগ্য ভাবে নয়। কাজেই প্রকৃতির এইরকম ব্যবস্থা যে শরীরটার খুব বেশি অযত্ন করলে, অতি ভয়ঙ্কর ব্যথা যন্ত্রণায় ভুগতে হয়; তার ফলে অল্প

সময়ের মধ্যেই আবার আমরা কর্তব্যপালনে তৎপর হয়ে উঠি, তাছাড়া প্রাণধারণের জন্য যে-সব ক্রিয়ার দরকার হয়, প্রকৃতিই আমাদের হয়ে তার কিছুটা করে দেন, আমাদের হাঁ-না বলবার অপেক্ষায় থাকেন না। আমাদের যদি নিজেদের খাবার হজম করার, কিম্বা রক্ত চলাচলের ভার নিতে হত, তা হলে অনেকেরই শোচনীয় অবস্থা হত। কেউ হয়তো বলে উঠত, "কি সর্বনাশ! আজ সকালে আমার হৃৎপিণ্ডে চাবি দিতে ভুলে গেছি! ইদিকে গত তিন ঘণ্টা ধরে সেটি তো থেমে রয়েছে!" কোনো বন্ধু হয়তো বলতেন, "না, ভাই, আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারব না, কারণ অন্তত এগারোটা ডিনার হজম করতে বাকি আছে। এত ব্যস্ত ছিলাম যে গত সপ্তাহ থেকে ও কর্মটি করা হয় নি, ডাক্তার বলেছেন আর দেরি করলে, তার ফলাফলের জন্য উনি দায়ী হবেন না।"

আমি বলি কি, ভাগ্যিস শরীরের অযত্ন করলে, তার কুফলগুলো স্পষ্ট করে দেখা আর টের পাওয়া যায়। কারো কারো মনও যদি দেখা ছোঁয়া যেত তা হলে আরো ভালো হত—ধর যদি মনটাকে কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে যদি তার নাড়ি দেখানো যেত।

ডাক্তার হয়তো বলতেন, "সে কি! এই মনটা দিয়ে হালে করেছটা কি? ওকে খেতে দিয়েছ? কি ফ্যাকাশে চেহারা, নাড়ি তো প্রায় টেরই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"দেখুন, ডাক্তার-সায়েব, কিছুদিন ধরে ওকে নিয়মিত খেতে দেওয়া হয় নি। তবে কাল কষে আমসত্ত্ব খাইয়েছি। "আমসত্ত্ব? কিরকম আমসত্ত্ব?"

"ইয়ে—মানে—এক তোড়া ধাঁধা করতে দিয়েছিলাম।

"ঠিক যা ভেবেছিলাম। এবার শোন বলি; এইরকম চালাকি করে যাও যদি, ওর সব দাঁতগুলোর বারোটা বাজিয়ে দেবে, উপরন্তু ওর মানসিক পেটের ব্যামো হবে। এর পর কদিন ধরে সাদাসিধে সরল জিনিস ছাড়া, ওকে অন্য কিছু পড়তে দেবে না। এখন থেকে সাবধান! উপন্যাস-টুপন্যাস চলবে না।"

আমাদের শরীরগুলোর খাওয়া-দাওয়া ওষুধপত্র করা নিয়ে অনেকেরই কত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমার মতে সে কথা মনে রেখে, শরীর সুস্থ রাখার কতকগুলো নিয়মকে মনের ব্যাপারে অনুবাদ করে নিলে মন্দ হয় না।

তা হলে গোড়াতেই মনের জন্য উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। কোন জিনিসটা শরীরের সইবে আর কোনটা সইবে না সেটা জানতে আমাদের খুব বেশি সময় লাগে না, কাজেই আরেক টুকরো অতি লোভনীয় পুডিং কিম্বা পাই ফিরিয়ে দিতে আমাদের খুব কষ্ট হয় না, কারণ গতবারের বদ-হজমের শোচনীয় কথা আমাদের মনে আছে এবং ঐ পাই-পুডিং-এর নাম মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে অতি বদ্ খেতে টক তেতো ওষুধের কথাও মনে পড়ে। আমরা যে-সব বই পড়তে ভালোবাসি তার মধ্যে কতকগুলো যে কত দুষ্পাচ্য সেটা কিন্তু বার বার পাঠ নিয়েও ভালো করে শিখতে পারি না। বারে বারে পেট ভরে কোনো অস্বাস্থ্যকর উপন্যাস গিলি এবং বলা বাহুল্য তার পরেই মনের ফুর্তি নষ্ট, কাজে অনিচ্ছা, জীবনে অরুচি—এক কথায় মানসিক দুঃস্বপ্ন।

তার পরের কথা হচ্ছে যে স্বাস্থ্যকর মানসিক খাবারগুলোকে ঠিক ঠিক পরিমাণে দিতে হবে। মানসিক পেটুকামি, অর্থাৎ অতিরিক্ত বেশি পড়া বড়োই বিপজ্জনক অভ্যাস, তাতে হজমের শক্তি কমে যায়; অনেক সময় খিদে নষ্ট হয়। আমরা সবাই জানি রুটি একটা ভালো পুষ্টিকর খাদ্য, তাই বলে কি আর কেউ একবারে বসে দু-তিনটে গোটা পাঁউরুটি খেয়ে ফেলার চেষ্টা করে?

আমি একজন ডাক্তারকে তাঁর রুগীকে বলতে শুনেছি—ঐ রুগীটির একমাত্র ব্যামো হল অতিশয় পেটুকামি আর কুঁড়েমি—'অতি পুষ্টির প্রথম লক্ষণ হল মেদ-বাহুল্য'—ঐ-সব লম্বা চওড়া কথা শুনে নিঃসন্দেহে রুগী তার বাড়ন্ত চর্বির বোঝা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আরাম পেয়েছিল।

মাঝে মাঝে ভাবি 'মোটা মন' বলে কোনো পদার্থ আছে কি না? সত্যি মনে হয় ঐরকম দুটো-একটা দেখেওছি। ওরকম মন দুলকি চালের কথাবার্তাও অনুসরণ করতে পারে না, প্রাণ বাঁচাবার জন্যেও কোনো যুক্তির বেড়া টপকাতে পারে না; সূক্ষ্ম তর্ক উঠলেই সেখানে আটকে যায়; এক কথায় ও সব মন অসহায় ভাবে হাঁসের মতো হেলেদুলে জীবন কাটানো ছাড়া আর কিচ্ছু করতে পারে না।

তার পর আরো আছে; খাবার হয়তো পুষ্টিকর হল, পরিমাণটাও ঠিক হল, তবু একসঙ্গে অনেকরকম পদ খাওয়া যে উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। যাদের তেষ্টা পেয়েছে তাদের বড়ো এক গেলাস বীয়র, কিম্বা সাইডার, এমন-কি, ঠাণ্ডা চা দিলেও সে কৃতজ্ঞ

হবে, অবিশ্যি শেষেরটার জন্য হয়তো ততটা উৎসাহ দেখাবে না। কিন্তু তাকে যদি একটা ট্রের ওপর ক্ষুদে এক মগ বীয়র, একটু সাইডার, একটু ঠাণ্ডা চা, একটু গরম চা, একটু কফি, একটু কোকো, ঐরকম একটু দুধ, একটু জল, একটু ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে জল, একটু ঘোল দেওয়া যায়, তা হলে তার কি মনে হবে? সব মিলিয়ে হয়তো বড়ো এক গেলাসের সমানই হবে, কিন্তু কেউ যদি মাঠে খড় তোলার কাজ সেরে এসে থাকে, সে কি সমান তৃপ্তি পাবে?

মনের খাবার কি ধরনের, কতখানি আর কয়রকমের হবে এটা স্থির করার পর আরো কয়েকটি বিষয়েও সাবধান থাকতে হবে। সেগুলি দুবার খাওয়ার মাঝখানে খানিকটা সময় দিতে হবে; ভালো করে না চিবিয়ে কোনো খাবার গিলবে না, তা হলে হজমের সুবিধা হবে। শরীরের এই দুটি নিয়ম মনের বেলাও খাটে।

প্রথমে দুবার খাওয়ার মাঝখানে খানিকটা সময় রাখার কথা ধরা যাক: শরীরের বেলা যেমন, মনের বেলাতেও এটা দরকার; তফাত শুধু এই যে একবার খাবার পর শরীরটার অন্তত তিন চার ঘণ্টার বিশ্রাম দরকার আর মনের পক্ষে মাত্র তিন চার মিনিটের বিশ্রামই যথেষ্ট। লোকে যতটা মনে করে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস যে তার চাইতে অনেক কম সময় হলেও চলে। কাউকে যদি একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা একই বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয়, তাকে আমি প্রত্যেক ঘণ্টায় একবার মাত্র পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিই, কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিটের জন্য মনটাকে একেবারে ছুটি দিতে হবে, পড়ার বিষয় বাদ দিয়ে, একেবারে অন্য বিষয়ে ভাবতে হবে। ঐ একটু ক্ষণের বিশ্রামের ফলে মনে যে কত উদ্দীপনা ও উৎসাহ আসে, সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

তার পর ধর খাবার চিবোনোর কথা, এর সমতুল্য মনের ক্রিয়া হল যেটুকু পড়া হয়েছে, সে-বিষয়ে চিন্তা করা। নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু বইয়ের পাঠ্যাংশ গেলার চাইতে এতে মনের অনেক বেশি কাজ হয়। এত বেশি কাজ হয় যে কবি কোল্‌রিজ বলেছিলেন যে মন অনেক সময় রেগেমেগে এত খাটতে অস্বীকার করে—এত বেশি খাটতে হয় যে আমরা প্রায়ই তাই নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাই না; বরং মনের মধ্যে যে-সব অজীর্ণ খাবার ইতিমধ্যে জমা হয়ে রয়েছে, তার ওপর আরো নতুন

খাবার চাপাতে থাকি, যতক্ষণ না হতভাগ্য মনটা তার নীচে একেবারে তলিয়ে যায়।

এদিকে মনটাকে যতই খাটানো যায়, ফল ততই ভালো হয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। দু-তিন ঘণ্টা বই পড়ার চাইতে এক ঘণ্টা গভীর চিন্তার অনেক বেশি মূল্য; একা একা বেড়াতে বেরোলে চিন্তা করার চমৎকার সুযোগও পাওয়া যায়। যে-সব বই পড়ি, সেগুলিকে উত্তমরূপে হজম করার আরেকটা সুফলও আছে: সেটি হল পঠিত বিষয়গুলোকে মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে, টিকিট লাগিয়ে রাখা যায়, তাহলে দরকার হলেই বিষয়গুলোকে কাজে লাগানো যায়। স্যাম স্লিক্ বলে সে নাকি জীবনে অনেকগুলো ভাষা শিখেছে, কিন্তু যে কারণেই হোক, মনের মধ্যে ভাষাগুলোকে আলাদা করে গুছিয়ে রাখতে পারে নি, সব গুলিয়ে গেছে। অনেকের মনও বইয়ের পর বই গিলে খায়, তার বিষয়বস্তুগুলোকে হজম করে গুছিয়ে রাখারও তর সয় না, তাদেরও ঐ স্যামের অবস্থাই হয়, কাজেই মনের হতভাগ্য মালিকের বন্ধুরা জ্ঞানীগুণী বলে তার পরিচয় দিলেও, সে যে কি করে ঐ পরিচয়ের যোগ্য হয়ে উঠবে, তা নিজেই ভেবে পায় না।

কারো বিষয়ে শোনা যায়: "লোকটির অনেক পড়াশুনো। যে-কোনো বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারো, ও কিছুতেই জব্দ হবে না।"

তুমি হয়তো ঐ অনেক পড়াশুনোর মানুষটির দিকে ফিরে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, কারণ সে নাকি সবে ম্যাকলের ইতিহাস পড়ে শেষ করেছে। সে লোকটি তখন ভালোমানুষের মতো হেসে, এমন মুখের ভাব করবার চেষ্টা করে যেন ঐ বিষয়ে ওর অজানা নেই, তার পর নিজের মনে ডুব দিয়ে সে উত্তরটা হাতড়ে বেড়ায়। এক মুঠো অত্যন্ত আশাপ্রদ তথ্য নিয়ে সে উঠে আসে, দুঃখের বিষয়ে তথ্যগুলো অন্য শতকের ব্যাপার। কাজেই সেগুলো ফেলে দিয়ে আরেক-বার চেষ্টা করে যা পাওয়া গেল, সেটাকেই মনে হল আসল জিনিস; দুঃখের বিষয়, তার সঙ্গে উঠে এল এক গাদা অবান্তর বিষয়, পলিটিক্যাল ইকনমির কিছু তথ্য, গণিতের কিছু নিয়ম, ওর ভাইপোদের-বয়স, কবি গ্রের 'এলেজি' নামক কবিতার খানিকটা অংশ ইত্যাদি। এই-সমস্তর সঙ্গে ও যা চাইছিল সে তথ্যটি এমন ভাবে জড়িয়ে, গিট বেঁধে আছে যে ছাড়ানোর কোনো আশাই নেই। ওদিকে সবাই ওর উত্তরের

অপেক্ষায় বসে আছে, শেষে নীরবতাটা এমনি অস্বস্তিকর হয়ে উঠল যে আমাদের অনেক পড়াশুনো করা বন্ধুটি কোনোরকমে তোতলামি করে, একটা আধা উত্তর গোছের কিছু দিলেন; কিন্তু যে কোনো স্কুলের সাধারণ ছেলেরাও ওর চাইতে স্পষ্ট আর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারত।

বে-হিসাবী মানসিক খাদ্যের রুগী দেখলে, তাকে চিনতে পারবে? তাকে একবার দেখলে মনে কি আর কোনো সন্দেহ থাকবে? দেখবে সে কেমন নিরুৎসাহভাবে পাঠাগারের চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একবার এটা চাখছে, একবার ওটা চাখছে—ওর কাছে মাপ চাইছি, একবার এ বই, একবার ও বই—কোনোটাই বেশিক্ষণের জন্য নয়। প্রথমে এক গাল উপন্যাস নিল; এ-রাম, নাঃ! সারা সপ্তাহ ধরে তো ঐ ছাড়া কিছু খায়ই নি! অরুচি ধরে গেছে। তার পর এক চাক্‌লা বিজ্ঞান; বুঝতেই পারছ তার ফল কি হল, উঃ! কি শক্ত রে বাবা! দাঁত বসে না এমনি করে সবরকম বই চেষ্টা করে দেখল, গতকালও তাই করেছিল, কোনো লাভ হয় নি; সম্ভবত আগামীকালও তাই করবে এবং কোনো লাভ হবে না!

অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌সের একটা ভারি উপভোগ্য বই আছে, তার নাম, "দি প্রফেসার অ্যাট দি ব্রেকফাস্ট টেবল", কোন লোক ছোকরা না বুড়ো, ঐ বইতে সেটি জানবার তিনি একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন: "মোক্ষম পরীক্ষা হল এই—ডিনারের দশ মিনিট আগে তাকে একটা বড়োসড়ো বান্‌ খেতে দিয়ো। সে যদি সহজেই সেটি গ্রহণ করে খেয়ে ফেলে, তা হলে সে যে ছোকরা সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।" হোম্‌স্ বলেছেন, "যাদের বয়স কম, তারা দিনে কিম্বা রাতে, যে-কোনো সময়ে যা-কিছু দেওয়া যাবে, তাই খেয়ে ফেলবে।"

মানুষ নামক জানোয়ারের মানসিক খিদের স্বাস্থ্যের দিকটা পরীক্ষা করতে হলে, তার হাতে কোনো জনপ্রিয় বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত, সুলিখিত, কিন্তু নীরস প্রবন্ধ—অর্থাৎ একটি মানসিক বান্‌—দিয়ে দেখ। সে যদি সাগ্রহ কৌতূহল এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটি পড়ে এবং পরে ও-বিষয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তা হলে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে তার মন সতেজ এবং সক্রিয়। যদি ভদ্রভাবে প্রবন্ধটিকে সে নামিয়ে রাখে, কিম্বা কয়েক মিনিট চোখ বুলিয়ে, তার পর বলে, "এরকম

বোকার মতো বই পড়া আমার কর্ম নয়। 'রহস্যময় হত্যাকাণ্ড' বইটার দ্বিতীয় খণ্ড দিন না।" তা হলেই সমান নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে লোকটির মানসিক পরিপাক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে।

এই রচনা পড়ে যদি বই-পড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সম্বন্ধে কিছু কাজের কথা শিখে থাক এবং বুঝে থাক যে হাতের কাছে যে-সব ভালো বই পাওয়া যায়, সেগুলি পড়ে, লক্ষ্য করে, শিখে, মনে মনে পরিপাক করা শুধু কৌতূহলের বিষয় নয়, কর্তব্যও বটে, তা হলে আমার লেখা সার্থক হয়েছে।

চিঠি লেখা সম্বন্ধে আট-নটি কাজের কথা

(১) টিকিট রাখার খাপের কথা

কোনো আমেরিকান লেখক বলেছেন, "এ অঞ্চলের সাপগুলোকে একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা : বিষাক্ত।" এ ক্ষেত্রেও সেই কথাই খাটে। টিকিট রাখার খাপকে একটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা : 'আজবদেশ'। নিঃসন্দেহে বলা যায় এর নানারকম নকল শীঘ্রই বেরোবে, তবে তাতে এই দুটি ছবির চমক থাকবে না, কারণ এগুলোর কপিরাইট আমার।

'চমক' বলছি কেন, বুঝতে পারছ না বুঝি? বেশ, খাপটাকে বাঁ হাতে ধরে খুব নজর করে দেখ। দেখতে পাচ্ছ অ্যালিস কেমন ডাচেসের খোকাকে কোলে নিয়ে আছে? (এটা কিন্তু নতুন ব্যাপার, বইতে এর কথা নেই।) আচ্ছা, এবার ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর বকবার আঙুল দিয়ে খাপটাকে ধরে একটা টান দাও তো দেখি। ব্যস্! খোকা অমনি একটা শুয়োর হয়ে গেল! তাতে যদি তুমি চমকে না যাও, তোমার শাশুড়ি হঠাৎ একটা জাইরোস্কোপে পরিণত হল, তা হলেও তুমি চমকে যাবে না!

এই খাপটাকে কিন্তু পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়। বরং তার উলটো। চিঠিপত্রের জন্য এক পেনির টিকিট আর টেলিগ্রামের

জন্য ছ পেনির টিকিট আর কোনোরকম টিকিটের কারো হঠাৎ দরকার হয় না। এক যদি টিকিটের আঠালো ধারগুলো রাখা যায়, আঙুল কেটে গেলে কাজে লাগানো যায়, সাবধানে তিন-চার বার হাত ধোয়া-ধুয়ি করলেও ছেঁড়ে না। এ-সব দরকারি জিনিস তো স্বচ্ছন্দে মনি-ব্যাগে কিম্বা পকেট-বইতে ভরে নিয়ে যাওয়া যায়। না, এই বিশেষ খাপটি তোমার খামের বাক্সে, কিম্বা যেখানে তোমার লেখার সরঞ্জাম থাকে, সেখানে রাখবার জন্য তৈরি। এটি আমি উদ্ভাবন করেছিলাম, কারণ মাঝে-মাঝেই ভিন্ন মূল্যের টিকিট দরকার হয়, বিদেশের চিঠি পাঠাবার জন্য, পার্শেল পোস্টের জন্য ইত্যাদি। সেই সময় তাড়াহুড়োতে ঠিক দামের টিকিট খুঁজে পাওয়া দায় হয়। কিন্তু যেদিন থেকে আমি আজবদেশের টিকিটের খাপের মালিক হয়েছি, আমার সব ভাবনা-চিন্তার অবসান হয়েছে। তার পর থেকে আমি অন্য কিছু ব্যবহার করি না। আমার বিশ্বাস রানী ভিক্টোরিয়ার ধোপানীও করে না।

এর একেকটা খোপে ছটি করে টিকিট ধরে। আমি বলি কি খোপে ভরবার আগে ঐ ছটি টিকিটকে এক জোড়া ফুলের মতো করে সাজিয়ে নিলে ভালো, অর্থাৎ একটাকে একটু ডাইনে, একটাকে একটু বাঁয়ে হেলিয়ে রাখতে হবে। তা হলে হাতের কাছে সর্বদা একটা কোণা পাওয়া যাবে, যা ধরে খুব তাড়াতাড়ি আর খুব সহজে একেকটা টিকিট বের করে আনা যাবে। নয়তো দেখবে একবার টানলে একসঙ্গে দুটো তিনটে বেরিয়ে আসছে।

আমার অভিজ্ঞতা হল যে পাঁচ পেনি, নয় পেনি কিম্বা এক শিলিং দামের টিকিট খুব কম দরকার হয়, কিন্তু অন্য খোপগুলো প্রায়ই খালি হয়ে যায়, আবার ভরতে হয়। তোমার অভিজ্ঞতাও যদি সেইরকম হয়, তা হলে ঐ তিনরকম টিকিট গোটা দুই করে এক শিলিং-এর খোপে রাখতে পারো, বাকি দুটি খোপে এক পেনি দামের বাড়তি টিকিট রেখো।

(২) কেমন করে চিঠি শুরু করতে হয়

যদি অন্য চিঠির উত্তর চিঠি লিখতে বসে থাক, তা হলে শুরুতেই সেই অন্য চিঠিটি বের করে, ভালো করে পড়ে দেখ, যাতে মনে পড়ে যায় কি কি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যাকে লিখছ তার বর্তমান ঠিকানা কি,

নইলে হয়তো চিঠি পাঠালে তুমি তার লণ্ডনের বারোমেসে ঠিকানায়, অথচ সে তোমাকে তার টর্কির ঠিকানা সযত্নে লিখে পাঠিয়েছে।

তার পর খামের ওপর ঠিকানা লেখ, টিকিট লাগাও। তুমি বলবে, "সে কি! চিঠিটা লিখবার আগেই?' নিশ্চয়ই। নইলে কি হতে পারে তাও বলছি: শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি লিখে যাবে, শেষ বাক্যের মধ্যিখানে পৌঁছে মনে পড়বে আর তো সময় নেই! তখন তাড়াহুড়ো করে চিঠি শেষ করবে, হিজিবিজি করে নাম সই করবে, ঝট্‌পট্ খাম সাঁটবে ডাকে সেটি খুলেও যাবে—দুর্বোধ্য অক্ষরে ঠিকানা লিখবে—তার পর সর্বনেশে কথা! দেখবে যে টিকিটের খাপে টিকিট নেই! তখন বাড়ির সব্বাইয়ের কাছে অনুনয়-বিনয় করে একটা টিকিট ধার চাইবে, তার পর হুড়্‌মুড়্ করে ডাকঘরে ছুটবে, ঘামে নেয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে পৌঁছে দেখবে সবে ডাকবাক্স বন্ধ হয়ে গেছে! এবং সবার শেষে এক সপ্তাহ পরে ডেড্ লেটার আপিস থেকে চিঠি ফেরত আসবে; ওপরে লেখা থাকবে, "ঠিকানা অপাঠ্য!"

সে যাই হোক, তোমার নিজের পুরো ঠিকানা চিঠির অপর দিকে দেবে। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে কোনো বন্ধু যদি নতুন ঠিকানায় উঠে গিয়ে সেখান থেকে চিঠির ওপরে লেখে শুধু "ডোভার", সে হয়তো ধরে নিয়েছে তার আগের চিঠি তুমি যত্ন করে রেখে দিয়েছ, কিন্তু তুমি সেটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ—তা হলে কিরকম বিরক্ত লাগে বল তো।

তার পর তারিখটাও পুরো লিখো। এ-ও বড়োই বিরক্তিকর ব্যাপার, যদি অনেক বছর পরে, চিঠিগুলোকে পর্যায় ক্রমে সাজাতে গিয়ে দেখ তারিখ দেওয়া আছে শুধু ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২রা আগস্ট, কিন্তু সালের নামগন্ধ নেই, যা দেখে বোঝা যাবে কোনটি আগের চিঠি, কোনটি পরের।

আরেকটি কথাও বলি ঠাকরুন—(বিঃ দ্রঃ—এ কথাগুলি কেবল মহিলাদের উদ্দেশ করেই বলছি, কারণ কোনো পুরুষমানুষ এমন কাজ কখনো করে না।) তারিখ বলতে কখনো কোনো সময়ে লিখবেন না "বুধবার"। ওটা হল স্রেফ পাগলামি।

(৩) তার পর কি করতে হয়

গোড়াতেই একটা মোক্ষম নিয়ম বলি: স্পষ্ট করে লিখো। সবাই যদি এই নিয়মটি পালন করত, গড়পড়তায় মানব জাতির মন মেজাজ প্রত্যক্ষ ভাবেই অনেকখানি মিষ্টত্ব লাভ করত। এ পৃথিবীর বিশ্রী লেখার বেশির ভাগের কারণ হল স্রেফ বড্ডো তাড়াতাড়ি লেখা হয় বলে। তুমি নিশ্চয় বলবে, "সময় বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি লিখি।" উত্তম উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহ। কিন্তু বন্ধুর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সময় বাঁচাবার কি অধিকার আছে তোমার? তার সময়ের দাম কি তোমার সময়ের সমান নয়? বহু বছর আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেতাম—ভারি চিত্তাকর্ষক সব চিঠি এটা মানতে হবে—কিন্তু এমন বদ্ হাতের লেখা যে তার জুড়ি নেই। একটা চিঠি পড়তে আমার এক সপ্তাহ সময় লাগত। পকেটে নিয়ে ঘুরতাম, একটু সময় পেলেই ধাঁধার মতো লেখাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতাম—নানান ভাবে ধরতাম, কখনো কাছে কখনো দূরে রেখে চেষ্টা করতাম, অবশেষে একেকটা দুর্বোধ্য হিজিবিজির মানে হঠাৎ ঝপ্ করে বুঝতে পারতাম, অমনি তার নীচে সেটি ইংরিজিতে লিখে ফেলতাম। এইভাবে অনেকগুলো রহস্য উদ্ধার করবার পর, পাঠ্যাংশ দেখে বাকিটার অর্থ আন্দাজ করতাম, শেষপর্যন্ত সমস্ত হিজিবিজি গুলোর পাঠোদ্ধার হত। আমার সব বন্ধুরা যদি ঐরকম চিঠি লিখত, তা হলে তো ওদের চিঠি পড়েই সারা জীবনটা কাটত।

এই নিয়মটি বিশেষ ভাবে লোকের কিম্বা জায়গার নামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশেষ করে বিদেশী নামের। একবার একটা চিঠি পেলাম, তাতে কয়েকটি রুশ নাম ছিল, যেরকম তাড়াহুড়ো করে, হিজিবিজি অক্ষরে লোকে অনেক সময় চিঠির শেষে লেখে 'ইতি। তোমার ইত্যাদি,' সেইরকম ভাবে লেখা। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যাংশ থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া গেল না; বানান যেভাবেই লেখা হোক-না কেন, তাতেও কিছু এসে গেল না, আমার তো ঐ বিদ্যে! শেষটা বাধ্য হয়ে বন্ধুকে লিখতে হল যে একটি নামও পড়তে পারি নি।

আমার দ্বিতীয় নিয়ম হল: আরো আগে কেন চিঠি লেখ নি সে বিষয় দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে কৈফিয়ত দিয়ো না।

বন্ধুর শেষ চিঠি শুরু করা সব চাইতে ভালো। চিঠিটা সামনে খুলে রেখো। তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ো ; তার চিঠি পড়ে যে-সব মন্তব্য মনে হবে, সেগুলো লিখো। তার পর তোমার নিজের বক্তব্য লিখো। নিজের অমূল্য মন্তব্য দিয়ে চিঠি ভরে, পুনশ্চে বন্ধুর প্রশ্নের জবাব তাড়াহুড়ো করে না দিয়ে, এইভাবে লিখলে বেশি সৌজন্য দেখানোও হবে, পড়তেও ভালো লাগবে। সে যে-সব খবর জানতে চেয়েছে, তার উত্তর পেয়ে গেলে, তার কাছে তোমার রসালাপ আরো উপভোগ্যও হবে।

বন্ধুর চিঠির কোনো অংশের উল্লেখ করতে হলে, তোমার ভাষায় তার সারাংশ না দিয়ে, বন্ধুর নিজের ভাষা উদ্ধৃত করাই ভালো। এ-র ভাষাতে, বি-র বক্তব্য সম্বন্ধে এ-র ধারণার চাইতে বি নিশ্চয় তার নিজের ভাষার মানে বেশি উপলব্ধি করবে।

যাদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান চলছে, তাদের কোনো বিষয়ে মতভেদ থাকলে, এই নিয়মটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বন্ধুকে এইরকম কথা লিখবার কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয় : "আমি হেনা-তেনা বলেছি এ কথা ভাবা তোমার ভুল। আমি আদৌ সে কথা বলতে চাই নি ইত্যাদি" এভাবে তো সারাজীবন চিঠি লেখালিখি চালানো যায়।

এখানে আরো কতকগুলো নিয়মও যথাযোগ্য ভাবে দেওয়া যায় ; যেখানে চিঠির আদান-প্রদান দুর্ভাগ্যবশত তর্কাতর্কিতে দাঁড়িয়েছে সেখানে এগুলো কাজ দেবে।

একটা নিয়ম হল, এক কথা বার বার বোলো না। যে-কোনো প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে সব কথা বলেও বন্ধুকে প্রভাবিত করতে না পেরে থাকলে ও বিষয়ে একেবারে চেপে যাও। বার বার যদি একই যুক্তি প্রয়োগ করবার চেষ্টা কর, সে-ও তাই করবে ; ঐভাবেই ব্যাপারটা চলতে থাকবে রেকারিং ডেসিমেলের মতো। রেকারিং ডেসিমেল শেষ হয়ে গেছে বলে কখনো শুনেছ ?

আরেকটি নিয়ম হল, একটা চিঠি লিখে যদি মনে হয় যে বন্ধু হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, তা হলে ওভাবে নিজেকে প্রকাশ করা দরকার মনে হলেও, চিঠিটা তখুনি ডাকে না দিয়ে, একদিন রেখে দাও। পরদিন আরেক বার পড়ে দেখ এবং কল্পনা কর যে ঐ চিঠি, আর কেউ তোমাকে লিখেছে। এর ফলে অনেক সময়ই তুমি চিঠিটা নতুন করে লিখবে, অনেকখানি টক-ঝাল বের করে দিয়ে, তার বদলে মধু মিশিয়ে, অর্থাৎ

আগের চাইতে অনেক বেশি উপাদেয় সামগ্রী বানিয়ে। এইভাবে চিঠিটা যাতে বন্ধুর মনে আঘাত না দেয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি মনে হয় এই নিয়ে আরো মন কষাকষি চলবে, তা হলে চিঠিটার একটা কপি রেখো। কারণ এই ব্যাপারের অনেক মাস পরে যদি বল, "আমি একরকম নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি ওভাবে আমি মোটেই লিখি নি। যতদূর মনে পড়ে আমি লিখেছিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।" এর চাইতে ঢের ভালো হয় না কি, যদি বন্ধুকে বলতে পারো, "না, ও কথা লিখি নি, এই দেখ আমি কি লিখেছিলাম—"

আমার পঞ্চম নিয়ম হল, বন্ধু যদি কোনো কড়া কথা লিখেও থাকে, হয় সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই এনো না, নয়তো তোমার উত্তরটা ওর চাইতে অনেক নরম করে দিয়ো। ও যদি সহৃদয়ভাবে এমন কিছু লিখে থাকে যাতে তর্কাতর্কি মিটমাট করে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তা হলে তুমিও আরো সহৃদয়ভাবে উত্তর দিয়ো। ঝগড়া পাকাবার সময় উভয় পক্ষই যদি $\frac{১}{১০}$ ভাগ এগোতে প্রস্তুত থাকে আর ভাব করবার সময় দুজনেই $\frac{৯}{১০}$ ভাগ এগোয়, তা হলে তো যত না ঝগড়া হবে, তার চাইতে বেশি ভাব হবে।

এতে একজন আইরিশম্যান আর তার উড়নচড়ে মেয়ের গল্প মনে পড়ে গেল। বাপ বলেছিল, "সব সময়ই দেখি তুই বেরিয়ে যাচ্ছিস! আর তিনবার বেরুলে একবার ফিরিস!"

আমার ষষ্ঠ নিয়ম হল: (তর্কাতর্কির চিঠি প্রসঙ্গে এই আমার শেষ কথা।) তর্কের শেষ কথা বলবার চেষ্টা কোরো না। বল দিকিনি সবাই যদি প্রতিপক্ষকেই শেষ কথাটি বলতে দিত, তা হলে কত ঝগড়া কঁড়িতেই নষ্ট হত। হতে পারে যে কথাটা না বলেই ছেড়ে দিচ্ছ সেটি আসলে ভারি মোক্ষম কথা ছিল: হতে পারে বন্ধু মনে করছে তোমার বলার কিছু নেই বলেই চুপ মেরে গেলে: তবু অভদ্রতা না করে যত শিগগির পারো, চেপে যেয়ো: মনে রেখো, 'ভাষা যদি রুপো হয়, মৌন হল সোনা।'

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: তুমি যদি একজন ভদ্রলোক হও আর বন্ধু হন মহিলা, তা হলে এই নিয়মটা একেবারে বাহুল্য হয়ে যাবে, কারণ শেষ কথা বলবার তুমি কোনো সুযোগই পাবে না।)

আমার সপ্তম নিয়ম হল, যদি ঠাট্টা করে বন্ধুর একটু নিন্দা করার

ইচ্ছা হয়, তা হলে নিন্দাটা এমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখবে যাতে স্পষ্ট করে বোঝা যায় ওটা নিছক পরিহাস। ঠাট্টা করে কিছু লিখলে আর বন্ধু সেটাকে বাস্তব বলে বুঝল—এর ফল বড়ো সাংঘাতিক হতে পারে। এমন-কি, এই কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেতেও দেখেছি। যেমন ধর, বন্ধুকে একটা মোহর ধার দিয়েছিলে, সে শোধ দিতে ভুলে গেছে, এই কথা তাকে মনে করিয়ে দিতে চাও। তুমি হয়তো ঠাট্টা করে লিখলে, "ব্যাপারটার উল্লেখ করলাম, কারণ ধার-ধোর সম্বন্ধে দেখছি তোমার স্মরণশক্তিটা সুবিধাজনক ভাবে দুর্বল।" এতে যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু মনে কর তুমি লিখলে, "অনেক দিন ধরেই সিঁদেল চোর আর পকেটমার হিসাবে তোমার কাজকর্ম লক্ষ্য করার পর বুঝেছি যে ঐ যে মোহরটা তোমাকে ধার দিয়েছিলাম, সেটি ফেরত পাবার একমাত্র পন্থা হল তোমাকে বলা 'শোধ কর, নয়তো পুলিস ডাকব'!" এ কথাকে ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু মনে করলে, তোমার বন্ধু বেজায় বেরসিক।

আমার অষ্টম নিয়মটি বলি : চিঠিতে যদি লেখ, "ভাই, এই খামে পাঁচ পাউণ্ড ভরে দিলাম।" কিম্বা "এর মধ্যে করে জনের চিঠি তোমাকে পড়তে দিলাম।" তা হলে এক মিনিটের জন্য লেখা থামিয়ে ঐ টাকা কিম্বা চিঠিটা নিয়ে এসে সত্যি সত্যি খামে ভরে দিয়ো। তা না হলে চিঠি ডাকে চলে গেলে পর নির্ঘাৎ দেখবে ওগুলো পড়ে রয়েছে।

আমার নবম নিয়ম বলি : একটা চিঠির কাগজ শেষ করে, যদি দেখ আরো কিছু বলবার আছে, তা হলে আরেকটা কাগজ নিয়ো, দরকার মতো পুরো কাগজই কিম্বা টুকরো কাগজই হোক। মোট কথা, যাই কর-না কেন, লেখা কাগজটার ওপর কোনাকুণি ভাবে আর কিছু লিখো না। সেই পুরনো প্রবাদটির কথা মনে কর, "লেখকের আড়াআড়ি, পাঠকের আড়ি-আড়ি।" কি বললে, কত দিনের পুরনো? মানছি খুব বেশি পুরনো নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই প্যারাটা লিখতে লিখতে এক্ষুনি প্রবাদটা বানালাম। তা হোক, তোমরা তো জানোই যে 'পুরনো' কিম্বা 'বুড়ো', এ-সব কথা হল আপেক্ষিক। ধর একটা মুরগি-ছানা এক্ষুনি ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছে, তাকে স্বচ্ছন্দে 'বুড়ো ব্যাটা' বলে সম্বোধন করা যায়, যদি এমন আরেকটা বাচ্চার সঙ্গে তুলনা কর, যার আধখানা শরীর বেরিয়েছে।

(৪) কেমন করে চিঠি শেষ করতে হয়

যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে চিঠি কি ভাবে শেষ করবে, 'বশংবদ' দেবে, না 'ইতি। বিনীত', নাকি 'ইতি। সেবক' ইত্যাদি, (ইতি। স্নেহের'-এ পৌঁছবার আগে গোটা বারো পদ পাবে)—সে যাই হোক গে, সন্দেহ থাকলে, লেখকের শেষ চিঠিটা একবার দেখ। সে যা বলে শেষ করেছে, অন্তত সেটুকু সৌজন্য দেখিয়ো, এমন-কি, কিঞ্চিৎ বেশি দেখালেও ক্ষতি নেই।

পুনশ্চ বড়ো ভালো বুদ্ধি, কিন্তু মেয়েরা যেমন ভাবে, আসলে চিঠিটার সারাংশ দেওয়া ওর উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা যায়, ওর উদ্দেশ্য হল যে-বিষয়ে নিয়ে বেশি হৈ-চৈ করতে চাই না, সেটাকে একটু কমিয়ে-টমিয়ে প্রকাশ করা। যেমন ধর, বন্ধু শহরে গেছে, সেখানে তোমার জন্য একটি কাজ করে দেবে বলে গেছে, তার পর কিন্তু ভুলে গেছে, তার ফলে তুমি বেশ অসুবিধায় পড়েছ। এখন সে চিঠি লিখে ঐ ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গটাকে তোমার উত্তরের প্রধান বিষয়বস্তু করলে, কাজটা বড়ো নিষ্ঠুর এবং মিছিমিছি দাবড়ানি দেওয়ার মতো হবে। তার চাইতে কত নম্রতার সঙ্গে এইভাবে লেখা যায় : পুঃ—আমার ঐ ছোটো কাজটি করতে ভুলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। সে-সময় আমার একটু অসুবিধা হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আমিও কত সময় কত কথা ভুলে যাই। জানোই তো 'যারা কাচের বাড়িতে বাস করে, তারা যেন পাথর না ছোঁড়ে।'

যখন চিঠি ডাকে দিতে নিয়ে যাবে, হাতে করে নিয়ো। যদি পকেটে রাখ, তা হলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অনেক-দূরে পাড়াগাঁর দিকে বেড়াতে যাবে, যেতে আসতে দুবার ডাকঘরের সামনে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখবে, চিঠি যেমন ছিল তেমনি পকেটেই রয়েছে!

(৫) চিঠির রেজিস্টার রাখা বিষয়ক

আমি বলি কি যে-সব চিঠি পাচ্ছ আর লিখছ, তার একটা করে হিসাব খাতা তৈরি করে রাখ। আমি বহু বছর ধরে তাই করছি এবং নানান দিক দিয়ে তার সুবিধা উপভোগ করছি। এর জন্য যত দেরিই

হোক-না কেন, সব চিঠির উত্তর দিয়ে থাকি। নিজের সুবিধার জন্য আগে যে-সব চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, সেগুলি হারিয়ে গেলেও তার বিষয়-বস্তুর একটা হিসাব পাই। আর সব চাইতে বড়ো সুবিধা হল যে অনেক বছর পরে যদি কোনো অর্ধ-বিস্মৃত চিঠির প্রসঙ্গে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তা হলে জোর গলায় বলতে পারি, "না, আমি মোটেই বলি নি যে চাকরটি 'সব দিক দিয়ে অমূল্য এবং সব বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করা যায় ?' আমার সে-চিঠির সারাংশ আমার কাছে লেখা আছে। আমি বলেছিলাম, 'অনেক দিক দিয়ে চাকরটির মূল্য আছে, কিন্তু বড়ো বেশি বিশ্বাস কোরো না।' কাজেই এখন যদি সে তোমাদের ঠকিয়ে থাকে, তার জন্য আমাকে দোষ দিয়ো না।"

এবার চিঠির রেজিস্টার কিভাবে তৈরি করতে ও রাখতে হয়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়মের কথা বলব।

ধর ২০০ পাতার একটা নতুন খাতা নাও, খাতাটা ৪ ইঞ্চি চওড়া আর ৭ ইঞ্চি উঁচু হলেই হবে। শক্ত করে বাঁধানো মলাট থাকা চাই, কারণ একশো বার খোলা আর বন্ধ করা হবে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার দুধারে লাল কালি দিয়ে, এক ইঞ্চি চওড়া একটা মার্জিন টেনে রেখো। মার্জিনটাতে যেন ৫ সংখ্যার অঙ্কও লেখা যায়, আমার নিজের তো ⅞ ইঞ্চিতেই চলে যায়। তবে তোমার হাতের লেখা যদি খুব ছোটো না হয় তো ১ ইঞ্চি রাখাই ভালো।

যত চিঠি পাবে ও লিখবে, কালক্রম রক্ষা করে, প্রত্যেকটার সারাংশ খাতায় তুলবে। পৃষ্ঠার বাঁ দিকে যে-সব চিঠি পেলে তার হিসাব রাখবে, পৃষ্ঠার ডান দিকে যেগুলো লিখলে তার হিসাব রাখবে। তা হলে আলাদা-ভাবে পাওয়া-চিঠি আর লেখা চিঠির হিসাব থাকবে, গুলিয়ে যাবে না। দরকার হলে সেই তালিকা থেকে চিঠির হদিস পাওয়া যাবে, অন্য তালিকাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

আগে শুধু ডান দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে লিখবে। খাতা শেষ হয়ে গেলে, উলটে নিয়ে, পিছন দিক থেকে আবার শুরু করবে এবং এবারও শুধু ডান দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে লিখবে। সেইগুলোকেই খালি পাবে। বাঁ দিকে পৃষ্ঠায় লেখার চাইতে এর সুবিধা অনেক বেশি। প্রত্যেক পাওয়া চিঠির হিসাবের পৃষ্ঠার ওপরে তার রেজিস্টার সংখ্যাটি লিখে রাখলে কাজে দেবে।

টেনিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১১ই মে, ১৮৫৯

ভাই উইলিয়ম,

বেশ কিছুদিন ধরে বড়োই ইচ্ছা হচ্ছিল তোমায় আমার আইল্ অফ হোয়াইট্ ভ্রমণের কথা লিখি, তবে লিখবার মতো তেমন কিছু আছে কি না সন্দেহ হচ্ছিল বলে লিখি নি। এবার যখন তুমি নিজেই শুনতে চেয়েছে, তখন চিত্তাকর্ষক হোক চাই নাই হোক, যা পাচ্ছ তাই নিয়ে খুশি থাকতে হবে।

ডবলু—যদি বলে থাকে যে আমি সভাকবির পাছু ধরে তাঁর গোপন আশ্রয় পর্যন্ত ধাওয়া করেছি, তা হলে সে সত্যের অপলাপ করেছে। 'ফ্রেশ্-ওয়াটারে' আমার পুরনো এক সহপাঠী থাকে, আমি আসলে তার কাছে ছিলাম ; কবি যে সেখানে আছেন, তা-ও জানতাম না। গিয়েইছিলাম যখন, তখন একজন স্বাধীন ব্রিটনের জন্মগত অধিকার প্রয়োগ করে, গেলাম একদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, যদিও আমার বন্ধু কলিন্স্ আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে টেনিসন্‌রা তখনো এসে পৌঁছন নি।

পায়ে হেঁটে ওঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেখি একজন লোক বাগানের রেলিঙে রঙ দিচ্ছে ; তাকে জিজ্ঞাসা করলাম মিঃ টেনিসন্ বাড়ি আছেন কি না। মনে মনে নিশ্চিত ছিলাম যে সে বলবে, 'না, নেই।' কাজেই সে যখন বলল, 'ঐ যে উনি!' বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ; তখন আমি যেমনি অবাক, তেমনি খুশি। দেখি কিনা আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে নিকার-বকার আর চশমা পরে কবি 'লন-মোয়ার' দিয়ে ঘাস-জমি ছাঁটছেন। চোখে কম দেখেন, কাউকে চিনতে পারেন না, কাজেই নিজের পরিচয় দিতে হল। ঐ জায়গাটা হাঁটা হয়ে গেলে, আমাকে তিনি মিসেস্ টেনিসনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। শুনে খুবই দুঃখিত হলাম যে তাঁর গুরুতর অসুখ করেছিল এবং তখন পর্যন্ত প্রায় সারা রাত অনিদ্রায় ভুগছিলেন। একটা

সোফার ওপর শুয়েছিলেন, ক্ষীণ শরীর, গাল বসা, কাজেই তাঁর কাছে খুব অল্প সময় রইলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে উনি ডিনার খেতে বললেন, মিঃ ওয়ারবার্টন বলে একজনের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। মিঃ ওয়ারবার্টন 'ক্রেসেণ্ট অ্যাণ্ড ক্রসের' ভাই।

আমি বাড়ি ফিরবার আগেই কিন্তু মিঃ টেনিসন্ কিন্তু নেমন্তন্নটা রদ্ করে দিলেন ; বললেন ঐদিন সন্ধ্যায় ভদ্রমহিলা যত কম উত্তেজিত হন ততই ভালো। কবি অনুরোধ করলেন আমি যেন সেদিন সন্ধ্যায় এসে চা খেয়ে যাই আর তার পরদিন ডিনার খাই। তার পর আমাকে বাড়িময় ঘুরিয়ে আমাকে ছবি-টবি দেখালেন। তার মধ্যে দেখলাম ওঁদের পরিবারের লোকদের আমি যে ফটো তুলেছিলাম, সেগুলিকে মিনে করা 'কার্টন'—না কি যেন বলে—তাতে করে বাঁধিয়ে ঝোলানো হয়েছে। বাড়ির চীল-কোঠার জানলা থেকে যে দৃশ্য দেখা যায়, সমস্ত দ্বীপটার মধ্যে তার চাইতে সুন্দর কিছু নেই। তাঁর বন্ধু রিচার্ড ডয়ল্ ঐ দৃশ্যের একটা ছবি এঁকে দিয়েছেন, কবি সেটি দেখালেন। বাড়ির ছাদের ওপর তাঁর ধূমপানের ঘরটিও দেখলাম ; বলা বাহুল্য, সেখানে যেতেই উনি আমাকে একটা পাইপ খেতে দিলেন। ছেলেপিলেদের নার্শারিতে গিয়ে ওঁর অপরূপ সুন্দর ছেলে হ্যালামকে দেখলাম ! সে কিন্তু আমাকে চট্ করে চিনতে পারল, ওর বাপের মতো দেরিতে নয়।

সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি মিঃ ওয়ারবার্টন লোকটি বড়োই অমায়িক, লাজুক, একটু নার্ভাস ধরনের। উনি একজন যাজক, এবং ঐ অঞ্চলের স্কুলগুলোর পরিদর্শক। সেদিন সন্ধ্যায় যাজকদের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। টেনিসন্ বলেছিলেন যে তাঁর মতে গোষ্ঠিবদ্ধভাবে যাজকরা দেশবাসীদের যতখানি উপকার করতে পারেন, তার অর্ধেকও করেন না ; তাঁরা যদি আরেকটু সহানুভূতিশীল হতেন, তা হলে ভালো হত। কবি আরো বলেছিলেন, "ওঁদের কিসের অভাব জানেন ? শক্তির আর অমায়িকতার। শক্তি না থাকলে অবশ্য শুধু অমায়িকতা দিয়ে কোনো কাজ হয় না ; তেমনি আবার অমায়িকতা ছাড়া শুধু শক্তিরও কোনো মূল্য নেই।" আমার মতে ঈশ্বরতত্ত্বের দিক দিয়ে ওঁর কথা-গুলোর পদার্থ আছে। এ-সব কথা হয়েছিল ওঁদের সেই ছোট্টো ধূমপানের ঘরে ; চা খাবার পর সেখানে আমরা আড্ডা গেড়েছিলাম এবং দুই ঘণ্টা ধরে ভারি চিত্তাকর্ষক গল্প হয়েছিল 'দি কিংস্ আইডিল্স্'-এর

প্রুফগুলো ঐখানে পড়েছিল, কিন্তু উনি কিছুতেই আমাকে দেখতে দিলেন না। ওঁর টেবিলের পাশেই হাতের নাগালের মধ্যে ঘোরানো বইয়ের শেল্ফের সব চাইতে নীচের তাকে কি বই আছে দেখার কৌতূহল হয়েছিল। দেখলাম প্রত্যেকটি হয় গ্রীক্ নয় ল্যাটিন—হোমার, ইসকাইলাস, হরেস্, লুক্রেশিয়াস্, ভার্জিল ইত্যাদি।

চমৎকার জ্যোৎস্না রাত ছিল। আমি যখন বিদায় নিলাম, কবি আমার সঙ্গে বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এলেন ; মিহি সাদা এক টুকরো মেঘের মধ্যে দিয়ে চাঁদটাকে কেমন দেখাচ্ছে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলেন, আমি নিজে কিছু লক্ষ্যই করি নি—একটা সোনার আংটির মতো, সাধুসন্তদের ছবিতে যেমন আলোর ছটা থাকে, তার মতো কাছে ঘেঁষে নয়, একটু তফাত রেখে। আমার ধারণা নাবিকরা বলে যে ওটা হল ঝড় বাদলের চিহ্ন।

টেনিসন্ বললেন চাঁদের ঐ শোভা উনি অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন। প্রথম দিকের একটি কবিতায় এর উল্লেখও আছে। কবিতাটির নাম 'মার্গারেট'।

পরদিন ডিনার খেতে গেছিলাম ; সেখানে স্যার জন্ সিমিয়নের সঙ্গে দেখা হল। ইনি ক্রাইস্ট চার্চের প্রাক্তন ছাত্র, কাছেই ওঁর জমিজমা আছে, আজকাল রোমান ক্যাথলিক্ হয়ে গেছেন। যত অতিশয় সজ্জন লোকের সঙ্গে মিশেছি, উনি তাদের একজন, কাজেই বুঝতেই পারছ, সন্ধ্যাটি বড়োই আনন্দে কেটেছিল। আমি সবটা খুবই উপভোগ করেছিলাম, বিশেষ করে ধূমপানের ঘরে শেষের দুটি ঘণ্টা।

আমার ফটোগ্রাফের বইগুলো নিয়ে গেছিলাম, কিন্তু মিসেস্ টেনিসন্ এত ক্লান্ত ছিলেন যে রাতে আর সেগুলি দেখতে পারেন নি। সুতরাং স্থির হল ওগুলি রেখে আসব, পরদিন সকালে গিয়ে নিয়ে আসব। তা হলে ছেলেপিগুলোকেও আরেকটু দেখতে পাব, রাতে তো শুধু খাবার সময়ে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা দিয়েছিল।

টেনিসন্ সেদিন আমাদের বলেছিলেন যে অনেক সময় কোনো কবিতা লিখতে লিখতে হয়তো শুতে গেছেন, তার পর কবিতার লম্বা লম্বা অংশ স্বপ্নে দেখেছেন। ঘুমের মধ্যের অংশগুলো ভারি ভালো লেগেছে, কিন্তু জেগে উঠে আর কিছুতেই মনে করতে পারেন নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি হয়তো ফটোগ্রাফের স্বপ্ন দেখ ?" ওঁর ঐ

স্বপ্নে দেখা কবিতার মধ্যে একটি খুব লম্বা, বিষয়বস্তু পরীদের ব্যাপার। তার গোড়াকার লাইনগুলি খুব লম্বা হলেও, ক্রমে ছোটো হতে হতে, শেষের পঞ্চাশ-ষাট লাইনে মাত্র দুটি করে সিলেব্‌ল্‌। একটি মাত্র কাব্যাংশের এতখানি মনে ছিল যে জেগে উঠে সেটি লিখে ফেলতে পেরেছিলেন, তখন তাঁর দশ বছর বয়স। সেই কবিতাটি সভাকবির প্রকৃত অপ্রকাশিত কবিতা বলে তোমার তুলে রাখবার ইচ্ছা হতে পারে, কিন্তু একটা বিষয়ে তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে: এতে তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্য-প্রতিভার বিশেষ পূর্বাভাস পাওয়া যায় না:

> "করতে পারে চড়াই-বুড়ো
> ঠেলাগাড়িকে পত্রাঘাত ?
> আমার কাব্যি বড্ডো কাঁচা,
> মাপ করবেন অচিরাৎ।"

ছাদের ওপরকার ধমপানের ঘরে নানারকম খুনের গল্প হয়েছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে টেনিসন্‌ কতকগুলো বীভৎস ঘটনার কথা বলেছিলেন। মনে হল বিকট বর্ণনাগুলো উনি ভারি উপভোগ করছিলেন। ওঁর কাব্য পড়ে কেউ এ কথা সন্দেহ করত না। ফিরবার সময় স্যার জন অতি সদয়ভাবে তাঁর গাড়ি করে আমাকে হোটেল পর্যন্ত পেঁৗছে দিতে চাইলেন। গাড়িতে উঠবার আগে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আশা করি গাড়িতে বসে কেউ চুরুট খেলে আপনার আপত্তি হবে না?" তাই শুনে হেঁড়ে গলায় টেনিসন্‌ বলে উঠলেন, "আরে, ওপরের ঐ ছোট্টো ঘরে যে মানুষ দুটো দুটো পাইপে কোনো আপত্তি করে নি, সে আবার গাড়িতে একটা চুরুটে আপত্তি জানাবে কোন লজ্জায়?" এইভাবে সেই সন্ধ্যাটি শেষ হয়েছিল; অনেককাল এত আনন্দে সন্ধ্যা কাটাই নি।

তার পর দিন ওঁদের বাড়িতে দুপুরে খেয়েছিলাম, কিন্তু টেনিসনের সঙ্গ বেশিক্ষণ পাই নি। তার পর মিসেস্‌ টেনিসন্‌ আর ছেলেমেয়েদের ফটোগুলো দেখালাম, হ্যালামের ছবির নীচে বড়ো-বড়ো জোরালো হরফে তার নাম লিখিয়ে নিতেও ভুললাম না। ফটোগুলোর উলটো দিকে যে-সব ছড়া লেখা ছিল, ছেলেমেয়েরা সেগুলোকে জোরে জোরে না পড়ে ছাড়ল না। ওদের বাপের ছবির সামনে লেখা ছিল, "দি পোয়েট ইন্‌

এ গোল্‌ডেন ক্লাইম ওয়াজ বর্ন," ইত্যাদি। লায়োনেল সেটি নিয়ে একটু মাথা ঘামিয়ে শেষে পড়তে আরম্ভ করল, "দি পোপ্‌"—

তাই শুনে মিসেস্ টেনিসন্ হেসে উঠলেন আর কবি টেবিলের অন্য ধার থেকে হেঁড়ে গলায় বললেন, "ও কি! পোপের আবার কি হল?" কেউ কিন্তু প্রসঙ্গটা বুঝিয়ে বলল না।

আমি মিসেস্ টেনিসন্‌কে কবির 'দি লেডি অফ্ শ্যালটে'র মানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অনেকেই তো অনেকরকম অর্থ করেন। উনি বললেন মূল উপকথাটি ইতালীয় ভাষায় লেখা, টেনিসন্ সেটি হুবহু তুলে দিয়েছেন, এখন তাঁর কাছ থেকে আবার একটা ব্যাখ্যানা চাওয়াটা উচিত হবে না।

ভালো কথা, টাইম্‌স্-এ ঐ যে 'দি ওয়ার' নামে কয়েক ছত্র বেরিয়েছে, তোমার কি মনে হয় ওগুলো টেনিসনের লেখা? এখানকার এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছি যে উনি লেখেন নি, এবার চেষ্টা করে আসল ব্যাপারটা জানতে হবে। অনেকেরই বিশ্বাস উনি লিখেছেন…

আজ এই পর্যন্ত রইল। ইতি।

তোমার স্নেহাধীন

চার্লস এল্ ডজ্‌সন।

পুঃ রাত তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট। রাতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে এমনি হয়।

থিয়েটারে ছোটোদের যোগদান

কাল বিকেলটা ব্রাইটনে কাটিয়েছিলাম; সেখানে পাঁচ ঘণ্টা ধরে তিনটি হাসিখুশি ও স্বাস্থ্যবতী ছোটো মেয়ের সঙ্গ উপভোগ করলাম। তাদের বয়স বারো, দশ, আর সাত। তিন বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেলাম; অনেকটা সময় জাহাজ-ঘাটায় কাটালাম; সেখানে মিস্ লুই ওয়েবের জলের তলার খেলা দেখে খুব আনন্দ পেলাম। ওখানে যতগুলো যন্ত্র সাজানো ছিল যাতে পয়সা ফেললেই শরীর মনের উপভোগ্য যাবতীয়

ভালো জিনিস পাওয়া যায়, তার সবগুলিতে পয়সা ফেললাম। এমন-কি, যন্ত্রগুলোর হেড-আপিস পর্যন্ত এক 'শাইলক্' আর তিন 'পোরশিয়ার' মতো ধাওয়া করে গেলাম আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করবার আশায় —এক্ষেত্রে ন্যায্য প্রাপ্যটি হল এক বাক্স চকোলেটের বড়ি—তার যন্ত্র বিকল হওয়াতে ওগুলো কিছুতেই বেরোচ্ছিল না। কেউ যদি ঐ তিনটি শিশুর প্রাণশক্তি লক্ষ্য করত; ছোটো-বড়ো যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছিল কি উৎসাহের সঙ্গে তাই উপভোগ করছিল; জাহাজ-ঘাটায় ছোটো দুটি ক্যায়সা দৌড়চ্ছিল আর দিনের শেষে বড়োটির মুখে শুনতে পেত—"কি মজাই-না করা গেল!" তা হলে তারাও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে এক-মত হত যে অন্তত এ-ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত পরিশ্রমের কুফল দেখা যাচ্ছে না এবং কোনো মর্মান্তিক পরিণামেরও আশঙ্কা নেই। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে যে এদের কাউকে থিয়েটারের শিশু বলা যায় না, এরা বোর্ড স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাইতে বিপজ্জনক কিছুতে যোগ দেয় না। মোটেই তা নয়; এরা তিনজনই মঞ্চে অভিনয় করে। বড়োটি কম করে পাঁচ বছর ধরে করছে, এমন-কি, সবার ছোটোটিও চারটি নাটকে অভিনয় করেছে।

হয়তো কেউ বলবে, সে যাই হোক, এখন তো ওদের ছুটির সময়, এখন ওদের মঞ্চে উঠে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে না, তাই এত ফুর্তি। ঠিক তার উলটো ব্যাপার। মিঃ স্যাভিল ক্লার্কের লেখা একটা নাটক এখন ব্রাইটনে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। নাটকটার নাম "অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড", এরা তিনজনেই তাতে অভিনয় করছে এবং মধ্যিখানে এক মাসের অবসর বাদে সেই বড়োদিনের সময় থেকেই করে আসছে। ছোটোটি ডর্মাউসের এবং আরো তিনটি ভূমিকা নিয়েছে, দ্বিতীয়টিও অভিনয় করছে, তবে কথা-বলার পার্ট নেই; আর সবার বড়োটি নাটকের নায়িকা অ্যালিসের ভূমিকা নিয়েছে। সমস্ত নাটকের মধ্যে এই ভূমিকাটিই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মতে কোনো শিশু এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনো নেয় নি: ওকে ২১৫টা বক্তৃতা দিতে হয়! এই সপ্তাহে ওরা রোজ অভিনয় করেছে এবং আমার সঙ্গে যেদিন দেখা হল তার আগের দিন দুটো 'শো' হয়েছিল; দ্বিতীয়টা শেষ হয়েছিল রাত সাড়ে দশটায়; পরদিন সকালে সাতটায় উঠে ওরা সমুদ্রে স্নান করতে গেছিল।

সেন্ট জেম্স্ গেজেট ১৯ জুলাই, ১৮৮৭

থিয়েটারে ছোটো ছেলে-মেয়ে

আমার মতে এ বিষয়ে যে-সব আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেগুলির হওয়া উচিত কতকটা এই ধরনের :

ষোলো বছরের নীচে (দশ বছর বড়োই কম) যত ছেলেমেয়ে থিয়েটারে কাজ করে, তাদের প্রত্যেককে লাইসেন্স নিতে হবে এবং প্রতি বছর সেটি নতুন করে করতে হবে।

ঐ লাইসেন্স শুধু সেই-সব ছেলেমেয়েদের দেওয়া হবে যারা লেখা-পড়ায় নিজেদের বয়সোপযোগী একটি বিশেষ পর্যায় অবধি পেঁাচেছে।

ছোটো ছেলেমেয়েরা বছরে কয় সপ্তাহ কাজ করবে এবং প্রতিদিন থিয়েটারে কয় ঘণ্টা থাকবে, তার একটা সীমানা ঠিক করে দেওয়া দরকার। মহড়া দেবার সময় এই নিয়ম ভাঙা যায়।

থিয়েটারে যে-সব ছেলেমেয়েরা কাজ নেবে, অভিনয় চলার সময় তাদের রোজ বিকেলের দিকে, নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা স্কুলে যেতে হবে। তারা যদি বোর্ড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী হয়, তা হলে অন্য সময় নিয়মিত স্কুলে যাবে। হাইস্কুলগুলোও হয়তো এই নিয়ম মেনে নেবে, অভিনয়ের সময়ে অর্ধেক দিন স্কুল করলেই চলবে।

থিয়েটারে যেতে আসতে ষোলো বছরের কম বয়সের মেয়েদের জন্য এস্কর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু আমার মনে হয় যে আইন করে দশের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ করে দিলে, অনেক গরিব গৃহস্থ পরিবারের ওপর ঘোরতর অন্যায় করা হবে, কারণ ঐ থিয়েটারের মাইনেটুকুতে তাদের অনেক সাহায্য হয়। তাছাড়া নিজেদের অতি প্রিয়, স্বাস্থ্যকর ও নির্দোষ একটা কাজ থেকে বঞ্চিত করলে, অনেক গরিব ছেলেমেয়ে বড়োই কষ্ট পাবে।

সান্‌ডে টাইম্‌স্‌ ৪ আগস্ট, ১৮৮৯

থিয়েটার ও শ্রদ্ধার ভাব

এই প্রবন্ধে আমি লুকিয়ে কোনো সার্মন বা উপদেশ দেব না। গোড়া থেকেই এই আপত্তিটুকু জানিয়ে রাখছি, কারণ আমি জানি প্রচলিত প্রথা—আমার মতে ভ্রান্ত প্রচলিত প্রথা—ঐ "সার্মন" শব্দটির ব্যবহার কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে আবদ্ধ করে রেখেছে। ফলে পাঠকরা হয়তো এই পাতাটি তাড়াতাড়ি উলটে যাবেন, এই কথা বলে—'যার যেমন পছন্দ! এ নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যাপার। আমার বাপু, ও-সব দুর্বলতা নেই। আমার কাছে মানবিক দিক থেকে কিছু বল তো শুনি।'

আমিও ঠিক তাই করতেই চাই। যে-সব পাঠকরা নাটক দেখতে যান, কিম্বা নাটক লেখেন, তাঁরা যদি একটু অবহিত হন, আমিও মানবিক দিক থেকেই কিছু বলব। গির্জার যাজক হিসাবে নয়, এমনকি, ভগবৎ-ভক্ত হিসাবেও নয়, স্রেফ এমন একটা মানুষ হিসাবে কিছু বলতে চাই, যে ভালো-মন্দের তফাত স্বীকার করে- মেনে নিচ্ছি যে ঐটুকু দরকার—যে ভালো লোককে আর ভালো কাজকে ভালো বলেই শ্রদ্ধা করে এবং যে বিশ্বাস করে যে জীবনের সমস্ত দুঃখের না হলেও, অধিকাংশ দুঃখেরই মূলে থাকে মন্দ লোক আর মন্দ কাজ।

তাছাড়া প্রচলিত নিয়মে যেমন বলে, 'ভালো' শব্দটারও কি তার চাইতে ব্যাপক অর্থ থাকতে পারে না? মানব-প্রকৃতির মধ্যে সাহস পৌরুষ, সত্য—কি ঐ জাতীয় যা কিছু আছে, সেগুলোও কি ওর মধ্যে পড়ে না? নিজের কোনো বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস না থাকলেও, মানুষ নিশ্চয় এই গুণগুলিকে শ্রদ্ধা করতে পারে? এই ধরনের শ্রদ্ধার একটা চোখে লাগা দৃষ্টান্তের কথা স্যার চার্ল্‌স্ নেপিয়ারের অভিযানের সময়ে, কোনো উত্তর সিন্ধুর দস্যু সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে শোনা যায়। ব্রাইটন শহরের রবার্টসনের লেখা, 'শ্রমিক শ্রেণীর উপর কাব্যের প্রভাব' নামক একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করে বলছি:

"ছোটো এক সৈন্যদল একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে মার্চ করে

যাচ্ছিল। দুধারের পাহাড়ের ওপর শত্রুদের অবস্থান। এগারোজন সৈনিক সহ একজন সার্জেণ্ট দৈবাৎ ভুল করে গিরিখাতের উলটো ধারে গিয়ে পড়াতে, বাকিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। ওরা মনে করেছিল গিরিখাতটি বুঝি শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু হঠাৎ সেটি গভীর এবং অনতিক্রম্য খাদে পরিণত হল। সেনাধ্যক্ষ ওদের ফিরে আসার জন্য সিগ্‌ন্যাল দিয়েছিলেন, ওরা ভুল বুঝে ভাবল আক্রমণ করতে বলা হচ্ছে। অমনি জয়ধ্বনি দিয়ে ওরা আক্রমণ করল।

ঐ খাড়া পর্বতের শিখরে একটা তিনকোণা মঞ্চের মতো জায়গা ছিল, তার সামনে আবক্ষ পাথরের দেয়াল, তার পিছনে সত্তরজন শত্রু। সেই ভয়াবহ গিরিপথ ধরে ওরা কজন উঠে এল ; ওরা এগারোজন, শত্রুরা সত্তরজন। এমন অসমান যুদ্ধ আর কতক্ষণ চলতে পারে ? একে একে ওরা ধরাশায়ী হল, ছয়জন সেইখানেই পতিত হল, বাকিরা পিছু হটতে বাধ্য হল, কিন্তু তার আগে নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রু নিধন করল।

শোনা যায় পার্বত্য জাতিদের মধ্যে একটা প্রথা আছে, ওদের বীর নেতাদের যুদ্ধে মৃত্যু হলে, তার হাতের মণিবন্ধে লাল কিম্বা সবুজ সুতো বেঁধে দেওয়া হয়, লাল সুতো শ্রেষ্ঠ সম্মানের চিহ্ন। ওদের যেমন নিয়ম, মৃত শত্রুদের ওরা কাপড় ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিল। দলের লোকরা এসে দেখল ব্রিটিশ বীর সৈনিকদের নগ্ন আহত মৃতদেহের দুই হাতেই লাল সুতো বাঁধা।"

আমি এই মনে করে সুখী যে থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই ধরনের 'শ্রদ্ধার' মান, মন-গড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রের চাইতে কম যায় না ; এমন-কি, লোক-সমাজে শ্রদ্ধার যে মান নির্বিবাদে প্রায়ই গৃহীত হয়ে থাকে, থিয়েটারের ক্ষেত্রের মান তাকে অতিক্রম করে যায়।

যেমন ধরুন পাপের প্রসঙ্গ। যেমন কথা-সাহিত্যে, তেমনি অনেক সামাজিক পরিবেশে পাপকে অনেক সময় অনুমোদন করা হয় এবং অতি কদর্য ও স্বার্থপর মনোভাব খোলাখুলি প্রকাশ করা হয়, তাও এমন বিশ্রী ভাষায় যে যদি কোনো ভদ্রগোছের থিয়েটারে, নাটকের দুরাত্মার ভূমিকা যে নিয়েছে তার মুখে ছাড়া, আর কেউ তেমন ভাষা প্রয়োগ করত, তাকে ধিক্কার দিয়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হত।

কয়েক বছর আগে 'সিল্‌ভার কিং' নাটক দেখেছিলাম, তাতে মিঃ

উইলার্ড অতি চমৎকার ভাবে এক ভদ্র দুরাত্মার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকে তিনি যখন তাঁর অনুচর অমার্জিত দুরাত্মাকে জঘন্য দুষ্কর্ম করতে, অর্থাৎ মরণাপন্ন শিশুর মাকে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করে দিতে পাঠালেন, ঐ পাপিষ্ঠের নিষ্ক্রমণের সময়ে সমস্ত দর্শকরা হিংস্র নিচু গলায় ধিক্কার দিতে লাগল। যে-কেউ ঐ চমৎকার নাটকটি দেখেছিল, সে-ই নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবে যে যারা ঐভাবে ধিক্কার দিচ্ছিল, তাদের কারো কারো ব্যক্তিগত জীবন যতই মন্দ হোক-না কেন, তবু তারই মধ্যে মাঝে মাঝে একেকটা উন্নত সময়ও আসে যখন তাদের চোখের সামনে থেকে পরদা উঠে যায় আর পাপের জন্মগত বীভৎসতা দেখে তারাও শিউরে ওঠে।

তাছাড়া বিশুদ্ধ পবিত্র জিনিসের প্রতি দর্শকদের সহানুভূতির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কয়েক সপ্তাহ আগেকার আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। আমি 'দি গোল্ডেন ল্যাডার' দেখতে গিয়েছিলাম তার প্রযোজক ছিলেন 'দি সিল্ভার কিং'-এর সেই কর্তব্যনিষ্ঠ অভিনেতা—পরিচালক মিঃ উইল্সন ব্যারেট। ঐ নাটকের একটি হাস্যকর চরিত্র, জর্জ ব্যারেট নামক সবজিওয়ালা তার মেয়ে সম্বন্ধে যে স্বগতোক্তি করেছিল, তাতে যে বাহবার ঢেউ উঠেছিল, তাই শুনে আমার নিজের বড়োই আনন্দ হয়েছিল। সবজিওয়ালা ভারি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মেয়ের নাম রেখেছিল 'ভিক্টোরিয়া অ্যালেক্জ্যাণ্ড্রা'।

মনে হল বাহবার ঢেউ বলতে চাইছে, 'মেয়েকে ঐ দুটো নাম দিলাম, কারণ যত নাম আছে তার মধ্যে ও-দুটোই সব চাইতে ভালো।' বাস্তবিকই ইংরেজ শ্রোতার কানে ও দুটি নাম শুনতে বড়ো মধুর লাগে, একটি হল এমন রানীর নাম যার নিষ্কলঙ্ক জীবন বহু বছর ধরে তাঁর প্রজাদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছে আর অন্য নামটি একজন যুবরানীর, যিনি যোগ্য ভাবে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

পাঠকেরও নিশ্চয়ই এমন বহু ঘটনার কথা মনে পড়বে যখন থিয়েটার হলের সব চাইতে দামী সীট থেকে আরম্ভ করে সব চাইতে সস্তা সীটের দর্শকরা সকলে মিলে স্বার্থত্যাগ, উদারতা, কিম্বা অন্য যে-সব গুণ মানব-চরিত্রকে উন্নত করে তোলে, তাই দেখে এইরকম গভীর সহনুভূতি প্রকাশ করেছে। আর দুটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি ক্ষান্ত হব।

অনেক বছর আগে মিঃ এমরিকে 'অল্ ইজ নট গোল্ড দ্যাট গ্লিটার্‌স্'-এর নায়কের ভূমিকায় দেখেছিলাম। নায়কটি হলেন একটা কারখানার মালিক, তাঁর বাইরের ব্যবহার অমার্জিত, কিন্তু হৃদয়টি বড়ো কোমল। ভালো করেই মনে আছে যখন তিনি তাঁর কারখানার কর্মীদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "যদি মনে করি ওদের মধ্যে একজনও পুরুষ, মেয়ে কি শিশু পেটে খিদে নিয়ে শুতে গিয়ে, শীতে কাঁপছে, আমি নিজেই-বা কি করে আরামে ঘুমোই!"—তখন জয়ধ্বনিতে থিয়েটার-বাড়ি যেন ভেঙে পড়েছিল।

এ-সমস্তই মন-গড়া গল্প হলেই-বা কতটুকু এসে যায়? যে-সব কর্মীদের এত যত্ন নেওয়া হচ্ছে, হোক-না তারা সবাই কাল্পনিক। আমরা তো আর শুধু ঐ বিশেষ অভিনেতাটিকে শ্রদ্ধা জানাই নি, যে কালেই হোক-না কেন, যে-মানুষ তার প্রতিবেশীদের জন্য চিন্তা করেছে এবং বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, 'যে-ই তার মুখের রুটি ক্ষুধিতকে দিয়েছে, গায়ের কাপড় দিয়ে অন্যের নগ্নতা দূর করেছে', তাকেই আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে-ছিলাম।

আমার অন্য উদাহরণটি আমাদের সময়কার শ্রেষ্ঠ-অভিনেতার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি যেন অনুপ্রেরণায় পূর্ণ। দেখে মনে হত, 'এই মানুষটি আমার ওপর ক্ষমতা বিস্তার করছে, ইচ্ছামতো আমাকে হাসাতে কাঁদাতে পারছে।' সেই অভিনেতার নাম ফ্রেডারিক রবসন। 'পর্টার্‌স্ নট্'-এ যারা তাঁকে দেখেছে, তারা কখনো একটি বেদনাবিধুর দৃশ্যের কথা ভুলতে পারবে না। সেই দৃশ্যে বুড়ো বাপ ছেলের সুনাম রক্ষা করার জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার পর যে মেয়েটি তাঁর ছেলের বাগ্‌দত্তা তার সঙ্গে নির্দোষ ভাবে ষড়যন্ত্র করে, ছেলের বুড়ো মাকে একটি জাল চিঠি পড়ে শোনাচ্ছেন, বলছেন ঐ চিঠি নাকি ছেলে লিখেছে। এদিকে বাপের অজান্তে প্রেমময়ী মেয়েটি বুড়ো-বুড়িকে তার শেষ সঞ্চয়টুকু দেবার ইচ্ছায়, চিঠিতে একটা পুনশ্চ জুড়ে দিয়েছে। তাতে লেখা 'মাগো, এখানে এসে আমি কাজের এত উন্নতি করেছি যে তোমাদের এই পাঁচ পাউণ্ড পাঠালাম।' স্ত্রীকে ঐ চিঠি পড়ে শোনাতে গিয়ে, অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ কথাগুলো দেখে, বুড়ো প্রায় সব কথা ফাঁস করে দেন আর কি! তার পরেই তাঁর 'জনান্তিকে'

উক্তি—ঐ অভিনেতার মতো আর কেই-বা শ্রোতাদের দিকে অমন সরসতায় ভরা বক্র দৃষ্টি দিতে পারে ?—"বাঃ রে! এটুকু দেখছি, আজ সকালের পরে এইখানে গজিয়েছে।" তার পরেই মেয়েটির সস্নেহ চালাকি টের পেয়ে গিয়ে, তার দিকে ঘুঁষি নেড়ে বাপ বললেন, "তবে রে বেটি!" চাপা গলায় বলা, অনিচ্ছাকৃত তিক্ততায় ভরা, ঐ কথাগুলির অপরিসীম স্নেহমমতার কথা যদি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম, তা হলে সুখী হতাম!

এবার এই আলোচনার ক্ষেত্র কমিয়ে এনে ধর্মীয় বিষয়ে কতখানি শ্রদ্ধা জানানো উচিত সেই প্রসঙ্গ তুলবার আগে, এই শব্দটিকে তার প্রচলিত মানের বাইরে আরো ব্যাপক একটা অর্থ দিতে চাই। অর্থাৎ আমাদের এই চোখে-দেখা মানব জীবনের উর্ধ্বে এবং বাইরে, কোনো এক মঙ্গলময় অদৃশ্য সত্তার কথা বলতে চাই, তার সঙ্গে একটা দায়িত্বের সম্পর্কে আমরা আবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি যে সব চাইতে নিকৃষ্ট 'ধর্মবিশ্বাস'ও সেই শ্রদ্ধার যোগ্য, কারণ অটল নাস্তিকতাবাদীরাও যে অবাস্তব নিয়মকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে, ঐ-সব ধর্মে তাকেই একটা বাস্তব রূপ দেওয়া হয়।

এই বিষয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা : যেগুলি শুভ বিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর যেগুলি অশুভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথম শ্রেণীতে ভগবানের নাম করতে হয়, পবিত্র আত্মাদের, প্রার্থনা, মন্দির ও ধর্মযাজকদেরও ধরতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাপাত্মা ও ভবিষ্যৎ শাস্তির নাম করতে হয়।

মঞ্চের ওপরে কিম্বা অন্য জায়গায় মাঝে মাঝে এ-সব প্রসঙ্গ যে-রকম অশ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়, তার একটা কারণ হতে পারে যে ঐ শব্দের একটা অবিচ্ছেদ্য অর্থ নেই, এ কথা অনেকেই ভুলে যান। যিনি কথাটি বলছেন তিনি তাতে যা বুঝছেন আর যিনি শুনছেন তিনি যে মানে করছেন, তার বেশি কিছুই নেই।

কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই আমি হয়তো বললাম, "গুড্ মর্নিং।" শুনে মনে হতে পারে এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমাদের দুজনার অজানা কোনো ভাষাতে ঐ কথা দুটোর কোনো বিশ্রী জঘন্য মানে হয়। তার জন্য কি আমরা দায়ী ? এ কথা মনে রাখলে অশিক্ষিত লোকদের মুখে মাঝে মাঝে যে-ভাষা

শোনা যায়, তাকেও আর ততটা আপত্তিকর মনে হবে না। ভেবেও মনে শান্তি পাওয়া যায় যে বক্তা এবং শ্রোতার দিক থেকে আপত্তিকর কথাগুলো কতকগুলো অর্থহীন আওয়াজের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

এমন-কি, যেখানে অপবিত্র শব্দ বাস্তবিকই দোষার্হ, কারণ জেনে-শুনে এবং ইচ্ছা ক'রে সেগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, আমার তো মনে হয় না থিয়েটারের মঞ্চে তার সব চাইতে জঘন্য উদাহরণ শোনা যায়। ও-সব শুনতে হলে ফ্যাশানেবল্ সমাজের আর জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যে খোঁজ করতে হয়।

বাইবেল থেকে উদ্ধৃত কোনো বাক্যের উদ্ভট 'প্যারডি'কে আশ্রয় করে যদি কোনো ঘটনার সৃষ্টি করা যায়, তাতে সমাজের লোকে যত আনন্দ পায়, তেমন আর কিছুতে নয়। অনেক সময় কোনো কল্পিত শিশুর মুখ দিয়ে ব্যঙ্গটিকে পরিবেশন করে, এই ধরনের আধা-কৈফিয়ত দেওয়া হয় : 'ছেলেমানুষ তো, ও আর কি বোঝে!' তা হয়তো সত্যি, কিন্তু যে বয়স্ক মানুষরা লোক হাসাবার জন্য এভাবে শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধার পাত্রে দাঁড় করায়, তারাও কি কিছু বোঝে না?

তার পর ধরা যাক, 'ইন্‌গোল্ড্‌স্‌বি লেজেণ্ড্‌স্'-এর পরিহাসের কথা; সেখানে পাপাত্মাকে দেখানো হয়েছে যেন ভারি ঠাট্টা-তামাশার বিষয়। যাঁরা 'পাপের' অর্থ বোঝেন, তা সে অশরীরী অবস্থাতেই হোক—অশরীরীতে তাঁরা নাও বিশ্বাস করতে পারেন—কিম্বা নারী-পুরুষের মধ্যে প্রতিফলিতই হোক, তাঁরা কি এরকম তামাশা বরদাস্ত করতে পারেন? যার জন্য মানবজাতি অভিশাপগ্রস্ত, যুগে যুগে মানুষ যার জন্য অশেষ দুঃখ পাচ্ছে, সে কি সাময়িক পরিহাসের বিষয় হল?

কিন্তু সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সব চাইতে নিকৃষ্ট যত অশ্রদ্ধার উদাহরণ আমার মনে পড়ছে, দুঃখের বিষয় সেগুলি বলেছেন ধর্মযাজকরাই। আমি তাঁদের মুখ থেকে এমন সব গল্প শুনেছি যে তার ভিতরকার অশ্রাব্য ধর্মনিন্দা মঞ্চে শোনা যে কোনো সম্ভাব্য উক্তিকে হার মানায়। পবিত্র বাক্য শুনে শুনে শেষপর্যন্ত তার মর্ম সম্বন্ধে একরকম ঔদাসীন্য এসে যায় কি না জানি, কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো কৈফিয়তের কথাও ভেবে পাচ্ছি না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল পাঠক নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, বার বার একটানা ভাবে যদি কোনো কথার পুনরুক্তি করে যাওয়া যায়, তা হলে গোড়ায় কথাটিকে যতই অর্থপূর্ণ

মানে হোক-না কেন, শেষে তার এক কণা মানেও বাকি থাকবে না, এমন-কি, ভেবেও পাবে না কি করে এইরকম একটা কথার সাহায্যে তুমি কোনো অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলে!

মঞ্চের ওপর ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করা, দিব্যি গালা ইত্যাদি কতদূর পর্যন্ত চলতে পারে? আমার মতে ওগুলো আপত্তিকর হয়ে ওঠে শুধু যখন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, পরিহাস ছলে বলা হয়। যদি গাম্ভীর্যের সঙ্গে, কোনো যথাযোগ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কথাগুলি বলা হয়ে থাকে, তা হলে বাইবেলের নজির দেখিয়ে সেগুলোর দোষ ধরা যায় না বাইবেলের মধ্যে সব চাইতে মধুর গদ্য-কাব্যের যে-অংশ আরম্ভ হয়েছে, "তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাকে অনুরোধ কোরো না..." তার শেষে একটা দিব্যি দেওয়া আছে: "মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কারণে যদি তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হয়, তা হলে ভগবান যেন আমার মরণ কিম্বা তার চাইতেও বেশি কিছু ঘটান।"

কিছুদিন আগেও ক্রমাগত যে ভাষা হালকা ভাবে ঠাট্টা করে সকলে ব্যবহার করত, যেমন 'মাই গড্!', কিম্বা "গুড্ লর্ড!" সেগুলির জন্য সমাজই দায়ী ছিল, থিয়েটারের মঞ্চ নয়। এমন-কি, মিস্ অস্টেনের মতো একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন লেখিকা পর্যন্ত তাঁর 'প্রাইড্ অ্যান্ড প্রেজুডিস্' নামক উপন্যাসের একজন নায়িকাকে দিয়ে বলিয়েছেন, "লর্ড! তেইশ বছর বয়স অবধি আইবুড়ো থাকলে আমি লজ্জায় মরে যেতাম!" অবশ্য যে কথা সকলে সব সময় ব্যবহার করছে, বক্তা কিম্বা শ্রোতা, কারো কাছেই তার কোনো মানে থাকে না। আজকাল কিন্তু কথাগুলো বড়োই কানে লাগে, কারণ অব্যবহারের ফলে ওগুলোর অর্থ সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি।

সেক্সপীয়রের 'মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং'-এ, বিয়েট্রিস বলছে "ও গড্! আমি যদি পুরুষ হতাম! তা হলে বাজারের মধ্যিখানে, ওর কলজে ছিঁড়ে খেতাম!" আর বেনেডিক বলছে, "ও গড্! মশাই, এ খাদ্য আমার মুখেই রোচে না। আমি ঐ জিবের ঝালটি সইতে পারি না।" তখনকার শ্রোতাদের কানে এ-সব কথায় বোধ হয় কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু আজকাল যদি-বা প্রথমটা চলতে পারে, কারণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে যথাযোগ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি বড়ো বেসুর বাজে। মিঃ আর্ভিং 'ও গড্' বদলে 'ও লর্ড!' করেছেন বটে, কিন্তু একেবারে

বাদ দিলেই ভালো হত।

প্রার্থনা করাকে মঞ্চে সর্বদা শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত আমি মাত্র একবার পেয়েছি। এক 'ব্যালে' নাচের নায়িকা রাতে তার শোবার ঘরে অপেক্ষা করে আছে, একটু পরেই তার দয়িত এসে, জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গান শোনাবে ; এই সময় সেই মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করার প্রহসন দেখাল ! যদি এই ধরনের দৃশ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখানো হয়—'হ্যাম্‌লেটের' একটি দৃশ্যে যেমন ক্লডিয়াসকে প্রার্থনা করতে দেখা যায়—তা হলে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। 'হেনরি দি ফোর্থ' নাটকে, এজিনকোর্টের যুদ্ধের ঠিক আগে নায়কের বেশে চার্লস্ কীন রণক্ষেত্রে হাঁটু গেড়ে যে সংক্ষিপ্ত ও আবেগপূর্ণ প্রার্থনা করেছিলেন, তাই শুনে হলসুদ্ধ সকলে অভিভূত হয়েছিল।

মঞ্চে যেখানেই মন্দির কিম্বা উপাসনা-গৃহ দেখানো হয়, উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখানো হয়। ধর্মকে যে কতখানি হেয় প্রতিপন্ন করা যায় তা দেখতে হলে, স্যাল্‌ভেশন আর্মির বাড়াবাড়ি, কিম্বা ফুটপাথের প্রচারকদের ছেঁদো কথা শুনতে হয়। এ-সব দেখলে বোঝা যায় অতিরিক্ত গায়ে-পড়া ভাব দেখিয়ে পবিত্র বস্তুকেও কতখানি অপমান করা যায়। 'লাইসিয়ম' থিয়েটারে 'মাচ্ অ্যাডো' মঞ্চস্থ হল। গির্জার দৃশ্য যে কি অপূর্ব সুরুচি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপিত করা সম্ভব হতে পারে, সেখানে আমাদের তাই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মঞ্চে ধর্মানুষ্ঠান দেখানো নিয়ে কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই-সব সমালোচকদের মধ্যে কেউই ধর্ম-বিষয়ক 'পবিত্র' ছবি দেখতে আপত্তি করেন না।

ক্যাম্বিসে আঁকা ছবি আর মঞ্চের ওপর সত্যিকার মানুষ দিয়ে গড়া ছবির মধ্যে প্রভেদটা যত-না বাস্তবিক, তার চাইতে মন-গড়া নয় কি ? আমার নিজের মনে এই আশা হয়েছিল যে যে-সব লোকরা ভগবান, কিম্বা স্বর্গধাম, কিম্বা প্রার্থনার কথা কখনো-চিন্তাও করে না, এই দৃশ্যের সুগম্ভীর সৌন্দর্য দেখে, তাদের মনে হতে পারে—'গির্জা কি তবে এত সুন্দর ? তা হলে সেখানে গিয়ে একবার নিজের চোখেই দেখে আসি।' অবশ্য ঐ সুন্দর দৃশ্যেরও একটি খুঁত ছিল। ঐরকম পরিবেশে বিয়েট্রিস বেনেডিকের সূক্ষ্ম কথা কাটাকাটি আর মার্জিত পরিহাসও অনেকের কানে লেগেছিল, যদিও ঐ বিশেষ দৃশ্যটি ছিল অপূর্ব আনন্দের ব্যাপার।

মিঃ আর্ভিং যদি ঐ দৃশ্যটির স্থান পরিবর্তন করে গির্জার বাইরে নিয়ে যেতেন, আমি খুব খুশি হতাম। 'আমার হাতে আবার চুমু খাও'-এর মতো দৃশ্য-বহির্ভূত প্রক্ষিপ্তাংশ যে-পরিচালক বরদাস্ত করতে পেরেছেন, সেক্সপীয়রের মূল পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখা বিষয়ে তাঁর খুব কড়া মতামত নেই নিশ্চয়ই।

ধর্মযাজকরা যদি বিদ্রূপের যোগ্য হয়ে থাকেন, তাঁদের রক্ষা করবার জন্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু অনেক সময় ব্যাপকভাবে তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয় না কি? 'পেশেন্স'-এর মতো হাসির নাটকে মিঃ গিলবার্ট আমাদের যে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর আমোদের সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা গভীর ভাবে ঋণী হলেও, মনে হয় বিশপদের আর যাজকদের হেয় প্রতিপন্ন করতে তাঁর খুব ভালো লাগে। কিন্তু অন্যান্য বৃত্তি যাঁরা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের চাইতে এঁরা কি গাম্ভীর্যে, পরিশ্রমে, কর্তব্য-পরায়ণতায় কিছু কম যান? ঐ যে মিষ্টিসুরে গাওয়া চালাক-চালাক গানটি, 'দি পেল ইয়ং কিউরেট', ওটি শুনে আমি বেদনা অনুভব করি। আমি তো মানস-নেত্রে তাকে দেখতে পাই সারাদিন খেটেখুটে রাতে বিবর্ণ মুখে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরছে। এতক্ষণ হয়তো সে দুর্গন্ধময় কোনো আঁস্তাকুড়েতে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, কোনো মরণাপন্ন রুগীকে শেষ সান্ত্বনার কথা বলছিল আর সেখানকার দূষিত বাতাস লেগে নিজেও হয়তো এখন অসুস্থ বোধ করছে —পাঠক, তোমার রসবোধ কি এতই তীক্ষ্ণ যে এই মানুষটাকে নিয়ে তুমি হাসাহাসি করতে পারো? তা হলে তোমার ব্যবহারে কিছুটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তোমার নিজের মরণাপন্ন সন্তানকে দেখবার জন্য যে বিবর্ণ তরুণ ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেকে এনেছ, তাকে নিয়েও হাসাহাসি কর। আর আমাদের মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের সম্মান রক্ষা করবার জন্য যে বিবর্ণ তরুণ সৈনিক পদদলিত রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হয়ে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সেখানকার ধুলো রাঙা করে দেয়—তাকে নিয়েও হাসাহাসি কর।

তবে মঞ্চে এর উলটো দৃশ্যও মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেমন 'ভিকার অফ্ ওয়েকফীল্ড্'-এ মিঃ আর্ভিং-এর অভিনীত সেই কোমলতা-মণ্ডিত ভালোবাসার যোগ্য বৃদ্ধের চাইতে ভালো আর কি হতে পারত? কিম্বা মিঃ উইল্সন ব্যারেট্ 'দি গোল্ডেন ল্যাডার'-এ যে তরুণ যাজকের

ভূমিকায় নেমেছিলেন, তার চাইতে উত্তম পৌরুষ ও বীরত্বের প্রতীক আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

পাপাত্মা কিম্বা ঐ ধরনের শক্তিকে যেভাবে সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে, সে-বিষয়ে আরেকবার ভেবে দেখা দরকার। অনেকে ন্যায্য ভাবেই জিজ্ঞাসা করতে পারে, "শয়তান বলে কেউ আছে, এ কথা বিশ্বাস করি বা নাই করি, তাকে শ্রদ্ধা জানাবার কি কোনো দরকার আছে ?" এর উত্তরে আমি বলি এ-সব বিষয়ে কিছু বলার সময়ে অন্তত খানিকটা গাম্ভীর্য অবলম্বন করা উচিত। অনেক সময় হতভাগ্য অপরাধীদের নিজেদের মনে হয়েছে যে কাম কিম্বা মোহের বশে যে-সব জঘন্য পাপকার্য করে তারা মানুষের সুখ নষ্ট করেছে, সেগুলি তারা নিজেদের চিন্তার বাইরে কোনো অশুভ প্রভাবে পড়েই করেছে। এ-সব জবানী বাদ দিয়েও, যে ব্যাপার মানব জীবনের গভীরতম দুঃখের সঙ্গে জড়িত, সেটা কখনো পরিহাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। অথচ সামাজিক ব্যাপারে কত সময় শয়তান সম্বন্ধে কোনো চতুর বিদ্রূপ শুনে লোকে সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে। এদের মধ্যে ধর্মযাজকরাও থাকেন, যাঁদের সমস্ত জীবন যদি অ-সততায় পূর্ণ হয়ে না থাকে, তা হলে তাঁরা শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এ-ও বিশ্বাস করেন যে শয়তানের অস্তিত্বই হল জীবনের গভীরতম দুঃখের অন্যতম।

এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার তো মনে হয় না যে সমাজের চাইতে মঞ্চের অবস্থা আরো নিকৃষ্ট, বরং তার উলটোটাই সন্দেহ করি। মিঃ আর্ভিং 'মেফিস্টফিলিস্'-এর যে চিত্র দেখিয়েছেন, তার নিশ্চয়ই একটা সুফল পাওয়া যাবে। এমন কে আছে যে ঐ দৃশ্য দেখেও পাপের জঘন্যতা সম্বন্ধে সচেতন হবে না ? এমন প্রকট শিক্ষা কজন প্রচারক তুলে ধরতে পারত ?

নরকের, কিম্বা পরলোকে শাস্তি পাওয়ার বিষয়ও ঐরকম গাম্ভীর্য বাঞ্ছনীয়। আমাদের বাপদের আমলে মঞ্চে ক্রমাগত 'ড্যাম্‌নেশন' কথাটির হালকা উল্লেখ শোনা যেত, এ বিষয়ে সমাজ ছিল মঞ্চের পথ-প্রদর্শক। এটা খুবই আশার কথা যে আজকাল ভদ্র সমাজেও যেমন ও-সব কথা আর শোনা যায় না, মঞ্চ থেকেও ঐ অভ্যাস দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। মঞ্চে এই বিষয়ের অপব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত আর শুভ ব্যবস্থার দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গে শেষ করব।

বয়স্কদের দিয়ে অভিনীত, মিঃ গিল্‌বার্টের চতুর নাটক 'পিনাফোর' আমি কখনো দেখি নি। ছোটোদের দিয়ে যখন মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, একটি অংশ শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেছিল। জাহাজের কাপ্তান বলল, 'ড্যাম্‌ মি।' অমনি এক দল ছোটো-ছোটো নিষ্পাপ মিষ্টি মেয়ে, উজ্জ্বল হাসি-মুখে যে গান গেয়ে উঠল, তার কোরাস্‌ হল, "ও বলল ড্যাম্‌ মি! ও বলল ড্যাম্‌ মি!" বড়োদের কান ও কথা শুনে শুনে এতই অভ্যস্ত যে তার কদর্থটা মনেই পড়ে না, কিন্তু সেই বড়োদের আমোদ দেবার জন্য নিষ্পাপ শিশুদের ও কথা বলতে শেখানো হয়েছে দেখে আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল, সে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না।

এই দুটি চিন্তাকে পাশাপাশি রেখে দেখ: এক দিকে নরক—তুমি নরকে বিশ্বাস কর না কর, তাতে কিছু যায় আসে না; বহু লোকে তো করে—অপর দিকে ঐ নিষ্পাপ কচি মুখে নরকের ভয়াবহতা নিয়ে তামাশা! এবার দেখ, ওতে কতখানি মজা পাও।

মিঃ গিলবার্ট কি করে এমন বিশ্রী জিনিস লিখতে পারলেন আর স্যার আর্থার সালিভ্যান তাঁর মহান্‌ শিল্পের অপব্যবহার করে, কি করে যে এমন যাচ্ছেতাই জিনিসের সুর দিতে পারলেন, এ বুঝতে আমার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠল না।

তবে আমার মধ্যে এতখানি গোঁড়ামি নেই যে এই ধরনের প্রসঙ্গেই আপত্তি করব। আমার মতে গাম্ভীর্যের সঙ্গে কোনো যোগ্য উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়ে থাকলে, ফল ভালো হতে পারে। 'দি গোল্‌ডেন ল্যাডার'-এর নায়ককে যখন একজন ফরাসী অফিসার তাঁর বন্দী বলে দাবি করলেন, তখন একজন ব্রিটিশ কাপ্তান তাকে তাঁর নিজের হেফাজতে নিলেন। এই কাপ্তানের ভূমিকায় মিঃ বার্নেজ চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। ফরাসী অফিসার বললেন, "উনি আমার বন্দী!" অমনি রগ-চটা ব্রিটিশ কাপ্তান গর্জন করে উঠলেন, "ড্যামিট্‌! তাই যদি হয়, তা হলে আমার জাহাজে উঠে তাকে ধরে নিয়ে যাও না!" এখানে ঐ শপথটার মধ্যে একটুও অশ্রদ্ধার ভাব নেই। এ তো আর হালকা পরিহাস নয়, এ হল গিয়ে নির্মম বাস্তব।

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। 'ডেভিড কপারফীল্ড' উপন্যাসটির নাটক-রূপে যদি 'লিট্‌ল্‌ এম্‌লি'র সঙ্গে স্টিয়ার ফোর্থ 'ইলোপ' করার পরবর্তী দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হয়, তা হলে কাহিনীর প্রতি

অবিচার করা হবে। 'লিট্‌ল্ এম্‌লি' তার বাগ্‌দত্ত হ্যাম্ পেগটিকে ভগ্নহৃদয় অবস্থায় ফেলে চলে গেছে। সে-খবর হ্যাম্‌ই এসে তার বাপকে দিল, ডেভিড্ সেখানে উপস্থিত।

হ্যাম্ অনুনয় করে বলল, "মাস্টার ডেভি, তুমি একটু বাইরে যাও, বাবার সঙ্গে আমার যে কথা আছে, সেটা আমাকে, বলতে দাও। তোমার ও-সব শুনে কাজ নেই, ভাই।"

ডেভিড্‌কে বলতে শোনা গেল, "আমি তার নাম শুনতে চাই।" ভগ্নকণ্ঠে হ্যাম্ তখন বলল, "কিছুদিন ধরে যখন-তখন এখানে একটা চাকরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এক ভদ্রলোককেও দেখছি। আজ সকালে শহরের বাইরে একটা অচেনা ঘোড়ার গাড়িও এসেছিল। চাকরটা যখন গাড়ির কাছে গেল, এম্‌লি তার সঙ্গে ছিল। অন্য লোকটি গাড়ির মধ্যে ছিল। সে-ই হল অপরাধী।"

মিঃ পেগটি এলিয়ে পড়ে সামনের দিকে হাত তুলে ধরলেন, যেন ভয়াবহ কিছুকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

"ভগবানের দিব্যি! বোলো না যে তার নাম স্টিয়ার ফোর্থ!" ভাঙা গলায় হ্যাম্ বলে উঠল, "মাস্টার ডেভি, এতে তোমার কোনো দোষ হয় নি—আমি কখনো তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাব না—কিন্তু সত্যিই তার নাম স্টিয়ার ফোর্থ আর সে একটা 'ড্যাম্‌ড্ ভিলেন!'

এই দৃশ্য দেখে যদি কোনো সমালোচক বলেন, "ছি! ছি! এ কি অশ্রদ্ধার ভাষা! ঐ শপথগুলো বাদ দিতে হবে!" তা হলে 'অশ্রদ্ধা' বলতে তিনি যা বোঝেন তার সঙ্গে আমার কোনো সহানুভূতি নেই।

পরিশেষে বাইবেলের ভাষার সুস্পষ্ট নাটকীয়তার কথা উল্লেখ করলে কোনো দোষ হবে কি? এভাবে আমি খৃশ্চানদের কাছে কোনো বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি না: যে কোনো মানুষের যদি এতটুকুও সাহিত্য-বোধ থাকে, সে-ই স্বীকার করবে যে কাব্যের ও সাধারণ দরদের দিক থেকে বিশ্বসাহিত্যে বাইবেলের স্থান অতি উচ্চে। প্যারেব্‌ল্‌গুলির প্রত্যক্ষ শক্তিই ঐ নাটকীয়তার মধ্যে প্রকাশ পায়। 'সোয়ার', অর্থাৎ 'যে বীজ বপন করে', উপাখ্যান পড়লে মনে হয় যেন ঘটনাগুলি সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে: কাছেই একটা পাহাড়, দিগন্তে তার আকৃতি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; তার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে

এক মানুষের মূর্তি চলে যাচ্ছে : আলোকিত আকাশে তার কালো আকৃতিটি পরিষ্কার চোখে পড়ছে ; তালে তালে তার হাতের দোলায় বক্তার কথার ছন্দ প্রকাশ পাচ্ছে।

'প্রডিগেল সন্'-এর গল্প নিয়ে কোনো নাটক লেখা হয়েছে কি না জানি না, তবে ওর সারমম নিয়ে অনেক সাহিত্যকর্ম নিশ্চয় রচিত হয়েছে। আমি এ কথা বলব যে আধুনিক জীবনের পটভূমিকার সঙ্গে ঐ গল্পকে মানিয়ে নিয়ে চমৎকার নাটক লেখা যায়।

প্রথম অঙ্কে দেখানো হবে ধনী গৃহের বিলাস সম্পদ ; দ্বিতীয় অঙ্কে এর উলটোটি ছবির মতো স্পষ্টভাবে চোখে পড়বে। উড়নচড়ে ছেলে এখানে দৃষ্টিকটু, লোকদেখানি বিলাসিতায় ডুবে আছে, তাকে ঘিরে আছে পৌরুষহীন পুরুষ আর নারীত্বহীনা নারীরা। দূর দেশে গিয়ে দুহাতে ছেলে টাকাকড়ি ওড়াচ্ছে।

তৃতীয় অঙ্কে ধাপে ধাপে তার অধঃপতন ঘটছে, অবশেষে অতল নৈরাশ্যে সে ডুবে যাচ্ছে। তার পরেই আসছে তার সমস্ত চিত্তের পরিবর্তন : এ কি ঘৃণ্য কাজে সে মত্ত ! শেষে কাতরভাবে ছেলে বলে উঠল, "আমি উঠে পড়ে আমার বাবার কাছে ফিরে যাব !" চতুর্থ অঙ্কে ছেলে আবার তার পৈত্রিক আবাসে ফিরে এসে, দরিদ্রবেশে, সকলের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে, অনিশ্চয়তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এক পাল কুঁড়ে চাকর-বাকর তাকে ভিখারি মনে করে, টিট্‌কিরি দিয়ে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সামনে উপবাস ও মৃত্যু। এমন সময় বুড়ো বাপ ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হয় না কি যে গ্যালারির সস্তা আসনে যে-সব গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকরা বসেছে, তাদেরও কারো কারো চোখ আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হবে, কারো কারো হৃদয়ে নতুন উন্নত চেতনা জাগবে আর যা কিছু ন্যায্য, যা কিছু বিশুদ্ধ, যা কিছু সুন্দর, তার প্রতি এমন শ্রদ্ধার উদ্রেক হবে যে সে ভাবটি খুব সহজে কেটে যাবে না ?

ছোটোদের প্রতি সম্ভাষণ

একটা রবিবারে মার্গারেট বলে একটি ছোটো মেয়ে ফসল কাটার উৎসব উপলক্ষে গির্জায় উপাসনা শুনতে গেছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য গির্জা সেদিন ফুল, ফল, সঙ্গীতে অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। আচার্য বলেছিলেন ভগবানের কি অসীম দয়া-দাক্ষিণ্য যে আমাদের নিজের বলতে যা কিছু আছে সবই তাঁর দেওয়া। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্য আমাদেরও সব চাইতে ভালো জিনিসগুলি তাঁকে দেওয়া উচিত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে ছোটোরা, হয়তো ভাবতে পারে যে ভগবানকে দেবার মতো, তাঁকে দেবার যোগ্য, তাদের কিছুই নেই। আচার্য বলেছিলেন যে ভালোবাসার যে কোনো ছোটোখাটো কাজ, তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি এতটুকু দয়াও ভগবান গ্রহণ করেন। সকলেই, বিশেষত ছোটো ছেলেমেয়েরা চেষ্টা করলেই এ-সব কাজ করতে পারে। উপাসনার শেষে সবাই যখন চলে গেল, ছোটো মার্গারেট গির্জার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আচার্যের কথাগুলির বিষয়ে ভাবতে লাগল। এমন সময় একটা লার্ক-পাখি ওর পায়ের কাছ থেকে উঠে, নীল আকাশের বুকে উড়ে যেতে যেতে এমন মধুর সুরে গান গাইতে লাগল যে মার্গারেট মনে মনে বলল, 'আহা, ও-ও যেমন করে পারে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে—আমার মতো ছোটো মেয়ের করবার কিছু যদি পেতাম, কি খুশিই-না হতাম!'

ঘাসের ওপর রোদে বসে মার্গারেট ভাবতে লাগল। একটু পরেই ওর চোখে পড়ল ওর পাশেই একটা গোলাপগাছ হয়েছে, জলের অভাবে তার ফুলগুলি সব শুকিয়ে নুইয়ে পড়েছে। অমনি মার্গারেট ছুটে ছোটো নদীটির কাছে গিয়ে হাতের অঞ্জলি ভরে জল এনে গোলাপের ওপর ছিটিয়ে দিল। বার বার এরকম করার ফলে ফুলগুলো আবার সুস্থ হয়ে উঠল।

ছোটো মার্গারেট এগিয়ে যেতে যেতে একটা কুটিরের সামনে এসে দেখল, একটা ছোটো ছেলে সিঁড়ির ওপর বসে বসে মনের দুঃখে কাঁদছে,

ওর খেলনা ভেঙে গেছে। কাগজের তৈরি ছোটো একটা হাওয়ায়-চলা ময়দা পেষার কল, তার কাগজের পাখ্‌নাগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে, আর ঘুরছে না। মার্গারেট খোকার কাছ থেকে খেলনাটা নিয়ে, কাগজের পাখ্‌নাগুলো সোজা করে দিল, তার পর যেই-না একটু বাতাস দিল, অমনি মনের আনন্দে পাখ্‌না ঘুরতে লাগল আর খোকাও ফুর্তির চোটে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিল।

তার পর মার্গারেট ভাবল এবার বাড়ি ফিরবে, কিন্তু ছোটো নদীটির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল পাটকিলে রঙের ক্ষুদে একটা পাখি জলে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। কি করে জানি জলে পড়ে গিয়ে প্রায় ডুবতেই বসেছিল, ছট্‌ফট্ করতে করতে ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছিল। মার্গারেট গাছের ডাল ধরে, যতটা সম্ভব জলের ওপর ঝুঁকে, অন্য হাতটা বাড়িয়ে জল থেকে পাখিটা তুলে তাকে নিরাপদে নদীর ধারে রাখল।

এবার নিজেরই ক্লান্ত লাগছিল, অবশেষে মার্গারেট বাড়ি পৌঁছল। সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে, ছোটো খাটটির ওপর সে শুয়ে পড়ল, মুখখানি সাদা হয়ে গেল, চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে রইল সে। মনে মনে বলল, 'এবার বোধ হয় আমি মরে যাব, নিশ্চয়ই মরে যাচ্ছি। একটু পরেই আর থাকব না।' মার্গারেটের বন্ধুরাও ঘরে এসে বলল "আহা, বেচারা মার্গারেট মারা যাচ্ছে!"

ঘরের বাইরে বাগানের পথের ধারে একটা গোলাপগাছ ছিল, সে ঐ কথা শুনে, অমনি বাড়তে আরম্ভ করল। বাড়তে বাড়তে গোলাপ গাছ জানলা অবধি পৌঁছে গেল, তার পর আরো বেড়ে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পর দেয়াল বেয়ে বেয়ে, খাটের পায়া বেয়ে বেয়ে, বেড়েই চলল গোলাপগাছ, গোছা গোছা গোলাপ ফুলে ঘর ভরে গেল, তার সুগন্ধে চার দিক ভুর্ ভুর্ করতে লাগল। মার্গারেটের ফ্যাকাশে মুখের ওপর ফুলগুলি ঝুঁকে পড়তেই, মুখখানিতেও ক্রমে ফিকে গোলাপী রঙ দেখা দিল। জানালা দিয়ে মৃদু মৃদু বাতাস ঘরে ঢুকে ওর মুখের ওপর বইতে লাগল, ছোটো একটা পাটকিলে পাখি জানলার বাইরে মিষ্টি সুরে গাইতে লাগল; মার্গারেটও হেসে চোখ মেলল—ও মা! ও যে তখনো গির্জার বাইরে ঘাসের ওপর, রোদে বসে আছে! সবটাই স্বপ্ন।

এই গল্পটা একটা বইতে পড়ে, মনে মনে জমা করে রেখেছিলাম,

তোমাদের আজ বিকেলে বলব বলে। এবার তোমাদের দয়া ভালোবাসার বিষয়ে তিনটি গল্প বলব। জানোই তো :

"মানুষ, পাখি, পশুটিকে
ভালোবাসে যেই জনা,
তার চাইতে কে-বা করে
আরো ভালো উপাসনা।"

প্রায় চল্লিশ বছর আগে জেনি লিণ্ড বলে একজন বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন। তাঁর গলার স্বর আর গান গাওয়া এতই সুন্দর ছিল যে সে-গান শুনলে শ্রোতাদের মনে হত যেন দেবদূতের কণ্ঠ শুনছে। দলে দলে ভিড় করে, পয়সা দিয়ে তারা ওঁর গান শুনে আসত।

একবার তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে গান গাইতে গেছেন ; সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় বৃষ্টি নামাতে একটা দীনহীন কুটিরে আশ্রয় নিলেন। সেখানে এক বুড়ি একা থাকতেন। জেনি লিণ্ড তাঁর সঙ্গে ভাব করে নিলেন। বুড়ি ওঁর পরিচয় না জেনেই, ওঁর কাছে একজন আশ্চর্য গায়িকার গল্প করতে লাগলেন। সেদিন বিকেলে তিনি গাইবেন, শহরসুদ্ধ সকলে তাঁর গান শুনবার জন্য পাগল, বুড়িরও গান শুনতে বড়োই ইচ্ছা করছিল, কিন্তু তাঁর মতো গরিব বুড়ির পক্ষে সে তো আর সম্ভব নয়। তখন জেনি লিণ্ড নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আমি আপনাকে গান শোনাব।" তার পর ঐখানে, ঐ গরিবের কুটিরে বসে সেই বিখ্যাত গায়িকা তাঁর সব চাইতে ভালো তিন-চারটি গান গেয়ে, বুড়ির মনের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন।

আরেকটা গল্প বলি। একজন লোক পাড়াগাঁয়ের একটা গলি দিয়ে যেতে যেতে ঝোপের মধ্যে কিরকম ঝট্‌পট্, কিচ্‌কিচ্ শব্দ শুনে, দাঁড়িয়ে পড়ে ভালো করে চেয়ে দেখলেন, একটা পাখির ছানা বাসা থেকে পড়ে গেছে, বেচারার ডানা কাঁটাগাছে আটকে যাওয়াতে, ছানাটা অসহায়ভাবে ঝুলে রয়েছে। মা-পাখি আশেপাশে ডানা ঝাপ্‌টে, প্রাণপণে ডাকাডাকি করছে, কিন্তু ছানাটাকে তুলে আনবার সাধ্য নেই তার। লোকটি যখন আস্তে আস্তে ছানাটাকে তুলে আবার বাসায় রেখে দিলেন, পাখিটা এতটুকু নড়ল না। তার পর নিজেও বাসায় উঠে, নির্ভয়ে ছানাদের ওপর ডানা

মেলে বসল, এতটুকু ভয় গেল না। যে-মানুষটি বিপদের সময় তার সাহায্যে এল, তার ওপর পাখির অগাধ বিশ্বাস।

এবার আরেকটা সত্যি গল্প বলি, একজন শিশু কিভাবে ভগবানের জীবের ওপর দয়া দেখাল, সেই বিষয়ে গল্প। তোমরা সকলেই বোধ হয় ফ্লরেন্স নাইটিঙেলের কথা শুনেছ। তাঁর নাম শুনলে যে কোনো ইংরেজের মন কোমল হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মহীয়সী নারীদের একজন, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহত ইংরেজ সৈনিকদের সেবা করার কথা সবার আগে তাঁর মনে হয়েছিল।

ছোটোবেলা থেকে তিনি সর্বদা ব্যথিতদের সাহায্য আর সেবা করতে চাইতেন। তাঁর প্রথম রুগী হল একটি কুকুর। যখন তাঁর খুব কম বয়স, তখন একদিন তাঁর চেনা এক মেষপালকের সঙ্গে দেখা হল। সে লোকটির মন বড়ো খারাপ, কারণ তার অনেক দিনের পোষা, প্রভুভক্ত কুকুরটি মরতে বসেছে। কতকগুলো নিষ্ঠুর ছেলে—হয়তো নিষ্ঠুর নয়, কিন্তু ভেবেচিন্তে কাজ করে নি—কুকুরটাকে এমন ঢিল মেরেছে যে বেচারা কোনোমতে শরীরটাকে টেনে এনে মরণাপন্ন অবস্থায় বাড়ি পৌঁচেছে। কুকুরটার শেষ অবস্থা উপস্থিত। লোকটি বলল, "ওর যা দশা, ওকে এবার মেরে ফেলতেই হবে।" এই বলে ছোটো মেয়েটিকে নিজের কুটিরে নিয়ে গেল, কুকুরের অবস্থা দেখাবার জন্য। নিজে বিষণ্ণ মুখে চলে গেল আদরের কুকুরটিকে মারবার ব্যবস্থা করতে।

ফ্লরেন্স নাইটিঙেল বুক ভরা বেদনা নিয়ে, আহত কুকুরটার পাশে বসলেন। একটু পরেই দেখলেন একজন লোক কুটিরের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই লোকটি পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জানত। ফ্লরেন্স তাকে ডেকে এনে কুকুরটাকে দেখালেন। ভালো করে দেখে লোকটি বলল, "ওর অবস্থা খুবই খারাপ কিন্তু কোনো হাড়-টাড় ভাঙে নি। মাত্র একটা কাজ করতে পারো এখন, খুব গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে, নিংড়িয়ে, ঐ ক্ষতগুলোতে সেঁক দাও তো, বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাও।"

ছোটো মেয়েটি তক্ষুনি কাজে লেগে গেলেন, আগুন জ্বেলে জল ফুটিয়ে অনেক ঘণ্টা ধৈর্য ধরে সেঁক দিলেন। বুড়ো কুকুরটা ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। কুকুরের মালিক বাড়ি ফিরে এলে, ফ্লরেন্স তাকে বললেন, "এবার ওকে ডাক তো দেখি। আহা,

ডাকই-না!" বুড়ো কুকুরকে ডাকতেই সে উঠে তার মালিককে অভ্যর্থনা জানাল।

সবারে যে ভালোবাসে
তার পূজার তুলনা নাই ;
ঈশ্বর মোদের বাসেন ভালো,
সবাই যে তাঁর সৃষ্টি, ভাই।

এবার তোমরা আমাকে কথা দাও যে রোজ তোমরা প্রত্যেকে কারো না কারো জন্য একটি ভালোবাসার কাজ করবার চেষ্টা করবে। আগে হয়তো সেরকম চেষ্টাও কর নি ; আজ একটা নতুন সপ্তাহ আরম্ভ হচ্ছে, আজ থেকে করবে তো ? গত সপ্তাহটা চিরকালের মতো চলে গেছে, এ সপ্তাহটা একেবারে অন্যরকমের হোক। অঙ্ক ভুল হলে যেমন করে সেটিকে স্লেট থেকে মুছে ফেলে, আবার নতুন করে কষো, ঠিক তেমনি করে গত সপ্তাহের সব অবাধ্যতা, স্বার্থপরতা, বদ্‌মেজাজ দূর করে দিয়ে, ভগবানের স্নেহের নিয়ম সার্থক করবার জন্য রোজ প্রাণপণ চেষ্টা করতে আরম্ভ কর তো দেখি।

অক্সফোর্ডে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের নতুন ঘণ্টা-ঘর

'যা কিছু সুন্দর, সে চির-আনন্দময়'

১) শব্দ-প্রকরণের দিক থেকে ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের মূল্য

ঘণ্টা-ঘরকে ইংরেজিতে বলে 'বেলফ্রি'। ফরাসী 'বেল' শব্দ, যার অর্থ 'সুন্দর, শোভন, সুসম' এবং জর্মান 'ফ্রি' শব্দ, যার অর্থ 'মুক্ত, শৃঙ্খলহীন, সুরক্ষিত, নিরাপদ', এই দুটি শব্দ থেকে 'বেলফ্রি' কথাটির উৎপত্তি। অর্থাৎ কিনা কথাটা 'মীটসেফ' অর্থাৎ 'ডুলি'র সমতুল্য। তা ছাড়া মীটসেফের সঙ্গে ঘণ্টা-ঘরটির চেহারারও এত বেশি সাদৃশ্য যে দুটিকে অভিন্নও বলা চলে।

২) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের রচনা-শৈলী সম্বন্ধীয়

এর রচনা-শৈলীকে প্রাচীন-অপকৃষ্ট বলা চলে, খব প্রাচীন আর অত্যন্ত অপকৃষ্ট।

৩) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের উদ্ভব সম্বন্ধীয়

এত বেশি নাছোড়বান্দার মতো করে যে মনে হয় ওটাই ও দের স্বভাব আর এত বেশি বেপরোয়াভাবে যে খ্যাপামির সঙ্গে তার বিশেষ তফাত দেখা যায় না, বাইরের লোকরা জানতে চাইছেন এই কীর্তিটির উদ্ভব কোন্ মহাপুরুষের মস্তিষ্কে হয়েছিল। সদস্যদের আপত্তি সত্ত্বেও কি কোষাধ্যক্ষ মহাশয় এটি তাঁদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছেন ? নাকি এই বাক্সটি কোনো অধ্যাপকের পরিকল্পনা অনুসারে তৈরি হয়েছে, এর মাথায় ঢাকনি বসালেও দেখতে যেমন কদাকার হবে, না বসালেও তেমনি। নাকি কোনো খুঁত-ধরা আধিকারিক ঝোঁকের মাথায় এই দুষ্কর্মটি করে, উপস্থিত ও পরবর্তী পুরুষদের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন ? এই-সমস্ত এবং এই ধরনের যাবতীয় প্রশ্নের যত দিন না উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, চিরকালের মতো রহস্যটি অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

এই বিষয়টি নিয়ে গুজব কিন্তু অস্বাভাবিক রকমে সক্রিয়। কেউ কেউ বলেন যে পরিচালক সমিতি গুরুগম্ভীর ভাবে জোট পাকিয়ে এই বুদ্ধিটির উদ্ভাবন করেছেন— গোড়ায় নাকি ভেনিসের সেন্ট মার্কের চুড়োর অনুকরণে ঘণ্টা-ঘরটির তৈরি হবার কথা ছিল। তার পর একটার পর একটা সংশোধনী প্রস্তাবের ফলে এইরকম স্রেফ একটি যাকে বলে ঘন-ক্ষেত্রের আকার নিয়েছে। অন্যরা কিন্তু বলেন যে রসায়নের রীডার একটি স্ফটিকের আকারে ঘরটি করতে বলেছিলেন। আবার আরো কয়েকজন বলেন গণিতের অধ্যাপক নাকি ইউক্লিডের একাদশ খণ্ডে এই নকশাটি খুঁজে পেয়েছিলেন। মোট কথা, গুজবের আর অন্ত নেই। সৌভাগ্যের বিষয়, আসল ব্যাপারটি আমরা জানতে পেরেছি।

আসলে এই নকশার সূত্রপাত এইভাবে হয়েছিল : বিশ্বস্তসূত্রে এ কথা আমরা জেনেছি।

ঐ কলেজের অধ্যক্ষের এবং স্থপতির পক্ষে নিজেদের নাম দুটিকে যে-সব মেরামতির কাজ হচ্ছিল, তার মধ্যে প্রকটভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের মাথা থেকে এক অপূর্ব এবং অনন্য

পরিকল্পনা প্রসূত হল ; নতুন ঘণ্টা-ঘরটিকে বিশাল একটা গ্রীক অভিধানের আকারে তৈরি করতে হবে। দুঃখের বিষয় এই বুদ্ধিটাকে কার্যকরী করে তুলবার আগেই, কার্য-ব্যপদেশে ওঁদের দুজনকে কয়েক-দিনের জন্য লণ্ডন যেতে হয়েছিল। যে-কারণেই হোক ওঁদের অনুপস্থিতিতে—এ-ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত বুঝে ওঠা যায় নি—কাজটা একজন ভ্রাম্যমান স্থপতির হাতে দেওয়া হয়েছিল, সে লোকটা বলে তার নাম নাকি জীবি। আপাতত সে বেচারাকে হ্যানওয়েলে বন্দী করা হয়েছে, কাজেই তার স্মৃতির ওপর খুব বেশি অন্যায় করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলে ক্ষ্যান্ত হব যে সে বলেছিল সে নাকি একদিন অন্যমনস্কভাবে ঐ যে-সব নানারকম রহস্যময় কারিকুরি-করা রঙ-চঙে সিন্দুক পাওয়া যায়, যার মধ্যে ট্যাপারিগাছের আর আগাছার শুকনো পাতা ভরে, বলা হয়, এই হল আসল চীনা চা, এগুলো বাজারে বিক্রি করা হবে।

এইরকম চায়ের সিন্দুকের আকৃতি মনোনীত করার মধ্যে কি একটু ভবিষ্যদ্বানী শোনা যাচ্ছে না? এমন কোনো ভ্রমণকারী আছেন কি, এই মহান বিদ্যানিকেতনে পদার্পণ করে, এখানকার নবতম রূপ-সজ্জা দেখে আপনা থেকেই যাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলি ঝরে পড়বে না, "দাও টি-চেণ্ট!" অর্থাৎ "ওগো চায়ের সিন্দুক!" কিম্বা "তুমি শিক্ষা দাও!" যাই বলা যাক-না কেন।

তা হলে এটুকু স্পষ্ট বোঝা গেল যে স্কট নামক যে বিখ্যাত স্থপতিকে গৃহ-সংস্কারের ভার দেওয়া হয়েছে, ঘণ্টা-ঘরের আকৃতির জন্য তিনি দায়ী নন। শোনা যায় তিনি নাকি এই নকশাকে বলেছেন, 'কেসুস বেলি' তার মানে হল এর জন্য চাইকি একটা যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের গ্রীক ল্যাটিনের মাস্টারমশাইরা আমাকে মাপ করবেন, তাঁরা বলেন ওর সরল মানে নাকি 'বেল' অর্থাৎ ঘণ্টা রাখবার 'কেস্' অর্থাৎ আধার। স্কট হয়তো মনের ক্ষোভ জানাবার উদ্দেশ্যে ঐ মানে করেছিলেন।

লোকে বলে নীচের এই কবিতাটি নাকি স্কটের লেখা :

"ভালো করে ঘণ্টা-ঘর দেখতে যদি চাও,
ঘুপ্‌সি আঁধার দুপুর রাতে দেখতে তবে যাও।
এক চিল্‌তে দিনের আলো পড়ে যদি গায়,

ভয়ের চোটে দর্শক সবে দৌড়িয়ে পালায়।
দ্যাল-জানলা আল্‌কাতরা মেখে তখন থাকে
দেখে দেখে তবু চেনা যায় না কোনোটাকে।
ভুষ-কালি ঘরখানির ছাদ কোথা হায়?
ঐ যে গিলে চমকে গিয়ে তফাতে দাঁড়ায়।
কোণাগুলো পালা করে, এ কি দেখি বাপ!
জঘন্য সামঞ্জস্য রেখে প্রাণে দেয় চাপ।
দূরে শুনো টেম্‌স্‌ নদী ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
শিউরে ছুটিয়া চলে, করে হাঁস্‌ফাঁস্‌!
সেই সময়ে যেয়ো, বাছা, দেখতে যদি চাও,
দেখে এসো ঘণ্টা-ঘরের বিস্তার ঢালাও!
তার পরে বাড়ি ফিরে খাতায় টুকে রাখো,
'জব নিজে এই ব্যাপার সইতে পারত নাকো।' "

৪) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের স্থাপত্যের প্রধান গুণ

এর প্রধান গুণ হল সরলতা, এত খাঁটি, এত গভীর, এক কথায় এত সরল সরলতা যে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে এর বর্ণনা করা যায় না। বর্তমান ব্যবস্থাপক-সভার সংক্ষিপ্ত আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বিরলতা সম্ভবতা এই মহান কীর্তির বিনীত অনুকরণ।

৫) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের স্থাপত্যের অন্যান্য গুণ

ঘণ্টা-ঘরের স্থাপত্যের অন্য কোনো গুণ নেই।

৬) ক্রাইস্ট চার্চের ঘণ্টা-ঘরের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য দেখার উপায়

অভ্যাগত প্রথমেই এসে গ্রেট কোয়াড্রাঙ্গল্‌-এর উলটো কোণে দাঁড়িয়ে, অট্টালিকার উত্তর ও পশ্চিম দিককার সৌন্দর্যের এক মহান দর্শন পাবেন। তাঁরা দেখবেন সরলরেখাগুলি কেমন সমকেন্দ্রাভিমুখী হয়ে একটি বিন্দুতে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা জোর করে মনে করিয়ে দেয়। তার পর যদি ঐ অদৃশ্য হওয়ার বিন্দুটি থেকে মনে হয়, 'ঐ জিনিসটিও অদৃশ্য হলেই তো ছিল ভালো!' তা হলে দর্শক হয়তো লোকগীতি বর্ণিত

সৈনিকের মতো তাঁর তলোয়ারে ভর দিয়ে—(অর্থাৎ তলোয়ার যদি থাকে, আজকালকার ভ্রমণকারীরা আবার ও-সব নিয়ে সাধারণত বেড়ায় না।) অশ্রু মোচন করতে পারেন।

এর পর তিনি কোয়াড্রাঙ্গ্‌ল্‌-এর চার দিক ঘুরে প্রতি পদক্ষেপে নব-নব সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে পারবেন। ডাইয়ারের বিখ্যাত কবিতা 'গ্রংগার হিলে' যেমন আছে :

"সদাই নতুন, সদাই ভালা,
ঘণ্টা-ঘর দেখে কবে চোখ করবে জ্বালা ?"

তার পর দর্শক যখন 'ডীনারি' থেকে হলের সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকবেন এবং ঘণ্টা-ঘর ক্রমে চোখের সামনে ছোটো হয়ে আসবে, তখন তিনিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে থাকবেন এবং এতক্ষণ যে পীড়া অনুভব করেছেন তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে ঘণ্টা-ঘর যখন ক্রমে দৃশ্যপট থেকে অপসারিত হবে।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রচ্ছদপটের জন্য শিল্পী ঘণ্টা-ঘরের যে দৃশ্যটি নির্বাচন করেছেন, সেটিই হল সব চাইতে ভালো। মার্টন মেডোর ও ধারের সীমানা থেকে এই দৃশ্যের রূপমাধুরী সম্যক উপলব্ধি হয়। সেখান থেকে এই শিল্পকর্মটির অবস্থানের রোমাঞ্চময় গাম্ভীর্য বোঝা যায়—(কিম্বা সংক্ষেপে বলা যায় যে ওটি কেমন বোঝা-স্বরূপ তা জানা যায়।) চিন্তাশীল পথচারী ঐ পর্যন্ত এসে দেখতে পাবেন এক দিকে চারটি রাইট অ্যাঙ্গ্‌ল্‌, (অর্থাৎ চারটি সমকোণ) আর অন্য দিকে চারটি অ্যাঙ্গ্‌লার, (অর্থাৎ যারা ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে)। এদের কারোই ওখানে থাকবার কোনো অধিকার নেই। পথচারী তখন মানবিক জিনিসের পরিবর্তনশীলতা নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন, কিম্বা ইউক্লিড আর আইজাক্‌ ওয়াল্টনের নাম স্মরণ করতে পারবেন, কিম্বা ধূমপান, অথবা বাইসিক্‌ল্‌ চড়া, অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অন্য কিছুও করতে পারবেন।

৭) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘর থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প কি উৎসাহ লাভ করেছে

এই ঘন্টা-ঘরের কথা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে গেছে এবং হস্তশিল্পের সব বিভাগই এরই দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এরই মধ্যে এক টুপির-বাক্স-

ওয়ালা ঘণ্টা-ঘর বাক্সের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন : র‍্যাম্‌স্‌গেটের দুজন বেদিং মেশিনওয়ালাও তাঁকে অনুসরণ করেছেন ; লণ্ডনের এক বিখ্যাত সাবানের ব্যবসায়ী ঐ ঘণ্টা-ঘরের মতো চৌকস আকারে বার-সোপ কেটে বিক্রি করছেন। তা ছাড়া আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে 'বরিকে'র বেকিং পাউডার আর 'থর্লির' গবাদির খাদ্য আজকাল আর অন্য কোনোরকম বাক্সে করে বিক্রি হয় না।

৮) ক্রাইস্ট চার্চের প্রাক্তন-ছাত্ররা ঘণ্টা-ঘর সম্পর্কে কি মনে করেন

স্থানীয় রুচির এই নবতম নীচতম বিকাশ দেখে সব প্রাক্তন-ছাত্ররা বড়ো তিক্তভাবে আক্ষেপ করছেন। তাঁরা বলছেন, "গভর্নিং বডি তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু গভর্নিং মাইণ্ড্‌টা গেল কোথায় ?" প্রতিধ্বনি বলে "কোথায় ?"—এক্ষেত্রে প্রকৃতি বুদ্ধি করে খানিকটা "প্রাকৃতিক নির্বাচন" করে নিয়েছে।

'গডি' উৎসব আসন্ন, তখন অনেক প্রাক্তন-ছাত্র এখানে মিলিত হবেন। একটি প্রস্তাব এসেছে যে ভোজের শেষে প্রত্যেক অতিথিকে নিপুণভাবে পনীর দিয়ে তৈরি একটি করে ঘণ্টা-ঘরের মডেল উপহার দেওয়া হবে।

৯) ক্রাইস্ট চার্চের আবাসিক সভ্যরা কিভাবে ঘণ্টা-ঘরটাকে দেখে

ক্রাইস্ট চার্চের কোনো অধ্যাপক কিম্বা ছাত্রকে 'সিংহীর' দল নিয়ে কলেজের প্রাচীন গৃহাদি দেখাতে যাঁরা দেখেছেন—এখানে 'সিংহী' শব্দ ব্যবহার করার কারণ হল অক্সফোর্ডের নানান দৃশ্য তাঁরা সিংহীর মতো লুব্ধ ও নির্মমভাবে গিলে থাকেন—তাঁরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন নতুন ঘণ্টা-ঘর প্রথম চোখে পড়তেই আগন্তকরা কিরকম আঁৎকে উঠে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকেন।

তার পর সেই বিস্ময়কর কীর্তি সম্বন্ধে পথ-প্রদর্শকের প্রতি নিক্ষিপ্ত তাঁদের প্রশ্নবাণ যাঁদের কানে গেছে—কিভাবে, কেন, কিসের জন্য, কত দিন ইত্যাদি—তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই হতভাগ্য পথ-প্রদর্শকের দুই গণ্ডে পৌরুষের রক্তিমাভার বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করে থাকবেন ?

"সচেতন গর্ব" কয় কি একে,
উচ্চাশার এই সাফল্য দেখে,
দেখতে কি চায় অপর চোখে
নিজের আত্মপ্রসাদ লোকে ?
নাকি চটল বেজায় এই দুনিয়ার
হাস্য দেখে, এ কীর্তি চমৎকার ?
নাকি লাগছে ধাঁধা হাসছে সবে,
এমন কঠিন সমস্যাটার মানে কি তবে
বোঝাতে হবে ? নাকি লজ্জা হল
চক্ষুশূলটা কেমন করে ঢাকবে বল।
এই জায়গার ঐ সুন্দর মুখে
এমন কালি পড়ার দুখে,
পায় না স্বীকার—যায় যে জ্বলে।
বুঝত লোকে এই জায়গাটার পুত্র হলে।

১০) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের যুক্তি-সংগত ব্যবস্থাকরণ

বিষয়টিকে তিনটি সিলজিজ্‌ম্‌-এ দাঁড় করানো হয়েছে। প্রথমটি 'বারবারা' শ্রেণীর ; ঘণ্টা-ঘরের শত্রুরা নাকি এর জন্য দায়ী :—

পাথরের কাজের মধ্যিখানে কাঠের ঘর বর্বরোচিত ; খিলান আর কারিকুরির মধ্যিখানে সজ্জাহীন চৌকো আকার বর্বরোচিত ;

অতএব সবটাই হাস্যকর ও কদাকার।

দ্বিতীয়টি 'সেলারেণ্ট' শ্রেণীর ; ঘণ্টা-ঘরের বন্ধুরা এটিকে সযত্নে রচনা করেছেন :—

কর্তৃপক্ষ এই ভয়াবহ সৃষ্টিকে গোপন করতেন, যদি পারতেন ; কর্তৃপক্ষ এখন এটির দিকে তাকালে যে ক্ষোভে পূর্ণ হন, সেটি গোপন করতেন, যদি পারতেন ;

অতএব.........(পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ)

তৃতীয় সিলজিজ্‌মটি 'ফেস্টিনো' শ্রেণীর ; এটি হল ঘণ্টা-ঘরের বন্ধুদের ও শত্রুদের মিলিত প্রচেষ্টা :—

ক্রাইস্ট চার্চের পুরাতন বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনতে হলে, একটি চুড়ো গড়তে হবে ;

একটি চুড়ো গড়তে হলে দশ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলতে হবে ; অতএব আর সময় নষ্ট করলে চলবে না।

তর্ক-শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে এই তিনটি সিলজিজ্‌ম্ পাঠানো হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে তৃতীয়টির সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ যুক্তি-পারম্পর্যের অভাব ঘটেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুসারে লোকে যখন অপোগণ্ড শিশুর মতো বিশ্বাস করে যে এই ধরনের মারাত্মক ভ্রম শুধরোবার জন্য টাকা পাওয়া যাবে, এমন দশটি ক্ষেত্রের মধ্যে নয়টিতে টাকা পাওয়া যায় না। শতকরা হিসাবে এটি বড়ো বেশি।

১১) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের নাটকীয় ব্যবস্থা

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল ডীন, ক্যাননরা ও ছাত্ররা একটি টেবিলের চার ধারে উপবিষ্ট। উন্মাদ স্থপতি অদ্ভুত পোশাক পরে, মাথায় ঘণ্টা বাঁধা সঙের টুপি দিয়ে, টেবিলের উপর একটা চৌকো কাঠখণ্ড স্থাপন করল।

ডীন (হ্যামলেটের ভূমিকায়)। মনে হয় যেন দেখি ঘণ্টা-ঘর।

ক্যাননরা (চার দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)। কোথায়, মহাশয় ?

ডীন। আমার মনের মাঝে। (বাইরে করাঘাত) কে ওখানে ?

সঙ। ভূত, মশাই, একটা ভূত। বলে নাকি ওর নাম টম বেচারি।

ব্যাঙের ছাতার ছদ্মবেশ ধরে বড়ো ঘণ্টার প্রবেশ

ঘণ্টা। টম বেচারিকে কেউ কিছু দিলে ? শয়তান ও বেচারিকে টেনে নিয়ে এসেছে ইঁট-সুরকির মধ্যে দিয়ে, দড়ি-কপিকলের ভিতর দিয়ে, তক্তা-ভারা ডিঙিয়ে ; ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওর পাঁচিল, উপড়ে এনেছে ওর চাতাল, ওর পিঠে একটা কাঠের বাক্স চাপিয়ে, ওকে বানিয়ে দিয়েছে

পাথর ফেরিওলা! টম বেচারিকে কিছু ভিক্ষা দাও। টমের শীত লেগেছে।

তক্তা, কড়িকাঠ, টুকিটাকি করি,
এই খাবে টম, বহু বরষ ধরি।

সেন্‌সর। শেষ পর্যন্ত যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই!

ডীন (কিং লীয়রের ভূমিকায়)। ছোটো-ছোটো মাস্টার, টিউটর, রীডার, অধ্যাপক সবে আমাকে দেখে করে খেউ-খেউ!

সেন্‌সর। বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে আর বাকি নেই।

ডীন (হ্যামলেটের ভূমিকায়)—বাক্স দেখিছ দূরে, মনে হয় চায়ের কৌটো সম?

সেন্‌সর। আকার দেখে ঠাওর করি কৌটোই বুঝি-বা।

ডীন। মনে হয় কাপড়-রাখার আয়না যেন।

সেন্‌সর। পিঠের দিকটা তাইতো বটে।

ডীন। কিম্বা স্নানের টব।

সেন্‌সর। টবের মতোই লাগে।

ডীন। এরা বোকা বানায় মোরে, যতখানি পারে!

মঞ্চের দুই পাশ থেকে 'বক্সে'র বেশে ঘণ্টা-ঘরের আর 'কক্সের' বেশে বড়্লি গ্রন্থাগারিকের প্রবেশ

গ্রন্থাগারিক। কে তুমি বট হে?

ঘণ্টা-ঘর। তাই যদি বল, তুমিই-বা কে, বাপু?

কার্ড বিনিময়

গ্রন্থাগারিক। দেখুন মিঃ বক্স, দয়া করে আমাকে যদি এর চাইতে আরেকটু বেশি উদ্গত ধরনের ঘণ্টা-চুড়োর ব্যবস্থা দেন, তা হলে আমি বাধিত হই। উপস্থিত যেটি দিয়েছেন, তার তো কতকগুলো কোণা ছাড়া কিছু নেই, মধ্যিখানটা স্রেফ্ ফাঁকা!

ঘণ্টা-ঘর। আপনাকে খুশি করতে কি না পারি, মিঃ কক্স।

তার মাথার ওপর একটা ছাতার হাড়গোড়ের খুদে মডেল, সোৎসাহে উলটো বাগে স্থাপন

গ্রন্থাগারিক। আহা, বলুন, দয়া করে বলুন দেখি, আপনার কি কোনো গুণই নেই নাকি, শিল্পসত্তার এতটুকু চিহ্ন?

ঘণ্টা-ঘর। না, নেই।

গ্রন্থাগারিক—তবে তুমি আমার সেই বহুকালের হারানো চৌকাঠ ছাড়া কেউ নও!

পরস্পরের আলিঙ্গন-বদ্ধ হওন

এরিয়েলের বেশে কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ। সুগম্ভীর বাদ্যসংগীত

গান ও কোরাস

পাঁচ হাত চৌকো ঘর, মুখ তার হাঁড়ি,
কাঠের তক্তায় গড়া চারি দিক, ভাই।
রঙ-করা ছাই-পাঁশ আর পাটকিলে,
এ-রঙ কভু ফিকে মারে নাকো ছাই!
ক্রাইস্ট চার্চ বুঝি সুখে বদলেছে ভোল,
অক্সফোর্ডের মনে জাগে কাঁদাকাটির রোল।
মরে গেছ রূপ তাই কর হাহাকার,
ঐ শোন ঐ শোন, শেষ ঘণ্টা তার।

১২) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের ভবিষ্যৎ

এই ঘণ্টা-ঘরের ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল—অন্তত তা যদি না-ও হয়ে থাকে, এর সঙ্গে সময়ের কতটুকুই-বা সম্পর্ক, এর অতীতটি হল—আমাদের পিতৃপুরুষদের ভাগ্য ভালো—অকিঞ্চিৎকর, এর বর্তমানটি শূন্যি। কুইন্ অ্যানের রাজত্বকালে জন্মাবার এবং তারই মধ্যে, কিম্বা তার পরবর্তী রাজত্বকালে মরবার সুবিধাটা এর আগে কখনো এত বেদনাদায়ক রকমের প্রকট হয়ে ওঠে নি।

বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীরা বলেন ঘণ্টাগুলি বাজালে ঘণ্টা-ঘর ভেঙে পড়বে। তাই যদি হয়, হলের সিঁড়ির ওপরকার অমন সুন্দর থাম ও ছাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে; শিল্পজগতে এই প্রক্রিয়ার নাম হল 'বিচূর্ণীকরণ'। কিন্তু স্থপতিমহাশয় এ হেন সঙ্কটের জন্যেও প্রস্তুত আছেন। হ্যান্ওয়েল্ থেকে তিনি চিঠি লিখেছেন: "কাত হয়ে পড়বার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেলেই, ঐ থামটিকে তার উপরিস্থিত উপস্থাপনাসুদ্ধ—(বেশ কথা-দুটি, না?)—সযত্নে নামিয়ে ওটিকে 'মার্কুরি' ভবনের মধ্যিখানে বসিয়ে দিতে হবে। ওখানে রাখলে ঐ প্রাচীন

ভবনটির একটা নতুন ধরনের অঙ্গ হবে, যেমন আর কোথাও দেখা যায় না।

"অজাত বংশধররা তখন ঐ ঘণ্টা-ঘরকে একটা শূন্যস্থিত টিকিট-ঘরের মতো ব্যবহার করতে পারবে।" উদ্দাম অনুপ্রেরণায় চক্ষু পাকিয়ে স্থপতি আরো বললেন, "শূন্যে যাত্রা করবার আগে লণ্ডন-অক্সফোর্ড বেলুন ঐখানে থামতে পারবে। ঐখানে বসে অপেক্ষমান আশান্বিত যাত্রীরা বেল্-এর জীবনীর নবতম সংস্করণ পড়ে সময় কাটাবে।

১৩) ক্রাইস্ট চার্চের নতুন ঘণ্টা-ঘরের নীতি-শিক্ষা

ঐ ঘণ্টা-ঘরের জন্য ক্রাইস্ট চার্চের নীতির মান যে উন্নত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অমনোযোগী দুনিয়াকে ডেকে ক্রাইস্ট চার্চ বলছেন—(দুনিয়া অবিশ্যি সেদিকে কান না দিয়ে অন্য বিষয়ে বক্‌বক্ করে যাচ্ছে)—

"রুটি-মাখনের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে। গ্রীক্ অধ্যাপকের মাইনের ঘাটতি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে—উদাত্ত, পুরুষোচিত কণ্ঠে, এটুকু মানছি—কিন্তু কে এখন এমন কথা বলতে পারবে যে আমরা আজকাল 'চৌকস' হয়ে উঠি নি?"

এটুকুতেই অবশ্য ব্যাপারটার নীতি-শিক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। ভালো করে খুঁজলে সব জিনিসের মধ্যেই একটা নীতি-শিক্ষা খুজে পাওয়া যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাগুলোর অর্ধেকের বেশিই তো নীতি-শিক্ষা দিয়ে ভরা; বাইরনের কবিতায় কিঞ্চিৎ কম; টাপারের কবিতার সবটাই নীতি-শিক্ষা, ঐ শেষোক্ত লেখককে যদি ক্রাইস্ট চার্চের প্রাক্তন সদস্য হিসাবে, এই রচনার শেষটুকু লিখে দেবার ভার দেওয়া হয়, তবেই বোধ হয় তাঁর প্রতিভার প্রতি অতি সুষ্ঠুভাবে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

"ক্রাইস্ট চার্চের উঠোন দেখ চৌকস করে, চৌকো নয় কি সে?
চৌকো নামেই ঘনিয়ে আসে, ঘনত্ব থাকে ঘণ্টা-ঘরে মিশে।
ঘণ্টা-ঘর দেখলে ভাবো জুয়াড়ির হাতে চৌকো খুঁটি,
পড়লে ঘুঁটি আর ফেরে না, ফেরার তরে নেইকো ছুটি।
যুগে যুগে রইবে হোথা, অপরূপের পায়ে-পায়ে,
বলল জগাই এক পা গেলে, রূপ ছেড়ে যে হাসি পায়,
সরল যা রয় মাঝামাঝি, দুয়ের গুণ মাখি গায়ে।"

ফাঁকা চেক্

একটি নীতি-কথা

"স্যাম্ বললে, 'বেশ বেশ, ধরুন বাড়ি কিনলেন, তার মানে ভদ্র ভাষায় বলা হচ্ছে ক্ষেপে গেলেন। কিম্বা ধরুন বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলেন, তার মানে ডাক্তারি ভাষায় বলা হচ্ছে এ ব্যামোর চিকিচ্ছে নেই'।"

"বেলা পাঁচটার চা!"—আমাদের অমার্জিত পূর্বপুরুষরা, এক পুরুষ আগেও ও কথাগুলোর মানে সম্যক বুঝতেন না, যেহেতু ওটা যে একেবারে হালের ব্যাপার। কিন্তু মনের প্রগতি এমনি দ্রুত যে এরই মধ্যে ওটি একটি জাতীয় প্রথায় দাঁড়িয়েছে। এই প্রথা সব শ্রেণীর ও সব বয়সের লোকেদের প্রতি এমন ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য এবং এমন সর্ব রোগের ধন্বন্তরি বলে স্বীকৃত যে মহান ম্যাগ্‌নাকার্টার সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

কাজেই মার্চ মাসের এক কন্‌কনে বিকেলে, যখন ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেওয়াটাকে আপেক্ষিক ভাবে শতগুণে উপভোগ্য প্রতিপন্ন হয়, ঘটনাক্রমে আমি আমার অতিথিবৎসল পুরনো বন্ধু মিসেস নিভার্সের আরামের বসবার ঘরটিতে উপস্থিত হলাম। আমি ঘরে ঢুকতেই তাঁর চওড়া অমায়িক মুখখানি প্রফুল্ল হাসিতে ভরে গেল। দেখতে দেখতে কিছু না নিয়ে আমাদের প্রসন্ন যথেচ্ছ গাল-গল্প ক্রমে জমে উঠল, সব-রকম কথাবার্তার মধ্যে এইরকম গল্পই সব চাইতে উপভোগ্য।

জন্—মাপ করবেন, মিঃ নিভার্স বলা উচিত ছিল, কিন্তু ওঁর স্ত্রী-রত্নটি সর্বদা ওঁর বিষয়ে এবং ওঁর উদ্দেশে জন্ নামটি বলে থাকেন, কাজেই আমরা বন্ধু-বান্ধবরাও ভুলেই যাই যে ওঁর আবার একটা পদবী আছে। সে যাই হোক, উনি একটু দূরে এক কোণে, চেয়ারের তলায় বেশ করে পা গুটিয়ে এমন ভাবে বসেছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল অতখানি খাড়া হয়ে বসলে কখনোই আরাম লাগতে পারে

না, আবার এতটা গা এলিয়ে বসেছিলেন যে মনে হচ্ছিল ওতে কারো সম্মান রক্ষা হয় না। উনি নীরবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন।

দূরের কোনো জায়গা থেকে সমুদ্রের গর্জনের মতো একটা শব্দ কখনো উঠছিল, কখনো পড়ছিল এবং অনেকগুলো ছেলের উপস্থিতির মতো শোনাচ্ছিল। অবশ্য আমি আগে থেকেই জানতাম যে ঐ বাড়িটা ছোটো ছেলে দিয়ে কানায় কানায় ঠাসা এবং যদিও তাদের দুরন্তপনার আর বাঁদরামির অন্ত ছিল না, তবু মোটের ওপর ছোটো ছেলেগুলো বড়ো ভালো ছিল।

"এবার গ্রীষ্মে সমুদ্রের ধারে কোথায় যাবেন, মিসেস নিভার্স ?" আমার পুরনো বন্ধুটি রহস্যজনক ভাবে মুখ টিপে হেসে, মাথা দোলালেন। আমি বললাম, "কিছুই বুঝলাম না কিন্তু।"

"খুব বুঝেছেন, মিঃ ডি সিয়েল, আমি যতটা বুঝি ততটাই বুঝেছেন, তা-ও এমন কিছু নয়। কোথায় যাব আমি জানি না, কোথায় যাব জন্ জানে না—তবে একটা কোথাও যাব নিশ্চয়ই আর সেখানে না পৌঁছনো অবধি জায়গাটার নাম পর্যন্ত জানতে পারব না। এবার খুশি হয়েছেন তো ?"

আমার মাথাটা আরো গুলিয়ে গেছিল। আমতা আমতা করে বললাম, "আমাদের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। কিম্বা হয়তো—হয়তো আমিই পাগল হয়ে যাচ্ছি, কিম্বা—" আমাকে অপদস্থ দেখে ভদ্রমহিলা ফুর্তির চোটে হেসে উঠলেন।

তার পর বললেন, "নাঃ, আপনাকে ফাঁপরে ফেলা ভারি অন্যায়। সব বলছি, শুনুন। দেখুন, গত বছর হাজার চেষ্টা করেও কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি। জন্ বলল, 'হার্ণ বে', আমি বললাম, 'ব্রাইটন', ছেলেরা বলল, 'এমন কোথাও, যেখানে সার্কাস দেখতে পাব।' আমরা অবিশ্যি ওটাকে তত গুরুত্ব দিই নি। এদিকে এঞ্জেলা তো বড়ো হচ্ছে, ওর জন্য এবার অন্য স্কুল দেখতে হবে ; তা এঞ্জেলা বলল, 'পোর্টস্‌মাথ চল, সেখানে সোলজাররা আছে।' আর সুসান, জানেনই তো সুসান আমাদের বাড়িতে কাজ করে, সে বলল, 'র‍্যাম্‌স্ গেট'! এই-সব উলটোপালটা কথার ফলে, শেষপর্যন্ত কোথাও যাওয়া হল না। তাই গত সপ্তাহে জন্ আর আমি পরামর্শ করে ঠিক করেছি আর কখনো ওরকম হবে না। তার পর কি বুদ্ধি করেছি জানেন ?"

স্বপ্নাবিষ্টের মতো খালি চায়ের পেয়ালাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "আন্দাজে বলা অসম্ভব।"

ভদ্রমহিলা বলে চললেন, "প্রথম কথা হল যে আমাদের একটা চেঞ্জের খুবই দরকার। ঘরকন্নার কাজে বছরে বছরে আমি বেশি করে বিব্রত হয়ে পড়ছি, বিশেষত আবাসিকদের নিয়ে আর জন্ তো সর্বদা গোটা দুই আবাসিক ভদ্রলোক জোগাড় করবে। বলে নাকি তাতে ভদ্রস্থতা বাড়ে আর ওঁরা এত চমৎকার গল্প করেন যে খুব জমে। আমি যেন একাই যথেষ্ট গল্প করতে পারি না।"

জন্ বিড়্বিড়্ করে বলল, "না, ঠিক তা নয়। আসলে—" ভদ্রমহিলা বলে চললেন—(মনে হয় ওঁর স্বামীর কথা কখনো ওঁর কানে যায় না।)— "মাঝে মাঝে বেশ ভালো লোকই আসেন, কিন্তু সত্যি কথাই বলব, যখন মিঃ প্রায়র বার্জেস্ ছিলেন, আমাদের সব চুল পেকে যাবার জোগাড় হয়েছিল। ভারি মুক্ত-হস্ত ভদ্রলোক, যতখানি হওয়া সম্ভব, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড়ো খুঁতখুঁতে। বিশ্বাস করবেন, তিনটি পদ না হলে ওঁর খাওয়াই হত না। অত বড়োমানুষি করলে যে আমাদের চলে না, সে তো বুঝতেই পারছেন। ওঁর পরে যিনি এলেন, তাঁকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে শখ-সাধগুলো খানিকটা কমিয়ে না আনলে কিন্তু আমাদের বনিবনা হবে না।"

আমি বললাম, "ঠিক কথা। আরো আধ পেয়ালা পেতে পারি কি?"

যান্ত্রিকভাবে টি-পটটি তুলে নিলেন বটে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে এতই মশগুল্ হয়ে গেলেন যে মিসেস নিভার্স তার বেশি কিছু করলেন না, শুধু বললেন, "সমুদ্রের হাওয়া আমাদের দরকার, বুঝলেন। এদিকে যখন কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে মতে মিলছে না, অথচ একটা কোথাও যেতেই হবে—মোটে আধ পেয়ালা চান?"

আমি বললাম, "অনেক ধন্যবাদ। কি স্থির করেছেন বলতে যাচ্ছিলেন—"

এক মুহূর্তের জন্যও কথা না থামিয়ে চা ঢালতে ঢালতে ভদ্রমহিলা বললেন, "স্থির হল যে একমাত্র উপায় হল—চায়ের সঙ্গে ক্রীম চান বোধ হয়, কিন্তু চিনি খান না? ঠিক আছে—সমস্ত ব্যাপারটাকে—দাঁড়ান, জন্ সবটা পড়ে শোনাবে—একেবারে লেখা-পড়া করে ফেলা হয়েছে—একদম ঠিকঠাক, তাই-না, জন্? এই যে দলিলটা, জন্ পড়ে শোনাবে,

—কমা সেমিকোলন দেখে পড় গো।"

চোখে চশমা এঁটে কেমন একটা বিষণ্ণ প্রসন্নতার সঙ্গে জন্ পড়তে আরম্ভ করলেন, (বোঝাই গেল ওঁর নিজেরই রচনা) :

"ইহা দ্বারা জ্ঞাপিত হচ্ছে যে এই গ্রীষ্মাবকাশের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর জায়গার ও এঞ্জেলার জন্য একটা নতুন স্কুলের বন্দোবস্ত করার ভার সুসানকে দেওয়া হল।

"শুধু নানান পরিকল্পনা সংগ্রহ করা নয়, তার মধ্যে একটিকে মনোনয়ন করে, তার খরচপত্রের খসড়া গৃহকর্ত্রীদের কাছে পেশ করতে হবে। তাঁদের অনুমোদন পেলে ঐ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যেতে হবে এবং যাবতীয় খরচের জন্য ফাঁকা চেকটি সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

আমি আর একটি কথাও বলবার আগে দড়াম্ করে দরজা খুলে ছোটো ছেলের পল্টন এসে ঘরে ঢুকল। সবার আগে ক্ষুদে হ্যারি, তার কোলে সর্বংসহা পোষা বেড়াল; ভাঙা ভাঙা ভাষায় হ্যারি বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল যে বেড়ালকে এক পায়ে দাঁড়াতে শেখাবার চেষ্টা চলছে। স্নেহময়ী মা তাকে কোলে তুলে নাচিয়ে নাচিয়ে বলতে লাগলেন, "হ্যারি-প্যারি রাইডি-পাইডি কোচি-পোচি" অর্থাৎ "হ্যারি চড়েছে ঘোড়ার গাড়িতে টগ্-বগা-বগ্-বগ্!" তার পর বললেন, "হ্যারি আসলে পুষিকে বেজায় ভালোবাসে, তাই বলে যেন তার পিছনে লেগো না! এবার যাও দিকিনি, সিঁড়িতে খেলা কর, এই তো আমার লক্ষী ছেলে সব! মিঃ ডি সিয়েল আর আমি একটু নিরিবিলি কথা বলতে চাই।" বলতে বলতে যেমনি দুদ্দাড় করে ছেলেগুলো এসেছিল, তেমনি দুদ্দাড় করে সবাই চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে গেল, "চল! চল! খাবার ঘরে গোল্লা-ছুট্!"

অপসৃয়মান পল্টনের দিকে মোটা মোটা হাত নেড়ে আমার বন্ধু বলে যেতে লাগলেন, "মাথাগুলো বেশ, তাই-না, মিঃ ডি সিয়েল? ফ্রেনলজিস্টাররা ওদের ভারি তারিফ করেন। ক্ষুদে স্যাম্‌কে একবার দেখুন, খুব ছোটোদের মধ্যে, কিন্তু বাড়ছে কেমন, আরি বাপ! হু-হু করে বেড়েই যাচ্ছে! ওর ওজন কত আপনার ধারণাই নেই। তার পর ধরুন ফ্রেডি, ঐ যে কোণায় দাঁড়িয়ে লম্বা ছেলেটা, অন্যদের চাইতে মাপে অনেকটা বড়ো সেটা সত্যি, মাঝে মাঝে ওদের ওপর বেজায় কর্তৃত্বও করে, ওদিকে মনটা ভালো। একটু কবিতা পড়তে দিয়ে দেখুন-না,

গলে জল হয়ে যাবে, মেয়েদের মতো। তার পর ঐ যে বেঞ্জি, ভারি ভালো ছেলে, কিন্তু ওর হাত-খরচ দিতেই আমরা ফতুর! ওকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেছিল, শেষটা হাত-খরচটা বাড়িয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি। তাই দিয়েছিলাম, না জন্?" জন্ গলার ভিতর একটু গোঁ-গোঁ শব্দ করে সায় দিলেন। "তার পর আর্থারের কথাই ধরুন, যত গণ্ডগোলের মূলে, জন্ আর আমি ভেবে মরি। ওয়েস্টমিনিস্টার যাবার আগে পর্যন্ত খুব ভালো ছেলে ছিল আর্থার, সবাই ওকে ভালোবাসত, এখন যেমন হ্যারিকে ভালোবাসে। আর্থার ওদের গল্প বলত, খাসা সব ছবি এঁকে দিত। বাড়ি আঁকত, তার বেশির ভাগটাই জানলা আর ছাদ— ওকেই বোধ হয় 'হাই আর্ট' বলে। ঐ হাই আর্ট ধাঁচে একবার একটা কাচের ঘর করবার চেষ্টা হয়েছিল, গাছপালার জন্য—আর বিশ্বাস করবেন কি?—লোকটা উল বোনার কাঁটার মতো লম্বা লম্বা কতকগুলো ডাণ্ডার ওপর ছাদটা বসিয়েছিল। বলা বাহুল্য অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের ঘাড়ের ওপর ছাদটা ভেঙে পড়ল, তখন গোড়া থেকে আবার সবটা তৈরি করতে হল। সেই সময়ে আমি জন্‌কে বলেছিলাম, 'এই যদি তোমার উচ্চ শিল্পের নমুনা হয়, তা হলে আমাকে আরেকটু বেশি শিল্প দিয়ে, আরেকটু কম উচ্চতা দিয়ো।' তবে শুনেছি ওয়েস্ট-মিনিস্টারে নাকি খুব ভালো কাজ করছে। ওর মাস্টারমশাই লিখেছেন বেচারা বড়ো অ্যাস্‌ম্যাটিক—"

জন্ এখানে বাধা দিয়ে বললেন, "এস্‌থেটিক গো।" ভদ্রমহিলা বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, ঐ লম্বা লম্বা ডাক্তারি কথা আমার কাছে সব এক। আর বড়োদিনের সময় যখন বিল্ আসে, তখনো কোনো তফাত দেখি না। দুটোরই মানে—আগের বারের মতোই দেয়! সে যাক গে, মোটের ওপর ওরা বড়ো ভালো ছেলে, ওদের একটিমাত্র দোষ আছে—কিন্তু সারাক্ষণ ওদের কথা বলে বলে আপনার কান পচিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ঐ দলিলটার বিষয়ে কি মনে হল?"

দলিলটা হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিলাম, এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি যে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষটা বললাম, "আমি কি তা হলে ভুল বুঝলাম? আপনারা নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি আপনাদের ঐ কাজের লোকটির হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন না?"

সামান্য বিরক্তির সঙ্গে ভদ্রমহিলা বললেন, "ঠিক তাই বলছি।

বিশ্বাস করুন, ও ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কাজেই এখন সুসান যেখানে নিয়ে যায়, আমরা সেখানেই যাব।"

ওঁর স্বামীও তাঁর চেয়ারে দোল খেতে খেতে বিমর্ষ কণ্ঠে সুর করে বলতে লাগলেন, "সেখানেই যাব! সেখানেই যাব! সুসানের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে সে যে কি আরাম লাগছে সে আর কি বলব?"

ক্ষীণভাবে মনে হল বোধ হয় কোনো পুরনো গানে আছে, "সুসান যেথা নিয়ে যায়, সেথা যাও, সেথা যাও!" বললাম, "হতে পারে সুসানের পছন্দে কোনো খুঁত নেই ইত্যাদি, তবু একটা কথা বলি, আমি হলে সব-কিছু ওর হাতে ছেড়ে দিতাম না। ওরও একটু চেক্ থাকা দরকার—"

হাততালি দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, "ঠিক তাই, মিঃ ডি সিয়েল, সেই ব্যবস্থাই করেছি আমরা, না জন্?" প্রতিধ্বনির মতো জন্ বললেন, "সেই ব্যবস্থাই করেছি।"

ওঁর স্ত্রী বলে চললেন, "আজ সকালে ওঁকে দিয়ে ঠিক তাই করিয়েছি। উনি ওকে একটা ফাঁকা চেক সই করে দিয়েছেন, যাতে ও যত খুশি খরচ করতে পারে। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, তাই নিয়ে নিজেদের মাথা ঘামাতে হচ্ছে না, বলুন তো কি আরাম! উনি এই নিয়ে সেই ইস্তক গজ্‌গজ্ করছেন, এবার আমি ওঁকে বলে দেব আপনারও সেইমত—"

আমতা-আমতা করে বললাম, "দেখুন, আমি কিন্তু কিউ দিয়ে বানান করা চেকের কথা বলি নি—"

আমার কথা অগ্রাহ্য করে মিসেস নিভার্স বলেই চললেন, "আপনারও সেই মত। এবার উনিও নিশ্চয়ই ব্যবস্থাটাকে যুক্তি-সংগত বলে মেনে নেবেন, উনি তো সর্বদা যুক্তি মেনেই চলেন।"

এই বলে স্বামীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি দিলেন এবং ওঁর স্বামীও টেনিসনের কবিতার, ধনী ময়দা-কলের মালিকের মতো ধীর বিচক্ষণ হাসি হাসবার চেষ্টা করলেন। দুঃখের বিষয় হাসিটা যতখানি ধীর দেখাল, ততখানি বিচক্ষণ দেখাল না।

এই নিয়ে আর মেলা কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না বুঝতে পেরে, সেদিন বিদায় নিয়েছিলাম এবং ওঁরা সমুদ্রের ধারে যাবার আগে আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। তবে কাল মিসেস নিভার্সের কাছ

থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি, তার থেকে খানিকটা উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি :

মার্গেট, ১লা এপ্রিল

প্রিয় বন্ধু,

আপনি নিশ্চয় সেই নৈশ-ভোজের গল্প শুনেছেন, সেখানে আইসক্রীম ছাড়া গরম কিছু ছিল না আর সুরুয়া ছাড়া ঠাণ্ডা কিছু ছিল না। এই জায়গাটা সম্বন্ধে আমিও ন্যায্যত বলতে পারি : এখানে জিনিসের দাম, সিঁড়ি আর ডিম ছাড়া চড়া আর কিছু নেই, সমুদ্র আর সঙ্গ ছাড়া নিচু কিছু নেই, মাখন ছাড়া ঝাঁঝালো কিছু নেই, চা ছাড়া জলো কিছু নেই!

চিঠিটার ভাব থেকে মনে হল সেখানে তাঁদের খুব ভালো লাগছে না।

নীতি-শিক্ষা

বাস্তবিকই কি এইরকম একটা প্রস্তাব করা হচ্ছে—অক্সফোর্ড মহাবিদ্যালয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—ঐতিহাসিকরা এখানে যাকে তমসামময় যুগের অংশ বলে ধার্য করেন না; কোনো এস্টিমেট গ্রহণ করবার আগেই; মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সামনে কোনো পরিকল্পনা পেশ না করেই—যার উপর ভিত্তি করে উক্ত এস্টিমেট তৈরি করা যেতে পারে; পরিকল্পনার নক্‌শা আঁকার জন্য কোনো স্থপতিকে না ডেকেই; এমন-কি, স্থপতি মনোনয়ন করবার জন্য কোনো উপদেষ্টা-মণ্ডলীর ব্যবস্থা না করেই, নতুন স্কুলগুলি নির্মাণের জন্য ফাঁকা চেক্ সই করা হোক?

উডস্টক নির্বাচন

(নভেম্বর ২৪, মঙ্গলবারের দিন-পঞ্জিকা—অক্সফোর্ড ক্রনিকল-এ উড্‌স্টক নির্বাচনের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক একজন লিবারেল, কিন্তু লিবারেল ভোটদাতাদের পাশবিক আচরণ সম্বন্ধে তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে ও মুক্তকণ্ঠে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন যে আমার মনে হল এ বিষয়ে 'ইউনিভার্সিটি হেরাল্ড্'-এ একখানি চিঠি লেখা উচিত।)

ডজ্‌সনের চিঠিখানি ২৮শে নভেম্বর ১৮৬৮, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হেরাল্ড-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এই একবারই তিনি রাজনীতি নিয়ে রসিকতা করেছিলেন।

চিঠি এইভাবে শুরু হয়েছিল :

মহাশয়,

উড্‌স্টকের সাম্প্রতিক নির্বাচনের কার্যকলাপ এতই চমকপ্রদ এবং কনজারভেটিভদের পক্ষে এতদূর মর্যাদাহানিকর যে সততার কারণে একটি কনজারভেটিভ পত্রিকাও এ-বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দিতে বাধ্য, আর কিছু না হলেও ওদের ভ্রান্তপথের অন্যান্য পন্থীদের সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে। (এর পর মিঃ ডজ্‌সন অক্সফোর্ড ক্রনিকল্‌-এর বিবৃতির এক হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়ে, নিজের যুক্তি-সংগত রসবোধের মাপকাঠিতে প্রত্যেকটি অভিযোগের বিচার করেছেন।)

মহাশয়, শুনলাম যে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে কনজারভেটিভ প্রার্থী মিঃ বার্নেট, 'জনতার প্রতি ভাষণ দেবার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপাত্মক চিৎকার ও গালিগালাজের কারণে সে ভাষণের এক বর্ণও শোনা যায় নি।' ঐ-সব পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর আমার কানে যে কি ভালো লেগেছিল সে কথা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। যদিও টরিদের চাতুরি, অভিজাত-তান্ত্রিক চালাকি ও স্রেফ সংখ্যাধিক্যের পশুবলের কারণে উন্নত ও আলোক-প্রাপ্ত সংখ্যালঘুরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমি যেন ওঁদের কণ্ঠস্বরে একটা মরণোন্মুখ অতিকায় জীবের মৃত্যু-ঘণ্টা এবং ঘুণ-ধরা কনজারভেটিভ মতবাদের পতনের কর্ণভেদী নিনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম।

পরাজিত প্রার্থী মিঃ ব্রডেরিক, [জর্জ চার্লস ব্রডেরিক, (১৮৩১—১৯০৩) মার্টন কলেজের ফেলো ও পরে ওয়ার্ডেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারক, লিবারেল হিসাবে কয়েকবার পার্লামেণ্টের সদস্য হবার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন, দি টাইম্‌স্‌ পত্রিকার রাজনীতি বিভাগের প্রবন্ধকার] —'ইনি যখন এগিয়ে এলেন, তাঁকে সোৎসাহে জয়ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল ও সকলে নীরবে তাঁর কথা শুনেছিলেন।' আমি অবশ্য একবারও মনে করছি না যে কনজারভেটিভ ভোটদাতারা এতই ভণ্ড যে তাঁরাও সোৎসাহ ঐ জয়ধ্বনিতে যোগদান করেছিলেন ; আশা করা যাক

যে অধঃপতিত উড্‌স্টকেও এতখানি নীচতা গিয়ে পৌঁছয় নি। কিন্তু নীরবে তাঁর কথা শোনাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল। মহাশয়, সে কথা চিন্তা করলেও আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। এ আবার কি! এক দঙ্গল ভোটদাতা যাঁদের দেহের মধ্যে ফুসফুস আছে, ফুসফুসের মধ্যে বাতাস আছে, তাঁরা কি না নীরবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাষণ শুনলেন! এত নীচ, এত নিকৃষ্ট ব্যাপার বিশ্বাস করা কঠিন!

গালিগালাজ হয়তো তাঁদের খুব বেশি জানা নেই, (যদিও একটু মন দিলেই তাঁদের লিবারেল ভাই-বেরাদারদের কাছ থেকে কিছু কিছু শিখে নিতে পারতেন), সে যাই হোক, খানিকটা বিদ্রূপাত্মক চিৎকার তো করতে পারতেন।

ওঁদের জঘন্যতার এইখানেই শেষ নয়। বলা হয়েছে যে সফল প্রার্থী 'যখনই লোকের সামনে দেখা দিয়েছিলেন, বিশ-ত্রিশজন পুলিশের লোককে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য নিয়োজিত করতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় নি।'

এইরকমই তো হওয়া উচিত, নইলে ইংল্যাণ্ডের মানুষের ঘুঁষি থাকে কেন? কনজারভেটিভ আহাম্মুকগুলোকে হয়তো তর্ক দিয়ে বোঝানো যেত না; এমনই ওদের বুদ্ধি যে সম্ভবত গালিগালাজ ও বিদ্রূপাত্মক চিৎকারে ওঁরা কান নাও দিতে পারেন, কিন্তু কাঁধের কাছ থেকে সটাং দুটো একটা কষিয়ে দিতে পারলে, তার যুক্তি নিতান্ত মূঢ়রাও বুঝতে পারে—থান ইঁট সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে, এমন মোটা মাথা কার আছে?

এবার, মহাশয়, বিপরীত দিকটাও দেখা যাক। হ্যাম্‌লেট যেমন তার মাকে বলেছিল—ও ছবি তো দেখলে, এবার এ-ছবি দেখ। ঐ ভদ্রলোকের 'পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গে একজনও পাহারাদার না নিয়ে, সেই উল্লসিত জনতার মধ্যে দিয়ে নিরাপদে হেঁটে চলে গেলেন।'

মহাশয়, বিখ্যাত ভ্যান অ্যামবার্গ সিংহকে পোষ মানান, কিন্তু এই অভূতপূর্ব সাহসিকতার কাছে, তাঁর কীর্তিও নিষ্প্রভ মনে হয়। কনজারভেটিভ প্রার্থীর প্রতি বীর লিবারেল ভোটদাতাদের দয়া-দাক্ষিণ্য দেখে, তিনি নিশ্চয় অন্যরূপ অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন...কিন্তু তিনি কি আর জানতেন কি-সব কাপুরুষের পাল্লায় পড়েছেন! তাঁর গায়ে একটা আঁচড় দেবার কারো সাহসে কুলোল না: যেখানেই তাঁর পৌরুষের

প্রতিমূর্তি-সম চেহারাখানি দেখা গেল, সেখান থেকেই মাথা নিচু করে, নিশ্বাস বন্ধ করে অমানুষগুলো কিনা কেটে পড়ল! তাঁর অন্তরের ক্ষোভ যদি ভাষায় মুক্তি পেত, তবে কি তিনি ঐ-সব দাস-মনোভাবাপন্ন কাপুরুষের দলকে উদ্দেশ্য করে, এই কথা বলতেন না, 'কনজারভেটিভ কাপুরুষ, কোথায় গেলি সব? ব্রডেরিকের পুত্র ব্রডেরিক তোদের যুদ্ধে আহ্বান করছে! তোদের গলা কি শুধু ভোট দেবার জন্যে? নাকি রাজনৈতিক যুদ্ধ শুধু পোলিং বুথে আবদ্ধ থাকে? তা হলে কোঁকে খোঁচা দেওয়ার সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনের তফাতটা কোথায় রে ব্যাটা? পচা ডিমের মতো কোনো যুক্তি আছে রে? বার্ণেটের জন্য কেউ একটা হুঙ্কার দিলি নে? ব্রডেরিকের জন্য একটা ধিক্কার নয়? তোরা কি নিজেদের ইংলিশম্যান বলিস নাকি? হায় রে জীবন, হায় রে মরণ!'

পরিশেষে বর্তমান লেখকের জিজ্ঞাস্য হল, 'কোন দিক দিয়ে মিঃ বার্ণেট উডস্টকের প্রতিনিধি হবার যোগ্য?' অক্সফোর্ড, উদারপন্থী লিবারেল অক্সফোর্ডই সে প্রশ্নের উত্তর দিক। যতদিন এমন একটা কণ্ঠহীন, হৃদয়হীন কনজারভেটিভ সংখ্যাগরিষ্ঠতা উড্‌স্টকের মুখে কালি ঢালছে, যে তারা না পারে বিরূপাত্মক চিৎকার করতে, না পারে ঢিল ছুঁড়তে, কিম্বা শত্রুদের গাল দিয়ে বাপান্ত করতে, ততদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে মিঃ বার্ণেটই তাদের প্রতিনিধি হবার যোগ্য। কিন্তু যে-সব সাহসী লিবারেলদের বীরত্বের কথা এখানে—লিপিবদ্ধ করা হল, তাঁরা যদি কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেন তখন বাস্তবিকই এমন রাজনৈতিক উৎসাহের প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা কোনো বার্ণেটের, কোনো ব্রডেরিকের এবং সত্যি কথা বলতে কি কোনো ইংরেজ ভদ্রলোকেরই থাকবে না।

কনজারভেটিভ সৌজন্য আর লিবারেল অসহিষ্ণুতা ও অভদ্রতার এই ব্যঙ্গাত্মক বিবৃতি দেবার পর ডজ্‌সন নিজের নাম সই করেছিলেন: 'লিবারেল দলের সেরা লিবারেল' বলে।

অক্সফোর্ডে প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষা

পেল-মেল গেজেটের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

যন্ত্র-বিজ্ঞানের যতরকম সু-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং দক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হল গোঁজ বা কীলক। গোঁজের সরু প্রান্তটিকে যথাস্থানে প্রবিষ্ট করতে এত সূক্ষ্ম শক্তির দরকার হয় যে সেটুকু প্রায় চোখেই পড়ে না, কিন্তু পরিশেষে তার চওড়া প্রান্তটি এত অভাবনীয় ফল দেয় যে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

আগামী ২৪ তারিখে অক্সফোর্ডে যে সমাবেশ হবে, সেখানে ঐ প্রথম প্রক্রিয়াটির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যাবে। যাঁরা কেবল প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, এইরূপ প্রস্তাব হয়েছে যে সেদিন তাঁদের এম. এ. ডিগ্রীধারীদের সমান ভোটাধিকার দেওয়া হবে। এতাবৎ সকলেই জেনে এসেছেন যে অক্সফোর্ডের পাঠ-ক্রমের অপরিহার্য দুটি বিষয় হল ল্যাটিন ও গ্রীক, এখন থেকে ঐ দুটি ভাষার যে কোনো একটিকে বাদ দিলেও চলবে।

গোঁজের এই 'সরু মাথা'টির দিকে আমি সেই-সব ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাঁরা অক্সফোর্ডে বাস করেন না, কিন্তু যাঁরা অক্সফোর্ডের শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহী, 'মোটা মাথা'টিকে তো এখনো দূরে দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তা 'মোটা মাথা'টিকে এত ভয় কেন? প্রকৃতি-বিজ্ঞানের হাব-ভাব দেখে কি এইরকম মনে হয়েছে, কিম্বা এইরকম মনে করবার কি কোনো কারণ ঘটেছে যে এই অধিকারটুকু পেলে, ক্রমশ সে আরো বেশি বেশি দাবি করবে?

এর উত্তরে, অক্সফোর্ড মহাবিদ্যালয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ইতিহাসটি নাটকীয়ভাবে তুলে ধরতে হয়।

প্রায় পঁচিশ বছর আগেও যখন এই মহাবিদ্যালয়ের তামসিক যুগ চলেছিল, তখন আমরা গ্রীক, ল্যাটিন আর গণিত শিক্ষাকেই উদার শিক্ষা

মনে করতাম। প্রকৃতি-বিজ্ঞান তখন আমাদের দোরে বসে কান্নাকাটি করত, বলত, "আমাকে প্রবেশ করতে দাও। অনিচ্ছুক যুবকদের কেন মিছিমিছি তোমাদের ঐ-সব অ-সন্তোষজনক বিদ্যা গেলাও? অস্থির জন্য তারা কি লালায়িত নয়, সালফুরেটেড হাইড্রোজেনের জন্য তারা হন্যে হয়ে ওঠে নি?" তাই শুনে আমাদের দয়া হল। ওকে আমরা ভিতরে ঢুকতে দিলাম, রাজার যুগ্যি ঘর তৈরি করে দিলাম। রি-এজেণ্ট আর রিটর্ট দিয়ে ওর প্রাসাদ সাজিয়ে দিলাম, হাড়গোড় জড়ো করে স্রেফ একটা ভাগাড় বানিয়ে ফেললাম। তার পর আমাদের প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের ডেকে বললাম, "বিজ্ঞানের ভোজ প্রস্তুত। এসো, পানাহার করে সুখী হও।" কিন্তু সে আর তারা করল না। হাড়গুলো নেড়েচেড়ে বলল নাকি বড্ডো শুকনো। হাইড্রোজেন শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তা হলে হবে কি, বিজ্ঞানের দাবির তবু শেষ নেই, "আরো ধন দাও! আরো ধন দাও!"

তার ওপর বিজ্ঞানের ঐ যে তিনটি রূপসী কন্যা: রসায়ন, জীব-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা (মনে রাখবেন আজকালকার ঘোড়ার ডাক্তারও সেকালের সলোমনের চাইতে বেশি ফলপ্রসূ।)—এরা কিছুতেই কান্না থামায় না, "দাও! আরো দাও!" তাই দিয়েছি, জলের মতো—মাপ করবেন, এইচ-টু-ওর মতো টাকাকড়ি ঢেলেছি এবং প্রেতিনীর মতো কেমন অবলীলাক্রমে ওরা সব-কিছু গিলে বসে আছে দেখে ভেবেছি—এ কি গা-শির্-শির্-করা ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা!

এবার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠল। বিজ্ঞান এখনো কেঁদে ভাসাচ্ছে, তবে এবার অধ্যাপক কিম্বা যন্ত্রপাতির অভাবে নয়, ছাত্রের অভাবে। বিজ্ঞান বলছে, "আমাদের বেলায় যত অসুবিধা! যারা প্রাচীন ভাষা, কিম্বা গণিত শেখে তাদের জন্য কত পুরস্কার জলপানির ব্যবস্থা করে রেখেছ, তাই দিয়ে সব চাইতে ভালো ছাত্রদের আমাদের দিক থেকে ভাগিয়ে নিচ্ছ! আমাদেরও কতকগুলো চালাক, বুদ্ধিমান ছেলে কিনে দাও, তার পর দেখো আমরা কত ভালো কাজ করি!" আবার ওদের কথা শুনে আমাদের দয়া হল। হাড়গোড় কিনে দিলাম, ছেলে কিনে দিলাম। এখন ওদের ঘর-দোরে লোকজনের ভিড়—শিক্ষা দান করবার জন্য টাকা দিয়ে শুধু যে মাস্টার রাখা হয়েছিল তা নয়, উপরন্তু শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য টাকা দিয়ে ছাত্রও রাখা

হয়েছিল। এর ফলাফল নিয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, খালি এটুকু বলব যে 'অনার্স' ছাত্র ছাড়া বাকি সবাইকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে ওরা ভারি তৎপর; অথচ ঐ ফিরতি ছাত্রদেরই অধ্যাপকদের যত্ন ও শিক্ষার সব চাইতে বেশি দরকার। ওরা বলে, "এই নাও, বোকা ছেলেগুলোকে ধর। ওদের ওপর এক ছুরি চালানো যেতে পারে, তা ছাড়া ওরা কোনো কর্মের নয়।" বলা বাহুল্য জ্যান্ত মানুষ কেটে গবেষণা চালানোর আইন পার্লামেণ্ট এখনো প্রণয়ন করেন নি।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মহড়া এখনো চলছে; অভিনেতারা এখনো সাজঘর থেকে ছুটোছুটি করছে, তাড়াহুড়ো করে নতুন পোশাক পরছে, তাও আবার গায়ে হচ্ছে না; তবে এর পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব শক্ত নয়। অনতিবিলম্বে আমাদের সেই প্রাক্তন ভীরু অশ্রুময়ী অতিথিকে যে ভোজ্যবস্তু দেওয়া হবে, তাই দেখে সে নাক সিঁটকাবে, বলবে, "আমাকে আর ঐ-সব ছেলে-ছোকরা দিয়ো না তো, তার বদলে অপর্যাপ্ত টাকা আর একটু চিন্তা করবার অবকাশ দিয়ো। প্লেটো আর অ্যারিস্টটল্ নিজেদের পেশায় মন্দ ছিলেন না, কিন্তু আমি চাই ডায়োজিনিজকে আর যে টবে চড়ে তিনি জনসাধারণকে বক্তৃতা দিতেন।" এই পরোক্ষ উল্লেখটি খুব অপ্রাসঙ্গিকও নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে ঐ দীনহীন আস্তানার ভিতরে ঐ আত্মগোপনকারী দার্শনিক যে-সব গবেষণা করেছিলেন তার খানিকটা ছিল খাঁটি বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ কীট-বিজ্ঞান-বিষয়ক।

আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে অক্সফোর্ডে গবেষণা একটা অভিনব ব্যাপার। আবহমান কাল থেকে আমরা আমাদের বাছাই করা প্রফেসার নামধারী গবেষকের দলকে রেখেছি। এঁরা চার দিক দিয়ে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন। এ কথা অবশ্য সত্যি যে আজকালকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যেমন চান, ওঁদের ততখানি নিঃসঙ্গতা দেওয়া হয় নি। আমরা আশা করে থাকি যে তাঁদের গবেষণার ফলাফলের অস্তিত্ব এবং বাস্তবতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা কয়েকটি 'লেকচার'ও দেবেন। তবে সেটাও সেরকম বাধ্যতামূলক নয়, যেমন গ্রীকের প্রাক্তন প্রফেসার ডঃ গেস্ফর্ড ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছিলেন, বিদ্যালয় সে বিষয় এতটা সচেতন ছিল

যে তিনি যে তাঁর পদোপযোগী কর্তব্য পালন করছেন না, কোনো লেকচারও দিচ্ছেন, সে বিষয়ে কোনোদিনও উচ্চ-বাচ্য করে নি।

এবার গোঁজের 'মোটা মাথা'র কথায় আসা যাক। কথাটি হল: পাঠক্রম থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক উভয়ই অন্তর্ধান করতে পারে। তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাসও তাদের অনুসরণ করতে পারে এবং অক্সফোর্ড মহাবিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ একদিন এমন সব লোকের হাতে ন্যস্ত হতে পারে যাদের বিজ্ঞান ছাড়া অপর কোনো বিদ্যার বালাই নেই। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে—"তা হবে নাই-বা কেন?" বিজ্ঞান কি শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যান্য বিভাগের চাইতে কোনো দিক দিয়ে কম যায়? বাস্তব তথ্য দিয়েই এই প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে। আমি শুধু আমার যৎসামান্য সাক্ষ্য দিতে পারি, অন্যরা সেটার অনুমোদন কিম্বা বর্জন করুন। এক সময় সকলের এইরকম ধারণা ছিল যে শিক্ষিত লোকমাত্রেরই নিজের মাতৃভাষা সুন্দরভাবে না হলেও, অন্তত নির্ভুলভাবে লিখতে পারা উচিত। এখন সন্দেহ হচ্ছে এই বিচার আর কতদিন চলবে। অল্প কয়েক বছর আগে "অ্যান্থ্রপলজিকেল রিভিউ"-এর কিম্বা ঐ ধরনের কোনো পত্রিকার কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য করার সম্মান লাভ করেছিলাম। লেখকরা নিঃসন্দেহে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন; অন্যরা যে-সমস্ত মতামত পেশ করেছিলেন তার অ-যথার্থতা প্রমাণ করতে নিশ্চয়ই তাঁরা প্রশংসনীয়ভাবে সক্ষম ছিলেন; সকলেই নিশ্চয়ই এক বাক্যে রায় দিতেন যে নবতম কোনো জর্মান গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে এক বছর আগেকার যাবতীয় মতামত একেবারে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই-সব চিন্তাগুলো যতই সান্ত্বনাদায়ক হোক-না কেন, শিক্ষিত-সমাজের ধার-কাছের ভাষায় সেগুলি প্রকাশ করা ছিল তাঁদের সাধ্যের বাইরে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, মফঃস্বলের কোনো পত্রিকার "স্থানীয় সংবাদের" বিভাগেও, কখনো আমি এমন আনাড়ি ও শোচনীয় ভাষা পড়ি নি।

লোকে হয়তো বলবে যে এইরকম দুটো-একটা দোষ ধরে দেওয়াতে আমার খুঁতখুঁতে স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, বিজ্ঞানের জগতে আজকালকার কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ মনীষীর সন্ধান পাওয়া যায়। এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, আমার বক্তব্য হল যে ঐ বিজ্ঞান ওঁদের সৃষ্টি, ওঁরা বিজ্ঞানের সৃষ্টি নন। অন্য ক্ষেত্রে গেলেও ওঁরা

সমান খ্যাতি অর্জন করতেন। একটা সাধারণ নীতি হিসাবে, আমি মনে করি একটিমাত্র বিষয় নিয়ে প্রচুর চর্চা করাকে শিক্ষা বলে না। আমার শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে কোনো ছাত্রের যদি শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানে অসাধারণ দক্ষতা থাকে, তাতে অনুশীলনের উচ্চ মান ও প্রচুর জন্মগত প্রতিভা প্রমাণ হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় দেখা যায় যে সেইসঙ্গে ঐ ছাত্রের ব্যাপক অজ্ঞতা আর বুদ্ধির মান সাধারণের চাইতে নিকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

এই-সব কারণে অক্সফোর্ড মহাবিদ্যালয়ের বাইরের লোকদের আমি এই বিষয় অবহিত হতে বলি যাতে অক্সফোর্ডের আবশ্যিক পাঠক্রম থেকে গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষা বাদ দেওয়া না হয়। এ কথা আমি ঐ বিষয়ের শিক্ষক হিসাবে বলছি না, তা হলে লোকের সন্দেহ হতে পারে যে আমার সেদিকে একটা পক্ষিপাতিত্ব থাকাই স্বাভাবিক। বরং ঠিক তার উলটো, আমি এই বিদ্যালয়ে কুড়ি বছরের বেশি সময় বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করছি। যদিও জীব-বিজ্ঞানীরা গণিতের সিদ্ধান্তের অস্বাভাবিক নিশ্চয়তার কারণে ঐ বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ কৃপার চক্ষে দেখেন, তবু গণিত-শাস্ত্র আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিষয় বলেই স্বীকৃত। ইতি।

চার্লস্ এল্ ডজ্‌সন

গণিতের অধ্যাপক, ক্রাইস্ট চার্চ অক্সফোর্ড।

চিঠিপত্র

সত্যি কথা বলতে কি, ছোট্টো বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠি-পত্রের মধ্যে লুইস ক্যারলের সদাশয় রসিক মেজাজটি যত পরিষ্কার ধরা পড়ে, তেমন বোধ হয় আর কিছুতে নয়। কখনো সাধারণভাবে শিশু ও কিশোর পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যে ছেপে বার করার জন্য লেখা, কখনো ব্যক্তিগত পত্রালাপ।

প্রথম খণ্ডে দুরকমেরই কয়েকটি চিঠি গ্রথিত হয়েছে। এই খণ্ডের দুটি চিঠিই ব্যক্তিগতভাবে লেখা।

চিঠি-পত্র

ক্রাইস্ট চার্চ, অক্সফোর্ড,
জানুয়ারি ২২, ১৮৭৮

প্রিয় জেসি,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল ; এমন ভালো লাগা অনেক দিন হল পাই নি আর কিছু থেকে। এই সূত্রে বরং আমার ভালো লাগা সম্পর্কে কয়েকটা খবর তোমায় জানিয়ে রাখি, যদি কখনো আমার জন্মদিনে কোনো উপহার দিতে ইচ্ছে করে তোমার, (আমার জন্মদিন আসে সাত বছর বাদে বাদে, যে এপ্রিল মাসে পাঁচটা মঙ্গলবার পড়ে, তার শেষ মঙ্গলবারে) তখন আন্দাজ করতে পারবে, কী দিলে ভালো হয়। তা হলে শোন, আমি ভীষণ ভালোবাসি ঝাঁঝালো রাই সর্ষে বাটা—অবশ্য তার গায়ে মাংসের ফালি লাগানো থাকা চাই ; আর ভালোবাসি লাল চিনি– অবশ্য তার সঙ্গে খানিকটা আপেলের পুডিং মেশানো থাকা দরকার, যাতে খুব মিষ্টি হয়ে না পড়ে ; তবে, সত্যি কথা বলতে কী, সব চেয়ে ভালোবাসি বোধ হয় নুন—তবে অবশ্য তারও সঙ্গে বেশ খানিকটা ঝোল মেশানো থাকা চাই। আসলে, ঝোলটা দরকার, যাতে নুনটা শুকনো খড়খড়ে না থাকে, গলিয়ে বেশ মোলায়েম করে ফেলে। এ-সব ছাড়াও আমার আরো কিছু কিছু জিনিস ভালো লাগে, যেমন, আলপিন—অবশ্য আলপিনদের ঘিরে একটা কুশন থাকা

দরকার, যাতে ওদের শীত না করে। আর, আমার ভালো লাগে কয়েক গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—অবশ্য গজাবার জন্য তার তলায় একটি ছোট্টো মেয়ের মাথা থাকা দরকার, তা না হলে দরজা খুললেই আলগা চুলগুলো সব ঘরময় ছত্রাকার হয়ে যাবে, আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্যালিকে বোলো, ও যে সেই চোর আর পাঁচটা আপেলের ধাঁধাটা বার করতে পেরেছে, সেটা খুব সুখের কথা। কিন্তু, জিগেস কোরো তো, শেয়াল, হাঁস আর শস্যের দানাভরা বস্তার সেই ধাঁধাটা পারে কি না! একটা লোক বাজার থেকে ফিরছিল ঐ তিনটি জিনিস নিয়ে, পথে তাকে নদী পার হতে হবে। নৌকো এত ছোটো যে, এক-এক বারে যে কোনো একটাকে সঙ্গে নেওয়া চলে, বাকি দুটোকে পাড়ে রেখে আসতে হয়; একটাকে ওপারে রেখে ফিরে এসে আবার একে একে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কিছুতেই শেয়াল আর হাঁসকে তো একসঙ্গে রাখা যায় না, খেয়ে ফেলবে; আবার হাঁস আর থলেভরা দানাও একজায়গায় রেখে যাওয়া যায় না, হাঁস সব দানা খেয়ে ফেলবে। দেখা যাচ্ছে, একমাত্র শেয়াল আর শস্যদানাকেই একসঙ্গে রাখা চলে, কারণ শেয়ালে দানা খায় না, আর দানা তো শেয়ালকে কখনই খায় না। ওকে বলে দেখো না, ধাঁধাটা পারে কি না!

মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে পরে—ধরো, দু বছরে একবার করে; তা হলে, বছর দশেকের মধ্যে আমরা বেশ বন্ধু হয়ে যাব, তাই-না? যখনই মন চাইবে চিঠি লিখ, খুব খুশি হব; স্যালিকেও লিখতে বোলো, চেষ্টা করে দেখুক হাত দিয়ে লেখা বেরোয় কি না। যদি হাত দিয়ে না পারে, পা দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে বোলো; অনুস্বরে পায়ের লেখা ভারি সুন্দর হয়। ওকে, কেট্‌কে আর হ্যারিকে আমার ভালোবাসা দিয়ো—নিজের জন্যে খানিকটা রেখে অবশ্য।

—তোমার আদরের বন্ধু,

লুইস ক্যারল।

তোমার মায়ের চিঠি এইমাত্র পেলাম, তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো।

ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ
মে ২২, ১৮৮৭

প্রিয় উইনি,

নাঃ, থাক ; চিঠিটা এত বড়ো যে, পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যাবে। কাজেই ইতি লিখে নাম সই করে দিলাম,

প্রীতিনিলয়,
সি. এল. ডজ্‌সন।

পুনশ্চ—'ক্যাসল ক্রোকে' খেলার বিবরণ দু কপি পাঠালাম এই-সঙ্গে।

পুঃ পুনশ্চ—'মিস্ স্টিভেন্‌স'-এর বদলে 'উইনি' আর 'বিশ্বস্ত'-এর বদলে 'প্রীতিনিলয়' লিখতে যে মনে মনে কত লড়াই করতে হয়েছে, ধারণাও করতে পারবে না।

পুঃ পুঃ পুনশ্চ—পরের বছরের পরের বছর, বা ঐরকম কোনো বছরে তোমায় নিয়ে আবার হয়তো কোনোদিন বেড়াবার সুযোগ পেতে পারি। ততদিনে হয়তো তোমার কপালে ভাঁজ পড়ে যাবে। তা হোক গে বয়ে গেল! সঙ্গে বুড়ো-বুড়ি কেউ থাকলে নিজেকে বেশ খোকা-খোকা দেখায়। আমি তো চাই, লোকে বলাবলি করবে, "আরে! ঐ বুড়ি থুখুড়ির সঙ্গে অমন চমৎকার ছেলেটি কে রে! আগলে আগলে চলেছে, যেন বুড়ি ওর ঠাকুমারও মা, ও নিজে যেন পুতিটি!"

পুঃ পুঃ পুঃ পুনশ্চ—আর লেখার সময় নেই।